মেয়েদের পাতঞ্জল।

"কুরুতে গঙ্গাসাগরগমনং, ব্রতপরিপালনমথবা দানম;
জ্ঞানবিহীনে সর্ব্বমনেন, মুক্তির্ন ভবতি জন্মশতেন॥"

ডাক্তার শ্রীচণ্ডীচরণ পাল কর্ত্তৃক
সঙ্কলিত।

জ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম হইতে
শ্রীমৎ নিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

জ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম,
১২ নং বৃন্দাবন পালের লেন, শ্যামবাজার, কলিকাতা।
সন ১৩৩৭ সাল, আষাঢ় মাস, ইংরাজী ১৯৩০।

প্রাপ্তিস্থান :—

১। গ্রন্থকার—"জ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম,"—
১২ নং বৃন্দাবন পালের লেন, শ্যামবাজার, কলিকাতা।

২। ডাঃ শ্রীকানাইলাল পাল। পোঃ ভাটপাড়া, ২৪ পরগণা।

৩। ডাঃ শ্রীবলাইলাল পাল। পোঃ কাঁচরাপাড়া, ২৪ পরগণা।

ইউনাইটেড প্রেস।
২৯ নং গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শ্রীগোপালচন্দ্র পাইন দ্বারা মুদ্রিত।

ভূমিকা।

আমরা জাগরিত না নিদ্রিত? আমরা জাগরিত নহি—আমরা নিদ্রিত বা মৃত। আমাদের মধ্যে কেহ কেহ নিদ্রিত এবং কেহ কেহ মৃত। যাহারা নিদ্রিত তাহাদের জাগিবার সম্ভাবনা আছে, আর যাহারা মৃত তাহাদের জাগিবার সম্ভাবনা নাই। নিদ্রিত ব্যক্তির গাত্রে ধাক্কা মারিয়া জাগান যায়, কিন্তু মড়ার গায়ে ধাক্কা মারিয়া জাগান যায় না। জাগরিত কাহারা?—যাহারা নিজেকে ভুলিয়া যায় নাই—যাহাদের আত্মবিস্মৃতি হয় নাই। মড়া নিজেকে ভুলিয়া গিয়াছে—মড়ার আত্মবিস্মৃতি হইয়াছে। আত্মস্মৃতিই জাগরণ, আর আত্মবিস্মৃতিই নিদ্রা বা মৃত্যু। আমাদের এ নিদ্রাকে মোহনিদ্রা বলে। মোহ আমাদের আত্মাকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। মোহ আমাদের আত্মাকে দেখিতে দিতেছে না। মোহের আবরণে আমরা আত্মদর্শন হইতে বঞ্চিত হইয়া রহিয়াছি।

আমরা সকলেই কি নিদ্রিত? আমরা প্রায় সকলেই নিদ্রিত এবং অনেকেই মৃত। আমাদের সহস্রের মধ্যে মাত্র এক জন এই নিদ্রা হইতে জাগরিত হইবার চেষ্টা করিতেছে—তাহারাই নিবৃত্তি-পথের সাধক। তাহারা বিষয়াসক্তি ত্যাগ করিয়াছে। তাহারা বিষয় যে বিষস্বরূপ—তাহা জানিয়াছে। নিদ্রিত ব্যক্তির বাহ্যজ্ঞান থাকে না। নিদ্রিত ব্যক্তিকে ধাক্কা মারিলে বা আহ্বান করিলে সে জাগিয়া উঠে; কিন্তু মৃত ব্যক্তি আর জাগে না। তাহাকে কেহ জাগাইতে পারে না। যাহারা বিষয়বিষে জর্জ্জরিত হইয়া বিষয়ের যন্ত্রণা অনুভব করিয়াছে—তাহারাই জাগিবে। আর যাহারা বিষয়ের যাতনা অনুভব করিতে পারিতেছে না—যাহাদের এই যাতনা অনুভব করিবার শক্তি নাই—তাহারা মৃত—তাহারা জাগিবে না।

আত্মস্মৃতিই সুখ, আর আত্মবিস্মৃতিই দুঃখ। যাহাদের সাধন করিবার ইচ্ছা জাগিয়াছে, তাহারাই জাগরিত হইবে। আমরা এতই বিষয়লম্পট যে, সাধন করিবার ইচ্ছামাত্রও আমাদের জাগে না। আমরা এতই চৈতন্যবিহীন শব হইয়া গিয়াছি যে, সংসারের এত জ্বালা সহ্য করিয়াও—তাহার নিষ্কৃতির জন্য কোন চেষ্টা করিতেছি না। সৎসঙ্গ কর—সৎসঙ্গ করিলে এসব ভ্রম বিদূরিত হইবে। কিন্তু সৎসঙ্গও দুর্লভ। বিষয়ীর সঙ্গ সৎসঙ্গ নহে। সংসারীর সঙ্গ সৎসঙ্গ নহে। যাহারা বিষয়ে আসক্ত তাহাদের বিষয়ী বলে। যাহারা সংসারে আসক্ত তাহাদের সংসারী বলে। ইহাঁদের সংসর্গ সর্ব্বথা পরিত্যজ্য। বিষয়ে আসক্তিবিহীন ও সংসারে আসক্তিবিহীন মানবই সৎ। ইহাদের সঙ্গকে সৎসঙ্গ বলে। আমরা যাহাদের সঙ্গ করি—তাহারা প্রায় সকলেই বিষয়াসক্তিযুক্ত। এমন কি সাধুদের পবিত্র আশ্রমে বা মঠে গিয়াও আসক্তিবিহীন সাধুদর্শন হইবে না। সেখানে তাহারা, হয় অর্থের, না হয় যশের ভিখারী। এই হেতু সৎসঙ্গ অতি দুর্লভ। এরূপ অবস্থায় সর্ব্বদা সৎশাস্ত্র পাঠ করিবে। সর্ব্বদা সৎশাস্ত্র পাঠ করিতে করিতে তোমার চিত্ত বিশুদ্ধ হইবে ও তুমি ভগবানের অনুগ্রহ লাভ করিবে। ভগবানের অনুগ্রহ লাভ করিলে তোমার সৎসঙ্গ জুটিবে। ভগবানের অনুগ্রহ ব্যতীত সৎসঙ্গ লাভ হয় না। যাহার সৎসঙ্গ লাভ হইয়াছে—সে ভগবানের অনুগ্রহ লাভ করিয়াছে। জীবনে সৎসঙ্গলাভ মহা ভাগ্যের কথা। একবার সৎসঙ্গ লাভ হইলে আর সে সঙ্গ পরিত্যাগ করিও না—সৎশাস্ত্রের আলোচনা ও সৎসঙ্গ লইয়া দিবারাত্র থাকিবে। যাহারা দিবারাত্র সৎশাস্ত্র ও সৎসঙ্গ লইয়া থাকে, তাহাদের মুক্তি অতি নিকট। যাহারা সৎশাস্ত্র ও সৎসঙ্গের বিরোধী, তাহারা পামর—তাহারা কোনমতেই নিষ্কৃতি পাইবে না।

চিত্তের সংস্কার হইতে আমাদের মনের মধ্যে ইচ্ছার উদয় হয়।

অসৎ ইচ্ছাকে একেবারে ত্যাগ করিবে। অসৎ চিন্তা মনে উঠিলেই—তাহাকে জোর করিয়া মন হইতে তাড়াইয়া দিবে, সদিচ্ছা উঠিলে, সেই সদিচ্ছাকে পালন করিবে। সেই সদিচ্ছার অনুবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিবে। দিবারাত্র সদিচ্ছা লইয়া থাকিলে, আর তোমার মনে অসদিচ্ছা স্থান পাইবে না। এই প্রকারে চিত্তের সংস্কার ধ্বংস হইবে। সর্ব্বদা ফলকামনাশূন্য হইয়া কার্য্য করিবে। ফলকামনা-সহকারে কার্য্য করিলে, চিত্তে পুনরায় সংস্কার সঞ্চিত হইবে, আর ফলকামনাশূন্য হইয়া কার্য্য করিলে আর নূতন সংস্কার পড়িবে না। একেবারে ফলকামনাশূন্য হওয়া বড় কঠিন; এইজন্য ঈশ্বর-প্রীত্যর্থে কর্ম্ম করিবে। "আমরা ঈশ্বরের দাস এবং দাসী—তিনি প্রীত হইবেন এইজন্য আমরা কর্ম্ম করিতেছি। কর্ম্ম আমাদের ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য নহে।" ঈশ্বরপ্রীতির জন্য কর্ম্ম করিয়া—চিত্তের সংস্কার ক্ষয় করিবে। এইরূপে চিত্তসংস্কার ক্ষীণ হইলেই—তোমার মোহাবরণ কাটিয়া যাইবে। তখন তুমি জাগরিত হইবে—তখন তুমি মুক্ত হইবে। আর যদি বিষয়কেই শ্রেয়ঃ বলিয়া বোধ কর—যদি বিষয়াসক্তি ত্যাগ না কর, তাহাহইলে, তোমার এই জন্মমৃত্যুপ্রবাহ ঘুচিবে না। দুঃখের হাত হইতে কোন মতেই নিষ্কৃতি পাইবে না। জাগ! জাগ! আর ঘুমাইও না—মোহনিদ্রা পরিত্যাগ কর। করুণ-হৃদয় ঋষিগণ তোমায় আহ্বান করিতেছেন—জাগ! জাগ! তাঁহাদের আহ্বানে যদি তোমার নিদ্রা না ভাঙ্গে; তাহাহইলে, তুমি মৃত। তোমার উদ্ধার সুদূরপরাহত—তুমি কোন মতেই দুঃখের হাত হইতে নিস্তার পাইবে না। তোমাকে অনন্তকাল পর্য্যন্ত এই দুঃখভোগ করিতে হইবে।

জীবনে অনেক কষ্ট ভোগ করিয়াছি। রিপুর প্রলোভনে পড়িয়া পশুর কার্য্য অনেক করিয়াছি। নিজেকে কখনও পশু বলিয়া ভাবি

নাই। পশুর কার্য্য করিয়াও নিজেকে মানুষ বলিয়া ভাবিতাম। মানুষ যে কি, তাহা জানিতাম না। মানুষের জীবনের কর্ত্তব্য কি, তাহা জানিতাম না। বিষয়সঞ্চয়ই জীবনের একমাত্র সার্থকতা বলিয়া জানিতাম। এক্ষণে ভুল ভাঙ্গিয়াছে। কর্ত্তব্যের পথ পাইয়াছি। নির্ম্মল শান্তিসুখ কাহাকে বলে, জানিয়াছি। প্রবৃত্তিপথের মরীচিকাভ্রান্তি ঘুচিয়াছে। নিবৃত্তিপথের স্নিগ্ধ সমীরণ আজ ত্রিতাপের সন্তাপ হরণ করিতেছে। নিবৃত্তিপথ ভিন্ন মানুষের সুখশান্তির আর অন্য কোন উপায় নাই। প্রবৃত্তিপথে একটুও সুখ নাই। তাই মনে হয় যে আমার ন্যায় ভ্রান্ত কুপথগামী পথিককে যদি যথাসময়ে সুপথ দেখাইয়া দিতে পারি, তাহাহইলেও,এই ঘৃণিত পশুজীবনের কতকটা সার্থকতা হয়।

যথাসময় কি? যৌবনের পূর্ব্ববর্ত্তী কালই যথাসময়। আমাদের দেশের বালকবৃন্দ যদি কৌমার অবস্থায় এই পতঞ্জলি ঋষি প্রদর্শিত পথের সন্ধান পায়, তাহাহইলে, অনেকেই সুপথে আসিবে। ঋষিবাক্য, সত্যবাক্য। ঋষিবাক্যের পালনে আমাদের মঙ্গল ব্যতীত অমঙ্গল হয় না। ঋষিপ্রদর্শিত পথই প্রকৃত পথ। স্বার্থত্যাগী ঋষিরা আমাদের যে সকল উপদেশ দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের কোনও স্বার্থ নাই। জীবের দুর্দ্দশায় ব্যথিত হইয়া, তাঁহারা এই অমূল্য রত্ন আমাদের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন। আমরা সেই রত্নকে পা দিয়া ঠেলিলে, আমাদেরই ক্ষতি। জীবনের যথাসময়ে এই উপদেশের আভাস পাইলে, নিজের জীবনকে অনেক উন্নত করিতে পারিতাম। তাই আজ ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলিকে তাহাদের অমূল্য সময় বৃথা ব্যয় করিতে দেখিলে কষ্ট হয়। ইহাদের সুপথ দেখাইবার কেহই নাই। ইহারা বড়ই নিরাশ্রয়। ইহারা বন্ধুহীন। ইহারা চতুর্দ্দিকেই শত্রুবেষ্টিত। তাই আজ মুমূর্ষু বৃদ্ধদিগের যাতনা দেখিয়া বড় কষ্ট হয়। ইহারা জীবনে নিরাশ হইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়াছে, আর প্রতিমুহূর্ত্তে মৃত্যুযন্ত্রণা

অনুভব করিতেছে। পুত্রকলত্র, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়কুটুম্ব বা ধন দৌলতাদিতে ইহারা তিলমাত্র শান্তি পাইতেছে না। সমুদয় জীবনটা বৃথায় কাটাইয়া গেল। নিজের কোন কাজ করিতে পারিল না। যাহা উপার্জ্জন করিয়াছিল, তাহার সমুদয়ই ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে। কোথায় যাইতে হইবে, তাহাও জানে না। দেহত্যাগের কিছু পূর্ব্বেও যদি তাহারা সুপথের সন্ধান পায়, তাহাহইলেও, তাহাদের জীবনের কতকটা সার্থকতা হয়।

আজকাল অনেক পাতঞ্জলদর্শন ছাপা হইয়াছে, কিন্তু পণ্ডিত ব্যতীত সাধারণ জনসম্প্রদায় তাহার মর্ম্মগ্রহণ করিতে পারে না। আবার শুদ্ধ পাণ্ডিত্যে দর্শনের মর্ম্মগ্রহণ করা যায় না। কারণ সাধন ভিন্ন ইহার মর্ম্মগ্রহণ অসম্ভব। জীব ধর্ম্ম করিবে কেন? ধর্ম্ম করিয়া তাহার কি লাভ হইবে? ধর্ম্ম না করিলেই বা কি ক্ষতি হইবে? প্রকৃত ধর্ম্ম কি? প্রকৃত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান কি? প্রকৃত সাধু কাহাকে বলে?—এগুলি সাধারণ লোক জানে না। জানিয়া শুনিয়া কেহ কি কখনও অগ্নিতে হাত দেয়? তাই সাধারণ লোকের জন্য এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইল। পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্যক্তির জন্য নহে।

জগতে নানা প্রকৃতির লোক আছে। প্রকৃতি অনুযায়ী তাহারা পদার্থ দর্শন করে। কেহ একপ্রকার খাদ্য খাইতে ভালবাসে, আবার অপরে তাহা খাইতে ঘৃণা করে। কেহ নাটক নভেল ভালবাসে, আবার অপরে তাহা ঘৃণা করে। কেহ চুরি করিতে ভালবাসে, আবার অপরে তাহা ঘৃণা করে। কেহ পরনিন্দা ভালবাসে, আবার অপরে তাহা ঘৃণা করে। কেহ অপরের অনিষ্ট করিতে ভালবাসে, আর কেহ অপরের উপকার করিতে পারিলে সুখী হয়। এইজন্য এই পাতঞ্জলখানিও পাঠ করিয়া কেহ সুখী হইবে এবং অপর কেহ বা অন্তর্দ্দাহ অনুভব করিবে। বর্ত্তমান সময়ে দেশে পূর্ণ অশান্তি

বিরাজিত। শান্তি আমাদের মনে, আর অশান্তিও আমাদের মনে। যাহার মন যত নির্ম্মল, তাহার মনে তত শান্তি বিরাজ করিতেছে। যাঁহাদের হৃদয় উচ্চ, যাঁহাদের মনে রাগ, দ্বেষ, কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি আবর্জ্জনা নাই, তাঁহারা এই গ্রন্থকে সুচক্ষে দেখিবেন এবং ঋষিপ্রদর্শিত পথে চলিবার জন্য প্রাণপণ করিবেন।

মানবজন্ম দুর্লভ জন্ম। বিশেষতঃ ভারতবর্ষে জন্ম আরও দুর্লভ। ভারতবর্ষে জন্ম ঐহিক অর্থ বা সম্পদ্ লাভের জন্য নহে। ভারতবর্ষে জন্ম পরমার্থ লাভের জন্য। ভারতের শিক্ষা, ভারতের দীক্ষা মানুষের অসুরভাবকে বিনষ্ট করিয়া দেবভাবে পরিণত করে। যে শিক্ষায় মানুষকে দেবতা করিতে পারে না—সে শিক্ষা কুশিক্ষা। যে বিদ্যায় মানুষ অসুরত্ব ত্যাগ করিতে পারে না—সে বিদ্যা অবিদ্যা। অসুর-ভাবে সুখ নাই—অসুরভাব দুঃখে পরিপূর্ণ। মানুষ এই দুঃখের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে চায়। দুঃখের হাত এড়াইতে হইলে অসুরভাব ত্যাগ করিতে হইবে। ধর্ম্মকে জীবনের ভিত্তি করিতে হইবে। যে কার্য্যের ভিত্তিতে ধর্ম্ম নাই—তাহার অধঃপতন হইবে। যে অনুষ্ঠানের ভিত্তি ধর্ম্মবিহীন—সে অনুষ্ঠানে সফলতা লাভ করিতে পারিবে না। যে শিক্ষার ভিত্তি ধর্ম্মবিহীন—সে শিক্ষায় জাতীয় জীবন গঠিত হওয়া অসম্ভব। বর্ত্তমান শিক্ষার মূলে ধর্ম্মভাব নাই, ইহা সকলেই জানেন। ধর্ম্মসম্বলিত শিক্ষাপ্রদানার্থ অনেকে, বক্তৃতা দেন বটে; কিন্তু কার্য্যতঃ কেহই অগ্রসর হন না। বিবাহে পণগ্রহণ-প্রথা—একটী নারকীয় ও পৈশাচিক প্রথা বলিয়া অনেকেই লোক-সমক্ষে প্রচার করেন বটে; কিন্তু ইহার প্রতিকারের উপায় কয়জন করিতেছেন? তাই বলি, শিক্ষা ও দীক্ষার ধর্ম্মভিত্তি থাকা চাই। ধর্ম্মই আমাদের জীবন, অধর্ম্মই আমাদের মৃত্যু। মনে সদিচ্ছা রাখিতে না পারাই, আমাদের দুর্ব্বলতার পরিচায়ক, সেইজন্য ধর্ম্ম-

কর্ম্মানুষ্ঠানে আমাদের সাহস হয় না। অহঙ্কারে ও দর্পে মত্ত হইয়া আমরা চিরকাল পশুভাবে কাটাইয়াছি—তাই আজ হৃদয় দেবভাব-গ্রহণে কুণ্ঠিত হইতেছে। আমাদের নিজেদের জীবন নষ্ট করিয়াছি—তাহার ফলও ভোগ করিতেছি। এক্ষণে যাহাতে আমাদের ছেলেমেয়ে-গুলি আমাদের ন্যায় অসুর হইয়া দুর্দ্দশাগ্রস্ত না হয়—ধৈর্য্য ও সাহস অবলম্বন করিয়া তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। ছেলেমেয়েদের দোষ নাই। দোষ আমাদের। ছেলেমেয়েরা বিদ্যালয় হইতে যাহা শিক্ষা করিতেছে, তাহা শিক্ষা করুক—এক্ষণে আর অন্য উপায় নাই। বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষার ব্যবস্থা নাই। বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষা প্রদানের উপযুক্ত শিক্ষক নাই। ছেলেমেয়েদের ধর্ম্মশিক্ষার প্রকৃত শিক্ষক, তাহাদের পিতামাতা। বিবাহে পণপ্রথানিবারণের প্রকৃত কর্ত্তা, ছেলেদের পিতামাতা। ছেলেমেয়েদের স্বগৃহে ধর্ম্মশিক্ষা দাও। নিজে ধর্ম্মপথ অবলম্বন কর। নিজে চা খাইবে, গাঁজা খাইবে বা মদ খাইবে আর ছেলেদের—চা, গাঁজা বা মদ খাইও না উপদেশ দিলে, তাহারা তোমার কথা শুনিবে কেন? নিজে ধর্ম্ম আচরণ করিয়া ছেলেদের শিক্ষা দাও, তাহাহইলে, তোমার নিজের কাজ হইবে এবং দেশের ও দশের কাজও হইবে। এখনও বালকবালিকাগণের মধ্যে অনেক রত্ন আছে—আমাদের দোষে সেগুলি নষ্ট হইবে? যত্নসহকারে তাহাদের ধর্ম্মপথে আনয়ন কর—দেশের অনেক কাজ হইবে। এই পুস্তকমধ্যে স্থানে স্থানে বিভিন্নশ্রেণীর নীচপ্রকৃতিবিশিষ্ট ব্যক্তিসম্বন্ধে সাধারণভাবে কটাক্ষপাত করা হইয়াছে—কোন বিশেষ ব্যক্তিসম্বন্ধে নহে এবং তাহা কেবল অসচ্চরিত্র, পশুভাবাপন্ন, ক্রোধী, লোভী ও কামুক ব্যক্তিসম্বন্ধেই; চরিত্রবান্ দেবভাবাপন্ন সজ্জনসম্বন্ধে নহে। দেবভাবাপন্ন ব্যক্তিগণ দেবসদৃশ, তাঁহারা জগৎপূজ্য ও দেশের গৌরবস্থল।

প্রবৃত্তিপথে সুখ নাই। ম্যাজিষ্ট্রেটই হও বা জজই হও, খুব

বড় ডাক্তারই হও বা ইঞ্জিনিয়ারই হও—যদি তুমি নিবৃত্তিপথের পথিক না হও, তাহাহইলে, তুমি কখনও সুখী হইতে পারিবে না। নিবৃত্তিপথ অবলম্বন করিয়া বিষয়াসক্তিবিহীন হও—অনন্ত সুখের অধিকারী হইবে। ভারতবর্ষের রাজা হইয়াও সুখী হইবে না, সমুদয় জগতের একমাত্র অধিপতি হইয়াও সুখী হইবে না, এমন কি, স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতালের অধীশ্বর হইয়াও সুখী হইতে পারিবে না—যদি তুমি নিবৃত্তিপথের পথিক না হও—যদি তুমি অসুরভাব পরিত্যাগ করিয়া দেবভাবাপন্ন না হও-যদি তুমি পাপকার্য্য ত্যাগ করিয়া পুণ্যবান্ না হও—যদি তুমি নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি লইয়াই ব্যস্ত থাক—যদি তুমি অষ্টাঙ্গযোগ অবলম্বন না কর। তাই বলি, যদি সুখী হইতে চাও ও অপরকে সুখী করিতে চাও, তাহাহইলে, মহাজনের পন্থা অবলম্বন কর, ঋষিবাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস কর ও তাঁহাদের বিধি পালন কর। এই পুস্তকে যে স্বরাজের উল্লেখ আছে, তাহা স্থূল বৈষয়িক সম্পদ নহে; পরন্তু তাহা আত্মরাজ্য। ইহা পাইলে দুঃখের একান্তনিবৃত্তি হইবে।

এক একটী সূত্র মনোযোগসহকারে পাঠ করিবে। উপন্যাস পাঠের ন্যায়—তাড়াতাড়ি পড়িবে না। প্রত্যেক সূত্র পাঠ করিয়া তাহা মনন করিবে, পরে তাহা ধ্যান করিবে। এ পুস্তক তাড়াতাড়ি পড়িলে ফল পাইবে না। ধীরে ধীরে এক একটী সূত্রের মর্ম্ম বিশেষরূপে অবগত হইয়া পাঠ করিয়া যাইবে। পূর্ব্ব সূত্রের মর্ম্ম উত্তমরূপে অবগত হইতে না পারিলে, পরবর্ত্তী সূত্রের মর্ম্ম বুঝিতে পারিবে না; সুতরাং পুস্তকপাঠে কোনও ফল হইবে না। এইরূপভাবে সমুদয় পুস্তকখানি পাঠ করিয়া—ইহার মর্ম্ম অবগত হইতে পারিলে, তুমি নিশ্চয়ই সুখের প্রকৃত পথ দেখিতে পাইবে। তখন তুমি অন্যের বিনা অনুরোধে স্বয়ং সেই পথ অবলম্বন করিবে।

পুস্তকখানি নিত্য পাঠ করিবে। যত অধিকবার পাঠ করিবে, ততই ইহার অভ্যন্তরের গূঢ় রহস্য হৃদয়ঙ্গম হইবে। আর যদি তোমার পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি থাকে, তাহাহইলে, আর তোমার পতন নাই। তুমি বাঁচিয়া গেলে। পুস্তক পাঠের সঙ্গে সঙ্গে সাধন অবলম্বন করিবে, তাহা না করিলে, পুস্তকের মর্ম্ম অবধারণ করিতে পারিবে না। যদি কোন স্থান বুঝিতে না পার, যদি কোনও সাধন জানিবার ইচ্ছা হয়, যদি কোথাও কোন সন্দেহ উপস্থিত হয়—সাক্ষাতে আমি তাহা বুঝাইয়া দিব। আমি কাহারও উপদেষ্টা নহি। আমি সকলের ভৃত্যমাত্র। আমি তোমাদিগকে বুঝাইতে পারিলে, আমার জীবন সার্থক মনে করিব।

ব্রহ্মচর্য্যই বালকদের প্রধান সাধন। ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনদ্বারা বালকদের উন্নতিবিধান আবশ্যক, তদ্ব্যতীত আমাদের দেশের প্রকৃত উন্নতি হইবে না। ছোট ছোট বালকেরা বীর্য্যক্ষয় করিয়া অনেক কঠিন রোগাক্রান্ত হয় এবং পীড়ানিবারণের জন্য গোপনে পেটেণ্ট ঔষধ প্রভৃতি ব্যবহার করে। এই সকল বালক পেটেণ্ট ঔষধ খাইয়া কোনও উপকার প্রাপ্ত হয় না, বরং ইহাতে তাহাদের শরীর শীঘ্র শীঘ্র ধ্বংসপথে অগ্রসর হয়। তাহারা আমার নিকট আসিলে, আমি অতি যত্নপূর্ব্বক তাহাদের ব্যবস্থা করিয়া দিব। মোট কথা—আমার নিকট হইতে যদি কাহারও কোন আধ্যাত্মিক উপকার-প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকে, তাহা আমাকে জানাইলে, আমি ভৃত্যবৎ তাহার আদেশ যথাসাধ্য পালন করিবার চেষ্টা করিব। পারিশ্রমিক-স্বরূপ কাহারও নিকট এক পয়সাও চাহি না। রিপ্লাই পোষ্টকার্ড বা ষ্টাম্প না পাঠাইলে কাহারও পত্রোত্তর দিতে পারিব না।

জগতে আর সুখের আশা করি না। দুঃখভোগেও অরুচি নাই। সকাম কর্ম্মের বিষময় ফল ভোগ করিতেছি। নিজের

কর্ম্মফল নিজেকেই ভোগ করিতে হইবে। নিজের প্রায়শ্চিত্ত নিজেকেই করিতে হইবে। নিজের মূর্খতা এখন বুঝিতে পারিতেছি। "আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ"—এই ভগবদ্বাক্যের যথার্থ মর্ম্ম এতদিনে গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি। জগতে আমার কেহ নাই। আমার আমি ছাড়া আর কেহ নাই। আমার সাধনপথ আমাকেই প্রশস্ত করিয়া লইতে হইবে। জগৎ স্বার্থান্বেষণে তৎপর। জগতের জীব কামে পূর্ণরূপে অন্ধ। এই কামরিপু আজ মানবসমাজকে বিধ্বস্ত করিতেছে। কাম, ক্রোধ ও লোভে মত্ত হইয়া জীব নিজের মঙ্গলপথ ত্যাগ করিয়া—অমঙ্গলের পথে দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতেছে। সকলেই মনে করিতেছে, "আমার মত বাহাদুর আর নাই।"—ইহা তাহাদের বিষম ভ্রান্তি।

প্রকৃত ধর্ম্মপথ অবলম্বনের আকাঙ্ক্ষা বাল্যকাল হইতেই ছিল। প্রকৃত ধর্ম্মপথ জানিবার জন্য অনেকের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া প্রতারিত হইয়াছি। যখন যেখানে যে ধর্ম্মগ্রন্থ পাইয়াছি, তাহা পাঠ করিয়াছি। কত অসার পুস্তক কিনিয়া যে কত অর্থ বৃথা ব্যয় করিয়াছি—তাহার স্থিরতা নাই। Phrenological Society, Theosophical Society প্রভৃতি পাশ্চাত্য ধর্ম্মজগতের বহু পুস্তক পাঠ করিয়াছি। আমাদের ভারতীয় ধর্ম্মগ্রন্থ যখন যেখানে যাহা পাইয়াছি, তাহাই ক্রয় করিয়া পাঠ করিয়াছি। এইরূপে অনেক সময় ও অর্থ বৃথা ব্যয় করিয়াছি। সমুদয় পাঠ করিয়া নিম্নলিখিত কয়েকখানি পুস্তক সার বলিয়া জ্ঞান করিয়াছি; তাহা পাঠ করিয়া সাধন করিলেই প্রকৃত ধর্ম্মজ্ঞান হইবে। (১) উপনিষদ, (২) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, (৩) সাংখ্য ও পাতঞ্জল দর্শন, (৪) পঞ্চদশী, (৫) শঙ্করাচার্য্যের গ্রন্থাবলী ও (৬) যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ। ধর্ম্মশাস্ত্র এবং ধর্ম্মের গূঢ় রহস্য বুঝিবার জন্য পাতঞ্জলদর্শন একখানি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ; কিন্তু সাধারণতঃ যে সকল পাতঞ্জলদর্শন প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা সাধারণের বোধগম্য নহে; সেইজন্য সাধারণের

বুঝিবার নিমিত্ত এই পাতঞ্জল প্রকাশিত হইল। যশ বা অর্থলাভ ইহার উদ্দেশ্য নহে। পরহিতব্রতই একমাত্র উদ্দেশ্য। যাঁহার অর্থে ইহা মুদ্রিত হইল, তাঁহারই উদ্দেশে ইহা প্রদত্ত হইল। অধিকারী সাধক ইহা পাঠ করিয়া এবং এতদনুযায়ী সাধন করিয়া উন্নতিলাভ করিলে আমি পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব। প্রকৃত অধিকারী মূল্যদানে অক্ষম হইলে তাহাকে এই পুস্তক বিনামূল্যে দান করা হইবে। আপনারা ইহা যত্নসহকারে পাঠ করিয়া সাধন করিবেন, যথাযথ সাধন করিলেই ফল পাইবেন এবং অপরকে নিঃস্বার্থভাবে সৎপথে লইয়া আসিবেন। সর্ব্বদা স্বার্থত্যাগ করিয়া কার্য্য করিলেই ভগবদনুগ্রহ লাভে সমর্থ হইবেন। নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ভগবানের শ্রীচরণে সমর্পণ করিবেন। সুখ আসে আসুক বা দুঃখ আসে আসুক—দিবারাত্র তাঁহার দিকে চাহিয়া তাঁহার কার্য্য করিবেন—নিষ্কামভাবে অভিমানশূন্য হইয়া করিবেন, তাহাহইলেই ভগবৎ আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইবেন ও পরম আনন্দলাভ করিবেন।

ধর্ম্ম ভিত্তি না হইলে কোন কার্য্যেরই প্রকৃত উন্নতি হয় না। নিজের উন্নতি বা দেশের উন্নতি যাহাই করনা কেন, তাহার ধর্ম্মভিত্তি আবশ্যক। অধর্ম্মের আশ্রয় লইয়া কেহ কেহ সাময়িক ভোগসুখাদি লাভ করে বটে, কিন্তু পরিণামে অত্যন্ত কষ্টভোগ করে। পরিণাম-চিন্তা কেহই করে না। সকলেই বর্ত্তমান সুখে ও আনন্দে উন্মত্ত। কোন একটী মূষিক ধান্যের গোলা হইতে অনবরত ধান্য লইয়া আসিয়া নিজের গর্ত্ত পূরণ করিতেছে; কিন্তু তাহার পার্শ্বেই যে একটী বিড়াল তাহাকে ভক্ষণ করিবার জন্য বসিয়া আছে সে তাহা আদৌ লক্ষ্য করিতেছে না। সেইপ্রকার মানুষ আজীবন অর্থ ও সম্পত্তি সঞ্চয়েই ব্যস্ত, মৃত্যু যে তাহার সঙ্গেই ফিরিতেছে, তাহা সে আদৌ লক্ষ্য করে না। মানুষের সুখ বাহিরে নাই, তাহার সুখ

তাহার মধ্যেই আছে—এ বিষয় সাধারণ লোক জ্ঞাত নহে। এইজন্যই তাহারা বাহিরের সম্পদ্ বর্দ্ধিত করিবার জন্য সর্ব্বদাই সচেষ্ট। যাহারা এই ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা প্রবৃত্তিপথ ত্যাগ করিয়া নিবৃত্তি-পথের আশ্রয় লইয়াছেন। বিষয়াসক্তিতে সুখ নাই। আসক্তির নিবৃত্তিতেই সুখ। প্রবৃত্তিপথ এবং নিবৃত্তিপথ সম্পূর্ণ বিপরীত। প্রবৃত্তি-পথ—কুপথ। প্রবৃত্তিপথে দুঃখ ব্যতীত সুখ নাই। মাত্র নিবৃত্তিপথেই সুখ আছে। কাম, ক্রোধ ও লোভের বৃদ্ধিতে দুঃখ ব্যতীত সুখ নাই। কাম, ক্রোধ এবং লোভের দাস হইয়া সুখ নাই। কাম, ক্রোধ ও লোভকে জয় করিতে পারিলেই সুখী হওয়া যায়। বাহিরের কোন কিছু আমাদের দুঃখের কারণ নহে। আমাদের দুঃখের কারণ আমাদের অন্তরেই অবস্থান করিতেছে। আমরা নিজেরাই আমাদের শত্রু। বাহিরের কেহ আমাদের শত্রু নহে। এই সকল উপদেশ পুস্তকে শুদ্ধ পাঠ করিলেই হইবে না। উপযুক্ত আচার্য্যের নিকট উপদেশ গ্রহণ করিয়া সাধন করিতে হইবে। সাধারণ লোকের বুদ্ধি অজ্ঞানে আবৃত, এইজন্য তাহারা যখন যে কার্য্য করে, তাহা অজ্ঞানের কার্য্য হয় এবং সেইজন্য তাহারা পরিণামে দুঃখ প্রাপ্ত হয়। এই পাতঞ্জলখানি মনোযোগসহকারে পাঠ করিয়া মনন করিলে, তাহাদের অজ্ঞান বিদূরিত হইবে। তখন তাহারা তাহাদের ভুল বুঝিতে পারিবে এবং তৎপরে সৎসঙ্গ ও সদুপদেশের অভাব অনুভব করিবে। তাহা না হইলে, লোকে বিষয়মদে এতই মত্ত যে তাহাদিগকে নিদ্রিত বা মৃত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আত্মঘাতী হইলে সুখ হয় না। সাধারণ লোক আত্মঘাতী। তাহারা আত্মঘাতী হইয়া অজ্ঞানে এতদূর অন্ধ যে, নিজেদের অবস্থা কোনমতেই বুঝিতে পারিতেছে না। ঈশ্বরের কৃপা, শ্রীগুরুর অনুগ্রহ, সৎসঙ্গ ও নিজ পুরুষকার ব্যতীত মনুষ্যের আর কোন উপায় নাই। পশুর ন্যায় জন্মগ্রহণ করিল, পশুর ন্যায় পাশব-

বৃত্তির পরিচালনায় জীবন অতিবাহিত করিল এবং পশুর ন্যায় দেহত্যাগ করিল—দুর্লভ মানবজীবনে মনুষ্যোচিত কর্ত্তব্য কিছুই করিল না।

আমি এক্ষণে ১২নং বৃন্দাবন পালের লেনে বাস করিতেছি। পরে আমার নিজ বাটী ভাটপাড়ায় থাকিবার ইচ্ছা আছে। এস্থানে প্রত্যহ প্রাতে ৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত রোগীদিগকে বিনামূল্যে চিকিৎসা করা হয় ও বেলা ১টা হইতে ৩॥টা তৎপরে ৪॥টা হইতে ৫॥টা ও তৎপরে সন্ধ্যা ৭টা হইতে ৮॥টা পর্য্যন্ত স্থানীয় স্ত্রীলোকদিগকে এবং প্রতি রবিবার বেলা ২টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত ব্রহ্মচারী বালকদিগকে ও অপরাপর বয়স্থ পুরুষদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দান করা হয়। এই শিক্ষার্থীদিগের আগ্রহা-তিশয্যে—বিশেষতঃ জননীগণের আগ্রহাতিশয্যে এই পাতঞ্জলদর্শন মুদ্রিত হইল, এইজন্য এই পুস্তকের নাম "মেয়েদের পাতঞ্জল" রাখা হইল। যাহারা সাধন করিতে ইচ্ছুক, তাহাদিগকে সাধন শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। ধর্ম্মসম্বন্ধে যাহার যে কোন সংশয় থাকে, তাহার সেই সংশয় ভঞ্জন করা হইয়া থাকে। প্রকৃত সত্যপথের জিজ্ঞাসুকে তাহার পথ দেখাইয়া দেওয়া হয়। তার্কিকদিগের সহিত তর্ক করিবার আমার ইচ্ছাও নাই এবং সময়ও নাই। তবে, যাহারা মানের প্রত্যাশী এবং অমানী হইয়াও মান লইবার আশায় আমার নিকট আসে, আমি তাহাদিগকে বিনা আপত্তিতে মান দিতে কুণ্ঠিত নহি। সেই হেতু পাণ্ডিত্যাভিমানী মহাপুরুষেরা যেন আমার সহিত সাক্ষাৎ না করেন। আমি সামান্য মূর্খ এবং আমার বিদ্যাবুদ্ধিও অল্প। মানবমাত্রেই ভ্রম ও প্রমাদের বশবর্ত্তী, সেইহেতু এ পুস্তকে যদি কোন ভ্রম থাকে, তাহা ভবিষ্যৎ সংস্করণে শুদ্ধ করা হইবে। ভ্রম-প্রদর্শনকারীদিগের নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিব।

শ্যামবাজার,
মহাবিষুবসংক্রান্তি, সন১৩৩৬সাল।

শ্রীচণ্ডীচরণ পাল।
গ্রন্থকার।

ওঁ নমো ভগবতে নিত্যগোপালায়।

হে দেব !

চাহিনা সমাধি চাহিনা নির্ব্বাণ
চাহিনাকো এই ত্রিলোকের মান।
শুধু চাহি প্রভো হে জগত নাথ
তোমারি করমে স'পিতে প্বরাণ॥

না চাহি দর্শন না চাহি স্পর্শন
নাহি চাহি তব প্রেম আলিঙ্গন।
শুধু চাহি নাথ (ওহে) অখিলের পতি
(যেন) কভু নাহি ভুলি তব শ্রীচরণ॥

চাহিনা রাজত্ব চাহিনা সম্পদ্
বৈরাগ্য হউক অঙ্গ আভরণ।
নাহি চাহি সুখ নাহি চাহি শান্তি
তুমি যদি মনে জাগ অনুক্ষণ॥

তোমারে ভুলিয়া হে মম দয়িত
বিষয়ে যেন না হই হে মগন :
তব কার্য্য তরে নাহি ডরি নাথ
শতকোটি জন্ম করিতে গ্রহণ॥

হে মম জীবন হে মম মরণ
ওহে মম নিদ্রা স্বপ্ন জাগরণ।
হে মম সর্ব্বস্ব মম সর্ব্বেশ্বর
ভক্তি-উপহার করগো গ্রহণ॥

প্রণত দাস।

ওঁ নমো ভগবতে নিত্যগোপালায়

মেয়েদের পাতঞ্জল।

ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিম্।
দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যম্॥
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্ব্বদা সাক্ষিভূতম্।
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্‌গুরুং তং নমামি॥

ওঁ অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

সমাধি পাদঃ।

অথ যোগানুশাসনম্ ॥ ১ ॥

অথ যোগসম্বন্ধীয় উপদেশ বর্ণিত হইতেছে।

শুদ্ধশাস্ত্রপাঠে পাণ্ডিত্য লাভ হয়—তর্ক করিতে পারা যায়। সাধনার অনুষ্ঠান না করিলে সিদ্ধিলাভ করা যায় না। শুদ্ধ পাঠে সিদ্ধি হয় না। শাস্ত্রের সাধনপ্রণালী অবলম্বন করিয়া সাধনা করিতে হয়। এইজন্য শাস্ত্রপাঠের সঙ্গে সঙ্গে আমরা সাধনার অনুষ্ঠান করিলে শান্তি এবং মোক্ষলাভ করিতে পারি।

চিত্তের স্বভাবানুযায়ী আমরা সুখ দুঃখ অনুভব করি। যাহার চিত্ত সাত্ত্বিক—সে সর্ব্বদাই সুখী আর যাহার চিত্ত, রজঃ ও তমোগুণে পূর্ণ—সে সর্ব্বদাই দুঃখভোগ করে।

চিত্তভূমি পঞ্চপ্রকার :—(১) ক্ষিপ্ত, (২) মূঢ়, (৩) বিক্ষিপ্ত, (৪) একাগ্র, ও (৫) নিরোধ।

(১) ক্ষিপ্তভূমিক চিত্ত—ইহা সর্ব্বদাই অতি চঞ্চল। যাহার চিত্ত যত অধিক চঞ্চল—সে তত অধিক পাপী, সে তত অধিক দুঃখী। চিত্তে রজঃ ও তমোগুণ অধিক হইলে, চিত্ত ক্ষিপ্ত হয়। পাগলদের চিত্ত ক্ষিপ্ত। তাহারা কোন একটী বিষয়ে মনকে অধিকক্ষণের জন্য স্থির রাখিতে পারে না। বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ভ্রমণ করে। এই হাসে, এই কাঁদে। কেন হাসে তাও জানে না, আর কেন কাঁদে তাও জানে না। তাহারা অবশভাবে এইরূপে অতি কষ্টে তাহাদের জীবন অতিবাহিত করে। ক্ষিপ্তচিত্তের মন এক বিষয়ে স্থির রাখিতে পারে না। এক বিষয়ে মন রাখিয়া তাহারা সুখ পায় না। সুখলাভ করিবার জন্য একটী বিষয় অবলম্বন করে কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই তাহারা সেই বিষয়ে

দুঃখ বোধ করে এবং পুনরায় সুখ পাইবার জন্য অপর একটী বিষয় অবলম্বন করে, এবং তৎপরক্ষণে আবার সে বিষয় ত্যাগ করিয়া আর একটী বিষয় অবলম্বন করে। একটী বিষয় লইয়া তাহারা অধিকক্ষণ অবস্থান করিতে পারে না। এক একটী ছেলে আছে—সে একক্ষণে একরকম দ্রব্য চাহিয়া লয় আবার ক্ষণপরেই তাহা ফেলিয়া দেয় ও অপর দ্রব্য চাহিয়া লয় এবং ক্ষণপরেই তাহাও ফেলিয়া দেয় ও অপর একটী দ্রব্য চাহিয়া লয়। এই পুতুল চাহিল তাহাকে পুতুল দাও—দিবামাত্র সে একটু সন্তুষ্ট হইল কিন্তু দুই মিনিট পরেই তাহা ফেলিয়া দিয়া বাঁটী চাহিল—আবার দুই মিনিট পরেই বাটী ফেলিয়া দিয়া ঘটী চাহিল, আবার দুই মিনিট পরেই ঘটী ফেলিয়া দিয়া অপর কিছু চাহিল। এই প্রকৃতির ছেলেদের কোন কিছুতেই সন্তোষ করা যায় না। তাহারা নিজেরাও কষ্ট পায় এবং বাপমাকেও কষ্ট দেয়। এই সব ছেলেদের চিত্ত ক্ষিপ্ত। এই সব ছেলেদের মার ধর করিলে তাহারা আরও খারাপ হইয়া যায়। তাহারা যাহা করে, তাহা অবশ হইয়া করে। তাহারা যা করে, তাহা বাধ্য হইয়া করে। তাহাদের চিত্তের ক্ষিপ্ততাগুণে তাহারা এই সকল কার্য্য করিতে বাধ্য হয়। পিতামাতার বুঝা উচিত যে, এই ছেলেরা ইচ্ছা করিয়া এই সকল কার্য্য করে না এবং তাঁহাদের বিরাগ উৎপাদনও ইহাদের ইচ্ছাকৃত নহে। পিতামাতার বুঝা উচিত যে, তাহারা বাধ্য হইয়াই এই সকল কার্য্য করিতেছে। এই সকল ছেলের মানসিক উন্নতির জন্য কোন পথ অবলম্বন করা উচিত, তাহা প্রত্যেক পিতামাতার জানা অত্যন্ত আবশ্যক। তাহা জানা না থাকিলে—পিতামাতা তাহাদের সন্তানগণকে উপযুক্তরূপে লালনপালন করিতে পারে না। এই সকল সন্তানের প্রতি উপযুক্ত ব্যবহার না করিয়া, অযথা ব্যবহার করিলে সন্তানের ভবিষ্যৎ জীবন বিষময় হইয়া যায়। আমাদের দেশের উন্নতি করিতে হইলে উপযুক্ত

পিতামাতা আবশ্যক এবং সন্তানকে ঠিক ঠিক ভাবে মানুষ করা আবশ্যক। এখনকার শতকরা ৮০ জন পিতামাতা পশু, সুতরাং তাহাদের সন্তানেরা পিতামাতার নিকট পশুর ব্যবহার প্রাপ্ত হইয়া, তাহাই শিক্ষা করে ও ভবিষ্যৎ-জীবন পশুসদৃশই হইয়া যায়। পিতামাতা জানে যে, কামরিপুচরিতার্থতাই মনুষ্যজীবনের প্রধান উদ্দেশ্য, তাই তাহারা পশুর ন্যায় জগজ্জননীর অংশস্বরূপা স্বীয় সহধর্ম্মিণীর উপর সাধারণ বেশ্যার ন্যায় ব্যবহার করে। তাহার ফলে আমাদের সন্তানেরাও সেইভাবে ভাবিত হয়। এইরূপ ব্যবহারে কখনও নিজের বা দেশের উন্নতি করা যায় না। আজকাল আমাদের দেশের যাঁহারা পাণ্ডা সাজিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই কি দেশের প্রকৃত নেতার পদ অধিকার করিবার উপযুক্ত হইয়াছেন। অন্ধ যেমন অন্ধকে পথপ্রদর্শন করিয়া উভয়েই বিপন্ন হয়, ইঁহারাও সেইরূপ ধরণের পথপ্রদর্শক। তাই বলি— নিজের মধ্যে কি মালমশলা আছে, তাহা আগে ভাল করিয়া জান, তাহা হইলে, নিজেও সুখী হইতে পারিবে এবং অপরকেও সুখী করিতে পারিবে।

ক্ষিপ্ত চিত্তের মানুষেরা কখনও কোন উন্নতি লাভ করিতে পারে না; যে সকল ছাত্রের ক্ষিপ্তচিত্ত তাহারা আজ এ বিদ্যালয় কাল ও বিদ্যালয় এইরূপে ক্রমাগত বিদ্যালয়ের পরিবর্ত্তন করে। আজ এ মাষ্টার কাল আর একজন মাষ্টার এইরূপে ক্রমাগত মাষ্টারের পরিবর্ত্তন করে। আজ এ খাদ্য চাই—কাল আর একপ্রকার খাদ্য চাই, এইপ্রকারে ক্রমাগত খাদ্যের পরিবর্ত্তন করে। আজ এই প্রকার পরিধেয় চাই, কাল আবার অন্যপ্রকার পরিধেয় চাই এইরূপে ক্রমাগত বস্ত্রাদির পরিবর্ত্তন করে। ইহাদের মন কিছুতেই সন্তুষ্ট হয় না। ইহারা এক বিষয়ে মনকে অধিকক্ষণ রাখিতে পারে না। ইহাদের চিত্তের পরিবর্ত্তন সাধন করিতে হইলে কৌশলক্রমে করিতে হয়। জোর জবরদস্তি করিলে হইবে না।

যে সকল যুবক বা যুবতী ক্ষিপ্তচিত্ত, তাহাদের দ্বারা জগতের মহা অনিষ্ট সাধন হয়। যৌবন অবস্থায় আমাদের কাম, ক্রোধ প্রভৃতি রিপু অতি প্রবল। ইহাদিগকে কিছুতেই সুপথে আনা যায় না। ইহারা যখন যাহা ইচ্ছা তাহাই করায়। ইহারা কাহারও উপদেশ মানে না বা গ্রহণ করিতে চাহে না। বাল্যকাল হইতে সন্তানদের সাত্ত্বিকভাবে লালিতপালিত না করিলে, যৌবনাবস্থায় তাহাদের ভয়ানক দুর্গতি হয়। ইহাদের কামক্রোধ প্রভৃতি রিপু প্রবল হইলে, ইহারা দিক্‌-বিদিক্‌ জ্ঞানশূন্য হয় এবং জগতে এমন কোন পাপকার্য্য নাই যাহা ইহারা না করিতে পারে। ইহাদের দ্বারা সকল প্রকার পাপকার্য্য সম্পাদিত হইতে পারে। অতএব বাল্যকাল হইতেই যাহাতে ছেলেরা সাত্ত্বিকভাবাপন্ন ও সচ্চরিত্র হয়, প্রত্যেক পিতামাতা ও অভিভাবকের সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। পিতামাতা যদি পুত্র ও কন্যাগণকে শাস্ত্রানুযায়ী লালন পালন না করে, তাহা হইলে, তজ্জন্য পিতামাতাকে পাপভাগী হইতে হয় এবং ভবিষ্যৎ জীবনে সেই পাপের ফলভোগ করিতে হয়। এইরূপ ক্ষিপ্তচিত্ত যুবকেরা বৃদ্ধাবস্থায় অত্যন্ত কষ্টভোগ করে।

যে সকল ব্যবসায়ী ক্ষিপ্তচিত্ত, তাহারা তাহাদের ব্যবসায়ে উন্নতিলাভ করিতে পারে না। আজ এ ব্যবসা কাল আর একটী ব্যবসা—তৎপরে আর একটী ব্যবসা, এইরূপে তাহারা ক্রমাগত ব্যবসায় পরিবর্ত্তন করিতে থাকে। ক্ষিপ্তচিত্ত মানুষেরা যখন যে অবস্থাতেই থাকুক, তখন তাহারা কষ্টভোগ করে। অতএব কি বালক, কি যুবক, কি ছাত্র, কি ছাত্রী, কি ব্যবসাদার, কি উকিল, কি ডাক্তার কাহারও ক্ষিপ্তচিত্ত হওয়া ভাল নয়। এই প্রকার ক্ষিপ্তচিত্তের উন্নতিসাধন করিতে হইলে কৌশল অবলম্বন করিয়া সাধন করিতে হয়।

(২) মূঢ়-ভূমিক চিত্ত—ইহারা বোকা। ইহারা গাধা। ইহারা নির্ব্বোধ। ইহারাও কোন কার্য্যে উন্নতি করিতে পারে না। ইহাদের

বুদ্ধি বড় মোটা। ইহাদের বুদ্ধি বড় মলিন। ইহারা হিতাহিত বিচার করিতে পারে না। ইহারা নিজের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইতে পারে না। ইহারা সর্ব্বদাই পরমুখাপেক্ষী। কোন বিষয় নিজে নিজে স্থির করিতে পারে না, আর যদিও স্থির করে, তাহার ফল প্রায়ই মন্দ হয়। ইহারা অত্যন্ত বিলাসপ্রিয়। ইহারা অযথা অনাবশ্যকীয় কার্য্যে বৃথা অর্থ নষ্ট করে। ইহারা বড়ই কাম, ক্রোধ ও লোভের বশবর্ত্তী হয়। ইহারা হিতাহিতবিচারশূন্য ও পরের হাতের ক্রীড়াপুত্তলী মাত্র। ইহারা প্রায়ই অপরের দ্বারা প্রতারিত হয়। ইহারা যখন যে যাহা বলে, তাহাই করে এবং এইরূপে ক্রমাগত প্রতারিত হয়। ইহারা প্রায়ই সাধারণ পশুর সমান। ইহারা দেহকেই আত্মা বিবেচনা করে। ইহারা দেহকে ক্ষণবিধ্বংসী মনে করে না। ইহারা দেহকেই চিরস্থায়ী মনে করে। ইহারা দেহের চিন্তাতেই ব্যস্ত। ইহারা দেহের সেবাতেই ব্যস্ত। দেহের সুখেই ইহারা সুখী আর দেহের দুঃখেই ইহারা দুঃখী; ইহারা মৃত্যুচিন্তা করে না। ইহারা দেহের দাস। দেহকে বসন ভূষণে সজ্জিত করিয়া ইহারা নিজের সৌন্দর্য্য সম্পাদন করে। দেহের সৌন্দর্য্যেই ইহারা মোহিত হয়। অন্তরাত্মার খবর ইহারা জানে না। দেহই ইহাদের যথাসর্ব্বস্ব। কেহ কোন তোষামোদ করিলে ইহারা আনন্দে মাতিয়া উঠে, আর কেহ অল্প নিন্দা করিলেই ইহারা মরমে মরিয়া যায়। ইহারা পশুবৃত্তিতেই ডুবিয়া আছে। পশুর বৃত্তি আহার, নিদ্রা, ভয় ও ক্রোধাদি লইয়াই ইহারা জীবন কাটায়। ইহারা অর্থ উপার্জ্জন করে, খাইয়া ক্ষুধার নিবৃত্তি করে, স্ত্রীসম্ভোগে কামবৃত্তি চরিতার্থ করে, কতকগুলি সন্তানের পিতামাতা হয়, রাত্রে নিদ্রাসুখ অনুভব করে ও যথাসময়ে ভবলীলা সাঙ্গ করে। ইহাদিগকে নরাকার পশু ভিন্ন আর কি বলিব। পশুর বৃত্তি লইয়া জীবনযাপন করিবার জন্য মানবজন্ম নয়; যদি তাহা হয়, তাহা হইলে, মানব,

পশু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইবে কি করিয়া! মানুষের মধ্যে মানুষের গুণ থাকা আবশ্যক এবং সেই গুণানুযায়ী কার্য্য করা আবশ্যক, নচেৎ সে মানুষ পশু ভিন্ন আর কিছু নয়। জগতে এইপ্রকার মূঢ়চিত্তের লোকের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। কৌশল অবলম্বন করিয়া সাধন করিলে, ইহাদিগকেও পশু হইতে মানবে পরিবর্ত্তিত করিতে পারা যায়।

(৩) বিক্ষিপ্ত-ভূমিক চিত্ত—ইহারা ক্ষিপ্ত ও মূঢ় হইতে শ্রেষ্ঠ। ইহারা নিজের চিত্তকে অধিকক্ষণ পর্য্যন্ত কোন এক বিষয়ে লিপ্ত রাখিতে পারে। ইহারাই সাধারণ সাধকশ্রেণীভুক্ত। ইহারা সাধন করিয়া একাগ্রচিত্ত হইতে পারে ও ক্রমশঃ চিত্ত নিরোধ করিয়া মানবজীবনের সফলতা লাভ করে। ইহারাই মানব শ্রেণীভুক্ত। কিন্তু ইহাদের সংখ্যাও খুব অল্প। শতকরা ২০ জন মাত্র।

(৪) একাগ্র-ভূমিক চিত্ত—এক+অগ্র=একাগ্র। অগ্র=অবলম্বন। যে চিত্ত একটী অবলম্বন লইয়া থাকে, তাহাকে একাগ্র চিত্ত বলে। ঘর ঝাঁট দিতেছে—এক মন দিয়া। ঝাঁট দিবার সময়—মনে অন্য কোন চিন্তা নাই। রন্ধন করিতেছে—এক মন দিয়া, মনে অন্য কোন চিন্তা নাই। রন্ধন করিতে করিতে অপর কাহারও সহিত গল্প করিতেছে না। পুস্তক পাঠ করিতেছে—একমন দিয়া। অঙ্ক কসিতেছে—একমন দিয়া। "কৃষ্ণ", "কৃষ্ণ" জপ করিতেছে—এক মন দিয়া, তখন মনের মধ্যে "আলু, কাঁচকলা" উঠিতেছে না। এইরূপ চিত্তকে একাগ্রচিত্ত বলে।

(৫) নিরোধ-ভূমিক চিত্ত—একাগ্রচিত্তে যে একটীমাত্র অবলম্বন ছিল—যখন তাহাও চিত্ত হইতে দূর হয়। যখন চিত্তমধ্যে কোন চিন্তা উঠে না। যখন চিত্ত সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হয়—তখন তাহাকে নিরোধ চিত্ত বলে। নিরোধ চিত্তই আমাদের মুক্তির অভিমুখীন করে।

যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ ॥ ২ ॥

চিত্তের বৃত্তি নিরোধই যোগ। এই যোগ সাধনই মানবজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। এই যোগসাধন না করিলে, আমরা এই জন্মমৃত্যু প্রবাহ হইতে নিস্তার পাইব না। এই যোগ সাধন না করিলে, আমাদের এই অনাদি অনন্তকালের কষ্ট দূরীভূত হইবে না। এই যোগসাধনের জন্যই এই মনুষ্যজন্ম। পশুবৃত্তিচরিতার্থ জন্য মনুষ্য-জন্ম নহে। আবার মনুষ্যজন্ম অতিদুর্লভ। অনেক সুকৃতির ফলে এবং ভগবানের কৃপায় আমরা এই মানবজন্ম প্রাপ্ত হই এবং এই মানবদেহ ভিন্ন অন্য পশুদেহে সাধনা সম্ভব নহে। এইজন্যই মানব-দেহ দুর্লভ। বহু লক্ষবার পশুজন্ম গ্রহণ করিয়া তবে মানবজন্ম পাইয়াছি, সুতরাং এ মানবজন্মে মানবদেহের উপযুক্ত কার্য্য করাই আবশ্যক। পশুর কার্য্য জন্য বহুবার পশুজন্ম গ্রহণ করিয়াছি। মানব-দেহ পাইয়া আর পশুর কার্য্য করা উচিত নহে। পশুবৃত্তি যতই অবলম্বন কর না কেন, পশুবৃত্তির তৃপ্তি কখনই হইবে না, বরং উত্তরোত্তর এই বৃত্তির বৃদ্ধি হইয়া আমাদিগকে কষ্টের পর কষ্টপ্রদান করিবে। চিত্তবৃত্তি কাহাকে বলে? চিত্তের স্রোতকে চিত্তের বৃত্তি বলে। কামনাই চিত্তের স্রোত। যাহার চিত্তে যত অধিক বিষয়ের কামনা—তাহার চিত্তের স্রোতও তত অধিক সংখ্যক। যাহার চিত্তে কামনা যত কম—তাহার চিত্তের স্রোতও তত কম। যাহার যত অধিক কামনা সুতরাং যাহার চিত্তস্রোত অধিক, তাহার চিত্তের চঞ্চলতাও অধিক। যাহার চিত্ত যত অধিক চঞ্চল, সে তত অধিক কষ্ট পায়। সে তত অধিক পাপী। যাহার চিত্ত যত কম চঞ্চল— সে অপেক্ষাকৃত সুখী। যাহার চিত্তে আদৌ চঞ্চলতা নাই অর্থাৎ যিনি সম্পূর্ণরূপে কামনাশূন্য, তিনিই সম্পূর্ণরূপে সুখী। এইজন্য

জানিয়া রাখ যে, বিষয় বাসনাই আমাদের দুঃখের মূলহেতু এবং বিষয়বৈরাগ্যই সুখের মূলহেতু। যাহার যত বিষয়বৈরাগ্য অধিক, সে তত অধিক সুখী। যিনি পূর্ণমাত্রায় বৈরাগ্যবান্, তিনি সম্পূর্ণ সুখী। বিষয়ে আসক্তিহীন হওয়াকেই বৈরাগ্য বলে। যাহার বিষয়ে যত অধিক আসক্তি, সে তত অধিক দুঃখী। সে তত অধিক পাপী। যাহার বিষয়াসক্তি যত কম, সে তত অধিক সুখী। এই বিষয়াসক্তিই আমাদের সর্ব্বদুঃখের মূল। এই বিষয়াসক্তি হইতে আমাদিগের চিত্তে সংস্কার পতিত হয়। যাহার বিষয়াসক্তি যত অধিক, তাহার সংস্কারও তত অধিক। এই সংস্কারই আমাদের দুঃখ ও কষ্টের মূল কারণ। আমরা অনাদি অনন্তকাল হইতে এই সংস্কার সঞ্চয় করিয়া আসিতেছি। অনাদি অনন্তকাল হইতে আমরা কত লক্ষ লক্ষ প্রকার দেহ ধারণ করিয়াছি, সেই সকল দেহের সংস্কার আমাদিগের চিত্তে গ্রথিত হইয়া আছে। এই সংস্কারের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার নামই মুক্তি। এই সংস্কারের হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্যই আমাদের সাধন। এই সকল সংস্কার অতি গভীরভাবে আমাদের চিত্তে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে। তাহাদিগকে দূর করা বড়ই কঠিন ব্যাপার এবং দূর না করিলেও উপায় নাই। তাহাদিগকে দূর করিতে না পারিলে আমাদিগের এই অনন্ত দুঃখও কোন কালে ঘুচিবে না, সেইজন্য প্রত্যেকেরই প্রাণপণে সাধন করা আবশ্যক। কিন্তু সাধন কেন করিব, তাহা না জানিলে লোকে সাধন করিবে কেন? সাধন করা আবশ্যক কেন, সাধন করিলে কি হয়, সাধন না করিলে কি হয়, এই সকল বিষয় মানুষ জানিতে না পারিলে, তাহারা সাধন করিতে পারে না। সাধন বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিয়া সাধন করিলে উত্তম ফললাভ হয়। সাধনতো সকলেই করে; কিন্তু ফললাভ হয় না কেন? ইহার বার আনা দোষ আমাদের কুলগুরুদের এবং চারি

আনা দোষ শিষ্যের। বর্ত্তমান সময়ে কুলগুরুদিগের মধ্যে অতি অল্প-সংখ্যক কুলগুরু, গুরুনামের উপযুক্ত। তাঁহাদের সংখ্যা এত অল্প যে, প্রকৃত কুলগুরু নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সাধারণ গুরুর-দল নিজের পেটের দায়েই গুরুগিরি করে। অর্থলাভের জন্যই গুরুগিরি করে। ইহারা শাস্ত্র জানে না। ইহারা শাস্ত্র মানে না। ইহারা শাস্ত্রানুযায়ী চলে না। ইহারা অপরকে শাস্ত্রের উপদেশ দিলেও নিজে শাস্ত্রানুযায়ী চলে না। ইহারা অপরকে শাস্ত্রের উপদেশ দিলেও নিজে শাস্ত্রানুযায়ী কার্য্য করে না। ইহারা অপরকে সাধনের উপ-দেশ দিলেও, নিজে সাধন করে না। ইহাদের চিত্ত কুসংস্কারে পরিপূর্ণ। ইহাদের চিত্ত কাম, ক্রোধ ও লোভাদি রিপুবর্গে পরিপূর্ণ। এইরূপ মলিন চিত্ত হইতে যে মন্ত্র উচ্চারিত হয়—তাহাও মলিন অর্থাৎ সেই মন্ত্রের পবিত্রতাশক্তি থাকে না। বিষ্ঠাপূর্ণ হাঁড়ি হইতে চন্দনের সুবাস নির্গত হইতে পারে না। ইহাদের কামক্রোধাদি-অসৎরিপুপূর্ণ মলভাণ্ডস্বরূপ চিত্ত হইতে পবিত্র মন্ত্রোচ্চারণ হইতে পারে না। এই সকল কামুক গুরুর দল, এই সকল ক্রোধী গুরুর দল, এই সকল লোভী গুরুর দল, আমাদের দেশের ও সমাজের ঘোর অনিষ্টসাধন করিতেছে। এইরূপ দুর্গন্ধচিত্তযুক্ত পামর গুরুকে ত্যাগ করিলে শিষ্যের কোনও প্রত্যবায় হইবে না; বরং ইহাদিগকে ত্যাগ করাই শিষ্যের পবিত্র ধর্ম্ম; বরং ইহাদিগকে ত্যাগ না করিলে, আমাদিগের মহৎ পাপ সঞ্চয়ের কার্য্য হইবে। আমরা নিজের ঘরের পয়সা দিয়া এই পাপিষ্ঠদলগুলির পোষণ করিতেছি। দুগ্ধ দিয়া সর্পকে পোষণ করিলে যে ফল হয়—আমাদিগকেও ভবিষ্যতে সেই ফল ভোগ করিতে হইবে। আমরা এই সকল গুরুকে নাচ দিয়া মাথায় চড়াইয়াছি। এইজন্য প্রকারান্তরে আমরা দেশের অমঙ্গল ও অনিষ্টের কার্য্য করিতেছি। এই সকল গুরু, দানের

উপযুক্ত পাত্র নহে। উপযুক্ত পাত্রে দান করিলে যেমন পুণ্য হয়; তেমনি অনুপযুক্ত পাত্রে দান করিলে পাপ হয়। এই পাপের ফল আমরা ভোগ করিতেছি এবং ভবিষ্যতে আমাদের সন্তানকেও ভোগ করিতে হইবে। এই পাপিষ্ঠেরদলকে যতদিন পোষণ করিবে; ততদিন এই পামরেরাও উন্নতিলাভ করিতে পারিবে না। ইহাদিগকে ত্যাগ করিলে, ইহাদের চৈতন্য হইবে। ইহাদিগকে অযথা সমাদর না দিলেই ইহাদের চৈতন্য হইবে। অতএব এই পাপিষ্ঠদলকে উন্নত করিবার জন্য—আমাদের ইহাদিগকে ত্যাগ করা উচিত। ইহাদিগের ছায়ামাত্রও স্পর্শ করিলে, আমাদের নিরয় হইবে। অতএব যদি নিজের মঙ্গল প্রার্থনা কর, তাহা হইলে, এই অসৎগুরুর সঙ্গ ত্যাগ কর। যদি দেশের মঙ্গল প্রার্থনা কর, তাহা হইলে, এই অসৎ গুরুদিগের ত্রিসীমানায় যাইও না। যদি স্বরাজ প্রার্থনা কর, তাহা হইলে, এই স্বরাজের কণ্টকগুলির উন্নতি বিধান করিবার চেষ্টা কর। স্বরাজ প্রতিষ্ঠা জন্য দেশে ব্রাহ্মণ চাই। ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কেহ স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে না। ব্রাহ্মণের ছেলে ব্রাহ্মণ নয়। গলায় পৈতা ধারণ করিলেই ব্রাহ্মণ হওয়া যায় না। ব্রাহ্মণ হইতে গেলে, ব্রাহ্মণের গুণসম্পন্ন হওয়া চাই। ব্রাহ্মণ হইতে হইলে, ব্রাহ্মণের চরিত্রসম্পন্ন হওয়া চাই। মুচির কাজ করিলে ব্রাহ্মণ হয় না। ব্রাহ্মণের কাজ করিলে ব্রাহ্মণ হয়। ব্রাহ্মণের চরিত্রের অধিকারী হইলে ব্রাহ্মণ হয়। পবিত্র ব্রাহ্মণ হইতে হইলে অষ্টাঙ্গ যোগের সাধন চাই। অষ্টাঙ্গ যোগ সাধন না করিলে ব্রাহ্মণ হওয়া যায় না। বিষয়ের কৃমিকীট ব্রাহ্মণ নহে। যিনি পূর্ণ বৈরাগ্যবান্, তিনিই ব্রাহ্মণ। যিনি সম্পূর্ণরূপে বিষয়াসক্তি হীন, তিনিই ব্রাহ্মণ। যাঁহার চিত্ত সম্পূর্ণ রূপে স্থির হইয়াছে, তিনিই ব্রাহ্মণ। যাঁহার চিত্তচঞ্চলতা আছে, তিনি ব্রাহ্মণ নন। যাঁহার চিত্ত মনবিহীন হইয়াছে—যাঁহার চিত্তে বিষয়ের একটীমাত্র স্রোতও বিদ্যমান

নাই—যাঁহার চিত্তনিরোধ অবস্থাপ্রাপ্ত হইয়াছে; লৌকিক দৃষ্টিতে চণ্ডাল হইলেও, তিনিই শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ। যতদিন ভারতে এইরূপ ব্রাহ্মণের সংখ্যা বৃদ্ধি না হইবে, ততদিন ভারতে উন্নতির আশা নাই। ততদিন স্বরাজ প্রাপ্তি সুদূর-পরাহত।

যাঁহার চিত্তবৃত্তি নিরোধ হইয়াছে, তিনিই ব্রাহ্মণ। তিনি মহাভাগ্যবান্। তিনি নরকুলে শ্রেষ্ঠ। এই চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিতে পারিলে, মনুষ্যজন্ম সার্থক হয় এবং যোগসম্পন্ন হয়। নানাপ্রকার বিষয়বাসনাই চিত্তের বৃত্তি। বিষয় পাঁচপ্রকার। আমাদিগের পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয় আছে। এই পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়ের পাঁচ প্রকার বিষয়। চক্ষুর বিষয় রূপ। কর্ণের বিষয় শব্দ। নাসিকার বিষয় গন্ধ। জিহ্বার বিষয় রস। ত্বকের বিষয় স্পর্শ। এই জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা আমরা বিষয় গ্রহণ করিয়া চিত্তের নিকট পৌছাইয়া দিই। তখন চিত্ত সেই বিষয়াকারে আকারিত হয়। চক্ষুর দ্বারা রূপ গ্রহণ করিয়া আমরা চিত্তের নিকট পাঠাইয়া দিই। তখন চিত্ত সেই রূপের আকারে আকারিত হয়। কর্ণের দ্বারা শব্দ গ্রহণ করিয়া আমরা চিত্তের নিকট পাঠাইয়া দিই, তখন কর্ণ সেই শব্দের আকারে আকারিত হয়। নাসিকার দ্বারা গন্ধগ্রহণ করিয়া আমরা চিত্তের নিকট পাঠাইয়া দিই, তখন চিত্ত সেই গন্ধের আকারে আকারিত হয়। জিহ্বা দ্বারা মিষ্ট, তিক্ত প্রভৃতি রস গ্রহণ করিয়া আমরা চিত্তের নিকট পাঠাইয়া দিই, তখন চিত্ত সেই মিষ্ট, তিক্ত প্রভৃতি রসের আকারে আকারিত হয়। চর্ম্মদ্বারা আমরা স্পর্শজ্ঞানকে চিত্তের নিকট পাঠাইয়া দিই, তখন চিত্ত সেইজ্ঞানের আকারে আকারিত হয়। এইরূপে আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়গণ ভিন্ন ভিন্ন বিষয় লইয়া চিত্তের নিকট উপস্থিত করে এবং চিত্ত সেই বিষয়গুলি গ্রহণ করে। চিত্ত বিষয় গ্রহণ করিবার সময় সেই বিষয়ের আকারের আকারিত হয়। এই জন্য চিত্তের আকার অনবরত পরিবর্ত্তিত হইতেছে। অনাদি অনন্তকাল হইতে চিত্তের আকার

এইরূপে অনবরত পরিবর্ত্তিত হইতেছে। এইরূপ আকার পরিবর্ত্তন করা চিত্তের স্বভাব হইয়া গিয়াছে। চিত্ত আকার পরিবর্ত্তন না করিয়া স্থির থাকিতে পারে না। চিত্তের এই আকার পরিবর্ত্তনের স্বভাব এত দৃঢ় হইয়াছে, যে আমরা সহজে এই চিত্তকে স্থির করিতে পারি না। চিত্ত স্থির করা অতি কঠিন ব্যাপার। কঠোর ও তীব্র-সাধনদ্বারা এই চিত্ত স্থির হয়। চিত্তের এইরূপ পরিবর্ত্তন স্বভাবকেই চিত্তচঞ্চলতা বলে। ইহাকেই চিত্তের স্রোত বলে। যাহার চিত্ত যত অধিক চঞ্চল সে তত অধিক পাপী। সে তত অধিক দুঃখ পায়। যাহার চিত্ত যত অধিক স্থির সে তত অধিক পুণ্যবান্। সে তত অধিক সুখী। এই চিত্তের চঞ্চলতা দূর করিয়া চিত্তকে স্থির করাই সকলপ্রকার সাধনের মুখ্য উদ্দেশ্য। চিত্তস্থৈর্য্য সম্পাদন হইলেই সাধন শেষ হইল। নর জন্ম সফল হইল। অনাদি অনন্ত দুঃখস্রোত হইতে অব্যাহতি হইল। তাহার আর জননমরণের ভয় থাকিবে না। তাহার আর কোন অভাব থাকিবে না। তাহার আর কোন ভয় থাকিবে না। সে চিরকালের জন্য নির্ভয় হইল। সে অনন্ত সুখের অধিকারী হইল। অমৃতের পুত্র পিতার সহিত যুক্ত হইল। ভ্রান্তিবশতঃ সে নিজেকে অতি ক্ষুদ্র ও নীচ বলিয়া জ্ঞান করিত, এখন ভ্রান্তিদূর হইয়া, সেই অজ্ঞান দূর হইয়া, সে নিজের প্রকৃতস্বরূপ বুঝিতে পারিল। এই নিজের স্বরূপ বুঝিতে পারাই সকল সাধনের চরম ফল। যতদিন না আমরা নিজস্বরূপ জ্ঞাত হই—ততদিন আমরা স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইব না—ততদিন আমাদের দুঃখও ঘুচিবে না।

বিষয়াসক্তিই আমাদের পাপ। এই বিষয়বাসনাই আমাদের পাপপথে লইয়া যায়। রূপ দর্শন করিলাম, তৎক্ষণাৎ রূপের ছাপ চিত্তে পতিত হইল এবং চিরকালের জন্য অঙ্কিত হইয়া গেল। শব্দ শ্রবণ করিলাম, তৎক্ষণাৎ চিরকালের জন্য সেই শব্দের ছাপ চিত্তে

রহিয়া গেল। গন্ধ আঘ্রাণ করিলাম, তৎক্ষণাৎ চিরকালের জন্য সেই গন্ধের ছাপ চিত্তে রহিয়া গেল। রস আস্বাদন করিলাম তৎক্ষণাৎ চিরকালের জন্য সেই রস আস্বাদনের ছাপ চিত্তে রহিয়া গেল। আমরা পুনঃ পুনঃ যে কার্য্য করি, তাহার ছাপও পুনঃ পুনঃ আমাদের চিত্তে পতিত হয়। এইরূপ বহুকাল পর্য্যন্ত কোন এক কার্য্য করিলে, তাহার ছাপ গভীরভাবে চিত্তে অঙ্কিত হয়; এবং সে ছাপ শীঘ্র মুছিয়া ফেলা যায় না। ইহাকেই চিত্তের সংস্কার বলে। অনাদি অনন্তকাল হইতে এই সকল সংস্কার আমাদের চিত্তে গ্রথিত হইয়াছে। ইহাদিগের কর্ম্মসংস্কার বলে। ইহাদিগকে কর্ম্মাশয় বলে। ইহাদিগকে হৃদয়গ্রন্থি বলে। ইহাদিগকে অবিদ্যাবন্ধন বলে। ইহারা মাছধরা জালের গাঁটের ন্যায় অসংখ্য—আমাদের চিত্ত ছাইয়া ফেলিয়াছে। এইসকল কর্ম্মাশয় হইতে বাসনার উদ্রেক হয় এবং সেই বাসনা আমাদিগকে পুনঃ পুনঃ অবশভাবে কার্য্যে নিযুক্ত করে। আমাদের কার্য্য আমাদের স্বাধীন ইচ্ছার বশে হয় না। আমরা আমাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্কারবশে বাধ্য হইয়া নানাপ্রকার কার্য্য করি। আমরা মনে ভাবি, আমাদের কার্য্য আমাদের স্বাধীন ইচ্ছার অধীন, তাহা আমাদের সম্পূর্ণ ভ্রম। কোন এক অজানিত শক্তির বশে বাধ্য হইয়া আমরা এ সকল কার্য্য করিতেছি। সেই শক্তিকে চিনিতে পারাই সাধনার একটী উদ্দেশ্য। ক্ষুদ্র বালক যে কার্য্য করে, তাহা তাহার চিত্তের সংস্কারবশে বাধ্য হইয়া করে। বৃদ্ধ যাহা করে, তাহাও চিত্তের সংস্কারবশে বাধ্য হইয়া করে। এই চিত্তের সংস্কার হইতে বাসনার উদ্ভব হয় এবং সেই বাসনাদ্বারা ইন্দ্রিয়গণ পরিচালিত হইয়া কার্য্য করে। এই বাসনার প্রতিরোধ করা—সাধনার একটী অঙ্গ। এই সংস্কারকে ক্ষয় করা—সাধনার একটী অঙ্গ। যতদিন সংস্কার ক্ষয় না হয় ততদিন মুক্তি নাই। যতদিন সংস্কার আছে—ততদিন বাসনা আছে—তত-

দিন কার্য্য আছে। যতদিন কার্য্য আছে—ততদিন পুনঃ পুনঃ নূতন নূতন কার্য্য হইতে নূতন নূতন সংস্কার জন্মিবে। এইরূপে আমাদের সংস্কারের ক্ষয় না হইয়া, পুনঃ পুনঃ বৃদ্ধি হইতেছে। সংস্কার ক্ষয় হইলেই চিত্ত শুদ্ধ হয়—চিত্তশুদ্ধি হইলেই চিত্তনিরোধ হয়। চিত্তনিরোধ হইলেই, যোগসাধন সম্পন্ন হয়। এই সংস্কার ক্ষয় জন্য, বাসনার প্রতিরোধ আবশ্যক এবং তজ্জন্য বিষয়াসক্তি ত্যাগ করা আবশ্যক। এবং তজ্জন্য সঙ্কল্প বিকল্প ত্যাগ করা আবশ্যক। অনুরাগবশতঃ বিষয়ের সঙ্কল্পও খারাপ, আর বিদ্বেষবশতঃ বিষয়ের বিকল্পও খারাপ।

যদি নিজ ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য কামনাসহকারে কোন কর্ম্মের সঙ্কল্প করি, তাহা হইলে, রাগজ কর্ম্মাশয়ের সৃষ্টি হইবে; আবার বিদ্বেষবশতঃ যদি কোন কর্ত্তব্য কর্ম্মের অবহেলা করি, তাহা হইলে, তাহা হইতে দ্বেষজ কর্ম্মাশয়ের সৃষ্টি হইবে। এইরূপে কর্ম্মাশয়ের উৎপত্তি ক্রমাগত হইতে থাকিলে, আমাদের মুক্তি সুদূর-পরাহত। কর্ম্মফল আকাঙ্ক্ষা করিয়া কোন কর্ম্ম করিলেই কর্ম্মাশয়ের উৎপত্তি হইবে, আর নিষ্কাম-ভাবে কোন কর্ম্ম করিলে আর কর্ম্মাশয়ের উৎপত্তি হয় না এবং তজ্জন্য কর্ম্মের ফলভোগও করিতে হয় না। সম্পূর্ণ নিষ্কামভাবে কর্ম্ম করা বড় কঠিন। কোন না কোন কামনা মনে না থাকিলে, আমরা আদৌ কর্ম্ম করিতে পারি না; এইজন্য ঈশ্বরার্থে কর্ম্ম করিবে। ঈশ্বর-প্রীতির জন্য কর্ম্ম করিবে। নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য নহে। নিজের সুখাভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্য নহে। এইজন্য সুখদুঃখে সমজ্ঞান করিয়া কেবলমাত্র কর্ত্তব্যবোধে কর্ম্ম করিয়া যাইবে। তাহা হইলে, আর নূতন কর্ম্মাশয় হইবে না এবং পুরাতন কর্ম্মাশয়গুলি ক্ষীণ হইয়া ক্রমে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। এইরূপে যতই কর্ম্মের ক্ষয় হইবে, ততই চিত্তশুদ্ধ হইবে ও চিত্তস্থির হইবে। ক্রমে বিবেক, বৈরাগ্য, ভক্তি ও জ্ঞান প্রভৃতি প্রকাশ পাইবে এবং সর্ব্বশেষে আত্মদর্শন হইয়া কৃতার্থ হইয়া যাইবে।

স্বচ্ছ দর্পণে যেরূপ চন্দ্রপ্রতিবিম্ব সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়, বাসনা ও বৃত্তিহীন চিত্তে সেইরূপ আত্মদর্শন সুস্পষ্ট হয়। জলে যেমন ময়লা থাকিলে অর্থাৎ জল পঙ্কদ্বারা মলিন হইলে, যেমন তাহাতে চন্দ্রপ্রতিবিম্ব স্পষ্ট দেখা যায় না, সেইরূপ চিত্ত বাসনারূপ পঙ্কদ্বারা মলিন হইলে আত্ম-দর্শনও স্পষ্ট হয় না। যেমন পরিষ্কার ও নির্ম্মল জলে চন্দ্রপ্রতিবিম্ব সুস্পষ্ট দেখা যায়, সেইরূপ বাসনাশূন্য নির্ম্মল ও পরিষ্কার চিত্তে আত্মদর্শন খুব স্পষ্ট হয়। জল কেবল কর্দ্দম পরিশূন্য হইলেই যে, চন্দ্রপ্রতিবিম্ব বেশ স্পষ্ট দেখা যাইবে, তাহা নহে। জলে যদি স্রোত বহিতে থাকে, জলে যদি তরঙ্গ থাকে; তাহাহইলেও সেইরূপ চঞ্চল জলে চন্দ্রপ্রতিবিম্ব ভাল দেখা যায় না। সেইরূপ চিত্ত কেবলমাত্র নির্ম্মল হইলেই হইবে না, সেই চিত্তে কোন স্রোত না বহিলে অর্থাৎ চিত্ত স্থির হইলে তবে তাহাতে আত্মদর্শন সুস্পষ্ট হয়। অতএব আত্মদর্শন জন্য চিত্তকে বাসনাবিহীনও করা চাই এবং নিশ্চলও করা চাই, তবেই তাহাতে স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়া অনন্তকালের জন্য দুঃখের হাত হইতে ত্রাণ পাইবে।

মানবজীবনে এই যোগসিদ্ধ না হইতে পারিলে, মানবজীবন বৃথায় গেল। এই যোগসিদ্ধ হইতে গেলে, শুদ্ধ কর্ণদ্বারা শ্রবণ করিলেই হইবে না। শ্রবণ করিয়া মনন করিতে হইবে এবং তৎপরে শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট বা গুরূপদিষ্ট সাধনা করা আবশ্যক। সাধন না করিলে, ফললাভ হইবে না। পরমুখাপেক্ষী হইয়া, শুদ্ধ পরানুগ্রহের উপর নির্ভর করিবে না। ভগবানের কৃপা বা গুরুর কৃপা আছে সত্য। কিন্তু যাহাকে তাহাকে তাঁহারা সেই কৃপা বিতরণ করেন না। যে কৃপার পাত্র তাহাকে তাঁহারা কৃপা বিতরণ করেন। যে সাধক প্রাণপণ করিয়া সাধনে অগ্রসর হন—তিনিই সেই কৃপার পাত্র। অলস ও সাধনহীন সাধককে তিনি কৃপা করেন না। অতএব "শাঁর

কৃপাতেই সব হইবে,"—এইটী মনে করিয়া, সাধন ত্যাগ করিয়া বসিয়া বসিয়া, খাইয়া শুইয়া ও ঘুমাইয়া কাল কাটাইও না। মনে করিও না যে, তুমি ভগবানের বড় ভক্ত হইয়া গিয়াছ। লোকে তোমায় বড় ভক্ত বলিতে পারে; কিন্তু তাহাতে তোমার লাভ কি? লোকের সুখ্যাতিতে তুমি বড় হইবে না, আর লোকের অখ্যাতিতেও তুমি ছোট হইবে না। তুমি তুমিই থাকিবে। তুমি যাহা আছ তাহাই থাকিবে, তাহার অন্যথা হইবে না। অনেক ভক্ত বিটেল এইরূপে অপরের নিকট বিট্‌লেমি প্রকাশ করে, যেন তাহারা ভগবানে খুব বিশ্বাস করিয়াছে, যেন ভগবানে সম্পূর্ণ মনপ্রাণ অর্পণ করিয়াছে, যেন তাহাদের সাধন করিবার আর কিছু নাই, যেন ভগবান্ তাহাকে কাঁধে করিয়া লইয়া যাইবেন। এইসকল ভক্ত বিটেল ভয়ানক প্রতারক—ইহাদের সংস্পর্শেও যাইও না। ইহারা অলসের একশেষ। ইহারা খালি বসিয়া বসিয়া খাইতে ভালবাসে এবং এইরূপে এই দুর্লভ জীবন বৃথায় ব্যয় করে। ইহাদের মধ্যে ধর্ম্মের লেশমাত্র নাই। এইরূপ ভক্ত বিটেলদের দুইজনের পরস্পর ঐক্য নাই। সর্ব্বদাই মুখোমুখী, হাতাহাতি ও মারামারি চলিতেছে। ইহারা গোপনে গোপনে পরনিন্দা ও পরচর্চ্চায় ব্যস্ত। ইহারা নিজেরা যে মস্ত বড়, তাহা সাধারণে প্রকাশ করিতে ব্যস্ত। আজকাল বাঙ্গলার অনেক মঠে এইরূপ ভক্ত বিটেলের সংখ্যা অনেক দেখিতে পাইবে। অবশ্য প্রকৃত সাধকও অনেক আছেন; কিন্তু এই ভক্ত বিটেলের সংখ্যাও আশাতীত অধিক। কোন মঠে যাইয়া একেবারে সরলবিশ্বাসে কাহাকেও মনপ্রাণ অর্পণ করিও না। আমি নিজে অনেক জায়গায় ঠকিয়াছি এইজন্য তোমাদেরও সাবধান করিতেছি। প্রকৃত সাধকের সংখ্যা খুব কম বলিয়া জানিবে এবং তাঁহারা কাহারও সহিত মুখোমুখী বা হাতাহাতি করেন না বা অপরাধ না থাকিলেও কাহারও

গায়ে পড়িয়া ঝগড়া করেন না। আমি ভুক্তভোগী—অনেক স্থানে প্রতারিত হইয়াছি, তাই তোমাদের সাবধান করিতেছি। আমি জানিতাম লোকের অপকার না করিলে, সে কখনই অপকার করিবে না, বিশেষতঃ আশ্রম বা মঠের ন্যায় পবিত্র পুণ্যক্ষেত্রে; বিশেষতঃ যাহারা সর্ব্বত্যাগী হইয়া বিষয়বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া একমাত্র নিত্যধ্যানে নিযুক্ত রহিয়াছেন। আমার বাহিরে থাকিয়া তাহাই মনে হইত; কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিতেছি যে, ইহারা এখনও পশুবৃত্তি ত্যাগ করিতে পারে নাই। ইহাদের অপেক্ষা সাধারণ সংসারীরা অনেকগুণে শ্রেষ্ঠ। সাধারণ সংসারীরা নিজেদের ধার্ম্মিক বলিয়া প্রচার করে না। নিজের কষ্টে নিজেই জলিয়া পুড়িয়া মরিতেছে এবং ভগবানের দিকে তাকাইয়া প্রার্থনা করিতেছে। আর বিটেলরা বাহিরের সকলকে ঘৃণার চক্ষে অবলোকন করে ও নিজেদের মহাপুণ্যাত্মা ও ধার্ম্মিক বলিয়া মনে মনে ভাবে। ইহাদের আত্মপ্রতারণা ইহারা ধরিতে পারে না। মনে মনে ভাবে যে, ইহারা যাহা করিতেছে, তাহাই বেশ। তাই বলিতেছি, সাধন করিবার জন্য পরমুখাপেক্ষী হইও না। তাহাহইলে দুর্দ্দশার একশেষ হইবে। নিজে যে অবস্থায় আছ, সেই অবস্থায় থাকিয়া, কোমর বাঁধিয়া সাধনে লাগিয়া যাও—তোমার মঙ্গল হইবে। তুমি আশ্রম, মঠ বা তীর্থক্ষেত্রে বিশেষ কোন সুবিধা পাইবে না—বরং তাহারা তোমায় কুপথে লইয়া যাইবে, তোমার সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া, তোমায় রাস্তায় বসাইবে। তাই সাধকশ্রেষ্ঠ স্বামী বিবেকানন্দ গাহিয়াছিলেন :—

"যোগ-ভোগ, গৃহস্থ সন্ন্যাস, জপ তপ, ধন উপার্জ্জন,
ব্রত ত্যাগ তপস্যা কঠোর, সব মর্ম্ম দেখেছি এবার।"
"বিদ্যাহেতু করি প্রাণপণ, অর্দ্ধেক করেছি আয়ুক্ষয়—
প্রেমহেতু উন্মাদের মত, প্রাণহীন ধরেছি ছায়ায়;

ধর্ম্মতরে করি কতমত, গঙ্গাতীর শ্মশান আলয়;
নদীতীর পর্ব্বত গহ্বর, ভিক্ষাশনে কতকাল যায়।
অসহায় ছিন্নবাস ধরে, দ্বারে দ্বারে উদর পূরণ—
ভগ্নদেহ তপস্যার ভারে, কি ধন করিনু উপার্জ্জন?"
"ভিক্ষুকের কবে বল সুখ? কৃপাপাত্র হয়ে কিবা ফল?"

—বীরবাণী—

তাই বলি, পরের কৃপাপাত্র হইও না, পরের কৃপার ভিখারী হইও না। একমাত্র ভগবানের উপর নির্ভর কর, তাঁর শাস্ত্রগ্রন্থের আদেশ পালন কর। সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ কর। যদি সদ্‌গুরু না জুটিয়া উঠে, তবে শুদ্ধ সদ্‌গ্রন্থের সাহায্য লইয়া সাধন করিয়া যাও—তোমায় কাহারও কৃপাপাত্র হইয়া দ্বারে দ্বারে ঘুরিতে হইবে না। তোমার মধ্যেই সব আছে, কেবল অজ্ঞানে দেখিতে পাইতেছ না। বুদ্ধি মলিন, তাই বুদ্ধির বিচারশক্তি হারাইয়াছ। হিতাহিত বিচার করিতে অক্ষম হইয়াছ। বুদ্ধিকে শুদ্ধ কর। চিত্তকে পরিষ্কার কর। চিত্ত স্থির কর—ইহাই তোমার প্রধান সাধনা। ইহাই তোমার শ্রেষ্ঠ সাধনা। নিজের মন শুদ্ধ হইলেই—তোমার মনই তোমায় সব দেখাইয়া দিবে, কাহারও পরামর্শ লইতে হইবে না। আপনার গৃহে বসিয়াই নিশ্চিন্তমনে অভ্যাসের সাহায্যে অতি অল্পকালেই সেই পরমপদ লাভ করিবে।

চিত্তের বৃত্তি নিরোধকরা অর্থাৎ চিত্ত স্থির করাই সকল সাধনের মুখ্য উদ্দেশ্য। পৃথিবীর সমুদয় জাতিই তাহাদিগের নিজ নিজ ধর্ম্মে যে সাধন প্রণালী অবলম্বন করে, তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য, এই চিত্তবৃত্তি স্থির করা। চিত্তের বৃত্তি নিরোধ হইলে, অর্থাৎ চিত্ত স্থির হইলে আমরা মানসিক বল লাভ করি। যাহার চিত্ত যত চঞ্চল, তাহাঁর মানসিক বলও তত দুর্ব্বল। এই মানসিক বল লাভ

না করিতে পারিলে আত্মদর্শন হয় না। যোগসাধন হয় না। "ন হি বলহীনেন লভ্যঃ"। আমরা বাহ্যিক বা মানসিক যে কোন দ্রব্যে চিত্তসংযম অভ্যাস করিয়া চিত্তস্থির করিতে পারি। মন্ত্রজপে চিত্তসংযম করিয়া চিত্তস্থির করা খুব ভাল।. সর্ব্বদাই ইষ্টমন্ত্র জপ করিবে। ইষ্ট-মন্ত্র জপ করিবার স্থান, অস্থান নাই: শুচি বা অশুচি নাই; সময় বা অসময় নাই দিবারাত্র যখনই অবসর পাইবে মনে মনে ইষ্টমন্ত্র জপ করিবে। পাইখানায় বাহ্যে করিবার সময়ও ইষ্টমন্ত্র জপ করা যায়। ইহাতে কোনও দোষ হয় না। ইষ্টমন্ত্রের অর্থ জানিয়া, ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে হয়। অর্থ না জানিয়া জপ করিলে, তাহার সম্যক ফল হয় না। বর্ত্তমান অধিকাংশ কুলগুরু এইরূপ মন্ত্রার্থ অবগত নহেন, সুতরাং তাঁহারা তাঁহাদিগের শিষ্যের কর্ণে মাত্র মন্ত্রের অক্ষর-কয়টী উচ্চারণ করিয়াই কার্য্য শেষ করেন। অর্থ না জানিয়া মন্ত্র-জপ করা শাস্ত্রবিধি নয়। ত্রাটকযোগদ্বারাও চিত্ত একাগ্র হয়। চিত্তবৃত্তি নিরোধ হয়। যোগাসনে উপবেশন করিয়া চক্ষুর ঠিক সম্মুখে কোন বস্তু বিশেষের উপর চক্ষুকে একদৃষ্টি করিয়া রাখার নাম ত্রাটক-যোগ। নির্জ্জন ঘরের মধ্যে উত্তর বা পূর্ব্বমুখ হইয়া পদ্মাসনে বসিবে, তৎপরে নিজের ইষ্টদেবের মূর্ত্তি সম্মুখে রাখিয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকিবে, যতক্ষণ না চক্ষু অত্যন্ত ক্লান্ত হয়। চক্ষুর পাতা ক্লান্ত হইলে চক্ষু বুজাইয়া বহুক্ষণ পর্য্যন্ত সেই মূর্ত্তি মানসচক্ষে দেখিতে থাকিবে— পুনরায় চক্ষুর পাতার বিশ্রাম লাভ হইলে, পুনরায় চক্ষু চাহিয়া সেই মূর্ত্তির দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিবে। এইরূপে যতক্ষণ পার করিবে। এই ত্রাটকযোগ করিবার সময় মুদ্রাবিশেষ অবলম্বন করিয়া, তাহা করিলে অতি উৎকৃষ্ট ফললাভ হইবে। কেহ কেহ নাসিকার অগ্রভাগের দিকে চাহিয়া থাকে। কেহ কেহ উভয় ভ্রূর মধ্যস্থলে কপালের দিকে জ্যোতিঃকল্পনা করিয়া চাহিয়া থাকে। চক্ষুর পীড়া

থাকিলে, এইরূপ ত্রাটকযোগ করা ভাল নয়। চক্ষু দুর্ব্বল হইলে বা অতিবৃদ্ধাবস্থায় এইরূপে ত্রাটকযোগ করিলে চক্ষুর পীড়া উৎপন্ন হইতে পারে। যাহাহউক চিত্তস্থির করিবার জন্য অধিকারী অনুযায়ী নানা-প্রকার উপায় আছে। সদ্গুরুর নিকট জানিয়া লওয়া ভাল।

চিত্তের মধ্যে তিনটী গুণ আছে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। চিত্তরূপে পরিণত যে সত্ত্বগুণ, তাহাই চিত্তসত্ত্ব। ইহাই বিশুদ্ধ জ্ঞানবৃত্তি। এই চিত্তসত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সহিত মিলিত হইলে প্রবৃত্তিপথে ধাবিত হয়। তখন লোকেরা বিষয়পথ ভালবাসে। তখন ইহারা সংসার ভালবাসে। তখন ইহারা পুত্রকন্যা-গৃহক্ষেত্রাদিতে আসক্ত হইয়া পড়ে এবং নিবৃত্তি-পথ ত্যাগ করিয়া আত্মধ্যান বা ইষ্টধ্যান ভুলিয়া যায়। যতই বিষয়-পথে অগ্রসর হইবে, ততই চিত্ত অধিকতর চঞ্চল হইবে ও অধিকতর অসুখী হইবে। মনের মধ্যে বিষয় চিন্তা যত কম হয়, তত ভাল। সর্ব্বদা ইষ্টমন্ত্র জপ করা ভাল। প্রথম প্রথম বড় কষ্ট হয়; কিন্তু অভ্যাস করিতে করিতে ক্রমে সহজ হইয়া আসে। জগতে এমন কোন কার্য্য নাই, যাহা অভ্যাসের দ্বারা সিদ্ধ হয় না। বিনা অভ্যাসে সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাও কখন শুনা যায় নাই। সিদ্ধ মহাপুরুষদেরও অভ্যাস করিতে হইয়াছে। অতএব সর্ব্বদা অভ্যাস লইয়া থাকিবে। অলসতার প্রশ্রয় দিবে না। এই অলসতা ও বিলাস আমাদিগকে পশু করিয়া ফেলে। যদি উন্নতির আকাঙ্ক্ষা কর, যদি পরমসুখের আকাঙ্ক্ষা কর, তাহাহইলে, এই বিলাস ও অলসতা সর্ব্বথা সর্ব্বসময়ে ত্যাগ করিবে। এই বিলাস ও অলসতায় বাঙ্গালাদেশ উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে। এই চিত্তসত্ত্ব যখন তমোগুণে আবৃত থাকে তখন আমরা তন্দ্রা, নিদ্রা, অলসতা, মোহ, প্রমাদ, ভ্রান্তি, বিচারশক্তিহীনতা প্রভৃতি অসৎগুণে অভিভূত হইয়া পড়ি—অতএব প্রাণপণে এই তমোগুণকে পরাজয় করিতে হইবে। এই তমোগুণ পরাজিত না হইলে, সাধন করিতে পারিবে না। জপ করিতে

বসিয়া জপ হইবে না—ঘুমাইয়া পড়িবে। এই তমোগুণ নিবারণ জন্ত সর্ব্বদা সৎকার্য্য লইয়া ব্যস্ত থাকিবে। সাত্ত্বিক আহার করিবে—সৎসঙ্গ করিবে—সৎশাস্ত্র পাঠ করিবে। অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিবে—নভেল প্রভৃতি কুরুচিসম্পন্নগ্রন্থ পাঠ করিবে না। এই চিত্তসত্ত্ব রজোগুণদ্বারা আক্রান্ত হইলে, আমরা কার্য্যে ব্রতী হই। রজোগুণ আমাদের কার্য্য করায়। রজোগুণের আশ্রয় লইয়া উপরোক্ত তমোগুণকে জয় করিবে। রজোগুণের আশ্রয় ভিন্ন সাধন কার্য্য হইবে না; রজোগুণের আশ্রয়ে সর্ব্বদা সৎকার্য্য করিবে—অসৎকার্য্য করিও না। সর্ব্বদা সাধন কার্য্য করিবে—বৃথা সময় নষ্ট করিবে না। সময় বড় অমূল্য। এইরূপে সাধন করিতে করিতে ক্রমশঃ চিত্ত পূর্ণসত্ত্বগুণ-বিশিষ্ট হইবে ও রজঃ ও তমোগুণ নষ্ট হইয়া যাইবে। এইরূপে সত্ত্বগুণের চরম বিকাশ হইলে, চিত্তসত্ত্ব স্বরূপ-প্রতিষ্ঠ হয় ও পূর্ণরূপে সাত্ত্বিক-প্রসাদগুণবিশিষ্ট হয়। বিশুদ্ধ সুবর্ণে খাদ মিশাল থাকিলে যেমন তাহাকে মলিন দেখায় এবং অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া খাদহীন করিলে যেমন তাহার পূর্ব্ব স্বাভাবিক প্রভা প্রকাশ পায়; সেইরূপ চিত্তসত্ত্ব হইতে খাদরূপ এই রজঃ ও তমোগুণ অপসারিত হইলে সেই চিত্তসত্ত্ব নিজের গুণ পূর্ণরূপে প্রকাশ করে। এই অবস্থায় সাধকের বিবেক উৎপন্ন হয় এবং এইরূপ বিবেকের বলে, সে সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করে; কিন্তু এই সর্ব্বজ্ঞতাও সাধনের বিঘ্নস্বরূপ। এই সর্ব্বজ্ঞতাকেও তুচ্ছজ্ঞান করিয়া, তাহাকে দৃঢ়রূপে সাধনপথে অগ্রসর হইতে হইবে। তাহা না করিয়া যদি সে অহঙ্কারে মত্ত হয়, তাহা-হইলে, পতন অনিবার্য্য।

তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্ ॥৩॥

তখন দ্রষ্টার স্বরূপে অবস্থান হয়।

আমরা দ্রষ্টা। আমরা সাক্ষিমাত্র। আমরা কার্য্যের কর্ত্তা নহি। যোগসাধন হইলে, আমাদের স্বরূপে অবস্থান হইবে। এখন আমরা বিরূপে অবস্থান করিতেছি। এখন আমরা স্বরূপঅবস্থানভ্রষ্ট হইয়াছি। স্বরূপে অবস্থানই সুখ আর বিরূপে অবস্থানই দুঃখ। আমরা চিরসুখী—আমরা অমৃতের পুত্র। আমাদের দুঃখ আসিতে পারে না। আমরা বিরূপে অবস্থান করিতেছি বলিয়াই—আমাদের যত দুঃখ। এই বিরূপ অবস্থান ত্যাগ করিয়া যখন স্বরূপপ্রতিষ্ঠ হইব, তখন আমাদের আর দুঃখ থাকিবে না। এই বিরূপে অবস্থান কি? আমরা শরীর নহি, কিন্তু আমরা শরীরে অবস্থান করিতেছি। আমরা ইন্দ্রিয় নহি, কিন্তু আমরা ইন্দ্রিয়ে অবস্থান করিতেছি। আমরা মন নহি, কিন্তু আমরা মনে অবস্থান করিতেছি। এইরূপে আমরা স্বরূপচ্যুত হইয়া বিরূপে অবস্থান করিয়া নানাপ্রকার ক্লেশ ও যন্ত্রণা পাইতেছি। আমরা আত্মা হইয়াও নিজেদের আত্মস্মৃতি ভুলিয়া গিয়াছি! আমরা যে নির্ম্মল ও বিশুদ্ধ আত্মা—তাহা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি এবং মনে ভাবিতেছি—আমরা এই দেহ। এই দেহাত্মবুদ্ধি আমাদের কষ্ট দিতেছে। যতদিন এই দেহাত্মবুদ্ধি থাকিবে, ততদিন আমরা দুঃখের হাত এড়াইতে পারিব না।

বৃত্তিসারূপ্যমিতরত্র ॥৪॥

অন্যত্র বৃত্তিসারূপ্য অর্থাৎ দ্রষ্টা, স্বরূপ না হইয়া বৃত্তিসারূপ্য অর্থাৎ চিত্তবৃত্তির সারূপ্য গ্রহণ করেন অর্থাৎ চিত্তের বৃত্তিই আমার স্বরূপ—এইরূপ বোধ করেন।

চিত্তের নিরোধ অবস্থায় সমাধি হয় আর ব্যুত্থানাবস্থায় বিক্ষেপ হয় অর্থাৎ এইসময় যে সমস্ত চিত্তবৃত্তি উদিত হয়, সেই বৃত্তির সহিত পুরুষের অবিশিষ্টরূপে জ্ঞান হয় অর্থাৎ অভেদজ্ঞান হয় অর্থাৎ বৃত্তিও যাহা, আমি পুরুষও তাহা এইরূপ একতা জ্ঞান হয় অর্থাৎ পুরুষ নিজের স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া পররূপকেই নিজের স্বরূপ জ্ঞান করেন। ইহাই যতপ্রকার ক্লেশের মূলকারণ। ইহাই অবিদ্যা, মায়া বা অজ্ঞান। জ্ঞান দ্বারা এই অজ্ঞান বিনষ্ট হইলে আমরা চিরকালের জন্য এই দুঃখের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইব। চিত্তের বিষয়সকল পুরুষ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। পুরুষ সেই বিষয়কে মাত্র প্রকাশ করেন। পুরুষের সাহায্যে বিষয় প্রকাশিত হয় মাত্র; কিন্তু পুরুষ বিষয় নহেন। পুরুষ যখন বিষয়ের সহিত একতা বোধ করেন, তখন পুরুষের বন্ধন হয়, আর যখন কেবল সাক্ষিস্বরূপ বিষয়কে দর্শন করেন—এবং আমি (পুরুষ) বিষয় নহি এইরূপ বোধ করেন, তখন তিনি মুক্ত অর্থাৎ স্বরূপস্থ।

"আমি যাইব", "আমি খাইব", "আমি দেখিব", "আমি শুনিব" এইসকল বৃত্তির মধ্যে "আমি" ভাব সাধারণ। এই "আমি", যাহা "প্রকৃত আমি" তাহাই দ্রষ্টা বা পুরুষ বা চৈতন্য। চিত্ত জড়। চিত্তের বিষয় প্রকাশ করিবার ক্ষমতা নাই। পুরুষের চৈতন্যশক্তিতে চিত্ত চৈতন্যমত হয়। তাহার পর সেই চিত্তের বিষয় প্রকাশিত হয়। চৈতন্যের সাহায্য ব্যতীত চিত্তের বিষয় প্রকাশিত হইতে পারে না। বিষয়-প্রকাশ হইলে, আমাদের সেই বিষয়জ্ঞান হয় এবং এই বিষয়ের জ্ঞানকে দৃশ্য বলে। মনে কর তুমি রূপ দর্শন করিলে—তোমার রূপের জ্ঞান হইল। এই রূপজ্ঞান তোমার দৃশ্য, আর তুমি দ্রষ্টা। মনে কর তুমি কোন শব্দ শুনিলে—এই শব্দজ্ঞান তোমার দৃশ্য হইল, আর তুমি দ্রষ্টা। মনে কর তুমি কোন মিষ্টরস আস্বাদন করিলে—

এই মিষ্টজ্ঞান তোমার দৃশ্য হইল, আর তুমি দ্রষ্টা। সুতরাং রূপ রসাদিরা বাহ্য দৃশ্য। চিত্ত সাহায্যে উহাদের জ্ঞান হয়। সুতরাং বিষয়ের "জ্ঞাতা" আমি, আর চিত্ত হইল জ্ঞান সংগ্রহ করিবার যন্ত্রমাত্র অর্থাৎ "জ্ঞানকরণ"; আর বিষয় "জ্ঞেয়" হইল। চিত্ত জ্ঞানকরণ হইলেও চিত্ত নিজে জ্ঞান সংগ্রহ করে না। চিত্ত ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয় দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞান সংগ্রহ করে এবং চিত্তের ভাণ্ডারে সজ্জিত করিয়া রাখিয়া দেয়। চিত্ত যে জ্ঞান সঞ্চয় করে; সেই জ্ঞান চিত্তে থাকিয়া যায়—নষ্ট হয় না। যখন বিষয় আমাদের সম্মুখে থাকে না, যখন ইন্দ্রিয়ও কোন জ্ঞান সংগ্রহ করে না, তখন আমরা চিত্তস্থিত সেই পূর্ব্ব-সংগৃহীত জ্ঞানকে অনুভব করিতে পারি। ইহার নাম স্মৃতি। চিত্তের উপর ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানের যে ছাপ পড়ে অর্থাৎ চিত্তের উপর যে সংস্কার পড়ে, তাহা হইতে ভবিষ্যৎ স্মৃতির উদ্ভব হয়। আমরা ১০ বৎসর পূর্ব্বে কোন একটী জিনিস দেখিয়াছিলাম। এখন সে জিনিসটী চক্ষুদ্বারা দেখিতে পাইতেছি না বটে; কিন্তু আমরা স্মৃতিসাহায্যে সেই জিনিসের রূপ দেখিতে পারি অর্থাৎ সেই জিনিসের রূপ স্মরণ করিতে পারি। আমরা ১০ বৎসর পূর্ব্বে কোন একটী সুমিষ্ট গীত শ্রবণ করিয়াছিলাম। এখন সে গানটী কর্ণদ্বারা শ্রবণ করিতেছি না বটে; কিন্তু আমরা স্মৃতিসাহায্যে সেই গীতটী স্মরণ করিয়া, তাহার আনন্দ উপভোগ করিতে পারি। আমরা ১০ বৎসর পূর্ব্বে কোন মিষ্টরস জিহ্বাদ্বারা আস্বাদন করিয়াছিলাম। এখন জিহ্বাদ্বারা সেই মিষ্টরস আস্বাদন করিতেছি না বটে; কিন্তু আমরা স্মৃতিসাহায্যে সেই মিষ্টরস স্মরণ করিতে পারি। চিত্তের পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্কার হইতে এইরূপে স্মৃতির উৎপত্তি হয়। বিষয় বাহিরে বর্ত্তমান না থাকিলেও আমাদের অভ্যন্তরে সংস্কাররূপে বর্ত্তমান থাকে। এই সংস্কার হইতে মনে সেই বিষয়ের স্মৃতি উৎপাদিত হয়। বিষয়

আমাদের মনের অনুকূল হইলে, সেই স্মৃতি হইতে আমাদের সুখ হয়; আর বিষয় মনের প্রতিকূল হইলে, সেই বিষয় হইতে দুঃখ উৎপন্ন হয়। বিষয় না থাকিলেও, বিষয়ের অবর্ত্তমানেও এইরূপে আমাদের মনে সুখ দুঃখের উদয় হয়। বাহ্যবিষয় ত্যাগ করা সহজ; কিন্তু এই অন্তরের বিষয় অর্থাৎ স্মৃতিত্যাগ করা অতি কঠিন। চিত্তে যতকাল সংস্কার থাকিবে, ততকাল স্মৃতিও থাকিবে। শরীর নষ্ট হইলেও স্মৃতি নষ্ট হয় না। শরীর নষ্ট হইলে, বাহ্যবিষয়ের হাত হইতে অব্যাহতি পাই বটে; কিন্তু এই চিত্তের সংস্কারের হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার যো নাই। বাহ্যবিষয় আমাদের ততটা সুখ বা দুঃখ দান করে না, যতটা দান করে—এই চিত্তের সংস্কার। আমাদের দেহ নষ্ট হইলেও চিত্ত নষ্ট হয় না। চিত্ত থাকিয়া যাইলে আবার সেই চিত্ত হইতে দেহ উৎপন্ন হইবে। চিত্ত নষ্ট করিতে পারিলে, আর দেহ উৎপন্ন হইবে না আর আমরা জীবনমরণপ্রবাহেও ঘুরিয়া বেড়াইব না। তখন আমাদের মুক্তি হইবে। দেহ নষ্ট হইলে মুক্তি হয় না। চিত্ত লয় হইলে মুক্তি হয়। চিত্ত পুরুষ নয়। চিত্ত পুরুষের দৃশ্য। এই দৃশ্য লয় হইলেই, তখন পুরুষ একা একা অর্থাৎ স্বরূপস্থ থাকেন—তাহাই মুক্তি। দুই থাকিতে মুক্তি নাই। যতক্ষণ দৃশ্য থাকিবে ততক্ষণ দ্রষ্টাও থাকিবে। দ্রষ্টা এই দৃশ্যে অভেদজ্ঞান করিলেই—তাহার বন্ধন। যখন দ্রষ্টার মধ্যে দৃশ্য বলিয়া স্বতন্ত্রজ্ঞান থাকিবে না—তখন মুক্তি। যখন দ্রষ্টা সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডকে "আমিময়" দেখিবে, তখন তাহার মুক্তি। যখন সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড দ্রষ্টার নিজ স্বরূপের মধ্যেই অবস্থান করিবে—তখন তাহার মুক্তি। যখন হিন্দু, মুসলমান, ইংরাজ, খৃষ্টান প্রভৃতি কিছুই ভেদজ্ঞান থাকিবে না—তখন মুক্তি। যতক্ষণ হিন্দু, মুসলমান, ইংরাজ, খৃষ্টান থাকিবে—ততক্ষণ বন্ধন। যতক্ষণ স্বাধীনতা ও অধীনতা বলিয়া কিছু থাকিবে, ততক্ষণ বন্ধন

আর যখন স্বাধীনতা, অধীনতা বলিয়া কোন জ্ঞান থাকিবে না—তখন মুক্তি। ভেদজ্ঞানে মুক্তি নাই। ভেদ জ্ঞানে "স্বরাজ" নাই। ভ্রান্তের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াও কষ্টের উপর কষ্ট পাইবে। তোমার ঘুরিয়া বেড়ানই সার হইবে। তোমার শক্তি ও সময় বৃথা নষ্ট হইতেছে। ঋষিপন্থা অবলম্বন কর, ধর্ম্মকে ভিত্তি কর। তোমরা যাহাকে ধর্ম্ম মনে ভাবিতেছ, তাহা ধর্ম্ম নয়—তাহা অধর্ম্ম। এইজন্য তোমরা প্রতিকার্য্যে বিফল মনোরথ হইতেছ। ধর্ম্ম কাহাকে বলে, তাহা তোমরা জান না। ভ্রান্ত পথে আর অধিক অগ্রসর হইও না—এখনও ফের! তোমাদের মঙ্গল হইবে!

অস্মিতা বা অভিমান বা অহঙ্কার নানাপ্রকার বিকৃতিপ্রাপ্ত হইয়া এই চিত্তের বিষয়জ্ঞানরূপে পরিণত হয়। যাহাদের অভিমান নাই, তাহাদের চিত্তের বিষয়জ্ঞানও নাই। এই অভিমানই নানাপ্রকার বিষয়জ্ঞান সৃষ্টি করে। চক্ষুদ্বারা রূপ দর্শন করিলাম। লাল, নীল, হরিদ্রা প্রভৃতি নানাপ্রকারের বর্ণ দেখিলাম; কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে নানাপ্রকার বর্ণ নাই। বর্ণ একমাত্রই আছে। নানাপ্রকার রূপ নাই। রূপ একমাত্রই আছে। আমাদের মধ্যে যখন যে প্রকার রূপের অভিমান হয়—আমরা তখন সেইপ্রকার রূপ দর্শন করি। রূপ বলিয়া কোন বাস্তব পদার্থ নাই। ইহা অভিমানের বিকার মাত্র। যখন অভিমান লয় প্রাপ্ত হয়, তখন রূপও লয়প্রাপ্ত হয়। আমাদের সুষুপ্তি অবস্থায় অভিমান থাকে না; সুতরাং তখন নানাপ্রকার রূপও থাকে না। তখন কোনওপ্রকার রূপ থাকে না। জাগ্রদবস্থায় ও স্বপ্নাবস্থায় আমাদিগের অভিমান থাকে; সুতরাং তখন নানাপ্রকার রূপও বর্ত্তমান থাকে। অতএব রূপ কোনপ্রকার বাস্তব পদার্থ নহে। রূপ অভিমানের বিকৃতি মাত্র। মূলে ভিন্ন ভিন্ন রূপ নাই। রূপ একমাত্রই আছে, তাহাকে বলে "রূপতন্মাত্র"। সেইরূপ ভিন্ন

ভিন্ন রস নাই। মিষ্ট, তিক্ত, কটু প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন রস আমাদের অভিমানের বিকৃতিমাত্র। বাস্তবপক্ষে ইহারা বর্ত্তমান নাই। আমাদের অভিমান যখন বিকৃতি প্রাপ্ত হয়, তখন আমরা ইহাদিগকে অনুভব করি। একমাত্র রসতন্মাত্রই বর্ত্তমান। সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন শব্দ, স্পর্শ বা গন্ধ নাই। কেবলমাত্র শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র বা গন্ধতন্মাত্রই আছে। তন্মাত্র অতি সূক্ষ্ম পরমাণু। স্থূল শব্দে, স্থূল স্পর্শে, স্থূল রূপে, স্থূল রসে বা স্থূল গন্ধে যে পরমাণু আছে, তাহা স্থূল পরমাণু। স্থূল পরমাণুর অতি সূক্ষ্মতম অবস্থাই পরমাণুর তন্মাত্র অবস্থা। তন্মাত্র অবস্থা যন্ত্রাদির দ্বারা দৃষ্টিগোচর হইবার যোগ্য নহে। ইহা যোগীরা ধ্যানাবস্থায় দেখিতে পান। ধ্যানাবস্থায় এই তন্মাত্র দেখিতে পাওয়া যায়। এই তন্মাত্র মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস বা গন্ধ নাই। সেখানে সকলপ্রকার শব্দই একপ্রকার বলিয়া অনুভূত হয়। সেখানে শব্দের মধ্যে ভেদাভেদ থাকে না। সেইরূপ স্পর্শের মধ্যে ভেদাভেদ থাকে না। সেইরূপ রূপ, রস বা গন্ধের মধ্যেও কোন ভেদাভেদ থাকে না। অস্মিতা বা অভিমান হইতে এই সকল তন্মাত্রের সৃষ্টি হইয়াছে; সুতরাং এই সকল তন্মাত্র আবার অস্মিতায় লয় পায়। ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের রূপ, রস, গন্ধাদি যেমন তন্মাত্রে লয় পায়, তন্মাত্রও সেইরূপ অস্মিতাতে লয় পায়। তন্মাত্র লয় হইলে, অস্মিতা-দর্শন হয়। এই অস্মিতাদিকে লয় করা বড় কঠিন ব্যাপার। অধিকাংশ সাধক এই অস্মিতার কোটায় আটকাইয়া আছেন। কঠোর সাধনা, ধ্যান ও সমাধি ভিন্ন এই অস্মিতা লয় হয় না। এই অস্মিতা লয় হইলে, মহত্তত্ত্বে পৌছান যায় এবং মহত্তত্ত্ব লয় হইলেই দ্রষ্টা স্বরূপে অবস্থান করেন; তখন তাঁহার মুক্তি হয়। তখন তিনি চিরকালের জন্য দুঃখের হাত এড়াইতে পারেন। যতক্ষণ পুরুষ স্বরূপে অবস্থান না করিয়া—প্রকৃতির বিকার এই মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি পররূপে

অবস্থান করিবেন—ততক্ষণ তিনি দুঃখের হাত এড়াইতে পারিবেন না। প্রকৃতির বিকার মহত্তত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া নিম্নস্থ সমুদয় বিকারগুলিকেই দৃশ্য বলা যায়। এই দৃশ্যের সহিত পুরুষ যখন একতা বোধ করেন তখন তাঁহার বন্ধন; আর এই দৃশ্যকে, পুরুষ যখন নিজ হইতে স্বতন্ত্র দৃষ্টি করেন—তখন তাঁহার মোক্ষ। দ্রষ্টার সহিত দৃশ্যের সংযোগই বন্ধন আর ইহাদের বিয়োগই মোক্ষ। দ্রষ্টার দ্বারাই দৃশ্যের প্রকাশ হয়। দ্রষ্টাই দৃশ্যকে প্রকাশ করেন। দ্রষ্টা না থাকিলে দৃশ্যও থাকে না। যাহার প্রকাশের জন্য অপর প্রকাশকের আবশ্যক করে, তাহাই দৃশ্য। যাহার প্রকাশের জন্য অপর প্রকাশকের আবশ্যক করে না, যাহা স্বয়ম্প্রকাশ, তাহাই স্বয়ম্প্রকাশ—চিৎ, দ্রষ্টা পুরুষ স্বয়ম্প্রকাশ এবং প্রাকৃতিক বিকারাদি দৃশ্য বা প্রকাশ্য। এই দৃশ্য, চৈতন্যের সহিত মিলিত হইয়া চেতনাযুক্তের ন্যায় হয়।

বৃত্তয়ঃ পঞ্চতয্যঃ ক্লিষ্টাঽক্লিষ্টাঃ ॥৫॥

চিত্তের বৃত্তি পাঁচপ্রকার এবং ইহারা ক্লিষ্টা ও অক্লিষ্টা।

বৃত্তি কাহাকে বলে? যে কর্ম্মের দ্বারা যাহার জীবিকানির্ব্বাহ হইয়া থাকে তাহাই তাহার বৃত্তি। বৃত্তিহীন হইলে না খাইতে পাইয়া লোকে মরিয়া যায়; বৃত্তিহীন হইলে চিত্তও ধ্বংস হয়। কেরাণীবাবুদের চাকরী বৃত্তি। যদি তাহারা চাকরী করিতে না পায়, তাহাহইলে, তাহাদের অর্থাভাব হইবে এবং তজ্জন্য খাদ্যাভাব হইবে এবং খাদ্যাভাব হইলে খাইতে না পাইয়া মরিয়া যাইবে। কোন দুর্দ্দান্ত পশুকে কোন গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়া কিছুদিন খাইতে না দিলেই সে মরিয়া যায়; সেইরূপ চিত্তের দুর্দ্দান্ত বৃত্তিগুলিকে খাইতে না দিলেই তাহারাও লয় পাইবে। বিষয়বাসনাই চিত্তের বৃত্তি। যতদিন

বিষয়বাসনা মনে উদিত হইবে, ততদিন চিত্তও জীবিত থাকিবে। এই বিষয়বাসনার লয় হইলেই চিত্তের লয় হয়। চিত্তের একবারে ধ্বংস হয় না। তবে তখন চিত্ত "সত্ত্ব" হইয়া যায়। তখন চিত্তকে আর চিত্ত বলে না। তখন চিত্তকে "সত্ত্ব" বলে। রজোগুণে চিত্তে কামনার উদ্ভব হয়। এই রজোগুণকে দমন করিতে পারিলেই চিত্তের কামনার দমন হয়। আমাদের মনে সর্ব্বদাই একটী না একটী কামনা লাগিয়াই আছে। হয় দেখিবার কামনা, নয় শুনিবার কামনা, নয় স্পর্শ করিবার কামনা, নয় পদদ্বারা চলিবার কামনা, নয় হস্তদ্বারা কোন কার্য্য করিবার কামনা, নয় বাগ্‌যন্ত্রদ্বারা বাক্য উচ্চারণ করিবার কামনা, নয় পায়ুদ্বারা মলত্যাগ কামনা, নয় উপস্থের কার্য্য কামনা; এইরূপ কোন না কোন কামনা আমাদের মনে লাগিয়াই আছে। এই কামনার দ্বারাই চিত্ত চঞ্চল থাকে। এই সকল কামনাই চিত্তচাঞ্চল্যের একমাত্র কারণ। চিত্তের সংস্কার হইতে স্মৃতির উদ্ভব হয় এবং এই স্মৃতি হইতে কামনার উদ্ভব হয় এবং এই কামনা হইতে কার্য্য হয়। পুনরায় এই কার্য্য হইতে চিত্তে নূতন নূতন সংস্কার পড়ে এবং ভবিষ্যতে সেই সংস্কার হইতে পুনরায় স্মৃতি ও কামনার উদ্ভব হয় এবং এইপ্রকারে আমাদের কর্ম্ম হইতে বিরাম নাই। আমরা সর্ব্বদাই নানাপ্রকার কার্য্যে বিব্রত থাকি এবং ক্রমাগত নূতন নূতন সংস্কারের সৃষ্টি করি। চিত্তকে সংস্কারশূন্য করিতে পারিলে, আর কামনার উদ্ভব হইবে না এবং আমাদের কর্ম্মের ক্ষয় হইবে ও আমরা নৈষ্কর্ম্ম্য অবস্থা প্রাপ্ত হইব। তখন আমাদের জ্ঞানালোচনা ও জ্ঞানোপার্জ্জনের সুবিধা হইবে এবং ক্রমে বিবেক উৎপন্ন হইবে।

চিত্তের কতকগুলি বৃত্তি ক্লিষ্টা ও অপর কতকগুলি অক্লিষ্টা। ক্লিষ্ট-বৃত্তি আমাদের কষ্টের কারণ। অক্লিষ্ট-বৃত্তি আমাদের সুখের কারণ। ক্লিষ্ট-বৃত্তির দ্বারা বন্ধন হয়। অক্লিষ্ট-বৃত্তি দ্বারা মুক্তি হয়। ক্লিষ্ট-

বৃত্তি অজ্ঞান উৎপাদন করে। অক্লিষ্ট-বৃত্তি জ্ঞান উৎপাদন করে। অতএব ক্লিষ্টবৃত্তি হেয় ও ত্যজ্য এবং অক্লিষ্ট-বৃত্তি গ্রহণীয় ও কর্ত্তব্য।

সংস্কার হইতেই কামনার সৃষ্টি হয়। এই কামনায় বা ভাবনায় আমরা দিবারাত্র বিব্রত থাকি। ভাবনাশূন্য অবস্থা আমরা প্রাপ্ত হই না। ভাবনাযুক্ত আমি—"বদ্ধ আমি"। ভাবনাশূন্য আমি—"মুক্ত আমি"। সর্ব্বভাবনাশূন্য হইয়া অবস্থিতি করিতে পারিলে, মনে একটা নির্ম্মল আনন্দের উদয় হয়। তাহাই নির্ম্মল ব্রহ্মানন্দ। বিষয়ানন্দের পরিণাম দুঃখ। ব্রহ্মানন্দের পরিণাম অনন্ত সুখ। ইহাতে দুঃখের লেশমাত্র নাই। এই আনন্দই প্রতি জীবের লক্ষ্য। এই আনন্দ লাভ করিবার জন্যই জীব অনাদি অনন্তকাল হইতে ছুটাছুটী করিতেছে। এই আনন্দলাভ করিলেই জীবের ছুটাছুটী বন্ধ হইয়া যায়; এবং পরমবিশ্রান্তি লাভ করিয়া পরমসুখে সুখী হয়। এই আনন্দের প্রাপ্তির উপায় জীব জানে না। কোন পথে যাইলে এই আনন্দ পাওয়া যায়, তাহা জীব জানে না। তাহাদের লক্ষ্য এই আনন্দপ্রাপ্তি কিন্তু পথভ্রান্ত হইয়া তাহারা এই আনন্দ হইতে বঞ্চিত হয়। কুপথে ভ্রমণ করিয়া, তাহারা বিষয়ানন্দকেই ব্রহ্মানন্দ বলিয়া গ্রহণ করে এবং পশ্চাৎ কষ্টের পর কষ্টভোগ করে। ইচ্ছা করিয়া কেহ দুঃখ চায় না আমাদের বিচারশক্তি মলিন। আমাদের বুদ্ধি নির্ম্মল নয়। মলিন বুদ্ধিতে বিচার ঠিক হয় না। কোনটী কার্য্য, আর কোনটী অকার্য্য—তাহা আমরা ঠিক করিতে পারি না। আমাদের বুদ্ধির দোষে আমরা অকার্য্যকে কার্য্য বলিয়া মনে করি, আর কার্য্যকে অকার্য্য বলিয়া মনে করি। আমরা যাহা দেখি তাহা ভুল দেখি। আমরা দেহকে "আত্মা" বলিয়া দেখি, তাহা সম্পূর্ণ ভুল। আমরা যাহাকে হিতকর বলিয়া দেখি, তাহা আমাদের অহিতকর। আমরা যাহা হিতকর বলিয়া শ্রবণ করি, তাহা আমাদের অহিতকর।

আমরা যাহা হিতকর বলিয়া আস্বাদন করি, তাহা আমাদের অহিতকর। আমরা যাহাকে হিতকর বলিয়া স্পর্শ করি, তাহা আমাদের অহিতকর। এইপ্রকারে আমাদের সমুদয় কার্য্যই প্রায় আমাদিগের অমঙ্গলের জন্য হয়। এইজন্য আমরা কষ্টের উপর কষ্টভোগ করিতেছি। প্রকৃত সুখের মুখ দেখিতে পাই না। প্রকৃত সুখ কাহাকে বলে জানি না। যেমন দর্পণ মলিন হইলে, তাহাতে মুখের প্রতিচ্ছবি স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় না; তেমনি বুদ্ধি মলিন হইলে, আমাদের বিচার ও মীমাংসা ঠিক ঠিক হয় না। চিত্তের নানাপ্রকার পরিণামে আমাদের বুদ্ধির নানাপ্রকার দোষ হয়।

চিত্তের এই ক্লিষ্টা ও অক্লিষ্টা বৃত্তিসকল পাঁচ প্রকার। অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ। চিত্তে ইহাদের কোন একটী বৃত্তি উঠিলেই তাহাকে ক্লিষ্ট-বৃত্তি বলে। এই ক্লিষ্ট-বৃত্তি হইতে যে সংস্কার সঞ্চিত হয় তাহাহইতে পুনরায় ক্লেশময় বৃত্তির উৎপত্তি হয় এবং আমাদিগকে দুঃখ প্রদান করে। অবিদ্যাদি এই পাঁচটী ক্লিষ্টবৃত্তি জ্ঞানের দ্বারা নষ্ট হয় এইজন্য জ্ঞান বিষয়িনী বৃত্তিগুলি অক্লিষ্ট-বৃত্তি। "আমি দেহ" এইরূপ বুদ্ধিকে অজ্ঞান বলে; "আমি দেহ নহি", "আমি আত্মা"—এইরূপ বুদ্ধি জ্ঞান। জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞান নষ্ট হয়। নির্ম্মল বুদ্ধিতে জ্ঞান হয়, আর মলিন বুদ্ধিতে অজ্ঞান হয়। যে জ্ঞানের দ্বারা আমাদের অবিদ্যাদি ক্লিষ্ট-বৃত্তিসকল নষ্ট হয়, তাহার নাম বিবেক। এই বিবেকজ্ঞানই আমাদের অক্লিষ্ট-বৃত্তি। বিবেক আমাদের চিত্তে সর্ব্বদাই বর্ত্তমান আছে, তবে চিত্তের মলিনতা হেতু বিবেক স্পষ্ট প্রকাশ পায় না। চিত্তের মলিনতা যত কমিয়া যাইবে, বিবেকও তত প্রকাশিত হইবে। ক্লিষ্ট-বৃত্তি হইতে ক্লিষ্ট-সংস্কার হয়; আর অক্লিষ্ট-বৃত্তি হইতে অক্লিষ্ট-সংস্কার হয়।

প্রমাণ-বিপর্য্যয়-বিকল্প-নিদ্রা-স্মৃতয়ঃ ॥ ৬ ॥

সেই ক্লিষ্টা ও অক্লিষ্টা বৃত্তিসকল পাঁচপ্রকার। প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি।

বৃত্তি বলিতে কার্য্যচেষ্টা বুঝায় না, কিন্তু কার্য্যচেষ্টার পূর্ব্বে যে খণ্ড খণ্ড বোধসকল উৎপন্ন হয়, তাহাই বৃত্তি। (১) প্রমাণ=যথার্থভূত বোধ, (২) বিপর্য্যয়=অযথাভূত বোধ, (৩) বিকল্প=অবস্তুবিষয়ক বোধ; (৪) নিদ্রা=রুদ্ধাবস্থার অস্ফুটবোধ, (৫) স্মৃতি=বুদ্ধভাবসমূহের পুনর্ব্বোধ।

চিত্তের ক্রিয়া ছয় প্রকার। যথা:—গ্রহণ, ধারণ, ঊহ, অপোহ, তত্ত্বজ্ঞান ও অভিনিবেশ। (১) "গ্রহণ" অর্থাৎ চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়দ্বার দিয়া রূপ ও শব্দ প্রভৃতি বিষয় যাহা আমাদিগের মধ্যে প্রবেশ করে, তাহাদের গ্রহণ। (২) "ধারণ" অর্থাৎ সেই রূপ ও শব্দাদি বিষয় চিত্তমধ্যে সঞ্চিত করিয়া রাখা। (৩) "ঊহ" অর্থাৎ সেই ধৃত বা সঞ্চিত বিষয়কে পুনরায় উত্তোলিত করা অর্থাৎ প্রকাশিত করা। (৪) "অপোহ" অর্থাৎ সেই উত্তোলিত বিষয়গুলি হইতে কয়েকটী বিষয় নির্ব্বাচন করিয়া লওয়া। (৫) "তত্ত্বজ্ঞান" অর্থাৎ সেই নির্ব্বাচিত বিষয়টীর উত্তমরূপ বোধন এবং (৬) "অভিনিবেশ" অর্থাৎ তাহাতে নিশ্চয় বুদ্ধি। চিত্তের এই ছয়প্রকার ক্রিয়াকে চিত্তের বৃত্তি বলে। এই সকল বৃত্তি চিত্ত হইতে লয় হইলে, তাহাকে চিত্তলয় বলে।

প্রকৃতি তিনটীগুণের সমষ্টিমাত্র। এইজন্য প্রকৃতির যেখানেই যাওনা কেন, এই তিনটী গুণের মধ্যে থাকিবেই থাকিবে। চিত্তও এই তিনটী গুণে নির্ম্মিত। সুতরাং চিত্তমধ্যেও সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটী গুণ আছে। তিনটী গুণ থাকিলে তিনটী গুণের কার্য্যও থাকিবে। সত্ত্বগুণ—প্রকাশ বা প্রখ্যা, রজোগুণ—চেষ্টা বা প্রবৃত্তি, তমোঃ

গুণ—আবরণ বা স্থিতি। প্রখ্যা=জ্ঞান। প্রবৃত্তি=চেষ্টাভাব। স্থিতি= সংস্কার। সংস্কার চিত্তমধ্যে স্থিরভাবে পড়িয়া আছে। এই সংস্কার হইতে প্রবৃত্তির বোধ উৎপন্ন হয় অর্থাৎ সুখবোধ বা দুঃখবোধ।' রাগ, দ্বেষ, ইচ্ছা, অনিচ্ছা ইত্যাদি সমুদয় বোধই সংস্কার হইতে উৎপন্ন হয়। সংস্কার মধ্যে যদি রাগ থাকে, তাহা হইলে, সেই সংস্কার হইতে রাগবোধ উদিত হইবে। আমাদিগের মধ্যে যে নানাপ্রকার ভাবের উদয় হয়, তাহা এই সংস্কার হইতেই হয়। প্রতি জীবের চিত্তে যে সংস্কার আছে, তাহা হইতেই তাহার মনোভাব উৎপন্ন হয়। শিশু পূর্ব্বজন্মে যে সকল কার্য্য করিয়াছিল এবং সেই সকল কার্য্য হইতে পূর্ব্বজন্মে সে যে সকল সংস্কার সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল, ইহজন্মে তাহার সেই সকল সংস্কার হইতে তাহার মনোভাব উৎপন্ন হইতেছে এবং সে অবশভাবে সেই সকল কার্য্য করিতেছে। যে শিশু পূর্ব্বজন্মে "চোর" ছিল; সে তাহার চিত্তমধ্যে সেই "চোরের সংস্কার" সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল এবং ইহজন্মে অতি বাল্যকাল হইতেই সেই "চুরি করিবার" প্রবৃত্তি তাহার মনে উদয় হইতে লাগিল এবং সে ক্রমে ক্রমে এটা ওটা সেটা চুরি করিতে করিতে একজন পাকা চোর হইল। পূর্ব্বজন্মে যে সাধু ছিল, সে পূর্ব্বজন্মে তাহার চিত্তে সাধুর সংস্কার সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিল এবং ইহজন্মে সে বাল্যকাল হইতেই সাধুভাব প্রকাশ করিতে লাগিল। এইরূপ উত্তমরূপে বিচার করিলে আমাদের শিশুসন্তানেরা পূর্ব্বজন্মে কিরূপ প্রকৃতির ছিল তাহা ইহজন্মের ব্যবহার হইতে আমরা বুঝিতে পারি এবং কৌশল অবলম্বন করিয়া তাহাদিগকে লালিত পালিত করিলে আমরা তাহাদিগের মঙ্গল সাধন করিতে পারি। চিত্তের সংস্কার আমরা দেখিতে পাই না; কিন্তু যখন সেই সংস্কার হইতে মনোভাব উৎপন্ন হয় ও সেই মনোভাবানুযায়ী কার্য্য উৎপন্ন হয়, তখন সেই কার্য্যদ্বারা আমরা

তাহার চিত্তের সংস্কার বিষয়ে বুঝিতে পারি এবং সে পূর্ব্বজন্মে কোন প্রকৃতির জীব ছিল, তাহাও অনুমান করিতে পারি। আমাদের পূর্ব্ব-পূর্ব্বজন্মের সংস্কারানুযায়ী আমরা ইহজন্মে কার্য্য করিতে বাধ্য হই। আমরা ইহজন্মের কার্য্যানুযায়ী আমাদিগের চিত্তে সংস্কার সঞ্চিত করিব এবং সেই সংস্কারানুযায়ী কার্য্য করিতেও বাধ্য হইব। ইহজন্মে যদি আমরা প্রচুর পরিমাণে পবিত্র কার্য্য করি ও পবিত্র সংস্কার চিত্তে সঞ্চয় করিয়া রাখি, তাহা হইলে, পরজন্মে আমাদের চিত্তের সেই পবিত্র সংস্কার হইতে সাধুকার্য্যের উদ্ভব হইবে; কিন্তু ইহজন্মে যদি আমরা প্রচুর পরিমাণে পাপকার্য্য করি, তবে পরজন্মে সেই সকল পাপসংস্কার হইতে আমাদের পাপ-কার্য্যেরই উৎপত্তি হইবে। এই সকল সংস্কারের ভাব, আমাদিগকে জোর করিয়া কার্য্যে বাধ্য করায় এবং আমরা অবশভাবে এই সকল পবিত্র বা পাপকার্য্য করিয়া ফেলি। সংস্কার হইতে এই যে সকল বোধ উৎপন্ন হয়, তাহাদিগকে প্রত্যয় বা খণ্ড খণ্ড বোধ বলে, বা চিত্তের বৃত্তি বলে। এই বৃত্তি নিরোধ করাই অর্থাৎ চিত্তকে প্রত্যয়শূন্য করাই যোগের প্রধান উদ্দেশ্য। এই প্রত্যয়গুলিই চিত্তকে অস্থির করে, চিত্তের চাঞ্চল্য উৎপাদন করে এবং তাহা হইতে দুঃখের আবির্ভাব হয় এবং এই চিত্তকে স্থির করিতে পারিলেই আমাদের সুখ হয়। অতএব যাহার চিত্ত যত অধিক চঞ্চল, সে তত অধিক পাপী ও অসুখী এবং যাহার চিত্ত যত অধিক স্থির সে তত অধিক পুণ্যাত্মা ও অধিক সুখী। চিত্ত, বুদ্ধি ও মন যদিও একই দ্রব্য নহে; কিন্তু সাধারণ লোকে ইহাদের এক মনে করিলেও তাহাদের সাধনের কোনও ক্ষতি হইবে না। এ পুস্তকখানি সাধারণের জন্য। যাহাদের অধিক জানিবার ইচ্ছা হয়, তাহাদের আরও উৎকৃষ্ট গ্রন্থ পাঠ করা উচিত।

প্রত্যক্ষানুমানাগমাঃ প্রমাণানি ॥ ৭ ॥

প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম হইতে যে জ্ঞান হয়, তাহাকে প্রমাণ বলে। প্রমাণ হইতে যে জ্ঞান হয়, তাহাই যথার্থ জ্ঞান। প্রমাণের বিপরীতকে বিপর্য্যয় বোধ বলে। অর্থাৎ যে বস্তু যাহা নয়, তাহাকে তাহা বলিয়া বোধ করা ; আকাশকে নীল বলিয়া বোধ করা ; মরুভূমিতে মরীচিকা জলের জ্ঞান হওয়া ; পৃথিবী যদিও বেগে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে তথাপি ইহাকে স্থির বলিয়া মনে করা ; পুত্র যদিও বাস্তব পুত্র নহে, তথাপি তাহাকে পুত্র বলিয়া মনে করা ; কন্যা বা স্ত্রী বাস্তব কন্যা বা স্ত্রী না হইলেও তাহাকে কন্যা বা স্ত্রী বলিয়া বোধ করা ; ঘরবাড়ী বাস্তব আমার না হইলেও তাহাদের আমার বলিয়া মনে করা। আমাদের হস্তপদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের কার্য্য প্রকৃতির হইলেও এবং তাহাতে আমাদের কিছুমাত্র কর্তৃত্ব না থাকিলেও তাহাদিগকে প্রকৃতির কার্য্য না বলিয়া আমাদের কার্য্য মনে করা। আমরা (পুরুষ) কিছুই করিতেছি না অথচ আমরা যেন সবই করিতেছি এইরূপ মনে করা। আমরা কোন কার্য্যের কর্ত্তা নহি অথচ আমরা যেন সকল কার্য্যের কর্ত্তা এইরূপ ভুল মনে করা ; শরীরের কার্য্যকে আমার কার্য্য বলিয়া মনে করা, ইন্দ্রিয়ের কার্য্যকে আমার কার্য্য বলিয়া মনে করা, মনের কার্য্যকে আমার কার্য্য বলিয়া মনে করা ; বুদ্ধির কার্য্যকে আমার কার্য্য বলিয়া মনে করা, অস্মিতার অভিমানকে বা অহঙ্কারকে নিজের স্বরূপ মনে করা। এই সকল মিথ্যাজ্ঞানকে "বিপর্য্যয় জ্ঞান" বলে। এইরূপ বিপর্য্যয়জ্ঞানগুলিকে আমরা প্রমাণ জ্ঞান মনে করি। ইহা আমাদের অতীব ভ্রান্তি ; বস্তুকে ঠিক ঠিক জানিলে, তবে তাহার নাম "প্রমাণ" হইবে। "দেহ আমি নহি", "আত্মা আমি" যখন এইরূপ জ্ঞান হইবে তখন তাহা "প্রমাণ-জ্ঞান", অন্যত্র "বিপর্য্যয়জ্ঞান"। "ইন্দ্রিয় আমি

নহি”, “মন আমি নহি”, “বুদ্ধি আমি নহি”, “পুত্র আমার নহে”, “কন্যা আমার নহে”, “ঘরবাড়ী আমার নহে” একমাত্র “আত্মাই আমি” যাহাদ্বারা এইরূপ যথার্থজ্ঞান হয়, তাহাকে “প্রমাণ” বলে।

কোন বস্তুর যথার্থ বোধকে প্রমাণ বলে এবং অযথার্থ বোধকে বিপর্য্যয় বলে। জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়া বস্তুর যথার্থ বোধ হইতে পারে অথবা অনুমান দ্বারাও বস্তুর যথার্থবোধ অনুমিত হইতে পারে। অন্ধকার ঘরে একগাছি দড়ি পড়িয়া আছে। আমরা সেই-টীকে সাপ মনে করিলাম এবং ভয়ে ত্রস্ত হইলাম—এইরূপ জ্ঞান “বিপর্য্যয় জ্ঞান”। আবার হস্তে আলোক লইয়া যখন সেই বস্তুটীকে ভাল করিয়া দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম যে তাহা সর্প নয়, তাহা রজ্জুমাত্র, তখন আমাদের ভয় দূর হইল। তখন আমাদের সেই রজ্জুবিষয়ে যথার্থজ্ঞান হইল, ইহার নাম প্রত্যক্ষ দ্বারা “প্রমাণ-জ্ঞান”। আবার অনুমান দ্বারাও প্রমাণ জ্ঞান হয়, যেমন মনের মধ্যে সুখ অনুভব হইতেছে। এই সুখ, দুঃখ, হর্ষ বা ক্রোধের অনুভব হইতেও “প্রমাণ-জ্ঞান” হয়। আবার স্মৃতির অনুভব হইতেও “প্রমাণজ্ঞান” হয়। ১০ বৎসর পূর্ব্বে কোন দ্রব্য দেখিয়াছিলাম, এক্ষণে সে দ্রব্য আমাদের সম্মুখে না থাকিলেও আমাদের স্মৃতির অনুভবের দ্বারা যেন সেই বস্তুকে সাক্ষাৎ দেখিতে পাইতেছি এইরূপ অনুমান হয়—ইহাও “প্রত্যক্ষ জ্ঞান”।

চক্ষুদ্বারা কোন রূপ দর্শন করিলে, চিত্ত সেই রূপদ্বারা উপরঞ্জিত বা বিকৃত হয়; কর্ণদ্বারা কোন শব্দ শ্রবণ করিলে, চিত্ত সেই শব্দদ্বারা উপরঞ্জিত বা বিকৃত হয়। এইরূপ নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা আমরা যখনই যে কোন বিষয়ই গ্রহণ করি না কেন, চিত্ত সেই সেই বিষয়ে উপরঞ্জিত ও বিকৃত হয়। এইরূপে চিত্ত ক্ষণে ক্ষণে আকার পরিবর্ত্তন করিতেছে ও বিকৃত হইতেছে। চিত্তসত্ত্বের এইরূপ এক একটী পরিবর্ত্তনকে অর্থাৎ পরিণামকে এক একটী প্রত্যয়, বোধ

বা জ্ঞান বলে। ইহারাই এক একটী চিত্তবৃত্তি। প্রত্যক্ষ করিয়া যে জ্ঞান হয়, তাহা পাকা জ্ঞান। মনে কর তুমি একটী আম্রের বর্ণ, আস্বাদ বা গন্ধের বিষয় বর্ণনা করিতেছ। তুমি যতই বর্ণনা কর না কেন; সেই বর্ণ, আস্বাদ বা গন্ধের যথার্থজ্ঞান তোমার শ্রোতার হৃদয়ে অঙ্কিত করিতে পারিবে না। তুমি সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত শত-সহস্র প্রকারে তাহাকে সেই আম্রের বর্ণ, আস্বাদ বা গন্ধের বিষয় শ্রবণ করাও না কেন, কোনমতেই তুমি সেই শ্রোতার হৃদয়ে তাহার যথার্থজ্ঞান প্রবেশ করাইতে পারিবে না; কিন্তু একবার মাত্র সেই আম্রফলটী তাহার হস্তে প্রদান কর, তৎক্ষণাৎ মুহূর্ত্তমধ্যেই তাহার পাকা রূপজ্ঞান হইবে। একবার মাত্র সেই আম্রের গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া, মুহূর্ত্তমাত্রেই সেই আম্রের গন্ধবিষয়ে তাহার পাকা জ্ঞান হইবে একবার মাত্র সেই আম্রের রস জিহ্বায় সংলগ্ন হইলেই, মুহূর্ত্তমাত্রেই সেই আম্রের আস্বাদন বিষয়ে তাহার পাকাজ্ঞান হইবে। অতএব প্রত্যক্ষে যেরূপ পাকাজ্ঞান হয়, অন্যরূপে সেইরূপ হয় না। রূপ প্রত্যক্ষ করিয়া তাহার রূপবিষয়ে পাকাজ্ঞান হইল। রস ও গন্ধ অনুভবদ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়া তাহার রস ও গন্ধের পাকা জ্ঞান হইল। এইরূপে প্রত্যক্ষ ও অনুমান "প্রমাণ" হইল।

আগমও একটী "প্রমাণ"। আগম কাহাকে বলে? আপ্তপুরুষের মুখ হইতে যে বাক্য নিঃসৃত হয়, তাহাই "আগম"। সিদ্ধ-পুরুষের বাক্যকে আপ্তপুরুষের বাক্য বলা যায়। আপ্তপুরুষের বাক্যের এমন একটা শক্তি আছে, যাহা আমাদের অন্তঃকরণে বিদ্ধ হইয়া গিয়া একেবারেই বস্তুবিষয়ক যথার্থজ্ঞানের সঞ্চার করে। তাঁহাদের বাক্যের এরূপ ক্ষমতা যে, তাঁহাদের বাক্য শ্রবণমাত্রেই আমাদের সেই বিষয়ে নিশ্চয়জ্ঞান হয়। যাহার তাহার বাক্যে এরূপ হয় না। আমরা কত জায়গায় কত বক্তৃতা শুনি; কিন্তু বক্তার উচ্চারিত বাক্য

আমাদের হৃদয়গ্রাহী হয় না। তাহারা উচ্চ চীৎকার করিয়া, শত-সহস্র বৎসর চীৎকার করিলেও ত আমাদের মন তাহাদের বক্তৃতার উপদেশগুলিকে নিসংশয়রূপে গ্রহণ করিতে পারে না। ইহার কারণ কি? ইহার কারণ তাহারা আপ্তপুরুষ নহে। তাহারা সাধারণ মানব। আপ্তপুরুষের অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ। সাধারণ মানবের অন্তঃকরণ মলিন। আপ্তপুরুষ সত্যসিদ্ধ। সাধারণ মানব অসত্যসিদ্ধ। আপ্ত-পুরুষ চোর, প্রতারক বা ভণ্ড নন। সাধারণ মানব চোর, প্রতারক এবং ভণ্ড। এইজন্য আপ্তপুরুষের মন হইতে যে বাক্য নিঃসৃত হয়, তাহার ক্ষমতা অসীম। আর সাধারণ মানবের মন হইতে যে বাক্য নিঃসৃত হয়, তাহা মলিনতায় পূর্ণ, এইজন্য সেই সকল বাক্য অন্যের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় না। আপ্তপুরুষের গুণে গুণান্বিত গুরুর মন্ত্রোচ্চারিত বাক্য শিষ্যের হৃদয়ে অসীম বল প্রদান করে ও কার্য্যকরী হয়। কামুক, লোভী, ক্রোধী এবং মলিনতাপূর্ণ গুরুর মন্ত্রে শিষ্যের কোনও কার্য্য হয় না। গুরুকে যে বাৎসরিক টাকা ও বস্ত্রাদি দান করা হয়, তাহা ভস্মে ঘৃত ঢালা হয় মাত্র এবং তাহাতে পুণ্যের পরিবর্ত্তে পাপের সঞ্চয় হয়। কারণ পাপিষ্ঠকে দান করিলে, পুণ্য হয় না—পাপ হয়। আপ্তপুরুষের বাক্য শ্রবণে আমাদের হৃদয়ে যে নিশ্চয়-বুদ্ধি হয়, তাহাকে "আগম প্রমাণ" বলে।

বিপর্য্যয়ো মিথ্যাজ্ঞানমতদ্রূপপ্রতিষ্ঠম্ ॥ ৮ ॥

যে জ্ঞান স্বরূপজ্ঞান নয়, যে জ্ঞান বিরূপজ্ঞান; যে জ্ঞান তদ্রূপ-প্রতিষ্ঠ নয়, যে জ্ঞান অতদ্রূপপ্রতিষ্ঠ তাহাকে "বিপর্য্যয়বোধ" বলে। বিপর্য্যয়জ্ঞান—ভ্রান্তিজ্ঞান। বিপর্য্যয়জ্ঞান, সত্যজ্ঞান নহে। সংসারে আমরা এই বিপর্য্যয় বুদ্ধি লইয়াই বসবাস করিতেছি। এইজন্যই

আমাদের এত কষ্ট। আমাদের সত্যবিষয়ে জ্ঞান হইলে, আর এত কষ্ট থাকিত না। যতক্ষণ রজ্জুকে সর্প বলিয়া মনে হইবে, ততক্ষণ ভয়ও হইবে। রজ্জুকে রজ্জু বলিয়া সত্যজ্ঞান উদিত হইলেই, ভয় আর থাকিবে না—নির্ভয় হইবে। যতক্ষণ দেহকে আত্মা বলিয়া মনে হইবে, ততক্ষণ দেহের নানাপ্রকার কষ্টে পীড়িত হইতে হইবে। যখন দেহকে আত্মা বলিয়া বোধ হইবে না, তখন প্রকৃত আত্মা কি বুঝিতে পারিবে। যখন আত্মদর্শন হইবে, তখন কষ্টেরও শেষ হইবে। আমাদের চিত্ত মলিন বলিয়া—আমাদের এইরূপ ভ্রান্তি হয়। চিত্তের মলিনতা কাটিয়া গেলে, চিত্তে "প্রমার" উদয় হইবে। চিত্ত বিষয়কে সত্যস্বরূপে প্রকাশ করিতে পারিবে। চিত্তের এইরূপ সত্যপ্রকাশের শক্তিকে "প্রমা" বলে। সমাধি হইলে এই প্রমা অত্যন্ত প্রকাশশীল হয়, তখন ইহাকে "প্রজ্ঞা" বলা হয়। এই প্রমাদ্বারাই চিত্তের যথার্থ প্রমাণ হয় এবং অজ্ঞান দ্বারা বোধ আবারিত থাকে বলিয়া বিষয়ের যথার্থ প্রমাণ হয় না। প্রমার দ্বারাই বিষয়ের যথার্থ প্রকাশ হয়, আর অজ্ঞান দ্বারা বিষয় অপ্রকাশিত থাকে; এইজন্য "ভ্রান্তিজ্ঞান" বা "বিপর্য্যয়জ্ঞান" হয়। আমাদের সকলেরই চিত্ত মলিন এইজন্য আমরা সকলেই সর্ব্বদা ভ্রান্তিজ্ঞান দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া আছি। আমরা মনে করি যে আমরা ভ্রান্ত নই; কিন্তু বাস্তবপক্ষে আমরা ভ্রান্ত। আমরা মনে করি যে আমরা ঠিক ঠিক কর্ত্তব্য কার্য্য করিতেছি; কিন্তু আমরা সর্ব্বদা অকার্য্য করিয়া যাইতেছি। এই অজ্ঞানে আচ্ছন্ন হইয়া আমরা সৎকর্ম্মকে অসৎ ও অসৎকর্ম্মকে সৎ মনে করি। এই অজ্ঞানে আচ্ছন্ন হইয়া আমরা আমাদের স্ত্রীর প্রতি অযথা অনুরাগে বদ্ধ হইয়া পিতামাতা ও সহোদর ভ্রাতার প্রতি কর্ত্তব্য ভুলিয়া যাই। এই ভ্রান্তি জ্ঞানে আচ্ছন্ন হইয়া আমার নিজ শরীর ও মনের প্রতি কর্ত্তব্য ভুলিয়া গিয়া ও কামে অন্ধ হইয়া আমাদের শরীরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সারপদার্থ

বীর্য্য ধ্বংস করিয়া শরীর ও মনকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলি। এই অজ্ঞানে আচ্ছন্ন হইয়া আমরা ক্রোধ এবং লোভে মত্ত হইয়া কতই না অনিষ্টকার্য্য করিয়া থাকি। এই অজ্ঞান আমাদের সর্ব্বনাশ করিতেছে। জ্ঞান দ্বারা এই অজ্ঞান নষ্ট হয়। এই অজ্ঞানকে নষ্ট করিতে পারা যায়। এই অজ্ঞান নষ্ট হইলে আমাদের জ্ঞান উৎপন্ন হয়। আমাদের চিত্তের প্রমাশক্তির প্রকাশ হয়। সমাধিজ প্রজ্ঞার প্রকাশ হয়। তখন আমাদের আত্মস্মৃতি জাগরূক হয়। আমরা আত্মাকে ভুলিয়া আছি বলিয়াই আমাদের এত কষ্ট। আত্মাকে ভুলিয়াই আমরা আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ পরম পূজনীয় পিতামাতার প্রতি তাচ্ছল্য করিয়া, স্ত্রীর ক্রীতদাসত্ব করিয়া জীবনকে ধন্য মনে করি। আত্মাকে ভুলিয়াই আমরা "গাড়োল" হইয়া গিয়াছি। আমরা এক একজন B. A.; M. A. পাশ করা "গাড়োল" ব্যতীত আর অপর কিছু নহে। যে শিক্ষায় আত্মস্মৃতি জাগরূক হয় না—সে শিক্ষা কুশিক্ষা। সেরূপ শিক্ষা অপেক্ষা মূর্খ থাকা ভাল ছিল। যে শিক্ষা আমাদের সচ্চরিত্র করে, যে শিক্ষা আমাদের স্বার্থত্যাগ শিক্ষা দেয়, যে শিক্ষায় আমরা গুরুজনকে ভক্তি করিতে পারি, যে শিক্ষায় আমরা হিংসাত্যাগ করিতে পারি, যে শিক্ষায় আমরা মিথ্যাকথা বলিতে ও পরকে প্রবঞ্চনা করিতে ভীত হই অর্থাৎ যে সকল শিক্ষায় আমরা মানুষের গুণ প্রাপ্ত হই—তাহাই সুশিক্ষা। আর যে শিক্ষায় আমরা পশুর গুণ প্রাপ্ত হই—তাহা কুশিক্ষা। সুশিক্ষা দ্বারা চিত্ত পরিষ্কার হয় ও বিপর্য্যয়বোধ নষ্ট হয়।

শব্দজ্ঞানানুপাতী বস্তুশূন্যো বিকল্পঃ ॥ ৯ ॥

বিকল্প একপ্রকার শব্দমাত্র; কিন্তু বস্তু নাই অথচ ব্যবহার্য্য এক প্রকার জ্ঞান। যেমন "ঘোড়ার ডিম"। "ঘোড়া" বলিয়া একপ্রকার

পদার্থ আছে ও ডিম বলিয়াও একপ্রকার পদার্থ আছে ; কিন্তু "ঘোড়ার ডিম" বলিলে উক্ত উভয় পদার্থের কোনটীই বুঝায় না বা কোন অর্থ-সঙ্গতিও হয় না। তোমার হস্তে কি আছে? ঘোড়ার ডিম অর্থাৎ কিছুই নাই—অতএব এই সকল শব্দ আমাদের ব্যবহার্য্য, কিন্তু শব্দানুযায়ী কোন পদার্থ নির্দ্দেশ হয় না। এইরূপ বোধকে "বিকল্প" বলে। এই বিকল্প বোধ চিত্তের এক প্রকার বৃত্তি। ইহাও চিত্তের ক্লেশ।

অভাবপ্রত্যয়ালম্বনা বৃত্তির্নিদ্রা ॥ ১০ ॥

আমাদের তিনটী অবস্থা জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি। যখন জাগ্রৎ ও স্বপ্ন অবস্থার অভাব হয়, সেইটীই আমাদের নিদ্রা। নিদ্রা বলিয়া স্বতন্ত্র কোন পিশাচের ন্যায় বস্তু নাই। নিদ্রা বাহির হইতে আসিয়া আমাদের মাথার ভিতর প্রবেশ করে না। জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থার অভাব হইলেই আমরা তাহাকে নিদ্রা বলি। জাগ্রৎ অবস্থায় জীবাত্মা বাহিরের যন্ত্রাদি লইয়া কার্য্য করেন। জাগ্রৎ অবস্থায় জীবাত্মা দশটী ইন্দ্রিয়ে অধিষ্ঠান করেন। জীবাত্মা যখন যেস্থানে অধিষ্ঠান করিবেন, তখন সেইস্থানের কার্য্য হইবে। জীবাত্মা চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ে অধিষ্ঠান করিলে তবে সেই সেই ইন্দ্রিয়ের কার্য্য হয়। জীবাত্মা চক্ষুতে অধিষ্ঠান করিলে আমরা দেখিতে পাই। জীবাত্মা চক্ষুতে অধিষ্ঠান না করিলে আমরা দেখিতে পাই না। চক্ষুর দর্শনশক্তি নাই। দর্শনশক্তি জীবাত্মার। জীবাত্মার দর্শনশক্তি আছে বলিয়াই আমরা দেখিতে পাই। যখন জীবাত্মা এই চক্ষুকে ত্যাগ করিয়া ভিতরে চলিয়া যান তখন আমাদের জাগ্রৎ অবস্থার শেষ হয়। জীবাত্মা বাহিরের ইন্দ্রিয়গুলির উপর অধিষ্ঠান না করিলে অর্থাৎ বাহিরের পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয় ও পাচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়ের উপর অধিষ্ঠান না করিয়া

ভিতরে প্রবেশ করিলে, আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি আর কার্য্য করিতে পারে না। সহজ কথায় আমরা বলি, ইন্দ্রিয়গুলি ঘুমাইয়া পড়ে। জীবাত্মা বাহিরের ইন্দ্রিয়গুলি ত্যাগ করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেই, বাহিরের ইন্দ্রিয়গণ কার্য্যবিহীন হয় অর্থাৎ তাহাদের কার্য্যের অভাব হয়। এই অভাবকেই আমরা নিদ্রা বলি। আমরা সাধারণতঃ নিদ্রা অর্থে স্বপ্ন ও সুষুপ্তি উভয়ই বুঝি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সুষুপ্তিকেই নিদ্রা বলে। স্বপ্নকে নিদ্রা বলে না। জীবাত্মা বাহিরের যন্ত্রগুলি ত্যাগ করিয়া যখন চিত্তের সংস্কারগুলির উপর অধিষ্ঠান করেন, তখন আমরা সেই সংস্কারগুলিকে দেখিতে থাকি অর্থাৎ তখন আমরা স্বপ্ন দেখি। স্বপ্ন বাস্তব পদার্থ নহে। কিন্তু স্বপ্ন দেখিবার সময় সেগুলিকে বাস্তব পদার্থ বলিয়া মনে হয়। যতক্ষণ স্বপ্ন দেখি, ততক্ষণ স্বপ্নকে মিথ্যা বলিয়া মনে হয় না। স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া পুনরায় জাগ্রৎ অবস্থায় আসিলে আমরা স্বপ্নকে মিথ্যা বলিয়া মনে করি। স্বপ্নগুলি চিত্তের সংস্কারমাত্র। যাহার চিত্তে যে সংস্কার পড়িয়া আছে, সে স্বপ্নকালে সেই সংস্কারগুলি দর্শন করে মাত্র। স্বপ্নে কোন বাস্তব পদার্থ থাকে না। আমাদের এই জাগ্রৎ অবস্থাও স্বপ্নমাত্র। ইহাতেও বাস্তব কোন পদার্থ নাই, ইহাতেও আমরা চিত্তের সংস্কারমাত্র দেখিতেছি। যতক্ষণ জাগ্রদবস্থায় ব্যবহারপরায়ণ থাকিব, ততক্ষণ আমাদের ইহাতে মিথ্যাবোধ হইবে না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই জাগ্রদবস্থায় আমরা যাহা কিছু দেখিতেছি, যাহা কিছু শুনিতেছি—এসকলই অবাস্তব পদার্থ। ইহা স্বপ্নের দৃশ্যমাত্র। ইহা আমাদের সংস্কারের ছবিমাত্র। ইহা আমাদের চিত্তের সংস্কারের দৃশ্য ভিন্ন অপর কিছুই নহে। এই সকল বিষয়ে উপনিষদে বিস্তৃত-বিবরণ আছে। যাঁহারা এই সকল বিষয়ে অধিক জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা উপনিষদ্ পাঠ করিবেন। জীবাত্মা যখন বাহিরের ইন্দ্রিয় লইয়া লীলা করেন, তখন আমাদের জাগ্রৎ অবস্থা; আর যখন

বাহিরের লীলাখেলা ত্যাগ করিয়া ভিতরে যান, তখন তিনি মাত্র চিত্তের সংস্কারগুলি লইয়া লীলা করেন—ইহা আমাদের স্বপ্নাবস্থা। আর যখন তিনি উভয় অবস্থাই ত্যাগ করিয়া লীলা হইতে বিরত হন ও বিশ্রাম করেন, তখন আমাদের সুষুপ্তি অবস্থা। এই সময় জীবাত্মা নিজে নিজে থাকেন। জীবাত্মার এই বিশ্রাম অবস্থাকেই আমরা সুষুপ্তি বা নিদ্রা বলি। বাস্তবিক নিদ্রা বলিয়া কোন বিশেষভাবপদার্থ নাই। নিদ্রা বলিয়া বাহিরের কোন বাস্তব দ্রব্য নাই। ইহা কেবলমাত্র কার্য্যের অভাব। ইহা জাগ্রৎ অবস্থা ও স্বপ্নাবস্থার কার্য্যের অভাব। ইহা একটী অভাব পদার্থ। ইহা ভাব পদার্থ নহে। এই অভাবকে অবলম্বন করিয়া চিত্তের যে বৃত্তি হয় তাহাকে নিদ্রা-বৃত্তি বলে। তমোগুণে জড়তা আনয়ন করিয়া জীবাত্মার এই অভাব উৎপাদন করে।

নিদ্রা তিন প্রকার সাত্ত্বিক. রাজসিক ও তামসিক। সাত্ত্বিক নিদ্রার পর আমাদের মন পরিষ্কার ও প্রসন্ন হয় ও আমরা খুব আরাম বোধ করি এবং বিছানায় শুইয়া থাকিতে ইচ্ছা হয় না। রাজসিক নিদ্রার পর মনে সুখ পাই না, যেন মনে কতরকম চিন্তাস্রোত চলিতেছে, মন অত্যন্ত যন্ত্রণাভোগ করে। তামসিক নিদ্রার পর, শরীর ভারী বোধ হয়, বিছানা ত্যাগ করিতে ইচ্ছা হয় না। মনও পরিষ্কার হয় না। নিদ্রাতেও চিত্ত স্থির থাকে কিন্তু অজ্ঞানে পূর্ণ থাকে; আর সমাধিতেও চিত্ত স্থির থাকে কিন্তু জ্ঞানে পূর্ণ থাকে। নিদ্রা অবশ আর সমাধি স্ববশ। নিদ্রা অস্বচ্ছ আর সমাধি স্বচ্ছ। নিদ্রা মলিনতাপূর্ণ আর সমাধি মলিনতা-শূন্য। এইজন্য নিদ্রাকেও একটী চিত্তবৃত্তি বলা যায়।

অনুভূতবিষয়াসম্প্রমোষঃ স্মৃতিঃ ॥ ১১ ॥

আমরা যে সকল বিষয় দর্শন বা শ্রবণ করি তাহাদের সংস্কার চিত্তে থাকিয়া যায়। এই সংস্কার হইতে সেই বিষয়ের স্মৃতি আমাদের বুদ্ধিতে উত্থিত হয়। সেই বিষয়ের স্মরণ করাকেই স্মৃতি কহে। ইহাও চিত্তের একটী বৃত্তি।

এই প্রকারে আমরা চিত্তের পাঁচটী বৃত্তি পাইলাম। প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি। ইহারা এক এক প্রকার বোধ। চিত্তের এই সমুদয় বোধ সুখ, দুঃখ ও মোহের সহিত উদয় হয়।

অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ ॥ ১২ ॥

অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা এই চিত্তবৃত্তিসকল নিরোধ হয়।

অভ্যাস ব্যতীত কোন কার্য্যে সফলতা লাভ করা যায় না। যে কার্য্যে যত কঠোর অভ্যাস করা যায়, আমরা সেই কার্য্যেই তত শীঘ্র সিদ্ধিলাভ করি। অভ্যাস দ্বারা সিদ্ধ হয় না এমন কার্য্য জগতে নাই। বিনা অভ্যাসে জগতে কোন কার্য্যে সিদ্ধিলাভ করা যায় না। তুমি যতটুকু অভ্যাস করিবে ততটুকু ফল পাইবে। তোমার অভ্যাস কখনও নিষ্ফল হইবে না। যে ছাত্র উত্তমরূপে বিদ্যাভ্যাস করে, সে উত্তমরূপ লেখাপড়া শিখিতে পারে। সন্তরণ অভ্যাস করিতে করিতে উত্তমরূপে সন্তরণ শিক্ষা হয়। রন্ধন অভ্যাস করিতে করিতে উত্তম রাঁধুনী হওয়া যায়। চিকিৎসা অভ্যাস করিতে করিতে সুচিকিৎসক হওয়া যায়। সেইরূপ যোগ অভ্যাস করিতে করিতে উত্তম যোগী হওয়া যায়। যোগ অভ্যাসই শ্রেষ্ঠ অভ্যাস। যোগসাধনই মানবজীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য। একমাত্র যোগসাধনেই সুখ পাওয়া যায়। যোগসাধন ভিন্ন পরমসুখপ্রাপ্তির আর অন্য কোন উপায় নাই।

এই যোগসাধন জন্য অভ্যাস আবশ্যক। যোগসাধনে ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া অভ্যাস করিতে হইবে। অনেকেই কিছুদিন সাধন করিয়া, "আমার দ্বারা হইবে না" এরূপ মনে করিয়া যোগসাধন ত্যাগ করে। ইহা যতই কঠিন হউক, ইহাকে ত্যাগ করিও না। তুমি বালক, যুবক বা বৃদ্ধ হও—অষ্টাঙ্গ যোগসাধন করিবেই করিবে। ইহা ভিন্ন সুখের অন্য উপায় নাই। এতদিন বৃথায় কাটাইয়াছ তজ্জন্য চিন্তিত হইও না—এখন বৃদ্ধ হইয়াছ তজ্জন্য চিন্তা করিও না। আর যদি একদিনমাত্রও তোমার পরমায়ু থাকে, তাহা হইলেও, যোগসাধনে নিরস্ত হইও না। যদি একদিনমাত্রও সাধন করিয়া তোমার মৃত্যু হয় তাহাও শ্রেয়ঃ; কারণ পরজন্মে তুমি উৎকৃষ্ট যোগিকুলে জন্মগ্রহণ করিবে। মৃত্যুসময় যদি তোমার যোগসাধন জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা থাকে, তাহা-হইলে, নিশ্চয়ই তুমি পরজন্মে উৎকৃষ্ট যোগিকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া নূতন দেহ লাভ করিবে এবং ভগবান্ তোমার এমন সব সুবিধা ও সঙ্গ করিয়া দিবেন যে তোমার যোগসাধন পক্ষে খুব সুবিধা হইবে। তাই বলি হতাশ্বাস হইও না ও নিরাশ হইও না। একবারমাত্র ভগবানের ভক্ত হইতে পারিলে, আর তোমার কোন অনিষ্ট হইবে না। ভগবান্ নিজমুখে বলিয়াছেন "কখন আমার ভক্ত বিনষ্ট না হয়"। তাই বলি এতদিন সময় বৃথায় কাটাইয়াছ, জীবনের অর্দ্ধেক সময় নিদ্রায় কাটাইয়াছ, অবশিষ্ট অর্দ্ধেক সময়ের মধ্যে বাল্যকালের অজ্ঞানে আচ্ছন্ন হইয়া অনেক সময় কাটিয়া গিয়াছে। যৌবনে কামোন্মত্ত হইয়া স্বীয় সহধর্ম্মিণীর ক্রীতদাসত্ব করিয়াছ এখন বৃদ্ধাবস্থায় রোগ, শোক ও জরায় আক্রান্ত হইয়া শরীর ও মনের বল হারাইয়া নানাপ্রকার দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছ। ভয় নাই—মনে সাহস অবলম্বন কর, ভগবানের শরণাপন্ন হও, পাপকার্য্য একেবারে ত্যাগ কর এবং এই মুহূর্ত্ত যোগাভ্যাসে যত্নবান্ হও, তোমার মঙ্গল হইবে।

মাত্র যোগের অভ্যাস করিলেই হইবে না। সঙ্গে সঙ্গে বৈরাগ্যও চাই। বিষয়বৈরাগ্য ভিন্ন মুক্তি, মোক্ষ বা পরমসুখ পাওয়া যায় না। বৈরাগ্য ভিন্ন শুদ্ধ অভ্যাসে কোন কার্য্য হইবে না। চক্ষু যদি রূপের লালসায় ছুটাছুটী করে, কর্ণ যদি শব্দের লালসায় ছুটাছুটী করে, নাসিকা যদি গন্ধের লালসায় ছুটাছুটী করে, এইরূপ অন্যান্য ইন্দ্রিয়েরা যদি বিষয়লালসা ত্যাগ করিতে না পারে, বিষয়ের আসক্তি হইতে যদি ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিতে না পার। যদি তুমি ইন্দ্রিয়ের দাস হও। যদি ইন্দ্রিয় তোমার আয়ত্তে না থাকে। ইন্দ্রিয় সংযম করিবার শক্তি যদি হারাইয়া থাক, তাহা হইলে, যোগসাধন তোমার পক্ষে অতীব কঠিন। যাহারা ইন্দ্রিয়লালসা ত্যাগ করিতে পারে, যাহারা ইন্দ্রিয় সংযম করিতে পারে, যাহাদের বিষয়াসক্তি নাই, তাহারা খুব সহজেই যোগসাধন করিতে পারে। ইহারা অতি বৃদ্ধ হইলেও যদি ভোগবাসনা-রহিত হয়, তাহা হইলে, ইহাদের যোগসাধনাও সহজ হইবে। এইজন্য বৃদ্ধ হইয়াছ বলিয়া নিরাশ হইও না। তবে এই বৃদ্ধাবস্থাতেও যদি পশুর বৃত্তি ত্যাগ করিতে না পার। যদি তুমি পাশবিক বৃত্তি, আহার-নিদ্রাদি লইয়াই ব্যস্ত থাক, তাহাহইলে নিশ্চয় জানিও যে, আর এই দুর্ল্লভ মানবজীবন তোমার অদৃষ্টে ঘটিবে না, তোমাকে পশু হইয়া জন্মিতে হইবে এবং অনাদি অনন্তকালের জন্য এই দুঃখস্রোতে ভাসমান থাকিবে। এই অভ্যাস ও বৈরাগ্য দুটীই আবশ্যক। একটী হইলে হইবে না। এই দুটীকে অবলম্বন করিয়া যোগসাধন কার্য্যে প্রবৃত্ত হও। তুমি নিশ্চয়ই সিদ্ধ হইবে।

তত্র স্থিতৌ যত্নোঽভ্যাসঃ ॥ ১৩ ॥

সেই অভ্যাস এবং বৈরাগ্যে দৃঢ়রূপে অবস্থিতি করিবার যে যত্ন, তাহার নাম অভ্যাস।

এই অভ্যাস ত্যাগ করিবে না। এই বাঙ্গালা দেশটাকে আলস্য ও বিলাসে ছাইয়া ফেলিয়াছে। তমোগুণ হইতে নিদ্রা, আলস্য, জড়তা, প্রমাদ ও মোহ প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। এই তমোগুণকে জয় করিতে হইবে। এই অলসতাকে জয় করিতে হইবে। প্রতিদিনের কার্য্যের সময় বিভাগ করিবে এবং যখনকার যে কার্য্য তখন সেই কার্য্য করিবে। কোন মতে ইহার অন্যথা করিবে না। রাত্রি ১০টা হইতে ভোর ৪টা পর্য্যন্ত নিদ্রা যাইবে। এই ছয় ঘণ্টার অধিক নিদ্রা আমাদের শরীর খারাপ করে। আবার জোর করিয়া এই ছয় ঘণ্টার কম নিদ্রাও যাইবে না। ছোট ছোট ছেলেদের একটু অধিক নিদ্রা আবশ্যক। আবার যোগীরা যোগসাধন করিতে করিতে, তাহাদের নিদ্রা আপনিই কমিয়া যায়। জোর করিয়া কমাইতে হয় না। তাহাদের অল্প নিদ্রাতেও শরীর খারাপ হয় না। অনেকে মাত্র দুই ঘণ্টা নিদ্রা যায়। তাহাতে তাহাদের শরীর অসুস্থ হয় না। যাঁহারা উচ্চযোগী তাঁহারা নিদ্রাকে সম্পূর্ণরূপে জয় করিয়াছেন। তাঁহারা আমাদের ন্যায় নিদ্রা যান না। তাঁহাদের নিদ্রাকে "যোগনিদ্রা" বলে। সে নিদ্রা আমাদের ন্যায় অজ্ঞানে আচ্ছন্নবৎ নহে। একমুহূর্ত্তের জন্যও অলসতার আশ্রয় লইও না। অলসতা ও নিদ্রা প্রভৃতি তমোগুণ আমাদের পশু করিয়া ফেলে। সর্ব্বদা নিজ কর্ত্তব্য কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিবে। শরীরের আরামের জন্য কখনও কর্ত্তব্য কার্য্যে অবহেলা করিও না। অলসেরা কখনও যোগসিদ্ধি লাভ করিতে পারে না। অলসেরা কোন কার্য্যেই সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না। এইজন্য সাধনের অভ্যাস ত্যাগ করিও

না এবং বৈরাগ্যও ত্যাগ করিও না। এই উভয়ে স্থিতিলাভ করিবার জন্য দৃঢ় যত্ন করিবে। চিত্ত সর্ব্বদা পরিবর্ত্তনশীল, এইজন্য আমরা সহজে এই অভ্যাস ও বৈরাগ্য লইয়া থাকিতে পারি না। ইহাতে প্রাণপণ উৎসাহ, ধৈর্য্য ও বীর্য্য আবশ্যক। কঠোর পুরুষকার অবলম্বন করিয়া অভ্যাস ও বৈরাগ্য সাধন করিবে। শ্রুতিও বলেন "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ ন চ প্রমাদাত্তপসো বাপ্যলিঙ্গাৎ। এতৈরুপায়ৈর্যততে যস্তু বিদ্বান তস্যৈব আত্মা বিশতে ব্রহ্মধাম॥"

সতু দীর্ঘকাল-নৈরন্তর্য্য-সৎকারাসেবিতো দৃঢ়ভূমিঃ ॥১৪॥

এই অভ্যাসকে দীর্ঘকাল সাধন করিতে হইবে, নিরন্তর সাধন করিতে হইবে এবং শ্রদ্ধা ও আদরের সহিত সাধন করিতে হইবে। তাহা হইলে, এই সাধন দৃঢ় হইবে এবং সাধক কোনরূপ অলসতায় বা বিলাসে মুগ্ধ হইবে না।

অভ্যাস করিবার সময় সকল কার্য্যেই একটু কষ্ট বোধ হয় কিন্তু ক্রমে ক্রমে যতই অভ্যাস করা যায়, তাহা ততই সহজ হইয়া যায়। সাধন অভ্যাসও সেইরূপ। আমাদের চিত্ত পশুভাবে আক্রান্ত হইয়া আছে। সেই পশুভাব ত্যাগ করাইয়া দেবভাবে লইয়া আসিতে গেলে একটু কষ্ট স্বীকার করিতে হইবে।

দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়-বিতৃষ্ণস্য বশীকার-সংজ্ঞা বৈরাগ্যম্ ॥১৫॥

দৃষ্ট বিষয় এবং আনুশ্রবিক বিষয়, এই উভয় বিষয়ে চিত্ত বিতৃষ্ণ হইলে অর্থাৎ এই উভয় বিষয়ের জন্য চিত্তে কোন তৃষ্ণা না থাকিলে

অর্থাৎ আসক্তি না থাকিলে যে বৈরাগ্য হয়, তাহাকে "বশীকার-সংজ্ঞক বৈরাগ্য" বলে।

দৃষ্ট বিষয়ে আসক্তিহীন হইতে হইবে অর্থাৎ আমাদিগের জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয়ে আসক্তিহীন হইতে হইবে। বিষয়ে আসক্তিহীন হইতে হইলে সর্ব্বদা বিষয়ের দোষ দর্শন করিবে। আমরা বিষয়ভোগ করিয়া সুখ পাইবার অভিলাষ করি, কিন্তু বিষয়ে সুখ থাকিতেই পারে না। কারণ বিষয় ত্রিগুণে নির্ম্মিত। যাহার মধ্যে তিনটী গুণ আছে—তাহা আমাদিগকে সুখ প্রদান করিতে পারে না। বিষয়লাভে সুখ নাই। বিষয়লাভে দুঃখমাত্রই আছে। বিষয় অর্জ্জনে দুঃখ। বিষয় রক্ষণে দুঃখ। বিষয় ক্ষয়ে দুঃখ। বিষয়ের কোন অবস্থাতেই সুখ নাই। সর্ব্ব অবস্থাতেই দুঃখ। চক্ষু দ্বারা কোন সুন্দরীর রূপ দেখিলাম। সেই রূপ পাইবার জন্য মনে তৃষ্ণা জাগিল। এই তৃষ্ণা আমার মনকে অহরহঃ দগ্ধ করিতে লাগিল। সেই রূপ লাভ করিবার জন্য চেষ্টা হইতে লাগিল। প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও সেই রূপের প্রাপ্তি ঘটিল না। কিন্তু চিত্তের মধ্যে রূপের সংস্কার রহিয়া গেল এবং চিরজীবন সেই সংস্কার ও সেই সংস্কার-সম্ভূত স্মৃতি লইয়া যন্ত্রণাভোগ করিতে লাগিলাম। সুন্দর একটী শিশু মাতৃগর্ভ হইতে বাহিরে আসিল, তাহার রূপে পিতামাতা মোহিত হইয়া গেল। শিশুটীকে পাইয়া তাহারা যেন স্বর্গীয় আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিল। শিশুটী ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। উজ্জ্বল মুক্তার ন্যায় দুই একটী দন্ত নির্গত হইল। শিশু আধ আধ সুমিষ্ট স্বরে যখন, "মা" "মা" বলিতে আরম্ভ করিল, তখন পিতামাতা তাহার সেই সুমিষ্ট স্বরে মোহিত হইয়া যেন স্বর্গের অমৃত ভোগ করিতে লাগিল। ক্রমে সেই শিশুটী পাঁচ বৎসরের হইয়া ইহলীলাসংবরণ করিল। শিশুর রূপ অদৃশ্য হইল, সুমিষ্ট স্বরও অদৃশ্য হইল; কিন্তু সেই রূপের ও সুমিষ্ট স্বরের সংস্কার চিত্তে রহিয়া গেল। এই সংস্কার

হইতে সেই শিশুর রূপের ও স্বরের স্মৃতি পিতামাতাকে আজীবন দগ্ধ করিতে থাকিবে। অর্থে সুখ কোথায়? অর্থের অর্জ্জনে দুঃখ। অর্থের রক্ষণে দুঃখ। অর্থের ব্যয়ে দুঃখ। অলঙ্কারে সুখ কোথায়? অলঙ্কারের অর্জ্জনে দুঃখ। অলঙ্কারের রক্ষণে দুঃখ। অলঙ্কারের ক্ষয়ে দুঃখ। বাগান, বাটী—তাহাতেই বা সুখ কই? তাহাদের অর্জ্জনে দুঃখ। তাহাদের রক্ষণে দুঃখ। তাহাদের ক্ষয়ে দুঃখ। এই প্রকার বিচার করিলে দেখিতে পাই যে, চক্ষুর বিষয় রূপ, বা কর্ণের বিষয় শব্দ, বা রসনার বিষয় রস—ইহাদের মধ্যে সুখ নাই। কেবল দুঃখমাত্রই আছে। যাহাদের চিত্ত সাত্ত্বিক, যাহাদের চিত্ত নির্ম্মল; তাহারা বিষয়ে সুখ-দর্শন করে না। তাহারা বিষয়ে দুঃখ-দর্শন করে। তাহারা ঠিক ঠিক বিচার করিতে পারে। চিত্ত নির্ম্মল না হইলে বিচারও ঠিক ঠিক হয় না। যাহাদের চিত্ত সমল, যাহাদের চিত্ত রজঃ ও তমোগুণে পূর্ণ, যাহাদের চিত্ত রাগদ্বেষে পূর্ণ, তাহারা ঠিক ঠিক বিচার করিতে পারে না। তাহাদের মলিন বুদ্ধিদ্বারা নির্ম্মল বিচার হয় না। তাহাদের বিপর্য্যয়-দর্শন হয়। তাহারা বিচারে দুঃখের পরিবর্ত্তে সুখ-দর্শন করে এবং পতঙ্গ যেমন অগ্নিতে ঝম্পপ্রদান করিয়া নিজের প্রাণ হারায়; ইহারাও সেইরূপ বিষয় বিষপান করিয়া, অনন্তনরকযন্ত্রণা ভোগ করে। তাই বলি, এই দৃশ্যবিষয় রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ ও স্পর্শে আসক্তি ত্যাগ কর। ইহাতে যতই আসক্তি বৃদ্ধি করিবে, ততই তুমি কষ্টের পর কষ্ট ভোগ করিবে; আর ইহাতে যতই আসক্তি ত্যাগ হইবে, ততই তুমি অমৃতের আস্বাদনে সুখের পথে অগ্রসর হইবে। "ত্যাগেন অমৃতং অশ্নুতে।"

আনুশ্রবিক বিষয় অর্থাৎ লোকের মুখে শুনা বিষয়। যে বিষয় চক্ষু দ্বারা দর্শন করি নাই। যে বিষয় কর্ণ দ্বারা শ্রবণ করি নাই। যে বিষয় নাসিকা দ্বারা আঘ্রাণ করি নাই। যে বিষয় ত্বক্ দ্বারা স্পর্শ করি নাই।

যে বিষয় জিহ্বা দ্বারা আস্বাদন করি নাই—এরূপ বিষয়েও আসক্তি করিবে না। এরূপ বিষয় কি? যেমন স্বর্গলাভ। স্বর্গীয় অপ্সরার সঙ্গলাভ। স্বর্গীয় ঐশ্বর্য্যভোগ। আমাদের ইহজগতের বিষয় যেমন সর্ব্বদোষে দুষ্ট, স্বর্গীয় বিষয়ও তদ্রূপ সর্ব্বদোষে দুষ্ট। স্বর্গের ভোগ চিরদিন থাকে না। তাহারও ক্ষয় হয়। স্বর্গভোগসমাপ্তি হইলেই পুনরায় মানবযোনি বা অন্য কোন নীচযোনিতে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিতে হয়। চিরমুক্তি হয় না। জীবনমরণপ্রবাহ হইতে অব্যাহতি হয় না।

বশীকার-সংজ্ঞক বৈরাগ্যলাভ বড় সহজ নয়। বিবেক উৎপন্ন না হইলে, ইহা লাভ হয় না। চিত্ত নির্ম্মল না হইলে, ইহা হয় না। চিত্তে সর্ব্বক্ষণ রজঃ ও তমোগুণের কার্য্য হইলে, ইহা হয় না। একদিকে সাধন-অভ্যাস ও অন্যদিকে বিচারপথ অবলম্বন কর। এইরূপ করিতে করিতে ক্রমে তোমার মন নির্ম্মল হইবে। চিত্তে সত্ত্বগুণের প্রতিষ্ঠা হইবে। চিত্তের রজঃ ও তমোগুণ হ্রাস পাইবে এবং ক্রমশঃ বিবেকোদয়ে বশীকার-সংজ্ঞক বৈরাগ্যলাভ হইবে।

বৈরাগ্যের চারিটী অবস্থা (১) যতমান, (২) ব্যতিরেক, (৩) একেন্দ্রিয় ও (৪) বশীকার। সাধক প্রথমে প্রতিজ্ঞা করে যে, "বিষয়ে আর ইন্দ্রিয়গণকে ছাড়িয়া দিব না"—এই অবস্থার নাম "যতমান বৈরাগ্য"। এই সময় সাধক প্রাণপণে ইন্দ্রিয় সংযত করিতে চেষ্টা করে। সাধারণ মনুষ্য ইন্দ্রিয়ের দাস। সাধকেরা ইন্দ্রিয়ের প্রভু। সাধারণ লোকের উপর ইন্দ্রিয় কর্ত্তৃত্ব করে। চক্ষু তাহাকে রূপ দর্শনে টানিয়া লইয়া যায়। কর্ণ তাহাকে শব্দ শ্রবণে টানিয়া লইয়া যায়। সে ভৃত্যের ন্যায় এই সকল ইন্দ্রিয়ের অনুগমন করে। সে ভৃত্যের ন্যায় ইন্দ্রিয়ের আদেশ পালন করে। তাহার এই কার্য্যে সুখ হইবে কি দুঃখ হইবে, সে তাহা বিচার করিবার সময় পায় না; যেন তাহার বিচার করিবার কোন

অধিকার নাই। ইন্দ্রিয় যাহা ইচ্ছা তাহাই করায়। সে ইন্দ্রিয়ের কার্য্যে বাধা দিতে পারে না। তাহার ইন্দ্রিয়গণ বড়ই প্রবল। সাধকেরা বিচার করিতে পারে। ইন্দ্রিয়েরা তাহাকে যে পথে লইয়া যাইবার জন্য চেষ্টা করে, তাহা সুপথ কি কুপথ তাহা সাধকেরা বিচার করিয়া বুঝিতে পারে। যদি কুপথ হয়, তাহা হইলে, সাধকেরা সেই কার্য্য হইতে বিরত হয়। ইন্দ্রিয়দিগকে সে কার্য্যে যাইতে দেয় না। ইন্দ্রিয় অপেক্ষা সাধকের ক্ষমতা অধিক। ইন্দ্রিয় সংযম করিবার ক্ষমতা সাধকের আছে এবং সে ইন্দ্রিয়গণকে সর্ব্বদা সংযত করে। এইরূপে ক্রমশঃ সেই সাধকের বিষয়াসক্তি কমিতে থাকে। সাধকের এই অবস্থাকে বৈরাগ্যের প্রথম অবস্থা "যতমান বৈরাগ্য" বলে। যখন এই সাধকের কতকগুলি বিষয়ের আসক্তি একেবারে কমিয়া যায় এবং অপর কতকগুলি আসক্তি এখনও প্রবলভাবে বর্ত্তমান থাকে; তখন সাধক পুনরায় সেই অবশিষ্ট প্রবল আসক্তিগুলিকে ক্ষীণ করিবার চেষ্টা করে; এইরূপ অবস্থাকে বৈরাগ্যের দ্বিতীয় অবস্থা অর্থাৎ "ব্যতিরেক বৈরাগ্য" বলে। বহুকাল এইরূপ অভ্যাস করিতে করিতে সাধকের ক্ষমতা বৃদ্ধি হয় এবং তখন ইন্দ্রিয়গণ সাধকের বশতাপন্ন হয়। তখন আমরা ইচ্ছানুযায়ী ইন্দ্রিয়গণকে পরিচালিত করিতে পারি। তখন আমরা ইন্দ্রিয়গণের প্রভু হই। তখন আমরা আর ইন্দ্রিয়ের দাস হইয়া থাকি না। তখন আমাদের পশু উপাধি লোপ পাইয়া মানুষ উপাধি হয়। আর যাহারা এই অবস্থায় উঠিতে পারে নাই, তাহারা এখনও মানুষ নয়—এখনও তাহারা পশু। B. A. বা M. A. পাশ করিলে, এ অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। B. A. বা M. A. পাশ করা পশু অনেক আছে। আর B. A. বা M. A. পাশ না করা অনেক মানুষ আছে; মূর্খ চাষা ও মুটেদের মধ্যেও অনেক মানুষ দেখিতে পাওয়া যায়; আবার শিক্ষিত, পণ্ডিত ও গুরুপুরোহিতের মধ্যেও

অনেক পশু দেখা যায়। যতদিন তুমি ইন্দ্রিয়ের দাস, ততদিন তুমি উচ্চ শিক্ষিতই হও, গুরুই হও বা পুরোহিতই হও; ততদিন তুমি পশু। শিক্ষার উদ্দেশ্য—চরিত্র উন্নত করা। শিক্ষার উদ্দেশ্য—ইন্দ্রিয়ের প্রভু হওয়া। যে শিক্ষায় চরিত্র উন্নত হয় না; যে শিক্ষায় মানুষ, মানুষ না হইয়া পশু হইয়া যায়; সে শিক্ষাকে, সুশিক্ষা বলিব কি করিয়া? শিক্ষাবিভাগে অনেক উচ্চপদবীধারী কর্ম্মচারী থাকেন। এই কর্ম্মচারিবৃন্দের মধ্যে যাঁহারা মানুষ, তাঁহারা ছাত্রদিগকে মানুষ করিবার ব্যবস্থা করেন; আর যাহারা পশু, তাহারা ছাত্রদিগকে পশু হইবার ব্যবস্থা করে। যাহারা ইন্দ্রিয়ের দাস, তাহারা ছাত্রদিগকে ইন্দ্রিয়ের দাস হইতেই শিক্ষা দেয়; আর যাঁহারা ইন্দ্রিয়ের প্রভু, তাঁহারা ছাত্রদিগকে ইন্দ্রিয়ের প্রভু হইতে শিক্ষা দেন। শিক্ষাবিভাগে এখনও অনেক জিতেন্দ্রিয়, দেবভাবাপন্ন মহাত্মা আছেন। এই মহাত্মারা প্রাণপণে চেষ্টা করিলে, আমাদের এই সোণার ভারতকে পুনরায় পূর্ণশান্তির আগারে পরিণত করিতে পারেন। এইসকল জিতেন্দ্রিয় ও রিপুজয়ী মহাত্মার সাহায্য ব্যতীত, আমাদের দেশের মঙ্গল সাধিত হইবে না।

অভ্যাসযোগ ও বিচারপথ অবলম্বন করিয়া এইরূপে সাধন করিতে করিতে যখন ইন্দ্রিয়গণ বিষয় হইতে সম্যগ্‌রূপে নিবৃত্ত হয়, বিষয়ের সামান্য আসক্তিমাত্র কেবল মনোমধ্যে বর্ত্তমান থাকে, তখন তাহাকে "একেন্দ্রিয় বৈরাগ্য" বলে। মন—ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়। মনও একটী ইন্দ্রিয়ের সামিল। এইজন্য ইহাকে "একেন্দ্রিয় বৈরাগ্য" বলে। মন ও আর পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয় লইয়া আমাদের ছয়টী জ্ঞানেন্দ্রিয়। যখন বিষয়াসক্তি পাঁচটী ইন্দ্রিয়কে সম্যগ্‌রূপে ত্যাগ করিয়া কেবল মনে বর্ত্তমান থাকে, তখন তাহাকে "একেন্দ্রিয় বৈরাগ্য" বলে। পরে যখন যোগীর এই মনও বশে আসে; ইচ্ছাপূর্ব্বক আর রাগকে নিবৃত্ত করিতে হয় না

যখন তাহার চিত্ত ইহলৌকিক বা পারলৌকিক কোন বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা করে না, তখন তাহার "বশীকার নামক বৈরাগ্য" সাধিত হইল। তখন সে আর মনুষ্যপদবাচ্য নহে—তখন তিনি দেবপদবাচ্য। তখন তিনি দেবতারও উপরে। তখন তাঁহার পূর্ণ বিবেক উদয় হইয়াছে। এই সময় বৈরাগ্যও চরম পূর্ণতালাভ করে। শরীর অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইলে যেরূপ জ্বালা যন্ত্রণা অনুভব হয়; পূর্ণবিবেকীর বিষয়সম্ভোগকালে, সেইরূপ যন্ত্রণার অনুভব হয়।

তৎপরং পুরুষখ্যাতেঃ গুণ-বৈতৃষ্ণ্যম্ ॥ ১৬ ॥

পুরুষখ্যাতি হইলে গুণবৈতৃষ্ণ্যরূপ পরাবৈরাগ্য হয়। পরাবৈরাগ্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈরাগ্য। ইহাই বৈরাগ্যের চরমসীমা। ইহা অপেক্ষা আর অধিক বৈরাগ্য হইতে পারে না। পরাবৈরাগ্য হইলে পরাভক্তি হয়। তখন আর প্রকৃতির কোন গুণে, কোন তৃষ্ণা বা আসক্তি থাকে না। সাধারণ মানব, প্রকৃতির গুণে আসক্ত ও মোহিত হইয়া আছে। বিষয়ে আসক্তি থাকিলে বৈরাগ্য হয় না। বৈরাগ্য না হইলে, মুক্তি হয় না। মুক্তি না হইলে, দুঃখের হাত হইতেও পরিত্রাণ পাওয়া যায় না। যাঁহার বৈরাগ্য আছে, তিনি বৈরাগী। কণ্ঠে তুলসীর মালা থাকিলেই বৈরাগী হওয়া যায় না। গাত্রে নামাবলী থাকিলেও বৈরাগী হওয়া যায় না। হাতে কুড়োজালী থাকিলেই বৈরাগী হওয়া যায় না। বৈরাগ্য পরমধন। যিনি এই পরমধনের অধিকারী, তিনিই বৈরাগী। বৈরাগীর বাহ্যচিহ্ন ধারণ করিয়া যাহাদের মনোমধ্যে বৈরাগ্য হয় নাই; যাহারা বিষয়ের আসক্তিতে আসক্ত, তাহারা ভণ্ড ও প্রতারক। তাহাদের কোনমতে বিশ্বাস করিও না। তাহাদের সঙ্গ করিও না। বিষয়াসক্তি,

নষ্ট হইলেই—গুণবৈতৃষ্ণ্য হইল। বিষয়াসক্তি না থাকিলে, মনও বিষয়ের দিকে যাইবে না। এই বিষয়াসক্তিহীন হওয়া মুখের কথা নয়। পুরুষের সহিত সাক্ষাৎকার হইলে, তবে এই বিষয়াসক্তি নষ্ট হয়। পুরুষের সহিত সাক্ষাৎকার হইলে, তখন প্রকৃতির তত্ত্ব হইতে অহংজ্ঞান উঠিয়া যায়। আমরা প্রকৃতির উপর অহম্ভাব স্থাপন করিয়াছি। আমি যে প্রকৃতি হইতে পৃথক্ তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। "আমিই শরীর", "আমিই ইন্দ্রিয়", "আমিই মন", "আমিই বুদ্ধি"—এইরূপ ভ্রান্তিজ্ঞানে আমরা প্রকৃতির উপর অভিমান করিয়া বদ্ধ হইয়াছি। পুরুষসাক্ষাৎকার হইলে এই ভ্রান্তিজ্ঞান নিবারিত হয়। পুরুষসাক্ষাৎকার না হইলে, এই ভ্রান্তিজ্ঞান নিবারিত হয় না এবং প্রকৃতির উপর আসক্তিও যায় না। সাধন করিয়া এই পুরুষসাক্ষাৎকার করিতে হয়। দৃঢ় অভ্যাস ও কঠোর বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া সাধন কর, পরাবৈরাগ্যের অধিকারী হইবে। পরাবৈরাগ্য লাভ হইলে আর তোমার কোন ভোগ থাকিবে না। তখন মনে হইবে "যাহা পাইবার জন্য এতদিন ছুটাছুটী করিতেছিলাম, তাহা পাইয়াছি," "অনাদি অনন্ত-কাল হইতে যে দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিলাম, তাহা চিরকালের জন্য নিবৃত্ত হইয়াছে"; "যে জন্ম ও মৃত্যুর প্রবাহে পতিত হইয়া পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিতেছিলাম ও মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছিলাম, অদ্য সেই প্রবাহ হইতে চিরবিমুক্তি লাভ করিলাম"; "যে ভবসংসারকে অতীব ভীষণ বলিয়া বোধ হইয়াছিল, তাহা আজ আমার সম্মুখ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে।" "যে জ্ঞান পাইবার জন্য এতদিন বহুকষ্ট করিয়া সাধন করিতেছিলাম, সেই জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছি"। এই পরাবৈরাগ্যই, পরাজ্ঞান, পরাভক্তি ও কৈবল্য নামে অভিহিত হয়।

চিত্তনিরোধ হইলেই সমাধি হয়, কিন্তু কৈবল্য হয় না। শুদ্ধ চিত্ত-নিরোধে যে সমাধি হয়, সে সমাধি কাঁচা সমাধি। তাহা পাকা সমাধি

নয়। কাঁচা সমাধি প্রকৃতির বশে বাধ্য হইয়া ভঙ্গ হইয়া যায়। এই সমাধির ব্যুত্থান আছে। চিত্তে বিক্ষেপ হইয়া এইরূপ ব্যুত্থান হয়। চিত্তের সংস্কার জন্য চিত্তের বিক্ষেপ হয়। আসক্তি ত্যাগ হইলে চিত্তে আর কোনরূপ বাসনা থাকে না। বাসনা না থাকিলেই, চিত্ত সংস্কারহীন হয়। চিত্তে সংস্কার না থাকিলেই, বিক্ষেপ হয় না। বিক্ষেপ না হইলেই, ব্যুত্থান হয় না। যখন চিত্তের মধ্যে বিক্ষেপ হয় না; সুতরাং সমাধি হইতে ব্যুত্থানও হয় না; তখন তাহাকে পাকা সমাধি বলে। এই পাকা সমাধি না হইলে কৈবল্য হয় না। এই পাকা সমাধি পাইতে হইলে, চিত্তের বিক্ষেপ সম্পূর্ণভাবে নষ্ট করিতে হইবে; সুতরাং আসক্তিকে পূর্ণভাবে ধ্বংস করিতে হইবে; সুতরাং পরাবৈরাগ্য আবশ্যক। পরাবৈরাগ্য না হইলে কৈবল্য সাধিত হয় না। এই আসক্তির পূর্ণত্যাগের জন্য তত্ত্বজ্ঞান আবশ্যক। পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান না হইলে পূর্ণ আসক্তি ত্যাগও হয় না। শুদ্ধ প্রাকৃতিক-তত্ত্ব জানিলেই হইবে না। প্রাকৃতিক-তত্ত্বও যেমন তত্ত্ব, তেমনি পুরুষও একটী তত্ত্ব। প্রাকৃতিক জ্ঞানও চাই এবং পুরুষ-তত্ত্বের জ্ঞানও চাই। এই পুরুষ-তত্ত্বের জ্ঞানকেই পুরুষ-সাক্ষাৎকার বা পুরুষ-খ্যাতি বলে। আমরা নিজেরাই ত পুরুষ। তবে আমরা আবার কাহার সাক্ষাৎ করিব! আমরা আমাদের নিজেদেরই সাক্ষাৎকার করিব। প্রাকৃতিক মায়ায় বদ্ধ হইয়া আমরা নিজেদের ভুলিয়া গিয়াছি। ইহাকে আত্ম-বিস্মৃতি বলে। আমরা যে আত্মা একথা ভুলিয়া গিয়াছি। আমরা আত্মা নয়; আমরা দেহ। যখন এই আত্মার ও দেহের ভেদ-দর্শন হইবে তখন আমাদের পুরুষ-সাক্ষাৎকার হইবে। তখন আমাদের মুক্তি হইবে। যতদিন এই আত্মতত্ত্ব ও পুরুষতত্ত্বের দর্শন না হয়, ততদিন মুক্তি নাই। এই তত্ত্বজ্ঞানের জন্য বৈরাগ্য আবশ্যক। বৈরাগ্য ভিন্ন এই তত্ত্বজ্ঞান হয় না, আবার তত্ত্বজ্ঞান ভিন্ন বৈরাগ্য হয় না; উভয়

সাধনই একসঙ্গে করিয়া যাইবে, অর্থাৎ অভ্যাস ও বৈরাগ্য সাধন একসঙ্গে করিয়া যাইবে।

বিতর্কবিচারানন্দাস্মিতারূপানুগমাৎ সম্প্রজ্ঞাতঃ॥১৭॥

বিতর্ক, বিচার, আনন্দ ও অস্মিতা, এই চারিটী ভাবকে অবলম্বন করিয়া যে সমাধি হয়, তাহাকে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলে।

সমাধি দুই প্রকার :—(১) সম্প্রজ্ঞাত ও (২) অসম্প্রজ্ঞাত। কোন অবলম্বনযুক্ত যে সমাধি তাহাকে সম্প্রজ্ঞাত-সমাধি বলে; আর অবলম্বন-শূন্য সমাধিকে অসম্প্রজ্ঞাত-সমাধি বলে। সম্প্রজ্ঞাত সমাধি, কাঁচা সমাধি; আর অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি, পাকা সমাধি।

সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে অবলম্বনের বিষয় চারি প্রকারের, এই হেতু সমাধিও চারিপ্রকার। (১) বিতর্ক, যাহা স্থূলমহাভূত ও ইন্দ্রিয়কে ভাবনার বিষয় করে। (২) বিচার, যাহা সূক্ষ্ম মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও পঞ্চ তন্মাত্রকে ভাবনার বিষয় করে। (৩) সানন্দ, যাহা লেশমাত্র রজঃ ও তমোগুণে মিশ্রিত অন্তঃকরণের প্রকাশ-শক্তি সত্ত্বগুণকে আশ্রয় করিয়া ভাবনা করে। (৪) অস্মিতা, যাহা বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণকে অবলম্বন করিয়া ভাবনা করে। বিক্ষিপ্ত চিত্তেও সমাধি হয়; কিন্তু তাহাতে বিক্ষেপসংস্কার থাকার জন্য, সেই সমাধি স্থায়ী হয় না। বিক্ষেপ-সংস্কার দ্বারা সমাধি ভাঙ্গিয়া যায়; কিন্তু একাগ্রচিত্তে যে সমাধি হয়, তাহা বিক্ষেপসংস্কার দ্বারা ভাঙ্গিয়া যায় না। তাহাতে প্রকৃতির তত্ত্ব সকলের সম্যক্-জ্ঞান হয়। যে জ্ঞান হইলে, আর সেই তত্ত্ববিষয়ে জানিবার কিছু অবশিষ্ট থাকে না। সুতরাং সম্যগ্রূপে প্রাকৃতিক তত্ত্বজ্ঞান হইলে, পুরুষ হইতে প্রাকৃতিক-তত্ত্ব যে পৃথক্ তাহারও জ্ঞান হয়। সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে বিষয়সম্বন্ধে যে জ্ঞান হয়, তাহাই সম্প্র-

জ্ঞান। যাহা সত্যজ্ঞান, তাহা সর্ব্বদা সর্ব্বক্ষণের জন্য চিত্তে স্থির রাখিতে পারিলে, আমরা আত্মপ্রসাদ লাভ করি। মিথ্যাজ্ঞান জন্য এতদিন যে কষ্ট পাইতেছিলাম, তাহা দূরীভূত হয়। মিথ্যাজ্ঞানই আমাদের কষ্টের কারণ। রজ্জুকে যতক্ষণ সর্প বলিয়া বোধ হইবে, ততক্ষণ ভয়ও থাকিবে; আর রজ্জুকে রজ্জু বলিয়া বোধ হইলে, ভয়ও তিরোহিত হয়। বিষয়সম্বন্ধে সত্যজ্ঞান হইলে বিষয় যে দুঃখের হেতু; তাহা আমরা বুঝিতে পারি। এক্ষণে ভ্রান্তিজ্ঞানবশতঃ আমরা বিষয়কে সুখের হেতু বলিয়া মনে করিতেছি। বিষয়কে দুঃখের হেতু বলিয়া জানিলে, আমাদের বিষয়াসক্তি দূর হইবে এবং বৈরাগ্যলাভেরও সুবিধা হইবে। সম্যক্ তত্ত্বজ্ঞান ভিন্ন সম্যগ্ রূপে বিষয়াসক্তি দূর হয় না। এই হেতু যাহাতে চিত্ত একাগ্র হয় ও সংস্কারশূন্য হয় ও রজস্তমোমল দূর হয়, বিধিমতে তাহার সাধনা করা উচিত। সম্প্রজ্ঞাত সমাধি হইলে আমাদের দুঃখ দূর হয়—কর্ম্মবন্ধন কাটিয়া যায় এবং চিত্তের নিরোধ অবস্থাকে অভিমুখীন করে; পুস্তকে পাঠ করিয়া এই সমাধি-বিষয় নিসংশয়রূপে জানা অসম্ভব। নিজে সাধন করিয়া জানা সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট পন্থা।

বিরাম-প্রত্যয়াভ্যাসপূর্ব্বঃ সংস্কারশেষোঽন্যঃ ॥ ১৮ ॥

বিরামের যে প্রত্যয়, তাহার অভ্যাসসাধ্য সংস্কার-শেষ-স্বরূপ সমাধি অসম্প্রজ্ঞাত। অর্থাৎ চিত্তের সমুদয় বৃত্তির বিরাম হইলে অর্থাৎ ক্ষয় হইলে সংস্কার-শেষ-স্বরূপ চিত্তনিরোধকে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলে।

চিত্তে কর্ম্মের সংস্কার থাকিলেই চিত্তে বৃত্তির উদয় হইবে। যতদিন বিষয়াসক্তি থাকিবে, ততদিন চিত্তে সংস্কার পড়িবে। যতদিন বিষয়াসক্তি ক্ষয় না হইবে, ততদিন চিত্তে নূতন নূতন সংস্কার পড়িবে এবং সেই

সংস্কার হইতে পুনরায় স্মৃতি ও আসক্তি জাগিবে। বিষয়াসক্তির ক্ষয়কে বৈরাগ্য বলে। বাহিরের পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়ের রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ ও স্পর্শ এই পাঁচটী বিষয়। বাহিরের এই পাঁচটী ইন্দ্রিয়কে সংযত করিয়া আমরা এই পাঁচটী বিষয় হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারি; কিন্তু মনোরূপ ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ে তখনও বিষয়ের আসক্তি রহিয়া গেল। বশীকার-সংজ্ঞক বৈরাগ্য দ্বারা এই মনের আসক্তিও লয় হয়। এই মনের আসক্তির লয় হইলে, আমরা বশীকারসংজ্ঞক বৈরাগ্যের অধিকারী হইলাম। তৎপরে পরাবৈরাগ্যের উদয় হয়, তখন চিত্ত সর্ব্বপ্রকার বৃত্তি হইতে বিরাম লাভ করে। এই পরাবৈরাগ্য লাভ হইলে, আমরা অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি অভ্যাস করিতে পারি। পরাবৈরাগ্যে কোন অবলম্বন থাকে না। সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে অবলম্বন থাকে। তাহাকে সবীজ সমাধি বলে। সাধারণ সাধকের আর অধিক জানিবার আবশ্যক করে না। যাঁহারা এইসকল সূক্ষ্ম বিষয় অধিক জানিবার বাসনা করেন, তাঁহারা সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিবেন।

ভবপ্রত্যয়ো বিদেহপ্রকৃতিলয়ানাম্‌ ॥ ১৯ ॥

বিদেহ ও প্রকৃতিলয়দিগের পুনরায় ভব-প্রত্যয় হয়।

বিদেহ অর্থাৎ স্থূলদেহশূন্য দেবতা। ইহারা চিরকালের জন্য মুক্ত নহেন। স্বর্গীয় ভোগের অপগমে ইহাদের পুনরায় ভবপ্রত্যয় হয় অর্থাৎ এই সংসারে আসিতে হয়। পরাবৈরাগ্য লাভ হইলে সাধক স্বর্গভোগকেও কাকবিষ্ঠাবৎ মনে করে এইজন্য ইহাদের আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। প্রকৃতিলীনদিগের অর্থাৎ প্রকৃতি মধ্যে যাহারা লীন হয় (যেমন সানন্দ সমাধি)—ইহাদিগেরও মুক্তি হয় না। সানন্দ সমাধি লাভ করিয়া এই আনন্দকেই ইহারা নির্ম্মল ব্রহ্মানন্দ মনে করিয়া,

সাধনার শেষ হইয়াছে মনে ভাবে ও আর সাধনায় অগ্রসর হয় না। এই সানন্দ সমাধি লাভ করিয়া ইহারা মনে করে যে মানবজীবন কৃতার্থ হইল। ইহারাও এই প্রাকৃতিক আনন্দে মগ্ন হইয়া যায় এবং পুরুষতত্ত্বের সাক্ষাৎকারের আবশ্যকতা মনে করে না। ইহাদের পরাবৈরাগ্য হয় নাই; যাহাদের পরাবৈরাগ্য হইয়াছে তাহারা এই আনন্দকে তুচ্ছবোধ করে এবং পুরুষতত্ত্ব সাক্ষাৎকারের চেষ্টা করে ও অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিলাভের চেষ্টা করে। বিদেহলীনদের ও প্রকৃতিলীনদের মুক্তি হয় না। তাহারা পুনরায় জন্মগ্রহণ করে। তাহাদিগকে পুনরায় ভবসংসারে আসিতে হয়। সাধারণ সাধকের ইহা অপেক্ষা অধিক জানিবার আবশ্যক নাই। যাঁহারা অধিক জানিতে চাহেন, তাঁহারা সদ্গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিবেন।

শ্রদ্ধা-বীর্য্য-স্মৃতি-সমাধি-প্রজ্ঞাপূর্ব্বক ইতরেষাম্ ॥২০॥

শ্রদ্ধা, বীর্য্য, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞা এই পাঁচটী উপায় অবলম্বন করিয়া সাধন করিলে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি লাভ হয়।

> "হোম দান আদি কর্ম্ম কর যে সকল।
> শ্রদ্ধা না থাকিলে, পার্থ! সকলি বিফল॥"

শ্রদ্ধাই সকল কার্য্যের মূল। শ্রদ্ধা না থাকিলে কোন কার্য্যই সুসম্পন্ন হয় না। কি ইহলৌকিক কার্য্য, কি পারলৌকিক কার্য্য, শ্রদ্ধা না থাকিলে কোন কার্য্যে সফলতা হয় না। অশ্রদ্ধার সহিত যে কার্য্য করিবে, তাহা সুসম্পন্ন হইবে না। শ্রদ্ধার সহিত কার্য্য করিলে মনে একটা উৎসাহ থাকে। অশ্রদ্ধার সহিত কার্য্য করিলে মনে সর্ব্বদাই অস্বচ্ছন্দভাব বর্ত্তমান থাকে এবং সে কার্য্য করিবার সময় মনে সামান্যও উৎসাহ থাকে না। যেন বাধ্য হইয়া কর্ম্ম করিতে হইতেছে, যেন

না করিতে হইলে ভাল হয়। "কতক্ষণে শেষ হয়," "কতক্ষণে শেষ হয়" এইরূপ উৎকণ্ঠার ভাব সর্ব্বদা অন্তঃকরণকে কষ্ট দেয়। শ্রদ্ধার সহিত কার্য্য করিলে কার্য্যে উৎসাহ বর্দ্ধিত হয়। কার্য্য করিবার সময় মনে আনন্দ হয়। সময় যেন কোথা দিয়া শীঘ্র ফুরাইয়া যায়। এই-জন্য শ্রদ্ধা না থাকিলে. তুমি কার্য্য করিতে পারিবে না। গুরু ও বেদান্তবাক্যে বিশ্বাস না থাকিলে, ধর্ম্মকার্য্যও করিতে পারিবে না। যে ছাত্রের, লেখাপড়ায় শ্রদ্ধা নাই, তাহার বিদ্যাশিক্ষা হইবে না। যে বালকের, পিতার প্রতি শ্রদ্ধা নাই, সে পিতৃ-আজ্ঞা পালন করিতে পারিবে না। যে স্ত্রীর, স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা নাই, সে ভাল করিয়া স্বামিসেবা করিতে পারিবে না। যে সাধকের, আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নাই, তাহার সাধনাও ভাল হইবে না। যাহার শ্রীগীতায় শ্রদ্ধা আছে, সে গীতা শুনিতে ভালবাসে। যাহার শ্রীগীতায় শ্রদ্ধা নাই, সে গীতা শুনিতে ভালবাসে না। যদি কাহারও সহিত গীতা শুনিতে আসে. গীতা শুনিতে বসিয়া তাহার বড় কষ্ট হয়। যতক্ষণ বসিয়া থাকে সর্ব্বদা ছট্‌ফট্‌ করে; যেন পলাইতে পারিলেই বাঁচে, তাহার গীতা শুনা হয় না। শ্রদ্ধা থাকিলে কার্য্যে উৎসাহ হয় অর্থাৎ বীর্য্য হয়। যে বিষয়ে আমাদের শ্রদ্ধা থাকে—আমরা সে বিষয়ের গুণ আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করি। যাঁহার শ্রীকৃষ্ণে শ্রদ্ধা আছে, তিনি শ্রীকৃষ্ণের লীলা পাঠ করিয়া সুখী হন। শ্রীকৃষ্ণ কোথায় কি কি লীলা করিয়াছেন, তাহা জানিবার জন্য তাঁহার প্রাণ ব্যাকুল হয়, এবং যতই তাঁহার গুণের বিষয় জানিতে পারেন, ততই তাঁহার প্রতি মুগ্ধ হন। নিজ ইষ্টদেবতার গুণাবলী; তাঁহার লীলাকথা আমরা যতই চিন্তা করি. যতই মনে মনে আলোচনা করি, ততই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হই, ততই তাঁহার সাধন ভজনে আমাদের শ্রদ্ধা ও উৎসাহ বর্দ্ধিত হয়। এইরূপে সাধন করিতে করিতে ক্রমে আমরা তাঁহার ভাবে ভাবান্বিত

হইয়া যাই। পূর্ব্বজন্মে যিনি শ্রীকৃষ্ণের সাধন ভজন করিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় সেই সাধনের সংস্কার তাঁহার চিত্তে অঙ্কিত আছে, এবং ইহজন্মে অতি বাল্যকাল হইতেই সেই সাধকের চিত্ত অবশভাবে আপনা আপনি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট হইবে। এই সকল শিশু যদি ইহজন্মে শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষিত হয়, তাহাহইলে, তাহারা সহজে ও শীঘ্র মন্ত্রসিদ্ধ হইতে পারিবে। আর অজ্ঞ গুরুদ্বারা যদি তাহারা শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়, তাহাহইলে, তাহাদের এই শক্তিমন্ত্রের সাধনা করিতে বড়ই ক্লেশ হইবে এবং ইহজীবনে সে মন্ত্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারিবে না। পূর্ব্বজন্মের সংস্কারানুযায়ী আমরা ইহজন্মে সংস্কার লাভ করিয়া থাকি। পূর্ব্বজন্মের শ্রদ্ধা অনুযায়ী আমরা ইহজন্মে শ্রদ্ধা লাভ করিয়া থাকি। এই শ্রদ্ধাকে স্বাভাবিক শ্রদ্ধা বলে। এই স্বাভাবিক শ্রদ্ধানুযায়ী কার্য্য করিলে আমাদের উন্নতি হয়। যাহার যেরূপ সংস্কার তাহাকে সেইরূপ কার্য্যে লাগাইলে সে উন্নতিলাভ করিতে পারে। যাহার ডাক্তারী করিবার সংস্কার আছে, তাহাকে ডাক্তারী শিক্ষায় লাগাইয়া দাও—সে উন্নতি লাভ করিবে। আর যদি তাহাকে মোক্তারী শিক্ষায় লাগাও, সে উন্নতি করিতে পারিবে না। যাহার ব্যবসাদারী সংস্কার, তাহাকে ব্যবসায়ে লাগাইয়া দাও; সে উন্নতি করিতে পারিবে। আর তাহাকে পরের চাকুরীতে লাগাইলে, সে উন্নতি করিতে পারিবে না। প্রত্যেক পিতামাতা ও অভিভাবকের এই সংস্কারবিষয়ে জ্ঞান থাকা আবশ্যক এবং যে ছেলের যেরূপ সংস্কার তাহাকে সেইরূপ কার্য্যে লাগান আবশ্যক। এইরূপ করিতে পারিলে আমাদের দেশের উন্নতি হইবে। কাহারও বা কৃষিকার্য্যে সংস্কার, কাহারও বা ছুতারের কার্য্যে, কাহারও বা কামারের কার্য্যে, কাহারও বা স্যাকরার কার্য্যে, কাহারও বা চিত্রাঙ্কণ কার্য্যে—সংস্কার আছে॥ পিতামাতা বালকদিগকে তাহাদের সংস্কারানুযায়ী কার্য্যে লাগাইলে, সেই বালক বালিকারা সহজেই

সেইসকল কার্য্যে উন্নতিলাভ করিবে। আর জোর করিয়া অন্যকার্য্যে লাগাইলে উন্নতি করিতে পারিবে না বরং অবনতি হইবে। সকল বালকেরই ব্রহ্মচর্য্যরক্ষার উপায় বিধান করিয়া তাহাদের সংস্কারানুযায়ী কার্য্যে লাগাইয়া দাও। মূলে সকলেরই ব্রহ্মচর্য্য আবশ্যক।

চিত্তের সংস্কার দুই প্রকার। এক ধর্ম্ম সংস্কার, আর এক অধর্ম্ম সংস্কার। বালকদিগের পূর্ব্বজন্মজাত অধর্ম্ম সংস্কারও থাকিতে পারে। যে সকল বালকের অধর্ম্ম সংস্কার আছে, তাহারা বাল্যকাল হইতেই অধর্ম্মকার্য্য করিতে ভালবাসে। এইরূপ বালককে সেই অধর্ম্ম সংস্কারে উৎসাহ দিতে নাই। তাহাদিগকে ধর্ম্মপথে আনিয়া এই অধর্ম্ম সংস্কারকে বাধা দিতে হয়।

শ্রদ্ধা হইতে বীর্য্য হয়। কার্য্যে শ্রদ্ধা থাকিলে কার্য্যে উৎসাহ হয়। যে কার্য্যে শ্রদ্ধা নাই, সেই কার্য্যে উৎসাহ হয় না। সে কার্য্য করিতে বিরক্তি আসে। উৎসাহের সহিত কার্য্য করিলে, সে কার্য্যে সফলতা লাভ করা যায়, আর কার্য্যে নিরুৎসাহ আসিলে তাহাতে সফলতা লাভ হয় না। বীর্য্যহীন হইলে কার্য্যে অলসতা আসে। বীর্য্যহীনের যোগ-সিদ্ধিলাভ হয় না। "নহি বলহীনেন লভ্যঃ"।

বীর্য্য ভিন্ন স্মৃতিসাধন হয় না। যাহার বীর্য্য যত অধিক তাহার স্মৃতিসাধনও তত সহজে হয়। বীর্য্যবান্ বালকেরা শীঘ্র শীঘ্র পাঠ মুখস্থ করিতে পারে ও তাহা অনেকদিন মনে করিয়া রাখিতে পারে। বীর্য্য-হীন বালকেরা শীঘ্র শীঘ্র মুখস্থ করিতে পারে না, ও যাহা মুখস্থ করে তাহাও শীঘ্র ভুলিয়া যায়। স্মৃতিসাধন না করিতে পারিলে, আমরা ইহলৌকিক বা পারলৌকিক কোন বিষয়েই উন্নতিলাভ করিতে পারি না। স্মৃতি-সাধনই যোগের প্রধান সাধন। পুনঃ পুনঃ অভ্যাস দ্বারা এই স্মৃতিসাধন করিতে হয়। যাহার চিত্ত যত অধিক চঞ্চল, তাহার স্মৃতিসাধনেও তত অধিক কষ্ট হয়। যাহার চিত্ত স্থির তাহার স্মৃতি-

সাধন শীঘ্র হয়। যাহার চিত্তে যত অধিক সংস্কার, যত অধিক বাসনা, যত অধিক বিষয়াসক্তি, তাহার চিত্ত তত অধিক চঞ্চল। চিত্তকে স্থির করিতে হইলে, বিষয়াসক্তি কমাইতে হইবে। বিষয়াসক্তি কমাইতে পারিলে, বৈরাগ্যলাভ হইবে। এই অভ্যাস ও বৈরাগ্য সাহায্যে স্মৃতিসাধন করিতে হয়। একাগ্রভূমিক চিত্তে স্মৃতিসাধন সহজে হয়। চিত্ত স্বভাবতঃ সর্ব্বদাই চঞ্চল, এইজন্য জপ করিতে বসিলে একমনে জপ করা যায় না। দুই মিনিট জপ করিতে না করিতে মনের মধ্যে বৈষয়িক চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হয় এবং জপ ভাঙ্গিয়া দেয়। দুই মিনিট "কৃষ্ণ, কৃষ্ণ" জপ করিতে না করিতে মনের মধ্যে "আলু-পটল" আসিয়া উপস্থিত হয়। জপে বসিবার সময় প্রতিজ্ঞা করিলাম যে, আজ অন্ততঃ ৫ মিনিট কাল একাগ্রমনে একধারায় "কৃষ্ণ, কৃষ্ণ" নাম জপ করিব; কিন্তু চিত্তের স্বাভাবিক চঞ্চলতাবশতঃ এই ৫ মিনিটের মধ্যে ১৫ বার জপ ভাঙ্গিয়া গেল। প্রথম সাধকদের জপ করিবার সময় এইরূপ বিঘ্ন উপস্থিত হয়; কিন্তু তাহাতে নিরাশ হইও না। প্রথম প্রথম সকলেরই এইরূপ হয়। যাঁহারা আজ মহাপুরুষ বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, তাঁহাদেরও প্রথম প্রথম এইসকল অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছে। অসুবিধা যতই হউক কোনমতে নিরাশ হইও না। চিত্তে যতই অন্যচিন্তা উঠুক না কেন, নিরাশ না হইয়া জপের মন্ত্র জোর করিয়া চিত্তে বসাইবে। যতবারই চিত্তের একাগ্রস্রোত ভগ্ন হইবে, ততবারই পুনঃ পুনঃ "কৃষ্ণ" মন্ত্র চিত্তে বসাইবে। বাহিরের বৈষয়িক চিন্তাকে পুনঃ পুনঃ দূরীভূত করিবে ও পুনঃ পুনঃ এই "কৃষ্ণ" মন্ত্র চিত্তে বসাইবে। এইরূপ পুনঃ পুনঃ অভ্যাস করিবে, দুই একদিনের অভ্যাসে হইবে না। বহুকাল অভ্যাস করিতে হইবে। ধৈর্য্য হারাইলে চলিবে না। ধৈর্য্য-সহকারে বহুকাল, নিরন্তর ও সযত্নে অভ্যাস করিবে। পুনঃ পুনঃ একই বিষয় চিত্তে ধরিয়া রাখিতে পারিলে, আমাদের চিত্ত একাগ্রভূমিক

হয়। একটী বিষয়ের স্মৃতি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চিত্তে জাগরূক রাখিতে পারিলে, চিত্ত একাগ্রভূমিক হয়। একাগ্রভূমিক চিত্তে সাততিক স্মৃতি বর্ত্তমান থাকে। ইহাকেই সমাধি বলে। যখন চিত্তের একটীমাত্র চিন্তাধারা বহুক্ষণ পর্য্যন্ত চিত্তে রক্ষা করিতে পারা যায়, যখন সেই চিন্তাধারার মধ্যে অন্য কোন চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হয় না, যখন ঐ চিন্তাধারা অন্য কোন চিন্তাধারার দ্বারা ভগ্ন হয় না, তখন তাহাকে "সমাধি" বলা যায়।

ঈশ্বরতত্ত্ব ও প্রকৃতিতত্ত্ব উভয়ই ধ্যেয় বিষয় হইতে পারে। যেরূপ ইষ্টমন্ত্র জপ ও স্মরণ করিলে চিত্ত একাগ্র হয়, সেইরূপ ভূততত্ত্ব, তন্মাত্রতত্ত্ব, ইন্দ্রিয়তত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব ও বুদ্ধিতত্ত্ব প্রভৃতির একাগ্রধ্যানেও চিত্ত একাগ্র হয়। যে কোন একটী বিষয় অবলম্বন করিয়া একাগ্রমনে ধ্যান করিলেই চিত্ত একাগ্র হইবে। ভূততত্ত্বের ধ্যান,—যেমন ইট, কাঠ, পাথর, মাটী প্রভৃতি। তন্মাত্রতত্ত্বের ধ্যান—যেমন রসতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, প্রভৃতি। সাধারণের পক্ষে ইষ্টমন্ত্র মানসিক জপ করাই উত্তম। সর্ব্বদাই ইষ্টমন্ত্র মানসিক জপ করিবে। কি আহার, কি বিহার, কি সাংসারিক কার্য্য এমন কি মলমূত্রত্যাগকালেও ইষ্টমন্ত্রজপ ত্যাগ করিবে না। দিবারাত্র ইষ্টমন্ত্র জপ করিবে। মনকে একদণ্ডের জন্যও খালি রাখিবে না। মনকে খালি অবস্থায় রাখিলেই মনে কুচিন্তা আসিয়া উপস্থিত হইবে। যাহাদের বৈষয়িক কার্য্য বা সাংসারিক কার্য্য করিতে হয় না, তাহারা সর্ব্বদাই জপ লইয়া থাকিবে; আর যাহাদের বৈষয়িক কার্য্য করিতে হয়, তাহারা সেই বৈষয়িক কার্য্যটী একমন দিয়া একাগ্রভাবে করিবে, তাহাহইলে, তাহাদের মনও একাগ্র হইবে। যখন যে কার্য্য করিবে তাহা একমনে করিবে। যখন উঠান ঝাঁট দিবে তখন একমনে ঝাঁট দিবে, কাহারও সহিত গল্প করিবে না বা মনে অন্য কোন বিষয় চিন্তা করিবে না। যখন রন্ধন

কার্য্য করিবে তখন একমনে রন্ধন কার্য্য করিবে, কাহারও সহিত গল্প করিবে না বা অন্য কোনদিকে মন দিবে না। যখন পুস্তক পাঠ করিবে তখন একমনে পাঠ করিবে। কাহারও সহিত কোন গল্প করিবে না বা অন্য কোন বিষয় চিন্তা করিবে না। এইরূপে যখন যে কোন কার্য্য করিবে, তাহা একমনে করিলেই মন একাগ্র হইবে ও স্মৃতিসাধন হইবে। এইরূপ করিয়া কার্য্য করিতে পারিলেই, তাহাকে "যোগযুক্ত" কর্ম্ম বলে। "করেতে করহ সংসারের কাজ, হৃদয়েতে ভাব সেই রসরাজ।" হাত পা দিয়া কর্ম্ম করিবে কিন্তু মনের মধ্যে ভগবানকে বসাইয়া রাখিবে। ইহাই যোগযুক্ত কর্ম্ম। আত্মাকে কখনও বিস্মৃত হইও না। আত্মবিস্মৃতিই মহাপাপ। সর্ব্বদা আত্মস্মৃতি বজায় রাখিতে পারিলে, আর কামক্রোধাদি রিপু আমাদের কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না। এইজন্য স্মৃতিসাধন সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান সাধন। বহুকাল সাধন করিয়া, যাহার স্মৃতিসাধন না হইল, তাহার সাধন বৃথা। স্মৃতিসাধন হইলে, আমাদের চিত্ত প্রসন্ন হয় আমাদের চিত্তশুদ্ধিলাভ হয়, আমাদের সত্ত্বশুদ্ধিলাভ হয়। এই আত্মস্মৃতি যখন অত্যন্ত প্রবল হয় অর্থাৎ আত্মবিস্মৃতি একবারেই হয় না তখন সাধক সেই আত্মস্মৃতিতেই নিমগ্ন থাকেন, তখন ইহাকে সমাধি বা সম্প্রজ্ঞাত-যোগ বলে। এইরূপ সাধকেরা বাহ্যজ্ঞানহীন হন না কিন্তু সঙ্কল্পহীনচিত্তে বাহ্যবিষয় দর্শন, শ্রবণাদি করিয়া থাকেন। সম্পূর্ণ উদাসীনভাবে বাহ্যকার্য্যের অনুষ্ঠান মাত্র করেন। বাহ্যকার্য্যে ইহাদের আসক্তি নাই। বাহ্যকার্য্যের আসক্তিতে ইহারা লিপ্ত হন না, উদাসীনভাবে বা সাক্ষিমাত্রস্বরূপে ইহারা দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করেন। ইহারা দেহ ও ইন্দ্রিয়ের কার্য্যকে নিজের কার্য্য বলিয়া মনে করেন না। ইহারা দেহ ও ইন্দ্রিয়ের কার্য্যে আসক্ত হন না। মাত্র শরীরধারণোপযোগী কার্য্য করিয়া যান। এইরূপে চিত্তশুদ্ধি হইলে, ক্রমে ক্রমে ইন্দ্রিয়াদির্ও

স্থির হইয়া আইসে ; সুতরাং বাহ্যবিষয়ও আর ইহাদিগকে চঞ্চল করিতে পারে না। এইরূপভাবে যে ইন্দ্রিয় নিরোধ, তাহাই প্রকৃত নিরোধ। ইহাতে ইন্দ্রিয়গণ আপনা আপনিই শান্ত ও স্থির হয়। বলপূর্ব্বক ইন্দ্রিয়নিরোধ, প্রকৃত নিরোধ নহে ; কারণ তাহাতে চিত্তমধ্যে বিষয় ভ্রমণ করিতে থাকে, তাহাতে চিত্তের চঞ্চলতা নিবারণ হয় না। জোর করিয়া ইন্দ্রিয় নিরোধ করিলেও চিত্তমধ্যে বিষয়চিন্তা চলিতে থাকে। যখন ইন্দ্রিয়রোধ হইবে এবং চিত্তও শান্তভাবে অবস্থিতি করিবে, তখন তাহাই প্রকৃত ইন্দ্রিয়নিরোধ যতদিন চিত্তমধ্যে সংস্কারের প্রবলতা থাকিবে, ততদিন ইহাতে বিষয়চিন্তাও উঠিবে। এই সংস্কার ক্ষয় করিবার জন্য গীতানুযায়ী কর্ম্মযোগ করা আবশ্যক। ফলকামনা ত্যাগ করিয়া, শুদ্ধ ঈশ্বরপ্রীতির জন্য কর্ম্ম করিলে, আমাদের সংস্কার ক্ষয় হয় ও চিত্তশুদ্ধি হয়। আর ফলকামনা করিয়া নিজের দেহ বা ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য কর্ম্ম করিলে, সংস্কার ক্ষয় না হইয়া আরও বর্দ্ধিত হয়। চিত্তে যতই সংস্কার বর্দ্ধিত হইবে ততই চিত্ত চঞ্চল হইবে ; আর যতই সংস্কার ক্ষয় হইবে ততই চিত্ত স্থির হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রিয়ও শান্তভাব অবলম্বন করিবে।

অতএব শ্রদ্ধা হইতে বীর্য্য হয় এবং বীর্য্য হইতে স্মৃতি হয়। এই স্মৃতি অচলা হইলেই সমাধি হয় এবং সমাধি হইতেই "প্রজ্ঞা" হয়। প্রজ্ঞা হইলে এই প্রকৃতিতত্ত্বের যথাবৎ সত্যজ্ঞান হয়। যে মিথ্যাজ্ঞানে মুগ্ধ হইয়া আমরা এতদিন ক্লেশ পাইতেছিলাম, তাহা তিরোহিত হয়। বিষয় যে হেয়, তাহা আমরা বুঝিতে পারি এবং বিষয়াসক্তিও ত্যাগ করিতে পারি। এইরূপ অবস্থা হইলে এই বিষয় যিনি দর্শন করিতেছেন, সেই দ্রষ্টৃপুরুষে আমাদের স্থিতিলাভ হয়। ইহাকেই কৈবল্য বলে। ইহাই মোক্ষের উপায়।

তীব্র-সংবেগানামাসন্নঃ ॥ ২১ ॥

যাহারা তীব্র-সংবেগের সহিত সাধন করে তাহাদের সমাধিলাভ ও সমাধির ফল কৈবল্যলাভ শীঘ্র হয়।

সাধন আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে সাধকের দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করা চাই যে, "যতকিছু বাধা বিঘ্ন উপস্থিত হউক না কেন, আমার চিত্ত যতই অধিক চঞ্চল হউক না কেন, আমি কঠোরভাবে সাধন করিয়া আমার ইন্দ্রিয়াদি জয় করিব ও আমার চিত্তকে স্থির করিয়া সমাধি লাভ করিব।" বহু পুণ্যের ফলে এই মনুষ্যজন্ম লাভ হইয়াছে। মনুষ্যজন্মেই সাধনা সম্ভব। পশুজন্মে সাধনা হয় না। পশুজন্মে পাশবিক কার্য্য করিয়াছি। যত-প্রকার পাশবিক কার্য্য জগতে আছে, তাহা লইয়াই অনাদি অনন্তকাল হইতে কাল কাটাইয়াছি। বহু পশুজন্মের পর তবে একটী মনুষ্যজন্ম পাওয়া যায়। মনুষ্যজন্ম সাধনার জন্য। মনুষ্যজন্ম মুক্তির জন্য। মনুষ্য-জন্ম পাশবিক আসক্তি ত্যাগ করিবার জন্য। যদি মনুষ্য হইয়াও পশুর আচরণ করি, যদি মনুষ্য হইয়াও পশুধর্ম্ম আহার, নিদ্রা, ভয় ও ক্রোধাদি লইয়াই এই দুর্লভ জীবনকে নষ্ট করি, তাহাহইলে, আমাপেক্ষা পাপাত্মা আর কে আছে? একেত মনুষ্যজন্ম দুর্লভ, তৎপরে সৎসঙ্গ ও সদ্গুরুলাভ আরও দুর্লভ। এই মনুষ্যজন্ম পাইয়া যাহারা সৎসঙ্গ ও সদ্গুরু লাভ করে, তাহাদের অপেক্ষা সৌভাগ্যবান্ আর কে আছে? সংসার ভীষণ অরণ্য সদৃশ। এই অতি ভীষণ সংসারারণ্যে রিপুরূপ ব্যাঘ্রাদি ভয়ঙ্কর পশুগণ সর্ব্বদা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এই সংসারারণ্যে পতিত পথভ্রান্ত পথিকের মন কি শান্তি লাভ করিতে পারে? বিশেষ মৃত্যুকালরূপ সন্ধ্যা উপস্থিত। রাত্রির ঘোর অন্ধকারে যে কি দুরবস্থা হইবে তাহার স্থিরতা নাই। এরূপ অবস্থায় পথিক কি আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে? পথিকের মন ভয়ে আকুল হইয়া যত শীঘ্র সেই অরণ্য

হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে পারে, তাহার চেষ্টা করে; সে অতি দ্রুতভাবে পথ অতিক্রম করিবার জন্য অতিমাত্র ব্যগ্র হয়। সাধনরাজ্যে সাধকের সাধনবেগ এইরূপ তীব্র ও প্রবল হওয়া আবশ্যক, তাহাহইলে, তাহার ফলও শীঘ্র হয়। সাধনে যাহার প্রবল শ্রদ্ধা আছে, সেই সাধক শীঘ্র শীঘ্র সাফল্যলাভ করে। আর সাধনে যাহার শ্রদ্ধা অল্প; তাহার ফললাভও বহুদূর। যেরূপ শ্রদ্ধা ও আগ্রহ সহকারে আমরা কোন কার্য্য করি, সেই কার্য্যের ফলও সেইরূপ শীঘ্র বা বিলম্বে হয়। যাহার অভাব বেশী সেই সাধনে শীঘ্র ফললাভ করে। দরিদ্রের সন্তান অর্থকরী বিদ্যায় শীঘ্র শীঘ্র ফললাভ করে; কিন্তু ধনীর সন্তানের ধনের অভাব নাই এইজন্য তাহার ধনলাভের আগ্রহও নাই, এইজন্য সে অর্থকরী বিদ্যার্জ্জনে কৃতকার্য্য হয় না। যাহার যে বিষয়ে বেশী অভাব, সে সেই বিষয়ে প্রবল তীব্রবেগে কার্য্য করে এবং কার্য্যের ফলও শীঘ্র লাভ করে। যাহার ধর্ম্মের আকাঙ্ক্ষা প্রবলভাবে মনে জাগিয়াছে, ধর্ম্মলাভ করিবার জন্য যাহার প্রাণ ছট্‌ফট্‌ করিতেছে; সংসারের কোন বিষয়ে যে শান্তিলাভ করিতে পারিতেছে না; সংসারের বিষয়গুলি যাহার নিকট বিষবৎ প্রতীয়মান হইতেছে। সেই সাধকই ধর্ম্মরাজত্বে শীঘ্র শীঘ্র ফললাভ করিবে। ধর্ম্মের অভাব মনে না জাগিলে, ধর্ম্ম হয় না। ক্ষুধা না পাইলে, খাইয়া তৃপ্তি হয় না। তৃষ্ণা না পাইলে, জলপানে তৃপ্তি হয় না। অনুরোধে ঢেঁকীগেলাগোছের ধর্ম্ম করিলে ধর্ম্মের ফললাভ হয় না। লোকের নিকট মান পাইবার জন্য ধর্ম্ম করিলে, ধর্ম্মের ফললাভ হয় না। ধর্ম্মের জন্যই ধর্ম্মের সাধন করিতে হইবে, তবেই ধর্ম্মের ফললাভ হইবে। অনেকেই সম্মান লাভের জন্য ধর্ম্মাচরণ করে, তাহারা ধর্ম্মের মূল্য জানে না। ধর্ম্ম কেন করিতে হয়, তাহা জানে না। ধর্ম্ম আমাদের আবশ্যক কেন, তাহা জানে না। তাহাদের প্রাণে ধর্ম্মের অভাব বোধ হয় নাই। তাহারা বিষয় পঙ্কে এত অধিক

নিমগ্ন যে, প্রকৃত ধর্ম্মের আভাস পর্য্যন্ত পায় নাই। ইহারা মোহনিদ্রায় এতদূর মগ্ন যে, ধর্ম্ম যে একটা সাধন করিবার জিনিস তাহারা তাহা জানে না। আমাদের দেশে দীক্ষাগ্রহণ প্রথা আছে। দীক্ষাগুরুও আছে। কিন্তু অধিকাংশ শিষ্য ও গুরু এই দীক্ষাসম্বন্ধে কিছুই জানে না। তাহারা এটাকে ব্যবসায় বলিয়া জানে। গুরুরা এটাকে উদর-পূরণের একটা ব্যবসায় মাত্র মনে করে। আর শিষ্যেরা মনে করে যে, "দীক্ষাগ্রহণ না করিলে—হাতের জল শুদ্ধ হইবে না"—তাই তাহারা "হাতের জল শুদ্ধ করিবার জন্য দীক্ষাগ্রহণ করে"; সুতরাং দীক্ষার ফলও তদ্রূপ হয়। বিষয়টা ভাল করিয়া না বুঝিলে, সে বিষয়ে কেহ কৃতকার্য্য হইতে পারে না; বিষয়ের অভাব না হইলে, সেই বিষয় সে আগ্রহের সহিত গ্রহণ করে না। যাহার শ্রদ্ধার ভাব যত প্রবল, তাহার সাধনফলও তত শীঘ্র হয়।

মৃদু-মধ্যাধিমাত্রত্বাৎ ততোঽপি বিশেষঃ ॥ ২২ ॥

মৃদু, মধ্যম ও অধিমাত্রতাহেতু ফলেরও বিশেষত্ব হয়। যাহারা সাধনে অল্প চেষ্টা করে, তাহাদের অল্প ফল হয়। যাহারা মধ্যমরূপ চেষ্টা করে, তাহাদের মধ্যমরূপ ফল হয়। যাহারা অত্যন্ত অধিক চেষ্টা করে, তাহাদের অত্যন্ত অধিক ফল হয়। যাহার শ্রদ্ধা বা বীর্য্য যেরূপ কম বা বেশী, তাহার সাধনফলও তদ্রূপ কম বা বেশী হয়। যাহারা প্রবল উৎসাহে ও উদ্যমে সাধন করে, তাহারা অতি শীঘ্র সাধন ফল পায় অর্থাৎ তাহাদের শীঘ্রই সমাধি ও কৈবল্য সাধিত হয়। তাহাদের সংস্কারবন্ধনও অতি শীঘ্র ছিন্ন হয়।

ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্ বা ॥ ২৩ ॥

ঈশ্বরপ্রণিধান হইতেও সমাধিলাভ হয়।

ভগবানে ভক্তির সহিত সর্ব্বকর্ম্মসমর্পণপূর্ব্বক তাঁহার আরাধনা করিলেও সমাধিলাভ হয়। ভগবানে কর্ম্মসমর্পণ নিতান্ত সহজ নয়। আমরা মুখে বলিয়া থাকি ভগবানে কর্ম্মসমর্পণ করিলাম, কিন্তু প্রাণের সহিত সমর্পণ করি না। মুখস্থ সমর্পণ করিলে হইবে না। প্রাণের সহিত সমর্পণ করিতে হইবে। তিনি যে সকল কার্য্য আমাদিগকে করিতে আজ্ঞা করিতেছেন, আমরা প্রাণপণে সেই সকল কার্য্য সমাধা করিব। তাঁহার আজ্ঞামত কার্য্য আমরা করিব। শাস্ত্রমুখে তিনি আমাদিগকে আদেশ দিতেছেন। শাস্ত্রই তাঁহার মুখ। আমরা শাস্ত্রানুযায়ী কর্ত্তব্যসকল পালন করিব। তিনি আমাদিগকে অশাস্ত্রীয় কার্য্য করিতে বলেন না। তিনি আমাদিগকে পাপকার্য্য করিতে বলেন না। তিনি আমাদিগকে সৎকার্য্যই করিতে বলেন। আমরা সেই সৎকার্য্য তাঁহার প্রীতির জন্য করিব। আমাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য নহে। তাঁহার প্রীতির জন্য যে কার্য্য হইবে, তাহা পুণ্যকার্য্য। আমাদিগের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য যে কার্য্য হইবে, তাহা পাপকার্য্য। যেখানে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি, সেখানে ভগবান্ নাই। যেখানে এই ইন্দ্রিয়তৃপ্তির আসক্তি নাই, সেখানেই ভগবান্। ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য কর্ম্ম করিলে, নিজের ভোগবিলাসের জন্য কর্ম্ম করিলে, তাহা ভগবানে অর্পিত হয় না; তাহা আমাদিগের ইন্দ্রিয়গণের শ্রীচরণে অর্পিত হয়। তাহা কামরিপুর, ক্রোধরিপুর ও লোভাদিরিপুর শ্রীচরণে অর্পিত হয়; সুতরাং তাহা ভগবানে অর্পিত হয় না। এইজন্য মুখে বলিতেছি ভগবানে অর্পণ করিলাম কিন্তু প্রাণে প্রাণে ইন্দ্রিয় ও রিপুগণকে চরিতার্থ করিলাম। তাই বলি, ঈশ্বরপ্রণিধান ছেলেখেলার জিনিস নয়। একটী ছেলেকে

একটী "খইয়ের মোয়া" দিয়া ভুলাইতে পার; কিন্তু ঈশ্বরকে ভুলাইতে পার না। তুমি মনে করিতেছ, তুমি বড় চালাক; কিন্তু ঈশ্বর তোমার চেয়ে বেশী চালাক। তাঁহাকে ফাঁকি দিবার যো নাই। তিনি আমাদের হৃদয়ের সব খবর রাখেন। চালাকি ফালাকি তাঁর কাছে চলিবে না। তুমি কালীঘাটে গিয়া, মা কালীকে সওয়া পাঁচ আনার ডালা দিয়া তোমার পাঁচ হাজার টাকার মোকদ্দমা জিতিতে চাও। মনে কর যে মা কালী বড় বোকা, তোমার নিকট অল্প কিছু খাদ্য পাইয়া ভুলিয়া যাইবে। তাইবলি সরল হও। কায়মনোবাক্যে সরল হও। সাধনরাজ্য—সরলতার রাজ্য। ইহা কুটিলতার রাজ্য নহে। ভগবান্ ভক্তের সরলতা চান। তিনি কুটিলতা চান না। তোমার চিত্ত যতদিন না সরল হইবে, তোমার চিত্ত যতদিন না সাত্ত্বিক হইবে—ততদিন তুমি ভগবানে কর্ম্ম অর্পণ করিবার যোগ্যতা লাভ কর নাই। তোমার ইন্দ্রিয় আসক্তি, তোমার বিষয় আসক্তি যতদিন প্রবল থাকিবে ততদিন তুমি ভগবানে কর্ম্মার্পণ করিবার যোগ্যতা লাভ কর নাই। তোমার চিত্ত যতদিন না আসক্তি ত্যাগ করিবে, তোমার যতদিন না বৈরাগ্যের উদয় হইবে, ততদিন তুমি ভগবানে কর্ম্মার্পণ করিবার অধিকারী হও নাই। ভগবানে কর্ম্মার্পণ করিতে হইলে, তোমার চিত্ত ভগবানের চিত্তে স্থাপন করিতে হইবে। তোমার অপবিত্র চিত্তকে কি করিয়া ভগবানের পবিত্র চিত্তে স্থাপন করিবে। তোমার চিত্তকে পবিত্র কর। চিত্তের মধ্যে যেন কোন আবর্জ্জনা বা ময়লা না থাকে। চিত্তের মধ্যে যেন বিষয় আসক্তি না থাকে। চিত্তের মধ্যে যেন কর্ম্মের ফলকামনা না থাকে। চিত্ত যেন শুদ্ধ ঈশ্বরপ্রীতির জন্যই কর্ম্ম করিতে পারে। চিত্ত যেন ঈশ্বর-প্রীতির জন্য কর্ম্ম করিয়া সুখী হয়। যখন তোমার চিত্তের এইরূপ অবস্থা হইবে, তখন তুমি তোমার চিত্তকে ভগবানের চিত্তে স্থাপন করিতে পারিবে। একবার চিত্তকে ভগবানে

ন্যস্ত করিয়া আবার যেন ফিরাইয়া লইও না। তুমি একবার যাহাকে কিছু দান কর পুনরায় সেই দানের দ্রব্য ফিরাইয়া লইতে পার না। তাই বলি, একবার চিত্ত ভগবানকে অর্পণ করিলে, আর তাহা ফিরাইয়া লইতে পার না। যদি ফিরাইয়া লও, তাহাহইলে, তোমার, পাপ হইবে। তাহাহইলে, তোমার ঘোর নরক হইবে। চিত্ত ভগবানে অর্পণ করিলে পর, সে চিত্ত আর তোমার থাকিবে না। সে চিত্ত ভগবানের হইবে। সে চিত্তের উপর তোমার কোন অধিকার থাকিবে না। তাহা ভগবানের সম্পূর্ণ অধিকারে আসিবে। তোমার চিত্তের উপর তোমার প্রারব্ধ কর্ম্মের সংস্কার আছে। তোমায় সেই প্রারব্ধ কর্ম্মানুযায়ী ভোগ করিতে হইবে। সুখের সময় সুখভোগ হইবে এবং দুঃখের সময় দুঃখভোগ হইবে। এই সুখ দুঃখ উভয়ই ভগবানের দান বলিয়া তোমায় বিনা আপত্তিতে ভোগ করিয়া যাইতে হইবে। তোমাকে মনে করিতে হইবে যে, তোমার মঙ্গলের জন্যই এই সুখ দুঃখ ভগবান্ তোমার নিকট প্রেরণ করিতেছেন। সুখভোগের সময় সুখে আসক্ত হইতে পারিবে না এবং দুঃখ আসিলে সেই দুঃখও বুক পাতিয়া সহ্য করিতে হইবে। এই সুখ দুঃখ উভয়ই ভগবানের দান মনে করিয়া সহ্য করিবার চেষ্টা কর। সহ্য করিতে শিক্ষা কর। এই সুখও ক্ষণিক আর এই দুঃখও ক্ষণিক। এই সুখও চিরস্থায়ী নয়, এই দুঃখও চিরস্থায়ী নয়। প্রকৃতির গতিই এইরূপ। কখনও বা সুখ আসিবে এবং কখনও বা দুঃখ আসিবে,—

"কেহ বা তোমারে মাল্য পরাইবে,
কেহ বা তোমারে পদ প্রহারিবে,
কিছুতেই চিত্ত-প্রশান্তি ভেঙ্গনা ;
সদাই আনন্দে রহিবে মগনা।"

ওঁ তৎ সৎ ওঁ। (স্বামী বিবেকানন্দ)

তাই বলি, অম্লানবদনে এই সুখ দুঃখ সমভাবে বহন কর।

"সমভাবে সুখ দুঃখ করিয়া বহন,
হে অর্জ্জুন! যেইজন ব্যথিত না হন,
অমরত্বলাভ তিনি করেন নিশ্চয়,
ইহলোকে পরলোকে নিত্যানন্দময়॥"

(গীতা, কুমারনাথ)

এইভাবে সাধন করিতে পারিলে আমরা ভগবানের অনুগ্রহ লাভ করি। ভগবান্ আমাদের অনুগ্রহ করেন—একথা সত্য। তবে তিনি যাকে তাকে অনুগ্রহ করেন না। প্রকৃত অনুগ্রহের পাত্রকে তিনি অনুগ্রহ করেন। এক পিতার ছয় পুত্র, তিনি সকল পুত্রকেই সমভাবে অনুগ্রহ করেন না। যে পুত্র পিতার আজ্ঞানুযায়ী কার্য্য করে, তিনি তাহাকেই অনুগ্রহ করিয়া থাকেন। আর যে পুত্র পিতার অবাধ্য, তিনি তাহাকে অনুগ্রহ করেন না। আমাদের পরম পিতাও সেইরূপভাবে অনুগ্রহ করেন। যে সাধক অলসতা ও বিলাসিতা ত্যাগ করিয়া, কর্ম্মের ফলকামনা ত্যাগ করিয়া, কেবল ভগবানের প্রীতির জন্য এবং সমভাবে সকল সুখ ও দুঃখ বহন করিয়া, নিজের কর্ত্তব্য-কার্য্যগুলি পূর্ণভাবে পালন করিয়া যায়, তিনি তাহাকেই অনুগ্রহ করেন। আর যে সাধক ভিতরে ভিতরে বিষয়াসক্তি রাখিয়া, বাহিরে লোকদেখান ধর্ম্মকার্য্য করে, ভগবান্ তাহাকে অনুগ্রহ করেন না বরং নিগ্রহ করেন। যে সাধককে ভগবান্ অনুগ্রহ করেন, তিনি সেই সাধকের ভোগের বস্তুগুলি ক্রমে ক্রমে সরাইয়া দেন। সমুদয় ভোগ্যবস্তু সরিয়া গেলে, নিশ্চিন্ত হইয়া সাধনার সুবিধা হয়। যত অধিক ভোগের দ্রব্য সম্মুখে থাকিবে, তত অধিক সাধনার বিঘ্ন হইবে। অনাদি-কাল হইতে আমাদের বিষয়বাসনা এত প্রবল হইয়াছে যে, সহজে এই আসক্তির হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারি না। বিষয় সম্মুখে থাকিলেই আমাদের

ইন্দ্রিয়গণকে আকর্ষণ করে। বিষয় সম্মুখে না থাকিলে, আমাদের ইন্দ্রিয়কে আকর্ষণ করে না। এই বিষয়ের আকর্ষণ বড় বড় যোগীর চিত্তকেও চঞ্চল করিয়া বিষয়পথে টানিয়া লইয়া গিয়াছে। ইন্দ্রিয়ের স্বাভাবিক গতিই বিষয়ের দিকে। নিরন্তর ও বহুকালযাবৎ এই বিষয়ের দিকে ধাবিত হইয়া, ইন্দ্রিয় অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে, এইহেতু ইন্দ্রিয়ের স্বাভাবিক গতি—এই বিষয়ের দিকে যাওয়া। ইন্দ্রিয়ের এই বাহ্যগতিকে ফিরাইয়া অভ্যন্তরদিকে লইয়া যাইতে হইবে। বাহ্যদিকে বিষয় ও অভ্যন্তরদিকে আত্মা। ইন্দ্রিয়গণকে এই বিষয় ছাড়াইয়া আত্মাতে সংলগ্ন করিতে হইবে। ইন্দ্রিয় বিষয়ে সুখ পায় বটে; কিন্তু সে সুখ ক্ষণিক, আর আত্মানন্দ চিরকালস্থায়ী। ইন্দ্রিয়কে বিষয় ছাড়ান অর্থাৎ বিষয়ের আসক্তি ছাড়ান চাই। যদি বিষয়ের আসক্তি ত্যাগ না হয়, তাহাহইলে, বনে গেলেও সাধনা হইবে না। নগরের মধ্যে আমাদের যেমন সন্দেশ, রসগোল্লায় আসক্তি থাকে; বনের মধ্যেও সেইরূপ বন্যজাত ফলাদিতে আসক্তি থাকিবে। সন্দেশ ও রসগোল্লার আসক্তি আমাদের যেরূপ অনিষ্ট করে, অরণ্যজাত ফলাদির আসক্তিও সেইরূপ অনিষ্টসাধন করে; এমন কি যদি তোমার একটী খড়িকা কাটীতেও আসক্তি থাকে তাহাও ক্রমে ক্রমে একটী বৃহৎ সংসার সৃজন করিবে। বিষয়াসক্তির কণামাত্র থাকিলে আত্মদর্শন হইবে না। মন একটা কিছু না পাইলে বিষয়াসক্তি ত্যাগ করিতে পারে না, এইহেতু মনকে আত্মার দিকে ফিরাইয়া দাও। মনে যত আত্মাসক্তি বৰ্দ্ধিত হইবে ততই বিষয়াসক্তি কমিয়া যাইবে। মনকে কোন কিছু না দিলে সে বিষয়াসক্তি ত্যাগ করিতে পারিবে না। প্রথম প্রথম একটু কষ্ট হইবে কিন্তু পরিশেষে মনকে যতই আত্মার দিকে লইয়া যাইবে ততই অফুরন্ত সুখ পাইবে, তখন বিষয়কে কাকবিষ্ঠাবৎ বোধ হইবে। তখন জগতের মান ও উপাধিকে অতি তুচ্ছবোধ হইবে। সংসারী

লোকেরা এই আত্মানন্দের আভাস পায় নাই, সেইজন্যই বিষয়ানন্দে ডুবিয়া থাকে। একবার আত্মানন্দের আভাসমাত্র পাইলেই ক্রমে আত্মানন্দ লাভের জন্য চেষ্টা আসিবে। যাহারা আদৌ আত্মানন্দ পায় নাই এবং বিষয়ানন্দে মগ্ন হইয়া আছে—তাহারা প্রথমে সৎসঙ্গ করিবে, করিতে করিতে আত্মানন্দের আভাস পাইবে। "ক্ষণমিহ সজ্জন সঙ্গতিরেকা ভবতি ভবার্ণব তরণে নৌকা" একমাত্র সজ্জন সঙ্গই ভবার্ণব পারের নৌকাস্বরূপ।

ক্লেশ-কর্ম্ম-বিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ ॥২৪॥

ক্লেশ, কর্ম্ম, বিপাক ও আশয় যাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, তিনিই ঈশ্বর। সাধারণ জীবের ক্লেশ, কর্ম্ম, বিপাক ও আশয় আছে, ঈশ্বরে তাহা নাই। অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ এই পাঁচটীকে ক্লেশ বলে। কর্ম্ম—শুভ এবং অশুভ। কর্ম্ম জন্য যে সুখ বা দুঃখরূপ ফল হয়, তাহাই বিপাক। সেই বিপাকের অনুরূপ বাসনা সকল আশয় অর্থাৎ কোন এক বিপাক অনুভূত হইলে সেই অনুভূতিজাত বাসনা সকল আশয়। ইহারা দুঃখের কারণ। ইহারা চিত্তে বর্ত্তমান থাকিয়া আমাদিগকে সুখ দুঃখ প্রদান করে। ইহারা আত্মাতে নাই সুতরাং আত্মার এইসকল ক্লেশ হওয়া অসম্ভব। তবে আত্মা যখন চিত্তে অভিমান করে তখন চিত্তের সুখ দুঃখে, সুখী ও দুঃখীর ন্যায় হয়। বস্তুতঃ আত্মার সুখ দুঃখ নাই আবার জড়চিত্তেরও সুখ দুঃখ নাই; তবে আত্মা চিত্তে অভিমান স্থাপন করিয়া যখন মনে করে, "আমি চিত্ত", "আমি শরীর", "আমি ইন্দ্রিয়", তখন আমরা সুখ দুঃখ বোধ করি নচেৎ বস্তুতঃ আমাদের কোন দুঃখ নাই। আমরা "সচ্চিদানন্দ"। আত্মার নিজের এ সকল সুখ দুঃখ নাই। চিত্তের সুখ দুঃখ আত্মাতে

আরোপ হয় মাত্র। যেমন যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকদিগের জয় হইলে, রাজার জয় হয় এবং সৈনিকদিগের পরাজয় হইলে রাজার পরাজয় হয় অথচ রাজা যুদ্ধক্ষেত্রে যাইয়া নিজে যুদ্ধকার্য্য করেন না; কেবল সৈনিক-দিগের জয় পরাজয়, রাজার উপর আরোপ হয় মাত্র; সেইরূপ চিত্তের সুখ দুঃখ আত্মায় আরোপ হয়। আত্মা প্রকৃতপক্ষে ফলভোক্তা না হইয়াও ফলভোক্তা হয়েন। এই সমুদয় ক্লেশ ও ফল যাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না "তিনিই ঈশ্বর"। জীবাত্মার এই বন্ধন আছে সুতরাং জীবাত্মা ঈশ্বর নহে। সাধন করিতে করিতে সাধনের পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্ত হইলে জীব "শিব" হইয়া যায়। জীব "ঈশ্বর" হইয়া যায়; কিন্তু জীব মুক্ত হইয়া ঈশ্বর সদৃশ হয়, আর ঈশ্বরের কোনও কালে বন্ধন ছিল না এবং তিনি সদামুক্ত পুরুষ। জীবকে ত্রিবিধ বন্ধন ছেদন করিয়া মুক্ত হইতে হইয়াছে, কিন্তু ঈশ্বরের কোনও কালে কোন বন্ধন ছিল না। যাঁহার এইরূপ বন্ধন অতীতকালে ছিল না, বর্ত্তমানকালে নাই, এবং ভবিষ্যৎকালেও থাকিবে না, তিনিই "ঈশ্বর"। ঈশ্বর-সত্ত্ব সম্পূর্ণ নিৰ্ম্মল আর জীব-সত্ত্ব মলিন। যাহার সত্ত্ব যত অধিক নির্ম্মল, তাহার ঐশ্বর্য্যও তত অধিক। যাঁহার ঐশ্বর্য্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অর্থাৎ যাঁহা হইতে অধিক ঐশ্বর্য্য আর কাহারও নাই, হয় নাই এবং হইবে না—তিনিই "ঈশ্বর"। জীব সাধন না করিলে ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হয় না; কিন্তু ঈশ্বরের কোন কালে সাধনের আবশ্যক হয় নাই এবং তিনি সাধন করেন নাই। তাঁহার ঐশ্বর্য্য স্বাভাবিক। সাধন করিতে করিতে জ্ঞানের উদয় হয়। যে যত অধিক সাধন করে, তাহার জ্ঞানও তত অধিক হয়। যাহার জ্ঞান সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, যাঁহা হইতে অধিক জ্ঞান আর কাহারও নাই—তিনিই "ঈশ্বর"। জীব সাধন দ্বারা জ্ঞানলাভ করে। ঈশ্বরকে সাধন করিতে হয় নাই। তাঁহার জ্ঞান স্বাভাবিক।

ঈশ্বর যে কি বস্তু তাহার ধারণা করা উচিত। ঈশ্বরকে চিন্তা

করিতে হইলে, ঈশ্বর বিষয়ে কিছু জ্ঞান থাকা আবশ্যক। সাধারণতঃ সাধনা দুই প্রকার, সাকার ও নিরাকার। আগে সাকার সাধনা তৎপরে নিরাকার সাধনা। কোন অবলম্বন লইয়া যে সাধনা, তাহা সাকার সাধনা; আর সর্ব্বপ্রকার অবলম্বন ত্যাগ করিয়া যে সাধনা, তাহা নিরাকার সাধনা। হিন্দুরা সাকার সাধনাও করে এবং নিরাকার সাধনাও করে। উচ্চ অবস্থা প্রাপ্তি ভিন্ন নিরাকার সাধনা হয় না। সম্প্রজ্ঞাত-সমাধি পর্য্যন্ত সাকার সাধনা। সম্প্রজ্ঞাত-সমাধির পর নিরাকার সাধনা করিয়া সাধকেরা কৈবল্য প্রাপ্ত হন। হিন্দুরা সাকার মূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া সাধন করে। এই মূর্ত্তি, মাটীর তৈয়ারীও হয় এবং পাথরের তৈয়ারীও হয়, গাছপালাও হইতে পারে কিম্বা কোন চিত্রপটও হইতে পারে। এই মূর্ত্তি, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ, রস বা শব্দাদি অবলম্বন করিয়াও হইতে পারে। প্রথমে বাহিরের চক্ষু দ্বারা দর্শন করিয়া অভ্যাস করিতে হয়। যেমন "শ্রীকৃষ্ণের রূপ"। অনবরতঃ চক্ষু দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ-রূপ দর্শন করিতে করিতে সেই রূপ চিত্তে অঙ্কিত হইয়া যায়, যখন সেই রূপ চিত্তপটে অধিকক্ষণ পর্য্যন্ত ধরিয়া রাখিতে পারিবে, তখন বাহিরের রূপ ত্যাগ করিয়া ভিতরে চিত্তে প্রতিষ্ঠিত রূপের ধ্যান করিতে পারিবে। চিত্তমধ্যে রূপের সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠা হইলে আমরা সহজে ধ্যান করিতে পারি। আমাদের চিত্ত চঞ্চল, এইজন্য চিত্তে সহজে এই রূপধ্যান প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি না। যাহার চিত্ত যত অধিক মলিন, তাহার চিত্ত তত অধিক চঞ্চল, সুতরাং সেই সাধক ততই বাহিরের মূর্ত্তির রূপকে চিত্তে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে না। যাহার চিত্ত যত অধিক নির্ম্মল, সে তত অধিকক্ষণ এই রূপকে মানসপটে স্থির রাখিয়া চিন্তা করিতে পারে। তাহার সিদ্ধিও তত শীঘ্র হয়। চিত্ত-স্থিরতাই আমাদের সিদ্ধি। যার চিত্ত যত অধিক স্থির হইয়াছে সে তত অধিক সিদ্ধিলাভ করিয়াছে। চিত্তস্থৈর্য্যই সকল-জাতীয় সকল

সাধনার মূল উদ্দেশ্য। রূপ, রস বা শব্দাদি কোনও একটী বিষয় মানসপটে অঙ্কিত করিয়া আমরা চিন্তা বা ধ্যান করিতে পারি। তাহাতেই চিত্ত স্থির হইবে। মানসপটে আমরা রূপ, রস বা শব্দাদির যে সূক্ষ্মমূর্ত্তি চিন্তা করি তাহাও মূর্ত্তি, তবে তাহা বাহিরের ন্যায় স্থূলমূর্ত্তি নয়। এইরূপ সূক্ষ্মমূর্ত্তি মানসপটে অঙ্কিত করিয়া ধ্যান করিলেও তাহার সাকার সাধনাই হয়, তাহার নিরাকার সাধনা হয় না; কারণ তাহাতে রূপ, রস বা শব্দাদির সূক্ষ্মমূর্ত্তির অবলম্বন আছে। জগতের অনেক জাতি এইরূপ মানসপটে সূক্ষ্ম মূর্ত্তি অবলম্বন গ্রহণ করিয়া ধ্যান করে। তাহারা ইহাকে নিরাকার উপাসনা বলে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহারাও সাকার সাধক। প্রকৃতির চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের কোন একতত্ত্ব অবলম্বন করিয়া সাধনা করিলে, তুমি সাকার সাধক। প্রকৃতির চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের মধ্যে তুমি স্থূল ক্ষিতি, অপ্ বা তেজাদির সাধনা কর বা সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়, মন বা বুদ্ধ্যাদির সাধনা কর—এ সকলই বিষয়—এ সকলই মূর্ত্তি, অতএব তুমি মূর্ত্তি হইতে অব্যাহতি পাইলে কই? যতক্ষণ তোমার মানসপটে মূর্ত্তি থাকিবে ততক্ষণ তুমি মূর্ত্তির উপাসক, ততক্ষণ তুমি সাকার উপাসক। এই সাকার উপাসনা করিতে করিতে যখন খুব অগ্রসর হইবে, তখন তোমার সমাধি হইবে; ইহাকে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলে। এই সময় চিত্ত খুব পরিষ্কার হয়। চিত্ত মল-বিহীন হয়, চিত্তে বিষয়াসক্তি আদৌ থাকে না—পরবৈরাগ্য লাভ হয়। যে সাধক এই অবস্থা লাভ করিয়াছেন, তিনি নিরাকার সাধনার উপযোগী। তাহা না হইলে, তুমি নিরাকার সাধকের ভান করিলে, তোমার কোন লাভ হইবে না। এই সকল কারণে, সাধনা করিতে হইলে, ঈশ্বর বিষয়ে কিছু জ্ঞান থাকা আবশ্যক। যে পুরুষের ঐশ্বর্য্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক; যে পুরুষের জ্ঞান সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, যে পুরুষের সর্ব্বজ্ঞতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক—তিনিই ঈশ্বর। ঈশ্বর প্রধান পুরুষ নহেন। তিনি প্রধান

ও পুরুষ দ্বারা নির্ম্মিত। ঈশ্বর একটী উপাধি। এই ঈশ্বরের কখনও কোন বন্ধন হয় নাই এবং তাঁহাকে কখনও সাধনদ্বারা বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে হয় নাই। এই ঈশ্বরকে ঐশ্বর্য্য, জ্ঞান ও সর্ব্বজ্ঞতা উপার্জ্জন করিতে হয় নাই। ইহা তাঁহাতে স্বাভাবিক। এই ঈশ্বর কখনও অনির্ম্মল হন নাই। তিনি সর্ব্বদা নির্ম্মল। এই সদা-নির্ম্মল, সর্ব্বৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন, সর্ব্বজ্ঞান-সম্পন্ন ও সর্ব্বজ্ঞতা-সম্পন্ন ঈশ্বরের ভাব মনে প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। তোমায় সেই ইষ্টমূর্ত্তিকে অবলম্বন করিয়া এইরূপ ঈশ্বরের ভাবে ভাবান্বিত হইতে হইবে। সাকার পূজা নিন্দনীয় নয়। আগে সাকার সাধনায় উত্তীর্ণ না হইলে নিরাকার সাধনা হয় না। একেবারেই গাছের আগ্‌ডালে লাফাইয়া উঠা যায় না। গাছের গোড়া অবলম্বন করিয়া উঠিতে হয়।

তত্র নিরতিশয়ং সর্ব্বজ্ঞবীজম্ ॥ ২৫ ॥

এই ঈশ্বরে সর্ব্বজ্ঞতার বীজ নিরতিশয়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। সাধনা করিতে করিতে আমাদের অতীন্দ্রিয় জ্ঞান হয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াতীত বিষয়-জ্ঞান হয়। চক্ষু, কর্ণ ও নাসিকাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়ের স্থূলজ্ঞান হয় মাত্র, কিন্তু সূক্ষ্মজ্ঞান হয় না। এই অদৃশ্য আকাশের মধ্যে কত শত রূপ ভাসিয়া বেড়াইতেছে, তাহা আমরা স্থূল চক্ষু সাহায্যে দেখিতে পাই না। সাধন করিতে করিতে সূক্ষ্ম চক্ষু, সূক্ষ্ম কর্ণ, সূক্ষ্ম নাসিকাদির আবির্ভাব হয়। তখন সাধক কত রকম দেবদেবীর মূর্ত্তি ও জ্যোতি প্রভৃতি দর্শন করিতে পান, কত রকম দিব্য আস্বাদ ও দিব্য গন্ধ গ্রহণ করিতে পান। এই সকল দিব্য রূপ, রস ও গন্ধ সর্ব্বদাই আকাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তোমার উপযুক্ত সূক্ষ্ম চক্ষু, কর্ণ ও নাসিকা হইলেই তাহাদিগকে দেখিতে, শুনিতে ও আঘ্রাণ করিতে পারিবে।

এইপ্রকারে ক্রমে ক্রমে যতই সাধনায় অগ্রসর হইতে থাকিবে, ততই প্রকৃতির সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর, ও সূক্ষ্মতম সৃষ্টি দর্শন করিতে পারিবে এবং ক্রমে ক্রমে তোমার সর্ব্বজ্ঞতা শক্তিরও বৃদ্ধি হইবে। উচ্চ সাধকদের সকলেরই কিছু না কিছু সর্ব্বজ্ঞতা শক্তি আছে; তবে কাহারও কম এবং কাহারও বেশী। যে পুরুষে এই সর্ব্বজ্ঞতা শক্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক—তিনিই ঈশ্বর।

সাধন না করিলে, সর্ব্বজ্ঞতা শক্তি পাওয়া যায় না। বিনা সাধনে জ্ঞান হয় না। আমাদের চিত্ত, রজঃ ও তমোগুণে পূর্ণ। যে চিত্ত রজঃ ও তমোগুণে পূর্ণ, তাহাতে জ্ঞান বর্দ্ধিত হয় না। সাত্বিক চিত্তে জ্ঞান বর্দ্ধিত হয়। যখন চিত্ত পূর্ণ সাত্বিক হয়, তখন পূর্ণজ্ঞান প্রকাশ পায়। সত্বগুণ প্রকাশ করে। সাধনা দ্বারা রজঃ ও তমোমল দূরীভূত হইলে, চিত্তে সত্বগুণের আধিক্য হয় ও চিত্তস্থৈর্য্য সম্পাদিত হয়, তখন জ্ঞান প্রকাশিত হয়। যাহার চিত্ত যত অধিক সাত্বিক ও স্থির, তাহার জ্ঞানও তত অধিক এবং সে তত অধিক সুখী। যাহার চিত্তে সত্বগুণ কম, তাহার জ্ঞানও কম এবং সে কম সুখী। চিত্তে যতই সত্বগুণের বৃদ্ধি হইবে, ততই চিত্তপ্রসাদ বা আত্মপ্রসাদ লাভ হইবে। সাধন করিতে করিতে, এইরূপভাবে, চিত্ত পরিষ্কার কর, তুমি মুক্ত হইয়া যাইবে। মুক্ত হইবার পর জগতের কার্য্য ভাল করিয়া করিতে পারিবে। নিজে মুক্ত হইয়া অপরকে মুক্তির পথ দেখাইয়া দিবে। একপ্রকার সাধক আছেন, তাঁহারা মুক্তির পর চিরবিশ্রান্তি লাভ করিবার ইচ্ছা করেন, এরূপ সাধক দেহপাতের পর আর দেহ গ্রহণ করেন না। আবার আর একপ্রকার সাধক আছেন, যাঁহারা দেহ-পাতের পর লোকহিতকর কার্য্যের জন্য পুনরায় দেহধারণ করেন এবং পুনরায় নূতন চিত্ত-নির্ম্মাণ করিয়া, সেই চিত্তানুযায়ী কার্য্য করেন। ইহারা আসক্তিবিহীন হইয়া কার্য্য করেন। আমাদের ন্যায় ইহাদের

কার্য্যে কোন আসক্তি নাই; সুতরাং ইঁহাদের কার্য্যে ইঁহারা বন্ধন প্রাপ্ত হন না। ইঁহারা স্বেচ্ছায় জন্মগ্রহণ করেন এবং স্বেচ্ছায় অভিলষিত কাল যাবৎ জগতে পরিভ্রমণ করেন ও কার্য্যশেষে দেহত্যাগ করেন। ইঁহাদিগকে "নির্ম্মাণ-চিত্ত যোগী" বলে। ইঁহারা আমাদের ন্যায় চিত্তদ্বারা বদ্ধ হন না।

পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ ॥ ২৬ ॥

সেই ঈশ্বর সর্ব্বগুরুর গুরু এবং তিনি সর্ব্বকালেই বর্ত্তমান আছেন। অপরাপর গুরুগণ কালের দ্বারা অবচ্ছিন্ন; কিন্তু ঈশ্বর কালের দ্বারা অবচ্ছিন্ন নহেন। তিনি সর্ব্বকালেই ছিলেন, এখনও আছেন এবং ভবিষ্যতেও থাকিবেন।

তস্য বাচকঃ প্রণবঃ ॥ ২৭ ॥

তাঁহার বাচক প্রণব।

প্রণবের বাচ্য ঈশ্বর এবং ঈশ্বরের বাচক প্রণব বা ওঁ। তাঁহার অনন্ত সৃষ্টি। এই অনন্ত সৃষ্টির মধ্যে তিনি অনন্তভাবে ক্রীড়া করিতেছেন। মনুষ্যও যেমন তাঁহার সৃষ্টি; ছাগল, গরুও তদ্রূপ তাঁহার সৃষ্টি। মনুষ্যের মধ্যে তিনি মনুষ্যরূপে ক্রীড়া করেন এবং ছাগল ও গরুর মধ্যে তিনি ছাগল ও গরুরূপে ক্রীড়া করেন। স্থূলসৃষ্টির মধ্যে তিনি যেমন আছেন, আবার সূক্ষ্মসৃষ্টির মধ্যেও তিনি তেমন আছেন। আমরা স্থূলসৃষ্টি, তাই তিনি স্থূল আকার গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করেন। স্থূলমনুষ্যলোকে তিনি যেমন আছেন, সূক্ষ্মদেবলোকেও তিনি তেমন আছেন। স্থূলমানব সহজে সূক্ষ্মের ধারণা করিতে পারে না। তাই স্থূল অবলম্বনে আমাদের ঈশ্বরপূজা। তাই স্থূলদ্রব্য

প্রদানে আমরা তাঁহার সন্তোষ সাধন করি। তিনি সর্ব্বস্থলেই বর্ত্তমান আছেন। তিনি মনুষ্যমধ্যেও আছেন তাই মানুষের সেবা করিয়া আমরা ভগবৎসেবা হইল বলিয়া মনে করি। তিনি গরুর মধ্যেও আছেন তাই গোসেবা করিয়া আমরা ভগবানের সেবা করিলাম বলিয়া মনে করি। তিনি বৃক্ষের মধ্যেও আছেন, তাই বৃক্ষকে ভগবান্ জ্ঞান করিয়া আমরা বৃক্ষের সেবা করিয়া থাকি। আমরা স্থূল অন্ন ভালবাসি, তাই তাঁহাকে স্থূল অন্ন নিবেদন করি। আমরা স্থূলশব্দ ভালবাসি, তাই স্থূলশব্দ দ্বারা তাঁহাকে আহ্বান করি। ভগবান্ সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর এবং সূক্ষ্মতম হইতেও অধিক সূক্ষ্ম। আমরা এই স্থূলশব্দদ্বারা সাধন করিয়া, এই স্থূলশব্দের অর্থ চিন্তা করিয়া, আমাদের চিন্তাশক্তির মধ্যে ক্রমশঃ সূক্ষ্মবিষয় ধারণা করিবার শক্তিকে পরিবর্দ্ধিত করি। সূক্ষ্ম ঐশ্বরিকভাব গ্রহণ করিবার শক্তি আমাদের নাই। আমাদের চিত্ত স্থূলবিষয় গ্রহণ করিতে এতদূর অভ্যস্ত হইয়াছে, যে, সে আর সূক্ষ্মবিষয় গ্রহণ করিতে পারে না। এইজন্য স্থূল মন্ত্রশব্দের উচ্চারণে ও সেই মন্ত্রার্থ চিন্তা করিতে করিতে আমাদের স্থূলে আকর্ষণ কমিয়া যায় ও ক্রমশঃ সূক্ষ্মের ধারণাশক্তি বর্দ্ধিত হয়। সূক্ষ্মের ধারণাশক্তি না হইলে, সূক্ষ্ম ভগবদ্ভাব গ্রহণ করা অসম্ভব। ভগবানের ধ্যান করিতে হইলে, ভগবদ্ভাবে ভাবিত হইতে হয়। সূক্ষ্ম ভগবানের ধ্যানের জন্য, সূক্ষ্ম ভগবদ্ভাবে ভাবিত হইবার জন্য, আমরা স্থূলশব্দরূপ মন্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করিয়া থাকি। ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে করিতে ও তাহার অর্থ চিন্তা করিতে করিতে, আমাদের চিত্ত পরিষ্কার হয় এবং আমরা সূক্ষ্মধ্যানের অধিকারী হই। শুদ্ধ ভগবদ্ভাব জানিলেই জীবন কৃতার্থ হয় না। ভগবদ্ভাবে নিমগ্ন হইতে হইবে। ভগবদ্ভাবে তন্ময় হইতে হইবে, তখন জীবন কৃতার্থ হইবে। এই ভগবদ্ভাবে তন্ময় হইতে হইলে, ওঁ মন্ত্রকে অবলম্বন করিয়া জপ ও ধ্যান করিতে হইবে। ওঁ = অ +

উ+ম্। অ=পালনশক্তি—বিষ্ণু, উ=সংহারশক্তি—শিব এবং ম্=সৃজনশক্তি—ব্রহ্মা। এই পালন-শক্তি বিষ্ণু, সংহার-শক্তি শিব ও সৃজন-শক্তি ব্রহ্মা, যাঁহার দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে, তিনিই ঈশ্বর। এই প্রণবকে শ্রেষ্ঠমন্ত্র বলা হইয়াছে বলিয়া অন্যান্য মন্ত্রকে নিকৃষ্ট বলা হইল না, তবে প্রণব মন্ত্র সকলের শীর্ষস্থানীয়। নিম্নশ্রেণীর সাধক এই প্রণব মন্ত্রের অধিকারী নহেন। উচ্চশ্রেণীর সাধকেরাই এই প্রণবমন্ত্রের অধিকারী। সাধক যখন ইন্দ্রিয়াদি জয় করিয়া চিত্ত শুদ্ধ করিতে সক্ষম হইবেন, তখন তিনি প্রণবের অধিকারী। সাধক যখন নির্ম্মলচিত্ত হইয়া ব্রাহ্মণ হইবেন, তখন তিনি প্রণবের অধিকারী। এইজন্য সাধারণ লোকে বলে,—ব্রাহ্মণ ভিন্ন প্রণব জপ নিষেধ। ইহার অর্থ—গলায় পৈতাওয়ালা ব্রাহ্মণ নহে; কিন্তু ব্রাহ্মণের গুণবিশিষ্ট মানব। যদি পৈতাওয়ালা ব্রাহ্মণ সন্তান ব্রাহ্মণের গুণপ্রাপ্ত না হইয়া চণ্ডালের গুণপ্রাপ্ত হয়, তাহাহইলে, সেও প্রণবের অধিকারী নহে। আর যদি চণ্ডালের সন্তান, চণ্ডালের গুণপ্রাপ্ত না হইয়া ব্রাহ্মণের গুণপ্রাপ্ত হয়, তাহাহইলে, সেও প্রণবের অধিকারী হয়। যাহার চিত্ত যত অধিক পরিষ্কৃত হইয়াছে, যাহার চিত্ত যত অধিক স্থির হইয়াছে, যাহার চিত্ত যত অধিক রজঃ ও তমোহীন হইয়াছে, যাহার চিত্ত যত অধিক সদ্‌গুণ-বিশিষ্ট হইয়াছে, সে তত অধিক ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, সে তত অধিক প্রণবের (ওঁ) জপের অধিকারী হইয়াছে।

মন্ত্রজপ করিলে ইষ্টদেবতা তুষ্ট হন ও আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহ করেন—এইটী আমাদের ধারণা, কিন্তু ইষ্টদেব আমাদের প্রতি চির-প্রসন্ন এবং তিনি আমাদিগকে চিরকালই অনুগ্রহ করিতেছেন, কিন্তু আমরা তাঁহার সেই চিরপ্রসন্নতার ধারণা করিতে পারি না। মলিন চিত্তে, ইষ্টের প্রসন্নভাবের ধারণা হয় না। চিত্ত যতই পরিষ্কার হইবে, ততই তাঁহার প্রসন্নভাবের ধারণা হইবে। জপ করিতে করিতে যখন

মনে আনন্দের উৎপত্তি হইবে, তখন বুঝিবে যে, ইষ্টদেব প্রসন্ন হইয়াছেন। ইষ্টদেবের প্রসন্নতা আমরা মনের মধ্যে অনুভব করিতে পারি। জপ করিয়া নিজের মন প্রসন্ন হইলেই বুঝিতে হইবে যে, ইষ্টদেব প্রসন্ন হইয়াছেন। জপ করিয়া যাহারা মনে আনন্দ পায় না, তাহাদের মন মলিন ও চঞ্চল। মনকে পরিষ্কার কর—মনে সুখ পাইবে। বিষয়াসক্তিই মনের মলিনতা। যাহার বিষয়াসক্তি যত কমিয়াছে; তাহার মন তত অধিক পরিষ্কার হইয়াছে এবং তাহার ঈশ্বরাসক্তিও তত অধিক বর্দ্ধিত হইয়াছে। বিষয়াসক্তি যতই কমিবে, ঈশ্বরাসক্তি ততই বর্দ্ধিত হইবে এবং অবশেষে বিষয়াসক্তি শূন্য হইলে, ঈশ্বরাসক্তি পূর্ণ হয় এবং তখন ঈশ্বরে মন একেবারে নিমগ্ন হইয়া সমাধি সাধিত হয়।

যাহার সহিত অধিকদিন বসবাস হয়, সে আমাদের আপনার হয় ও আপনার লোকও যদি দূরদেশে বাস করে, তাহাহইলে, সেও পর হইয়া যায়। বহুকাল একসঙ্গে বসবাসের ফল এইরূপ হয়। আমরা বহুকাল বিষয় লইয়া বসবাস করিয়াছি, এইজন্য বিষয় আমাদের আপনার হইয়াছে। আমরা বহুকাল ঈশ্বর হইতে দূরে অবস্থান করিতেছি, এইজন্য ঈশ্বর আমাদের পর হইয়াছেন। আবার ঈশ্বরের নিকট বাস করিবার চেষ্টা কর, তিনি তোমার আপনার হইবেন। ঈশ্বরের নিকট বাস করা অর্থাৎ মনে মনে প্রণব জপ করা। কঠোর উৎসাহ ও উদ্যমের সহিত মন্ত্র জপ কর, তিনি তোমার আপনার হইয়া যাইবেন। প্রথম প্রথম জপ ভাঙ্গিয়া যাইবে, তাহাতে নিরাশ হইও না। ধৈর্য্য ধরিয়া বহুকাল পর্য্যন্ত, নিরন্তর অর্থভাবনার সহিত জপ কর—তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হইবে। বহুকাল এইরূপ জপ ও ধ্যান লইয়া থাকিলে তোমার চেতনার উদয় হইবে—ইহাকে প্রত্যক্-চেতনাধিগম বলে। যখন তোমার এইরূপ অবস্থা হইবে, তখন বিষয়ভোগ আর তোমার

সাধনার প্রতিবন্ধকতা করিতে পারিবে না; তখন তোমার বিষয়ভোগে অরুচি হইবে; তখন বিষয়ভোগে কষ্ট হইবে এবং ইষ্টের ধ্যান ও সমাধি লইয়া থাকিতে ভাল লাগিবে এবং তখন তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া সাধন করিতে পারিবে। বিষয়ের প্রতিকূলে এবং চৈতন্যের অনুকূলে যখন চেতনা ধাবিত হয়, তখন তাহাকে প্রত্যক্-চেতনা কহে।

ওঁকার জপই শ্রেষ্ঠ জপ। ওঁকার জপে আমাদের শারীরিক চাঞ্চল্য আদৌ হয় না। শরীর নিশ্চল ও স্থির না হইলে ধ্যান বা সমাধির সুবিধা হয় না। ব্যঞ্জনবর্ণ উচ্চারণে আমাদের দন্ত, ওষ্ঠ ও কণ্ঠ প্রভৃতির সাহায্য গ্রহণ করিতে হয় অর্থাৎ ঐ সকল স্থানের ক্রিয়া হয়। ক্রিয়া হইলেই ঐ সকল স্থান চঞ্চল হয়। মানসিক জপে ঐ সকল স্থানের ক্রিয়া হয় না বটে; কিন্তু অভ্যন্তরে মানসিক স্রোতের একটা ক্রিয়া ও চঞ্চলতা থাকে। ওঁকার জপে ঐ সকল চঞ্চলতা থাকে না। ওঁকার জপ একতানভাবে খুব সহজে হয়—অন্য জপ একতানভাবে হয় না। স্বরবর্ণকে যেমন একতানভাবে উচ্চারণ করিতে পারি, ব্যঞ্জনবর্ণকে সেভাবে পারি না, ব্যঞ্জনবর্ণ উচ্চারণ করিতে অনেক বাক্‌শক্তির ব্যয় হয়। ওঁকারের শেষে ম্ আছে, তাহা আনুনাসিক ম্‌কারের শব্দ তাহাও বিনা প্রযত্নে একতানভাবে অতি সহজে উচ্চারিত হয়। এইজন্য চিত্তকে একতান করিবার জন্য ওঁ শব্দ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই শব্দ উচ্চারণ জন্য দন্ত বা ওষ্ঠাদির সাহায্যের অপেক্ষা নাই। এই সকল কারণে ওঁকার জপ—সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জপ।

তজ্জপস্তদর্থভাবনম্ ॥ ২৮ ॥

সেই ওঁকারের জপ ও তাহার অর্থ চিন্তা করিবে।

সাধারণ মূর্খ গুরুগণ, এই জপ কেন করে, কাহার উদ্দেশে করে

এবং করিলেই বা কি ফল হয়, তাহা আদৌ জানে না। অর্থ না জানিয়া, অর্থের ভাবনা না করিয়া মন্ত্র জপ করিলে, ময়না পাখীর ন্যায় জপ করা হয় বটে কিন্তু জপের ফল হয় না। এই জপ কিরূপে করিতে হয় অনেকে জানে না। অনেকে গঙ্গারঘাটে বসিয়া হাতে মালা ঘুরাইতেছে, আর মুখে আর একজনের সঙ্গে পরনিন্দা ও পরকুৎসার আলোচনা করিতেছে। এরূপ জপে ফল হয় না। মন্ত্রের অর্থ-ভাবনাই জপের প্রধান উদ্দেশ্য। হাতে মালা ঘুরাইয়া যাওয়া কঠিন নহে। মন্ত্রের অর্থভাবনা না করিলে কিছুই হইবে না। মূর্খ গুরুগণ শিষ্যকে বীজমন্ত্র, প্রণামমন্ত্র বা ধ্যানমন্ত্র কোন মন্ত্রেরই অর্থ বলিয়া দেয় না। সম্ভবতঃ তাহারা ইহা নিজেরাই জানে না। মূর্খ গুরুদ্বারা দীক্ষিত অনেক শিষ্যকে আমরা এবিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিয়াছি। কাহারও কাহারও প্রায় ৩০।৪০ বৎসর দীক্ষাকার্য্য হইয়া গিয়াছে এবং এযাবৎ সে তাহার গুরুকে তার ন্যায্য প্রাপ্যও দিয়া আসিয়াছে; কিন্তু তাহারা এযাবৎ শিষ্যকে এই সকল মন্ত্রের অর্থ বলিয়া দেয় নাই, এমন কি অনেক গুরু এই সকল মন্ত্রের বিশুদ্ধ উচ্চারণ পর্য্যন্ত করিতে পারে না এবং শিষ্যদেরও সেইরূপ অশুদ্ধ জ্ঞান দিয়াছে। অনেক শিষ্য "ধ্যায়েন্নিত্যং" এইস্থলে "ধ্যায়েত্যং" বলিয়া কার্য্য সমাধা করে।

কেহ কোন শব্দ উচ্চারণ করিলে সেই শব্দ শ্রবণ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই সেই শব্দের অর্থ বুঝিতে পারি এবং সেই বিষয়ের জ্ঞান হয়। মনে কর' কেহ "গরু" এই শব্দ উচ্চারণ করিল এবং আমরাও তাহা শুনিতে পাইলাম। আমরা যে শব্দমাত্রটী শুনিয়া ক্ষান্ত হইলাম, তাহা নহে। গরু শব্দ শুনিয়া আমাদের মনে গরুর চারি পা, দুইটী শিং প্রভৃতি অঙ্গাবয়ব যুগপৎ উদিত হইল। সেইরূপ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া মন্ত্রের অর্থ ও জ্ঞান হওয়া আবশ্যক। পাখীতেও শব্দ করে। আমরা পাখীর শব্দমাত্র শুনি; কিন্তু পাখী কি বলিতেছে সেই বিষয়ের জ্ঞান

আমাদের হয় না। যাহারা এইরূপে মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া, মন্ত্রের শব্দমাত্র শ্রবণ করে অথচ সেই শব্দের অর্থজ্ঞান হয় না—তাহাদের জপ করা বৃথা। মন্ত্রের অর্থজ্ঞান হওয়াই সর্ব্বাপেক্ষা আবশ্যক। মন্ত্রার্থ ইষ্ট-সম্বন্ধীয় বিষয় চিন্তা করিতে করিতে সেই ইষ্টের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা হয়, সেই ইষ্টের সহিত আমাদের ঘনিষ্ঠতা হয়। এই ঘনিষ্ঠতা ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া আমরা ইষ্টের ভাবে ভাবান্বিত হইয়া যাই এবং পরিশেষে সেইভাবে মগ্ন হইয়া তন্ময় অবস্থা প্রাপ্ত হই। জপ করিতে করিতে ধ্যান হয় এবং ধ্যান করিতে করিতে তন্ময় অবস্থা হয়। এই তন্ময় অবস্থাই সমাধি। এই তন্ময় অবস্থা কাহারও খুব গাঢ় এবং কাহারও বা পাতলা। এই তন্ময় অবস্থা কাহারও অনেকক্ষণ থাকে, কাহারও বা অল্পক্ষণ থাকে। যাহার চিত্তে যত অধিক বিক্ষেপ, তাহার তন্ময় অবস্থা তত অল্পক্ষণ থাকে। যাহার চিত্তে রজোগুণ যত অধিক, যাহার চিত্ত যত অধিক চঞ্চল, তাহার এই তন্ময় অবস্থা তত অল্পক্ষণ স্থায়ী হয়।

উত্তমরূপে ঈশ্বরের ধারণা না হইলে, ইষ্টের ধারণা হয় না। প্রত্যেকের ইষ্টদেবতা সেই একই ঈশ্বর। শ্রীকালীও যিনি, শ্রীকৃষ্ণও তিনি আর শ্রীমহেশ্বরও তিনি। সেই একই ঈশ্বর, নানারূপে ভক্তহৃদয়ে বিরাজ করেন। যিনি হিন্দুর ঈশ্বর, তিনিই মুসলমানের ঈশ্বর এবং তিনিই খ্রীষ্টান ও অন্যান্য সকল জাতির ঈশ্বর। ঈশ্বর এক, কেবল মূর্ত্তি স্বতন্ত্র, যাহার যে মূর্ত্তি ভাল লাগে সে সেই মূর্ত্তি লইয়া সাধনা করিয়া সেই একই ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হয়। সাধকগণ যতক্ষণ নিম্ন অবস্থায় থাকে, ততক্ষণ তাহাদের মধ্যে ভেদদর্শন, ততক্ষণ তাহাদের মধ্যে বাদবিসম্বাদ; কিন্তু উচ্চাবস্থায় উঠিলে তাহারা নিজেদের ভ্রম বুঝিতে পারে এবং সকল বাদবিসম্বাদেরও শেষ হয়। যত গোলমাল, যত মারামারি, যত কাটাকাটি—সব নীচে। উপরে সেই এক পরম শান্ত অবস্থা। তাহাই বৈকুণ্ঠধাম। সেখানে কাহারও কিছু কুণ্ঠা নাই।

এই জপ অভ্যাস করিতে হইলে শ্বাসে শ্বাসে করিতে হয়। শ্বাসে শ্বাসে কিরূপে জপ অভ্যাস করিতে হয়, তাহা গুরুর নিকট জানিয়া লইতে হয়। অশিক্ষিত গুরুরা এসব বিষয়ে কিছু জানে না। সেইজন্য শিক্ষিত গুরুর নিকট এই সকল বিষয় শিক্ষা করিবে। পুস্তক পাঠ করিয়া কোনরূপ শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া বা প্রাণায়ামাদি করিতে যাইও না। এইরূপ পুস্তক পাঠ করিয়া এবং অশিক্ষিত গুরুর নিকট প্রাণায়াম-পদ্ধতি শিক্ষা করিতে গিয়া অনেকে দুশ্চিকিৎস্য পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছে। এরূপ ভাবের অনেকগুলি রোগী আমাদের নিকট আসিয়াছে। এইরূপ প্রাণায়ামের ফলে প্রায়ই হৃদ্‌পিণ্ডের পীড়া হয়। বুক ধড়্‌ফড়্‌ করে ও অন্যান্য কষ্টকর লক্ষণ উপস্থিত হইয়া তাহাদের সারাজীবন কষ্টপ্রদান করে। কাহারও বা অন্য প্রকার কঠিন দুশ্চিকিৎস্য ফুস্‌ফুস্‌পীড়া হয়। কাহারও বা মস্তিষ্কের রক্তবহানালী ছিঁড়িয়া গিয়া অকস্মাৎ মৃত্যু উপস্থিত হয়। এইজন্য শ্বাসপ্রশ্বাসকে নিয়মিত করিতে হইলে, গুরুর সাক্ষাৎ উপদেশ আবশ্যক। অনেক স্ত্রীলোক পুস্তক পাঠে এই ক্রিয়া করিতে গিয়া, তাহাদের জরায়ু বহির্গত হইয়া পড়িয়াছে। এইরূপ অনেক ঘটনা আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। সেইজন্য সাধারণকে সাবধান করিবার জন্য এই বিষয় লিখিত হইল।

ততঃ প্রত্যক্‌চেতনাধিগমোঽপ্যন্তরায়াভাবশ্চ ॥ ২৯ ॥

এইরূপ মন্ত্রের অর্থ চিন্তা করিয়া প্রত্যক্‌চেতনের সাক্ষাৎকার হয় এবং সাধনপথের অন্তরায় সকল বিলীন হয়।

যাহার সহিত আমরা অনবরত বাস করি, তাহার গুণও প্রাপ্ত হই। সাধুর সঙ্গে অনবরত বাস করিলে সাধুর গুণপ্রাপ্ত হই এবং অসাধুর সহিত বাস করিলে অসাধুর গুণপ্রাপ্ত হই। সেইরূপ আমাদের চিত্ত

নিরন্তর ভগবৎ চিন্তা করিলে, সেই চিত্ত ভগবদ্ভাবে ভাবিত হয়। মন্ত্রের অর্থ চিন্তা করিয়া নিরন্তর জপ ও ধ্যান করিলে আমাদের চেতনা বিষয় ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরাভিমুখী হয়। এই চেতনা ঈশ্বরাভিমুখী হইলেই ইহাকে প্রত্যক্‌চেতনা বলে। এইরূপে প্রত্যক্‌চেতনা হইলে সাধনপথের বিঘ্নসকল দূরীভূত হয়।

ব্যাধিস্ত্যানসংশয়প্রমাদালস্যাবিরতিভ্রান্তিদর্শনালব্ধ-ভূমিকত্বানবস্থিতত্বানি চিত্তবিক্ষেপাস্তেঽন্তরায়াঃ ॥ ৩০ ॥

অন্তরায় ৯ প্রকার। (১) ব্যাধি, (২) স্ত্যান, (৩) সংশয়, (৪) প্রমাদ, (৫) আলস্য, (৬) অবিরতি, (৭) ভ্রান্তি-দর্শন, (৮) অলব্ধভূমিকত্ব, ও (৯) অনবস্থিতত্ব।

এই নয় প্রকার অন্তরায়, সাধনের বিঘ্ন উৎপাদন করে। ইহারা চিত্তের বিক্ষেপ আনয়ন করে এবং চিত্তকে স্থির হইতে দেয় না। সাধনের উদ্দেশ্য চিত্তকে স্থির করা। উপরোক্ত নয় প্রকার বিঘ্ন থাকিলে চিত্ত স্থির হইতে পারে না। চিত্ত চঞ্চল হয়।

(১) ব্যাধি অর্থাৎ পীড়া। শরীর পীড়াগ্রস্ত হইলে মনও অসুস্থ হয়। মন অসুস্থ হইলে সাধন হয় না এইজন্য স্বাস্থ্যকর, পুষ্টিকর ও পরিমিত আহার করিয়া শরীর সুস্থ রাখিবে।

(২) স্ত্যান। সাধন করা কর্ত্তব্য ইহা বুঝি; কিন্তু বুঝিয়াও সাধনে ইচ্ছা হয় না। ইহাকে স্ত্যান বলে। কঠোর পুরুষকার অবলম্বন করিয়া এই স্ত্যান ত্যাগ করিবে।

(৩) সংশয়। মনে কোন বিষয়ে সংশয় থাকিলে আমরা সে কার্য্য উদ্যমের সহিত করিতে পারি না; সেইজন্য শাস্ত্রের উপদেশ, বিচার

করিয়া ও গুরুর নিকট হইতে সকল সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া গ্রহণ করিবে। স্থির নিঃসংশয়চিত্ত হইতে না পারিলে সাধন হইবে না।

(৪) প্রমাদ। সমাধিলাভের জন্য গুরুর নিকট যে সকল সাধন-প্রণালী জানিয়া লইয়াছি, তাহা ভুলিয়া সাধন ছাড়িয়া বিষয়ে লিপ্ত হওয়া—ইহাকে প্রমাদ বলে। যাহাতে এইরূপ ভুল না হয়, যাহাতে আত্মসম্বন্ধে ভুল না হয়, যাহাতে আত্মবিস্মৃতি না আসে, সেইহেতু সর্ব্বদাই আত্মস্মৃতি বজায় রাখিবার চেষ্টা করিবে।

(৫) আলস্য। শরীর ভারবোধ হইলেই শরীরের আলস্য আসে। শরীর আর কর্ম্ম করিতে চাহে না, আসনাদি অভ্যাসে অপ্রবৃত্তি আসে। যেন শুইয়া থাকিতে পারিলেই ভাল হয়। আবার মন ভারী হইলেও মনের আলস্য আসে। ভগবৎ বিষয়ক চিন্তা করিতে পারে না. ধ্যানাদিতে অপ্রবৃত্তি আসে। তমোগুণের আধিক্যে শরীর ও মনের এইপ্রকার অবস্থা হয়। পুরুষকার গ্রহণ করিয়া, কঠোর-উদ্যমের সহিত এই আলস্য ত্যাগ করিবে।

(৬) অবিরতি। বিষয় হইতে বিরত না হইলে অবিরতি বলে। বিষয়মধ্যে মগ্ন হইয়া থাকাকে অবিরতি বলে। অবিরতি দূর করিতে হইলে বিষয়ের সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে হয়। বিষয়ের সঙ্কল্প ত্যাগ করিলে, বিষয়ে আসক্তি কমিয়া যায়।

(৭) ভ্রান্তি-দর্শন=ভুল দেখা। সত্যকে মিথ্যা বলিয়া জানা আর মিথ্যাকে সত্য বলিয়া জানা। শরীরকে আত্মা বলিয়া জানা। আত্মাকে শরীর বলিয়া জানা। নশ্বর শরীরকে চিরস্থায়ী বলিয়া জানা। সাধন করিতে করিতে যখন অন্তর্দ্দৃষ্টিলাভ হয় তখন এই ভ্রান্তিদর্শন দূর হয়।

(৮) অলব্ধভূমিকত্ব। যোগসাধন করিতে করিতে কোন উচ্চ অবস্থায় উঠিতে না পারার নাম অলব্ধভূমিকত্ব।

(৯) অনবস্থিতত্ব। অলব্ধভূমিকাতে অবস্থিত থাকিতে না পারিলে,

তাহাকে অনবস্থিতত্ব বলে। ভালরূপ সমাধি না হইলে, এইপ্রকার উচ্চ-ভূমিকাতে স্থিতিলাভ করিতে পারা যায় না। এইজন্য সমাধি করা আবশ্যক।

দুঃখদৌর্ম্মনস্যাঙ্গমেজয়ত্বশ্বাসপ্রশ্বাসা বিক্ষেপসহভুবঃ ॥৩১॥

পূর্ব্বোক্ত নয়প্রকার অন্তরায় যেমন চিত্তের বিক্ষেপ উৎপাদন করে, শেষোক্ত চারিপ্রকারও তদ্রূপ বিক্ষেপ উৎপাদন করিয়া থাকে। এই চারিপ্রকার যথা,—(১) দুঃখ, (২) দৌর্ম্মনস্য, (৩) অঙ্গমেজয়ত্ব, (৪) শ্বাস ও প্রশ্বাস।

(১) দুঃখ=আধিভৌতিক, আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক। ভূতাদিবর্গ হইতে উৎপন্ন দুঃখকে, আধিভৌতিক দুঃখ কহে; যেমন কাষ্ঠ বা প্রস্তরদ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হওয়া, সিংহ, ব্যাঘ্র বা অপর কোন জীবদ্বারা আক্রান্ত হওয়া। আধ্যাত্মিক দুঃখ দুই প্রকার, শারীরিক ও মানসিক পীড়াসকল। আধিদৈবিক দুঃখ দেবতা হইতে উৎপন্ন হয়, যেমন বজ্রাঘাতাদি।

(২) দৌর্ম্মনস্য। উপরোক্ত দুঃখদ্বারা আক্রান্ত হইলে আমরা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া যাই; আমাদের কি করা উচিত বা কি করা অনুচিত, তাহা আমরা স্থির করিতে পারি না। মন দুঃখে অভিভূত হইয়া পড়ে, ইহাকে দৌর্ম্মনস্য বলে। ইহাও যোগসাধনের অন্তরায়।

(৩) অঙ্গমেজয়ত্ব=অঙ্গসকল কম্পিত হয়। দৌর্ম্মনস্য উপস্থিত হইলে মনস্থির ত দূরের কথা, আমাদের শরীরও স্থির রাখিতে পারি না। শরীর চালনা করিতে বাধ্য হই।

(৪) শ্বাস ও প্রশ্বাস=শরীর চঞ্চল হইলে শ্বাসপ্রশ্বাসও চঞ্চল হয়। আমাদের যে স্বাভাবিক শ্বাসপ্রশ্বাস বহে, তাহা আমাদের অজ্ঞাতসারে

হয়, তাহা আমাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। এইপ্রকার স্বাভাবিক শ্বাসপ্রশ্বাস অনিচ্ছাপূর্ব্বক হয়। ইহা যৌগিক শ্বাসপ্রশ্বাস নহে। ইহা যোগের অন্তরায়। যোগী নিজের ইচ্ছানুযায়ী শ্বাস-প্রশ্বাসকে সংযত করেন। ইহাকে প্রাণায়াম বলে।

তৎপ্রতিষেধার্থমেকতত্ত্বাভ্যাসঃ ॥ ৩২ ॥

এই সকল বিক্ষেপের প্রতিষেধ বা নিবৃত্তির জন্য একতত্ত্ব অভ্যাস করিবে।

চিত্তে একতত্ত্ব অবলম্বন করিয়া অভ্যাস করিলে শীঘ্র শীঘ্র বিক্ষেপ নাশ হয়। এই একতত্ত্ব কি? যে কোন একটী তত্ত্ব। চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের মধ্যে যে কোন একটী তত্ত্ব। যাহার যে তত্ত্ব অভ্যাস করা সুবিধা হয়, সে সেই তত্ত্ব অভ্যাস করিবে। যাহার যে তত্ত্ব অভ্যাসে বেশী ভক্তি হয়, সে সেই তত্ত্ব অভ্যাস করিবে। কেহ বা স্থূলতত্ত্ব অভ্যাস করে, আর কেহ বা সূক্ষ্মতত্ত্ব অভ্যাস করে। প্রথমে স্থূলতত্ত্ব অভ্যাস না করিলে সূক্ষ্মতত্ত্ব অভ্যাস করা যায় না। স্থূলতত্ত্ব, যেমন শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীকালীর মূর্ত্তি বা কোন গাছ বা পাথর। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম—স্থূলতত্ত্ব। ইহাদের অপেক্ষা রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ সূক্ষ্মতত্ত্ব। ইহাপেক্ষা সূক্ষ্ম রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ অর্থাৎ রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র, গন্ধতন্মাত্র, শব্দতন্মাত্র ও স্পর্শতন্মাত্র আরও সূক্ষ্ম। ইহা অপেক্ষা অস্মিতা (যাহা হইতে তন্মাত্র সকল উদ্ভূত হইয়াছে এবং যাহাতে ইহারা লয় পায়) আরও সূক্ষ্ম। প্রথমে সাধকগণকে সর্ব্বাপেক্ষা স্থূলতত্ত্ব অভ্যাস করিতে হয়। এই স্থূল অভ্যাস করিতে করিতে ক্রমে সূক্ষ্মতত্ত্ব অভ্যাসের ক্ষমতা হয়। ক্রমে সূক্ষ্মতত্ত্বের ধারণা হয়। সূক্ষ্মতত্ত্বের ধারণা না হইলে, সূক্ষ্মতত্ত্ব দর্শন না হইলে, সূক্ষ্মতত্ত্ব ধ্যান করা যায় না। জোর

করিয়া সূক্ষ্মতত্ত্ব ধ্যান হয় না। অষ্টাঙ্গযোগ সম্যগ্‌রূপে পালিত হইলে তবে এই ক্ষমতা জন্মায়।

এইরূপ একটীমাত্র তত্ত্ব অবলম্বন করিয়া তাহাতে চিত্তকে অভ্যস্ত করিবে। চিত্ত নানাপ্রকার বিষয় চিন্তা করিলে—একতান হয় না। চিত্তকে একতান করিতে হইবে। একটীমাত্র বিষয়ে মনকে ধরিয়া রাখিতে হইবে। মন যেন বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ছুটাছুটি না করে। মন যেন স্থির হইয়া একটী বিষয় বহুক্ষণ পর্য্যন্ত চিন্তা করিতে সক্ষম হয়। যখন "শ্রীকৃষ্ণ" জপ করিবে, তখন যেন মনের মধ্যে আলু, পটল, কাঁচকলা না ভাসিয়া উঠে। এইরূপ হইলে চিত্ত একতান হয় না। এরূপ হইলে চিত্ত একাগ্র হয় না। চিত্ত একাগ্র না হইলে সমাধি হয় না। এইজন্য জপ করিবার সময় প্রথম প্রথম সাধকদিগের চিত্তে নানাপ্রকার বৃথা চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হয়। সেই সকল বৃথা চিন্তাকে জোর করিয়া তাড়াইতে হইবে এবং পুনঃ পুনঃ চিত্তে "শ্রীকৃষ্ণ" জপ বসাইতে হইবে। যতবারই এই জপ হইতে ভ্রষ্ট হইবে, ততবারই পুনঃ পুনঃ এই জপকে চিত্তে বসাইতে চেষ্টা করিবে। এইরূপ অভ্যাস করিতে করিতে তুমি সফলকাম হইবে। চিত্তের মধ্যে বিক্ষেপ সংস্কার থাকার জন্য, এইরূপ জপ ভাঙ্গিয়া যায়। যাহার চিত্তে যত অধিক বিক্ষেপ, তাহার চিত্ত তত অধিক চঞ্চল; তাহাকে সাধনা তত অধিক দৃঢ়তার সহিত করিতে হইবে।

চিত্তে নানাপ্রকার সংস্কার আছে। সেই সংস্কার হইতেই বাসনার উৎপত্তি হয়। যে পূর্ব্বজন্মে অনেক অসৎকার্য্য করিয়াছে, তাহার চিত্তে সেই অসৎকার্য্যের সংস্কার বর্ত্তমান আছে এবং তাহার মনে সেই অসৎকার্য্যের বাসনা জাগে। যে পূর্ব্বজন্মে অনেক সৎকার্য্য করিয়াছে, তাহার চিত্তে সেই সৎকার্য্যের সংস্কার বর্ত্তমান আছে এবং তাহার মনে সেই সৎকার্য্যের ইচ্ছা জাগে। প্রত্যেক মানুষের মনে যে সকল

বাসনা হয়, তাহা তাহার চিত্তের সংস্কার হইতে হয়। যে পূর্ব্বজন্মে চুরি অভ্যাস করিয়া চোরের সংস্কার চিত্তে সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছে; বর্ত্তমানজন্মে তাহার চুরি করিবার ইচ্ছা জন্মিবে এবং সে চোর হইবে। যে পূর্ব্বজন্মে অনেক দান করিয়াছে, তাহার চিত্তে দানের সংস্কার সংগৃহীত আছে এবং বর্ত্তমানজন্মে সেই দানের সংস্কার হইতে তাহার দান করিবার ইচ্ছা জন্মিবে। চিত্তের সংস্কারে বাধ্য হইয়া নানাপ্রকার লোকে নানাপ্রকার কার্য্য করে। আমরা যদি ইহজন্মে সৎকার্য্য করি, তাহাহইলে, আমাদের চিত্তে সৎসংস্কার পড়িবে এবং পরজন্মে আমাদের সৎকার্য্যে বাসনা জন্মিবে। কোন একটী কার্য্য বহুবার অভ্যাস করিলে, চিত্তে তাহার সংস্কার পড়ে। চিত্তে যখন যে বাসনার উদয় হইবে, তখন তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিবে। এইরূপ করিতে করিতে তোমার চিত্তদর্শন অভ্যাস হইবে এবং তখন তুমি পূর্ব্বজন্মে কি প্রকৃতির লোক ছিলে তাহা বুঝিতে পারিবে। এইরূপ চিত্ত পাঠ করা অতীব আনন্দ-জনক। নিজের চিত্ত ত পাঠ করিবেই এবং পরের চিত্তও পাঠ করিবে। এই চিত্ত পাঠে খুব অভ্যস্ত হইলে, তখন কে কিরূপ লোক, তাহা সহজেই বুঝিতে পারিবে এবং তাহার সহিত যথোপযুক্ত ব্যবহার করিতে পারিবে। ইহজন্মের কার্য্য বিচার করিয়া আমরা পরজন্মে কি হইব তাহাও নিশ্চয় করিতে পারি। সাধনার জন্য ঈশ্বর-বিষয়ক কোন একটী তত্ত্ব লইয়া অভ্যাস করিবে, তাহাহইলে, বিক্ষেপ সকল শীঘ্র শীঘ্র দূর হইয়া চিত্ত একাগ্র ও স্থির হইবে। এই চিত্তের স্থৈর্য্য ও একাগ্রতাই সাধনার মূল উদ্দেশ্য। প্রতিক্ষণ চিত্তের সংস্কার-বৃত্তির উদয়ের প্রতি দৃষ্টি করিয়া থাকিতে পারিলেও একতত্ত্বাভ্যাস হয়। এইরূপ দ্রষ্টৃস্বরূপে থাকিতে অভ্যাস করাও একটী উত্তম সাধনা।

একতত্ত্বাভ্যাসের মধ্যে ভগবৎ-তত্ত্বই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। একতত্ত্বা-ভ্যাস করিতে হইলে শারীরিক সমুদয় যন্ত্র ও ক্রিয়াকে একতান

করাইবে। হাত দিয়া যেন সর্ব্বদা ভগবৎ কার্য্য করা হয়, পা দিয়া যেন সর্ব্বদা ভগবৎ কার্য্য করা হয়। চক্ষু যেন সর্ব্বদা ভগবৎ রূপ দর্শন করে। কর্ণ যেন সর্ব্বদা ভগবৎ কথা শ্রবণ করে। এইরূপে আমাদের সমূদয় শরীরক্রিয়া যখন সর্ব্বদা ভগবানকে লক্ষ্য করিয়া হইবে, তখন আমাদের একতত্ত্বাভ্যাস হইবে। এইরূপ শারীরিক ক্রিয়ার সহিত শ্বাস-প্রশ্বাসও নিয়মিত করিবে। এইরূপ করিতে করিতে আমাদের দৌর্ম্মনস্থ দূর হয়। শরীরের চঞ্চলতা দূর হইয়া আসন অভ্যাস হয় ও শরীর স্থির হয়। এইরূপে ক্রমশঃ চিত্তের বিক্ষেপসকল দূর হইলে, আমরা দুঃখের হাত হইতে পরিত্রাণ পাই। তখন আমাদের ত্রিবিধ দুঃখ দূর হয় ও আমরা চিরশান্তি লাভ করিয়া কৃতার্থ হই।

ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা না থাকিলে ঈশ্বরতত্ত্ব অভ্যাস করা যায় না। এরূপ লোকেরা, যে কোন একটী তত্ত্বে চিত্ত স্থির করিবার অভ্যাস করিবে। যে যাহা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসে, যে, যে কোন দ্রব্য চিন্তা করিতে খুব সুখ পায়, সে, সেই দ্রব্যটী লইয়াই চিন্তা করুক। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতেও চিত্ত একাগ্র হয়। চিত্তকে একবার যে কোন বিষয়ে একাগ্র করিতে পারিলেই ভগবৎ বিষয়েও শীঘ্র একাগ্র করিতে পারিবে। বিল্বমঙ্গলের জীবনী—ইহার একটী উত্তম দৃষ্টান্তস্থল।

মৈত্রীকরুণামুদিতোপেক্ষাণাং সুখদুঃখপুণ্যাপুণ্য-বিষয়াণাং ভাবনাতশ্চিত্তপ্রসাদনম্ ॥ ৩৩ ॥

সুখী, দুঃখী, পুণ্যবান্ ও অপুণ্যবান্ জীবের প্রতি—মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা ভাবনা করিবে। এরূপ করিলে চিত্তপ্রসাদ লাভ হয়। চিত্ত প্রসন্ন হইলে, চিত্ত নির্ম্মল হয় ও একাগ্র হইয়া স্থিতিপদ লাভ করে।

মৈত্রী। পরের সুখ দেখিলে নিজে সুখবোধ করিবে। নিজের B. A. পাস করা ছেলের যদি মাসিক ৫০০৲ পাঁচ শত টাকা বেতন হয় এবং সেই ছেলে যদি তোমার সম্পূর্ণ বাধ্য হয়, তাহাহইলে, তোমার মনে যেরূপ সুখ হয়, তেমনই পরের এমন কি তোমার শক্ররও যদি সুখ দেখিতে পাও, তাহাহইলে, নিজেকে সেইরূপ সুখী জ্ঞান করিবে। পরের সুখ দেখিলে আমাদের স্বভাবতঃই হিংসা হয়। এরূপ হইলে যোগসাধন হইবে না। এরূপ করিলে সেই হিংসার সংস্কার তোমার চিত্তে পড়িবে এবং ভবিষ্যতে তোমাকে কষ্ট দিবে। আর পরের সুখে সুখবোধ করিলে—তোমার চিত্ত পরিষ্কার হইবে।

করুণা। পরের দুঃখ দেখিলে মনে করুণার ভাবনা করিবে। সচরাচর আমরা শক্রর দুঃখ দেখিয়া হর্ষান্বিত হই। এরূপ হইলে যোগসাধন হইবে না। শক্র যদি দুঃখে পতিত হয়, তাহাহইলে, তাহাতে তুমিও দুঃখিত হইয়া তাহার প্রতি করুণা প্রকাশ করিবে এবং তোমার সাধ্যমত তাহার দুঃখ প্রতীকারের চেষ্টা করিবে।

মুদিতা। পরকে পুণ্যকার্য্য করিতে দেখিলে আনন্দিত হইবে। সে মিত্রই হউক বা শক্রই হউক, বা যে কোন ধর্ম্মাবলম্বী হউক, তাহাকে পুণ্য করিতে দেখিলে তুমিও আনন্দিত হইবে। সেখানে হিংসা করিও না বা তাহার বিষয়ে কোনরূপ মন্দ আলোচনা করিও না। লোকের স্বভাব—হিতাহিত বিচার না করিয়া, অন্যের ধর্ম্মের নিন্দা করা। সে ধর্ম্মের প্রথা ভাল কি মন্দ, তাহা আমরা দেখিতে চাই না। এটী খুব খারাপ। বর্ত্তমান হিন্দু মুসলমানে যে বিবাদ—তাহা এই কারণেই হইয়াছে। সাধারণ লোকের বিবেকবুদ্ধি যতদিন না বর্দ্ধিত হইবে, ততদিন এই বিবাদও থাকিবে। উভয় সম্প্রদায়েই অবশ্য ভাল ভাল লোক আছেন, কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা খুব অল্প।

উপেক্ষা। কাহাকেও কোন পাপকার্য্য করিতে দেখিলে, তাহা

উপেক্ষা করিবে, যেন দেখিয়াও দেখ নাই। তাহা আদৌ গ্রাহ্য করিবে না। সে বিষয়ে কোন আলোচনা করিবে না। আমাদের স্বভাব, কাহারও কোন দোষ দেখিলে, তাহা শাখাপ্রশাখাযুক্ত করিয়া বৰ্দ্ধিত করিয়া সেই তিল প্রমাণ দোষকেও তাল করিয়া আমরা যাহার তাহার নিকট বর্ণনা করি; যেন নিজে কখনও কোন দোষ করি নাই। যেন নিজে সতীর শিরোমণি। এইরূপভাবে পরনিন্দা, পরচর্চ্চা করিলে সাধনা হইবে না।

প্রচ্ছর্দ্দনবিধারণাভ্যাং বা প্রাণস্য ॥ ৩৪ ॥

প্রাণের প্রচ্ছর্দ্দন বা অভ্যন্তরস্থ বায়ুকে নাসিকা দিয়া কৌশলক্রমে বাহির করা এবং বিধারণ অর্থাৎ প্রাণকে সংযত করা। এইরূপ প্রচ্ছর্দ্দন এবং বিধারণ দ্বারাও চিত্ত স্থিতিলাভ করে।

কৌশল বিশেষের দ্বারা প্রচ্ছর্দ্দন করিতে হয়। সে কৌশল কি? (১) প্রশ্বাস দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া করিবে; (২) প্রশ্বাস ধীরে ধীরে করিবে এত ধীরে করিবে যেন নাসিকার সম্মুখে তুলা ধরিলে তাহা না নড়ে; (৩) সেই সময় শরীর যেন সম্পূর্ণ স্থির ও শিথিল থাকে; (৪) মনের মধ্যে কোন চিন্তা না থাকে, মনকে নিঃসঙ্কল্প করিবে এবং মনে শূন্যবৎ ভাবনা করিবে। ইহাকে রেচন বলে। রেচন করিবার পর, তৎক্ষণাৎ বায়ুর পূরণ না করিয়া প্রাণকে বহির্দ্দেশে কিয়ৎকাল ধারণ করিয়া রাখিবে ও মনে শূন্যবৎ ভাবনা করিবে। ইহাকে বিধারণ বলে। ইহাতে পূরণের বিশেষ কোন কৌশল নাই। সহজভাবে পূরণ করিবে এবং সে সময়েও মনকে শূন্যবৎ রাখিবে। গুরুর উপদেশ অনুসারে ইহা করিবে।

বিষয়বতী বা প্রবৃত্তিরুৎপন্না মনসঃ স্থিতিনিবন্ধনী।৩৫॥

বিষয়বতী প্রবৃত্তি উৎপন্ন হইলেও মনের স্থিতিনিবন্ধনী হয়।

আমাদের মন বিষয়লোলুপ, একেবারে বিষয় ত্যাগ করিতে চায় না। এই বিষয় পাইবার লোভে অনেকে সাধনা করে। সাধনা করিতে করিতে নানাপ্রকার অতীন্দ্রিয় বিষয়ের দর্শন শ্রবণাদি হইয়া থাকে। আমরা স্বভাবতঃ সহজ চক্ষে যাহা দেখিতে পাই না, সহজ কর্ণে যাহা শুনিতে পাই না, সাধন করিতে করিতে আমরা সেই সকল দিব্যরূপ দেখিতে পাই ও দিব্যশব্দ শুনিতে পাই। এই প্রকার কোন দিব্যরূপ দর্শন করিলে বা দিব্যশব্দ শ্রবণ করিলে সাধকের আরও দেখিবার, আরও শুনিবার এবং আরও জানিবার ইচ্ছা বলবতী হয় এবং তখন সে শাস্ত্রে শ্রদ্ধাবান্ হইয়া মনোযোগ ও যত্ন সহকারে সাধনকার্য্য করিতে থাকে। প্রত্যেক সাধকেরই এইপ্রকার দিব্যদর্শন ও দিব্যশ্রবণ হওয়া আবশ্যক, তাহা না হইলে, তাহারা সাধনে রস পায় না এবং ক্রমে শাস্ত্রে ও গুরুবাক্যে অশ্রদ্ধা আসে এবং পরিশেষে সাধন ত্যাগ করে। তবে এইরূপ অতীন্দ্রিয় দর্শন বা শ্রবণ সাধনের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। সাধনের মুখ্য উদ্দেশ্য মুক্তি। মুক্তি কাহাকে বলে—অনেকে জানে না। অনেকে মনে করে, এরূপ একটী দিব্যদর্শন হইলেই সাধনের শেষ হইল এবং মানব জীবন কৃতার্থ হইল, যেন আর কিছু করিবার নাই। যেন তাহারা সিদ্ধপুরুষ হইয়াছে। এইরূপ অহঙ্কার আসিয়া তাহাদিগকে অধঃপাতিত করে। বস্তুতঃ জানিবে কোনরূপ জ্যোতির্দর্শন বা দেবদর্শন সাধনের চরম সীমা নহে। আমাদের চিত্ত যতই পরিষ্কৃত হইতে থাকিবে, আমাদের চিত্তের সংস্কার যতই কমিতে থাকিবে, ততই এই সকল দর্শন ও শ্রবণাদি আপনা হইতেই হইবে। আমরা ইচ্ছা করিলেও হইবে, না করিলেও হইবে। ইহাতে কোন বাহাদুরী

নাই। ইহা সাধকমাত্রেরই হইয়া থাকে। ইহা যোগীদিগের নিম্ন অবস্থা। অনেকে এই অবস্থায় আটকাইয়া যায়। আর উর্দ্ধে উঠিতে পারে না বরং অহঙ্কারবশতঃ তাহাদিগের দর্শন বিষয়ে অপরের নিকট গল্প করিতে ভালবাসে। এই সকল বিষয় গুরু ভিন্ন অপর কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না। এই সকল দর্শন অতি তুচ্ছ। এইরূপ দর্শন ও অণিমাদি ঐশ্বর্য্য সাধকের নিকট আপনিই উপস্থিত হয়। ইহাদের কোনও মূল্য নাই। ইহারা সাধনার বিঘ্ন উপস্থিত করে। ইহাদিগকে তুচ্ছবোধ করিয়া সাধনে অগ্রসর হইবে, এমন কি যদি সর্ব্বজ্ঞতাও প্রাপ্ত হও, তাহাও কাকবিষ্ঠাবৎ জ্ঞান করিয়া নিজ সাধনে অগ্রসর হইবে। এই বিষয়বতী প্রবৃত্তি যেন তোমার সাধনায় উৎসাহ দেয়—যেন তোমার অধঃপতনের কারণ না হয়। এই সকল সিদ্ধিকে তুচ্ছ মনে করিয়া দৃঢ়তার সহিত সাধন করিলে, চিত্তের স্থিতি-নিবন্ধনী হয়। চিত্ত স্থির হয়।

বিশেষ বিশেষ স্থানে আমাদের চিত্তের ধারণা করিলে আমাদের বিশেষ, বিশেষ অলৌকিক জ্ঞান হয়। যেমন নাসিকাগ্রে চিত্তধারণ করিলে দিব্যগন্ধের অনুভব হয়; ইহাকে গন্ধপ্রবৃত্তি বলে। জিহ্বাগ্রে চিত্তধারণ করিলে দিব্যরসের অনুভব হয়। এইরূপ প্রবৃত্তি উৎপন্ন হইলে, যাহাদিগের অহঙ্কার জন্মায় তাহারা অধঃপতিত হয়; কিন্তু প্রকৃত বৈরাগ্যবান্ সাধকের উপকার ব্যতীত অপকার হয় না। এই প্রবৃত্তির দ্বারা তাঁহার চিত্ত স্থির হয়। শাস্ত্র ও গুরুর উপদেশে তিনি নিঃসংশয় হন, সাধনায় উৎসাহ বৰ্দ্ধিত হয় এবং ক্রমে সমাধি নিকটবর্ত্তী হয়। এই প্রকারে সাধক যখন এই দিব্যরূপ, দিব্যরস বা দিব্যগন্ধাদির অনুভব করেন, তখন তাঁহার সাধারণ গন্ধাদির প্রতি অশ্রদ্ধা আসে, তাহাতে আসক্তি কমিয়া যায় ও বৈরাগ্য আসে। বৈরাগ্যযুক্ত হইয়া দৃঢ়ভাবে সাধন করিতে করিতে তাঁহার ক্রমশঃ

সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়সকল দর্শন হয় এবং ক্রমশঃ তাঁহার সমাধি অবস্থা আসে।

বিষয়বতী প্রবৃত্তি উৎপন্ন করিতে হইলে বহুদিন ধরিয়া অল্পে অল্পে অভ্যাস করিবে পরে কিছুদিনের জন্য নির্জ্জনে যাইয়া ও সর্ব্বচিন্তা পরিত্যাগ করিয়া, অল্পাহার বা উপবাস করিয়া দৃঢ়ভাবে নাসিকাগ্র প্রভৃতি স্থানে চিত্তধারণা করিয়া রাখিলে এইপ্রকার দিব্যগন্ধাদি অনুভব করা যায়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যম নিয়মাদিও সাধন করিতে হয়। যাহারা যম নিয়মাদি সাধন না করিয়া এই দিব্য অনুভবগুলি আয়ত্ত করিতে যায়, তাহাদের ঘোর অনিষ্ট হয়। প্রত্যেক বিষয়ই গুরুর আদেশ গ্রহণ করিয়া করা ভাল।

বিশোকা বা জ্যোতিষ্মতী ॥ ৩৬ ॥

বিশোকা বা জ্যোতিষ্মতী প্রবৃত্তিও চিত্তকে স্থির করিতে পারে।

এই প্রবৃত্তিকে বিশোকা প্রবৃত্তি বলে, কেননা ইহাতে আমাদের শোক দূর হয় আর ইহাকে জ্যোতিষ্মতী প্রবৃত্তি বলে, কেননা এই অবস্থায় সাধকের চিত্ত হইতে রজঃ ও তমোমল দূরীভূত হইয়া সাত্ত্বিক ভাব প্রকাশ হয়। হৃদয় সাত্ত্বিক আলোকজ্যোতিতে পূর্ণ হয়। সাধারণ লোকের হৃদয় তামসিক অন্ধকারে পূর্ণ, এইজন্য তাহারা প্রকৃতির সূক্ষ্ম অংশ-সমূহ দেখিতে বা শুনিতে পায় না; কিন্তু সাধক উচ্চাবস্থায় উঠিলে তাঁহার হৃদয়ে আর অন্ধকার থাকে না। অন্ধকারের পরিবর্ত্তে এই সাত্ত্বিক জ্যোতির প্রকাশ হয় এবং তিনি তখন প্রকৃতির সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তত্ত্বগুলি দর্শন করিতে পারেন, এইজন্য ইহাকে জ্যোতিষ্মতী প্রবৃত্তি বলে।

মনের মধ্যে স্বচ্ছ অনন্ত আকাশের সদৃশ জ্যোতি ধ্যান করিবে। মনে মনে চিন্তা করিবে, আমিই সেই জ্যোতি। আমি সেই জ্যোতি

ভিন্ন অপর কিছুই নহি। এইরূপ ভাবনা দৃঢ়ভাবে অভ্যস্ত হইলে, আমরা মনে পরমা শান্তি অনুভব করি এবং হৃদয়ে জ্যোতির আবির্ভাব হওয়ায় আমরা প্রকৃতির অস্মিতাদি সূক্ষ্মতত্ত্বগুলি দর্শনে সমর্থ হই।

বীতরাগবিষয়ং বা চিত্তম্॥ ৩৭ ॥

বীতরাগ পুরুষের চিত্তের যে ভাব, সেই ভাব অবলম্বন করিয়া ধ্যান করিলেও চিত্ত স্থিতিলাভ করে।

যে সকল মহাত্মা আসক্তিশূন্য, তাঁহাদের চিত্তের যে ভাব সেই ভাব মনে মনে ধ্যান করিলে, ক্রমশঃ আমাদের চিত্তও আসক্তিশূন্য হইয়া বীতরাগ হয় এবং তজ্জন্য চিত্তও স্থির হয়।

স্বপ্ননিদ্রাজ্ঞানালম্বনম্ বা ॥ ৩৮ ॥

স্বপ্নজ্ঞানকে বা নিদ্রাজ্ঞানকে অবলম্বন করিয়া ধ্যান করিলেও চিত্ত স্থির হয়।

আমাদের তিন অবস্থা,—জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও নিদ্রা। নিদ্রা বলিতে গভীর নিদ্রা বুঝিতে হইবে, যখন স্বপ্নও থাকে না। জাগ্রৎ অবস্থার বিষয়-গুলি অবলম্বন করিয়া, কিরূপে ধ্যান করিতে হয় তাহা বলা হইয়াছে। স্বপ্নাবস্থার বিষয় লইয়া ধ্যান করিলেও আমাদের চিত্ত স্থির হয়। কল্পনাপ্রিয় লোকের পক্ষে এই স্বপ্নাবস্থার বিষয়ধ্যান অতি সহজ এবং তাহারা ইহাতে শীঘ্র সিদ্ধিলাভ করে; যদি কখনও কোন ভাল স্বপ্ন দেখ বা সুন্দর দৈব স্বপ্ন দেখ, তাহাহইলে, জাগরিত হইয়া সেই স্বপ্নটী মনে রাখিবার চেষ্টা করিবে এবং সেইটী অবলম্বন করিয়া ধ্যান করিলেও চিত্ত স্থির হইবে। নিদ্রার শূন্যজ্ঞান অবলম্বন করিয়াও

ধ্যান হয়; কিন্তু তাহা কঠিন, কারণ আমাদের মনকে শূন্যভাবে রাখা অতি কঠিন।

যথাভিমতধ্যানাদ্ বা ॥ ৩৯ ॥

যথাভিমত বিষয়ের ধ্যান করিলেও চিত্ত স্থির হয়।

তোমার যাহা ভাল লাগে তাহাই ধ্যান করিবে, সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, তারা, পাথর, ইট, কাঠ প্রভৃতি কোন একটী বিষয়ে চিত্ত স্থির করিবার সামর্থ্য জন্মিলেই অন্য যে কোন বিষয়ে চিত্ত স্থির রাখিতে পারা যাইবে।

পরমাণুপরমমহত্ত্বান্তোঽস্য বশীকারঃ ॥ ৪০ ॥

পরমাণু পর্য্যন্ত ও পরম মহত্ত্ব পর্য্যন্ত স্থিতিলাভ করিবার সামর্থ্য হইলে তাহাকে চিত্তের বশীকার বলে।

যখন যোগী চিত্তকে পরমাণু পর্য্যন্ত এবং পরমমহত্ত্ব পর্য্যন্ত যে কোন বস্তুতে স্থাপন করিতে সমর্থ হন, তখন তিনি অসাধারণ ক্ষমতা লাভ করেন। ব্রহ্মাণ্ডের সকল বিষয়ের মধ্যেই তিনি প্রবেশ করিতে পারেন। সকল বিষয়ই তাঁহার অধীন হয়। তিনি যথা ইচ্ছা গমন ও বিহার করিতে পারেন।

ক্ষীণবৃত্তেরভিজাতস্যেব মণেগ্রহীতৃগ্রহণগ্রাহ্যেষু তৎস্থতদঞ্জনতা সমাপত্তিঃ ॥ ৪১ ॥

ক্ষীণবৃত্তি-চিত্তে অভিজাত (স্বচ্ছ ও নির্ম্মল) মণির ন্যায় যে গ্রহীতা, গ্রহণ ও গ্রাহ্যেতে তৎ-স্থিতা ও তদঞ্জনতা তাহা সমাপত্তি।

স্বচ্ছ ও নির্ম্মল স্ফটিকমণির পার্শ্বে একটী লাল জবাফুল রাখিলে সেই স্ফটিকমণির মধ্যে ঐ লাল জবাফুলের বর্ণ ও আকার প্রতিবিম্বিত হয় এবং বোধ হয় যেন স্ফটিকমণিটী মণি নয় একটী জবাফুল। বাস্তবিক স্ফটিকমণির মধ্যে জবাফুল নাই কিম্বা স্ফটিকমণিটীও লাল হইয়া যায় নাই। স্ফটিকমণি—মণিই আছে, ইহার কোন রূপান্তর বা বর্ণান্তর হয় নাই। সেইরূপ স্থির ও নির্ম্মল চিত্তের পার্শ্বে যে কোন বিষয়ই উপস্থিত হউক না কেন; চিত্তমধ্যে সেই বিষয়ের আকার, বর্ণ ও ভাব সম্যাগ্ রূপে ও স্পষ্টরূপে প্রতিবিম্বিত হয়। মনে কর কোন অপরিচিত লোক তোমার নিকট আসিল—তোমার চিত্ত যদি নির্ম্মল হয়, তাহা হইলে, সেই লোকটীর আকার প্রকার, তাহার বর্ণ, তাহার অন্তঃকরণের সৎ বা অসৎভাব, তাহার অতীতকালের ঘটনাবলী, তাহার ভবিষ্যৎ-কালের ঘটনাবলী—সমুদয় বিষয় নিখুঁৎভাবে ও স্পষ্টভাবে তোমার চিত্তে প্রতিবিম্বিত হইবে এবং তুমি সেই সব বিষয় স্পষ্ট ও পরিষ্কাররূপে জানিতে ও দেখিতে পাইবে। কোন বিষয়ই আর তোমার নিকট গোপন থাকিবে না। চিত্ত স্থির হইলে ও পরিষ্কার হইলে, চিত্তের এই অসাধারণ শক্তি জন্মায়। তুমি একটী তালাচাবিবদ্ধ লোহার সিন্ধুকের মধ্যে কত টাকা আছে বলিয়া দিতে পারিবে। তুমি একখানি পুস্তক পাঠ না করিয়া তাহার কোন পৃষ্ঠায় কি লেখা আছে, তাহা দেখিতে পাইবে। প্রকৃতি মধ্যস্থ স্থূল, সূক্ষ্ম বা সূক্ষ্মতম কোন বিষয় তোমার নিকট গোপন থাকিবে না।

তত্র শব্দার্থজ্ঞানবিকল্পৈঃ সঙ্কীর্ণা সবিতর্কা সমাপত্তিঃ ॥৪২॥

শব্দার্থজ্ঞানের বিকল্পের দ্বারা যে মিশ্রা সমাপত্তি হয়, তাহা সবিতর্কা সমাপত্তি।

একাগ্রচিত্তে বিষয় চিন্তা করিতে করিতে যে তন্ময় ভাব হয়—তাহা সমাপত্তি। স্থূলবস্তু লইয়া ধ্যান করিতে করিতে দুই প্রকার সমাপত্তি হয়। (১) সবিতর্কা, ও (২) নির্ব্বিতর্কা। যেস্থলে শব্দ, অর্থ ও জ্ঞান এই তিনটী একসঙ্গে মিশ্রিত থাকে, তাহাকে সবিতর্কা সমাপত্তি বলে। ইহা মিশ্রিত জ্ঞান। ইহা বিশুদ্ধ নির্ম্মলজ্ঞান নহে। তর্ক অর্থে শব্দময়-চিন্তা। বিতর্ক অর্থে বিশেষরূপে চিন্তা। "গো" এই শব্দ, কেবল শব্দ মাত্র। ইহার অর্থ বা জ্ঞান সম্পূর্ণ পৃথক্। "গো" শব্দ বাগ্‌যন্ত্রদ্বারা উচ্চারিত হয়, সুতরাং ইহার আশ্রয়স্থান বাগ্‌যন্ত্র। "গো" ইহার অর্থ একটী সাদা বা কাল বা লালবর্ণের জন্তু—যাহার চারিটী পা আছে, দুটী সিং আছে, একটী লেজ আছে এবং ইহা আমাদের গোয়ালঘরে অবস্থান করে; সুতরাং ইহার আশ্রয়স্থান গোয়ালঘর। "গো" সম্বন্ধে জ্ঞান অর্থাৎ ইহা আমাদিগকে দুগ্ধদান করে, গাড়ী টানে, মাঠে লাঙ্গল দেয় ইত্যাদি। এই জ্ঞান আমাদের চিত্তে থাকে সুতরাং ইহার আশ্রয়স্থান আমাদের চিত্ত। শব্দের আশ্রয়স্থান হইল বাগ্‌যন্ত্র, অর্থের আশ্রয়স্থান—গোয়ালঘর, আর জ্ঞানের আশ্রয়স্থান—চিত্ত। শব্দ, অর্থ ও জ্ঞান এই তিনটী বিষয় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র; কিন্তু স্বতন্ত্র হইলেও আমরা ইহাদিগকে মিশ্রিতভাবে ব্যবহার করি। এই তিনটী বিষয়কে একটী বিষয় মনে করিয়া ব্যবহার করি। এই তিনটী বিষয় যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, তাহা আমাদের মনে আদৌ উদিত হয় না। এইরূপভাবে তিনটী বিষয়কে একটী মনে করিয়া যে ধ্যান বা চিন্তা করি, তাহাকে "সবিতর্কা সমাপত্তি" বলে। সমাপত্তি অর্থে এইরূপ একাগ্রভাবে চিন্তা বা ধ্যানের অভ্যাসে ধ্যেয় বিষয়ে সাহজিকের মত তন্ময় ভাব।

স্মৃতিপরিশুদ্ধৌ স্বরূপশূন্যেবার্থমাত্রনির্ভাসা নির্ব্বিতর্কা। ৪৩॥

স্মৃতিপরিশুদ্ধি হইলে স্বরূপশূন্যের ন্যায় অর্থমাত্রনির্ভাসা যে সমাপত্তি, তাহাকে নির্ব্বিতর্কা সমাপত্তি বলে।

স্মৃতি যখন পরিশুদ্ধ হয় অর্থাৎ স্মৃতিতে যখন ময়লা থাকে না, স্মৃতিতে তখন বহুবিষয় মিশ্রিত না থাকিয়া একটীমাত্র বিষয় থাকে। যেমন গঙ্গাজলে বালি ও মাটী প্রভৃতি মিশ্রিত থাকিলে, আমরা তাহাকে ঘোলা জল বলি, তাহাকে ময়লা জল বলি, তাহাকে পরিষ্কার জল বলি না; আবার সেই জলের ময়লা স্বতন্ত্র করিতে পারিলে সেই ঘোলা জল পরিষ্কার ও স্বচ্ছ হয় এবং সেই জলের তলদেশ পর্য্যন্ত আমরা পরিষ্কার দেখিতে পারি। কলিকাতার গঙ্গাজল ঘোলা সেইজন্য ঐ জলের ভিতরকার মৎস্য আমরা দেখিতে পাই না, কিন্তু হরিদ্বারের গঙ্গাজল খুব পরিষ্কার ও স্বচ্ছ সেইজন্য সেখানে জলের ভিতরকার মৎস্যাদি পরিষ্কার ও স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের স্মৃতিও পরিষ্কার না হইলে আমরা ভিতরকার সূক্ষ্মবিষয় দেখিতে সক্ষম হইব না; আমাদের স্মৃতিতে শব্দ ও অর্থ একসঙ্গে মিশাইয়া থাকিলে, সে স্মৃতি-সাহায্যে আমাদের বস্তুবিষয়ক যথার্থজ্ঞান হয় না; কিন্তু আমরা যদি শব্দকে স্মৃতি হইতে দূর করিয়া দিতে পারি, তাহাহইলে, আমাদের স্মৃতি পরিষ্কার হইয়া, অর্থবিষয়ে ভাল জ্ঞান জন্মিতে পারে। একসঙ্গে যদি দশটী বালক চীৎকার করিয়া পাঠ করে, তাহাহইলে, সেই সমুদয় বালকের উচ্চারিত শব্দগুলি মিশাইয়া একটী শব্দের ন্যায় বোধ হয়। সেই মিশ্রিত শব্দ হইতে তোমার পুত্রের শব্দকে পৃথক্ শুনিতে পাইবে না; কিন্তু যদি আর নয়টী বালক পাঠ বন্ধ করে এবং তোমার পুত্রমাত্র পাঠ করে, তখন তুমি তোমার পুত্রের কণ্ঠস্বর স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে। সেইরূপ স্মৃতির মধ্যে শব্দ ও অর্থ দুটী বিষয় থাকিলে,

তোমার অর্থবিষয়ে যথার্থজ্ঞান হইবে না; কিন্তু যদি শব্দটী স্মৃতি হইতে বহিষ্কৃত হইয়া যায়, তখন তোমার স্মৃতিপরিশুদ্ধি হইবে এবং অর্থবিষয়ে স্পষ্ট ও পরিষ্কার জ্ঞান হইবে। শব্দ ও অর্থ একসঙ্গে মিশাইয়া যে ধ্যান, তাহা সবিতর্কা; আর মাত্র অর্থের যে ধ্যান, তাহা নির্ব্বিতর্কা। নির্ব্বিতর্কা সমাপত্তিতে, স্থূলভূতের সূক্ষ্মতম জ্ঞান হয়। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ স্থূলভূত। আমরা সাধারণতঃ এই স্থূলশব্দাদি গ্রহণ করিয়া থাকি। ইহাদিগের সূক্ষ্ম অংশ গৃহীত হয় না। নির্ব্বিতর্কা সমাপত্তিতে স্থূলভূতের সূক্ষ্মতম অংশ প্রত্যক্ষ হয়। স্থূলভূতের ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম অংশ। ইহাকে তন্মাত্র বলে, যথা শব্দ তন্মাত্র, স্পর্শ তন্মাত্র, রূপ তন্মাত্র, রস তন্মাত্র, ও গন্ধ তন্মাত্র। এই সকল তন্মাত্র হইতে স্থূলভূতের সৃষ্টি হইয়াছে। তন্মাত্রজ্ঞানই—সত্যজ্ঞান, স্থূলভূতজ্ঞান—ভ্রান্তিজ্ঞান। আমরা স্থূলভূতকে যেরূপ দেখি, তাহা প্রকৃতপক্ষে সেরূপ নহে। তাহা তন্মাত্রের সমষ্টি মাত্র। আমরা রূপ দর্শন করি। নীল, লাল, হরিদ্রাদি নানাপ্রকার রূপ দর্শন করি; এরূপভাবে যে নানাপ্রকার দর্শন তাহা ভ্রান্তিদর্শন, তাহা সত্যদর্শন নহে। প্রকৃত পক্ষে নীল, লাল বা হরিদ্রাদি রূপ নাই। একমাত্র রূপ তন্মাত্র আছে। তন্মাত্রের মধ্যে নানাপ্রকারত্ব নাই। এই তন্মাত্র হইতেই নানাপ্রকার সৃষ্টি হয়; সুতরাং আমরা মূলরূপ দেখিতে পাই না। রূপের পরিণাম মাত্র দেখি। দুগ্ধ হইতে মাখন হয় এবং মাখন হইতে ঘৃত হয়। ঘৃত মূলদ্রব্য নহে, মূলদ্রব্য দুগ্ধ; সুতরাং কেহ যদি ঘৃতকে মূলদ্রব্য বলিয়া মনে করে, তাহা তাহার ভুল। সেইরূপ নানাপ্রকার রূপ মূলদ্রব্য নহে। তন্মাত্রই মূলদ্রব্য। সেই প্রকার নানাপ্রকার শব্দ, স্পর্শ, রস বা গন্ধাদি নাই; কেবল তাহাদের তন্মাত্র আছে। আমরা একটী সন্দেশকে সন্দেশ বলিয়া দেখি, কিন্তু আমাদের সেই দর্শন সত্যদর্শন নহে, সে দর্শন ভ্রান্তিদর্শন। আমরা সন্দেশটীর স্থূলভূত

দর্শন করি। তাহার সূক্ষ্মভূত দর্শন করি না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সন্দেশটী সূক্ষ্মভূতের সমষ্টিমাত্র। সন্দেশটী শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র ও গন্ধতন্মাত্রের সমষ্টিমাত্র। এইরূপ প্রত্যেক ভূতপদার্থে তন্মাত্রই আছে—স্থূলভূত নাই। স্থূলভূত দর্শন—ভ্রান্তিদর্শন আর তন্মাত্র দর্শন—সত্যদর্শন। একটী নারীদেহের স্থূলরূপে মানুষ আকৃষ্ট হয়, স্থূলরূপে মানুষ বিমোহিত হয়। তাহার সূক্ষ্মরূপের বিষয় চিন্তা করে না বা দর্শন করে না; সেইহেতু তাহাতে মুগ্ধ হইয়া পরম পুরুষার্থজ্ঞানে সেই স্থূলভূতের চরণেই আত্মসমর্পণ করিয়া নরকের কীটরূপে পরিণত হয়। এইরূপ ভ্রান্তিদর্শন জন্য আমাদের বিষয়ে আসক্তি হয়। যখন এই ভ্রান্তিদর্শন দূরীভূত হইয়া সত্যদর্শন হয়, তখন বিষয়ের আসক্তিও কমিয়া যায়। স্থূলদর্শন ত্যাগ করিয়া তন্মাত্র দর্শন হইলে, আমরা আমাদের এতকালের ভ্রান্তি বুঝিতে পারি, আমরা আমাদের মূর্খতা ও বোকামি বুঝিতে পারি এবং তখন আমরা এই স্থূলভূতের আসক্তিও ত্যাগ করি। সূক্ষ্মভূত দর্শনে ও গ্রহণে যে সুখ ও আনন্দ হয় তাহা স্থূলভূতের সুখ অপেক্ষা কোটী কোটী গুণ বেশী। এই জন্য প্রকৃতপক্ষে বিষয়াসক্তি ত্যাগ করিতে হইলে, ধ্যান ও সমাধিদ্বারা সূক্ষ্মভূত দর্শন করা চাই অর্থাৎ তন্মাত্র দর্শন চাই। এইরূপ তন্মাত্রদর্শনকেই—নির্ব্বিতর্কা সমাপত্তি বলে। আমাদের স্মৃতি-পরিশুদ্ধি না হইলে, এই সূক্ষ্মদর্শন হয় না। স্মৃতির মধ্যে শব্দ ও অর্থ এই উভয় জ্ঞান থাকিলে স্মৃতি মলিন থাকে, এইজন্য অভ্যাস দ্বারা কেবল অর্থমাত্র চিন্তা করিতে হয়। শব্দ ত্যাগ করিতে হয়। অভ্যাস করিতে করিতে শব্দ ত্যাগ হইয়া, কেবল অর্থমাত্র চিন্তা করা যায়; এবং সেই অর্থ চিন্তা প্রগাঢ়ভাবে হইতে হইতে তন্মাত্র দর্শন হয়। শুদ্ধ শব্দ শুনিয়া যে জ্ঞান হয়, তাহা যথার্থ জ্ঞান নয়; কিন্তু শব্দের লক্ষ্য যে অর্থ, সেই অর্থজ্ঞান হইলে তবে যথার্থ জ্ঞান হইল বলা যায়। ইন্দ্রিয়দ্বারা বা মনদ্বারা সেই অর্থ

দৃষ্টিগোচর হইলে, তবে সেই জ্ঞানকে যথার্থজ্ঞান বলে। যে বিষয়, ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ বা মানসপ্রত্যক্ষ নয়; যেমন "অনাদি, অনন্ত, কাল ইত্যাদি" বলিলে শব্দমাত্রের জ্ঞান হইল; কিন্তু অর্থজ্ঞান হইল না। কাল—যে কিরূপ বিষয়, কিরূপ দ্রব্য, তাহা জানিতে পারিলাম না; সুতরাং এরূপ জ্ঞান, যথার্থজ্ঞান নহে—সত্যজ্ঞান নহে, তবে সত্যের আভাসমাত্র। অতএব শুদ্ধ শব্দ সাহায্যে যে জ্ঞান হয়, সে জ্ঞান যথার্থজ্ঞান নহে। শব্দের সাহায্য না লইয়া শুদ্ধ অর্থ সাহায্যে যে জ্ঞান হয়, তাহাই যথার্থজ্ঞান। আগম ও অনুমান হইতে আমাদের যে জ্ঞান হয়, তাহা যথার্থ নহে; কিন্তু ঐন্দ্রিয়িক ও মানস প্রত্যক্ষে, ধ্যান ও সমাধিযোগে যে অপরোক্ষজ্ঞান হয়—তাহাই যথার্থজ্ঞান। পরের মুখে শুনিয়া যে জ্ঞান তাহা পরোক্ষজ্ঞান, সে জ্ঞান অস্থায়ী ও বিচলিত হইতে পারে; কিন্তু নিজের ঐন্দ্রিয়িক বা মানস প্রত্যক্ষে যে জ্ঞান হয়, তাহা স্থায়ী এবং অটল ও অচল। তাহা কেহ কখনও ভগ্ন করিতে পারে না। নিজের অঙ্গ দগ্ধ হইলে যে প্রকার অপরোক্ষ যন্ত্রণার জ্ঞান হয়, পরের মুখে শুনিয়া সে প্রকার জ্ঞান হয় না। কোন একটী ফল নিজে খাইয়া আস্বাদ করিলে, তাহার যে প্রকার রসজ্ঞান হয়, অন্যের মুখে শুনিয়া সে প্রকার জ্ঞান হয় না। এইজন্য পরোক্ষজ্ঞান স্থায়ী হয় না, ভগ্ন হইতে পারে; কিন্তু অপরোক্ষজ্ঞান চিরস্থায়ী, কেহ ভগ্ন করিতে পারে না। ধর্ম্মসম্বন্ধেও তাই। ধর্ম্ম-সম্বন্ধে কেবল শ্রবণ ও মনন করিয়া নিশ্চিন্ত হইও না; সে বিষয়ে ধ্যান ও সমাধি করিবে। সমাধি ভিন্ন অপরোক্ষদর্শন হয় না। যে সাধকের সমাধি হয় নাই, তাহার মনের সন্দেহও ঘুচে নাই। সে আজ এক প্রকার, কাল অপর প্রকার সাধন গ্রহণ করিবে। সে আজ এক গুরু এবং কাল অপর গুরু গ্রহণ করিবে। সে আজ একজনের কথায়, আর কাল আর একজনের কথায় বিশ্বাস করিবে। এরূপ,

করিয়া সারাজীবন বৃথায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া কাল কাটাইবে। অর্থ ও পরিশ্রম বৃথা নষ্ট হইবে। কেহ বলিবে, "গাঁজা খাইলে সিদ্ধিলাভ হয়"—সে গাঁজা খাইবে। কেহ বলিবে, "ঊৰ্দ্ধবাহু হইলে সিদ্ধিলাভ হয়"—সে ঊর্দ্ধবাহু হইবে। কেহ বলিবে, "স্ত্রী, পুত্রকে পথে বসাইলে সিদ্ধিলাভ হয়"—সে তাহাই করিবে। কেহ বলিবে, "গেরুয়া পরিয়া পরের স্কন্ধে বসিয়া খাইলে সিদ্ধিলাভ হয়"—সে তাহাই করিবে। এবম্প্রকারে ধর্ম্মকে যাহার যেরূপ রুচি, সে সেরূপ রুচি অনুসারে গঠিত করিয়া দেশকে ছারখার করে। সনাতন ধর্ম্মগ্রন্থ অবলম্বন না করিলে, এইরূপে উৎসন্ন যাইতে হইবে অতএব সদ্গুরু ও সৎশাস্ত্র অবলম্বনে সুপথ নির্দ্ধারণ করিয়া তাহা ধরিয়া সাধন করিলে,সত্বর বাঞ্ছিত ফলপ্রাপ্ত হইবে।

এতয়ৈব সবিচারা নির্ব্বিচারা চ সূক্ষ্মবিষয়া ব্যাখ্যাতা ॥৪৪॥

ইহার দ্বারা সূক্ষ্ম বিষয়া সবিচারা ও নির্ব্বিচারা সমাপত্তি ব্যাখাত হইল।

যেমন স্থূল বিষয় অবলম্বন করিয়া "সবিতর্কা ও নির্ব্বিতর্কা" সমাপত্তি হয়; তেমন সূক্ষ্মবিষয়, তন্মাত্র, অহঙ্কার, বুদ্ধি ও অব্যক্ত অবলম্বন করিয়া "সবিচারা ও নির্ব্বিচারা" সমাপত্তি হয়। সাধন করিতে করিতে সমাধি যতই গাঢ় হইবে, ততই উত্তরোত্তর উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। শাস্ত্র পাঠ না করিয়াও যদি নিয়মমত সাধন করা যায়, তাহা হইলেও এই সকল উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায়। সাধারণের পক্ষে সাধন করিয়া এই সকল বিষয় প্রত্যক্ষ করা ভাল। শাস্ত্রপাঠে এই সকল বিষয় বুঝিতে পারিবে না। যাহারা বুঝিতে ইচ্ছা করিবে তাহারা সদ্গুরুর নিকট হইতে অথবা কোন বৃহৎ পাতঞ্জল-দর্শন হইতে পাঠ করিয়া ইহা বুঝিবে। এই গ্রন্থ সাধারণের জন্য—পণ্ডিতের জন্য নহে।

এই হেতু "সবিচারা ও নির্ব্বিচারা" সমাপত্তির বিস্তৃত ব্যাখ্যা দেওয়া হইল না।

সূক্ষ্মবিষয়ত্বং চালিঙ্গপর্য্যবসানম্ ॥ ৪৫ ॥

সূক্ষ্মবিষয়ত্ব অলিঙ্গে পর্য্যবসিত হয়।

কোন একটী দ্রব্যকে বিভাগ করিতে করিতে যে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র অংশ পাওয়া যায়, যে অংশকে আর বিভাগ করা যায় না; তাঁহাকে পরমাণু বলে। অনেকগুলি পরমাণুর যোগে একটী স্থূল বিষয় প্রকাশিত হয়। পরমাণু এত ক্ষুদ্র যে, তাহা সাধারণ চক্ষু সাহায্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। একটুক্‌রা লবণ যদি খানিকটা জলে মিশাইয়া দেওয়া যায়, তাহাহইলে, সেই সমুদয় জলই লবণাস্বাদ হইয়া যায় অর্থাৎ সেই লবণখণ্ডটী তখন অণুপরমাণুতে বিভক্ত হইয়া যায়। লবণের সেই পরমাণু অংশ আমাদের চক্ষুগোচর হয় না। আবার সেই জল ফুটাইলে যখন জলীয় অংশ বাষ্পাকারে আকাশে মিলাইয়া যায়, তখন জলের সহিত মিশ্রিত সেই লবণের পরমাণু সকল একত্রিত ও জমাট হইয়া পুনরায় আমাদের দৃষ্টিপথে আসে। একটা ক্ষুদ্র লবণখণ্ডে যে কত পরমাণু আছে, তাহার সংখ্যা গণনা করা যায় না। এই সকল পরমাণু আমরা সাধারণ চক্ষু দ্বারা দেখিতে পাই না। কিন্তু সমাধি অবস্থায় ধ্যানচক্ষুর্দ্বারা জানিতে পারি। এই সকল পরমাণু যখন অত্যন্ত সূক্ষ্মাবস্থা প্রাপ্ত হয়, যখন সেই সূক্ষ্মাবস্থা অপেক্ষা আর অধিক সূক্ষ্মাবস্থা হইতে পারে না, তখন তাহাদিগকে তন্মাত্র বলে। লবণের স্থূল পরমাণু হইতে আমরা লবণ আস্বাদ গ্রহণ করি, শর্করার স্থূল পরমাণু হইতে আমরা মিষ্ট আস্বাদ পাই। কুইনাইনের স্থূল পরমাণু হইতে আমরা তিক্ত আস্বাদ পাই; কিন্তু যখন এই স্থূল পরমাণু অত্যন্ত সূক্ষ্ম

হয় তখন তাহারা বিভিন্ন আস্বাদ বিহীন হয়। রস অর্থে—লবণরস অর্থাৎ লবণ আস্বাদ, মিষ্টরস অর্থে—মিষ্ট আস্বাদ, তিক্তরস অর্থে—তিক্ত আস্বাদ। স্থূল পরমাণু অবস্থায় আমরা লবণ, মিষ্ট ও তিক্তাদি ভিন্ন ভিন্ন রস আস্বাদন করিয়া থাকি; কিন্তু পরমাণু যখন অত্যন্ত সূক্ষ্ম হয় অর্থাৎ যখন তাহা "তন্মাত্র" হয়, তখন সেই তন্মাত্রে অর্থাৎ সেই রসতন্মাত্রে লবণ, মিষ্ট বা তিক্তাদি ভিন্ন ভিন্ন আস্বাদ থাকে না; এইজন্য তখন তাহাকে "রসতন্মাত্র" বলে। তন্মাত্র= তৎ মাত্র অর্থাৎ রসমাত্র কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন রস বা আস্বাদ নহে। এই রসতন্মাত্রই সূক্ষ্মরসের সূক্ষ্ম অবস্থা। সেইরূপ শব্দতন্মাত্রে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার শব্দজ্ঞান হয় না, কেবল শব্দমাত্র জ্ঞান হয়। সেইরূপ স্পর্শ-তন্মাত্র, রূপতন্মাত্র ও গন্ধতন্মাত্রের বিষয় বুঝিতে হইবে। সুতরাং স্থূলভূতের পরমাণু তন্মাত্রে লীন হয়; স্থূল-ভূতজ্ঞান অপেক্ষা তন্মাত্র-জ্ঞান সূক্ষ্ম, অধিক সত্য ও অধিক সুখদায়ক, আবার তন্মাত্র অস্মিতায় বা অহঙ্কারে লীন হয়। তন্মাত্রসকল অস্মিতা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এইজন্য তাহারা অস্মিতাতে লীন হয়। তন্মাত্র হইতে অস্মিতা আরও অধিক সূক্ষ্ম, অধিক সত্য ও অধিক সুখদায়িনী। আবার অস্মিতা মহত্তত্ত্বে লীন হয় কারণ মহত্তত্ত্ব হইতে অস্মিতা উৎপন্ন হইয়াছে। অস্মিতা অপেক্ষা মহত্তত্ত্ব অধিক সূক্ষ্ম, অধিক সত্য ও অধিক সুখদায়ক। আবার মহত্তত্ত্ব অব্যক্তে লীন হয় কারণ অব্যক্ত হইতে মহত্তত্ত্ব উৎপন্ন হইয়াছে। মহত্তত্ত্ব অপেক্ষা অব্যক্ত অধিক সূক্ষ্ম, অধিক সত্য ও অধিক সুখদায়ক। এই অব্যক্তই শেষ অবস্থা। ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্মাবস্থা। ইহা কোন কিছু হইতে উৎপন্ন হয় নাই; সুতরাং কোন কিছুতে লীন হয় না। যাহা কোন কিছু হইতে উৎপন্ন হইয়া আবার তাহার কারণ কোন কিছুতে লীন হয়, তাহাকে "লিঙ্গ" বলে। আর যাহার উৎপত্তিস্থান বা কারণ নাই,

তাহাকে অব্যক্ত বা "অলিঙ্গ" বলে। সৃষ্টির সময় এই অব্যক্ত হইতে মহত্তত্ত্ব এবং মহত্তত্ত্ব হইতে অস্মিতা এবং অস্মিতা হইতে ইন্দ্রিয়গণ ও পঞ্চতন্মাত্র এবং পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চমহাভূত উৎপন্ন হয়। যেমন অব্যক্ত বা অলিঙ্গ—প্রকৃতির আদি অবস্থা, সেইরূপ মহাভূতগণ—প্রকৃতির শেষ পরিণাম। অনুলোমগতিতে যেমন অব্যক্ত হইতে মহাভূতগণ প্রকাশিত হয়, সেইরূপ প্রতিলোমগতিতে মহাভূতগণ তন্মাত্রে, তন্মাত্র অস্মিতাতে, অস্মিতা মহত্তত্ত্বে ও মহত্তত্ত্ব অব্যক্তে লীন হয়। প্রকৃতির এই অনুলোম ও প্রতিলোম গতির বিজ্ঞান লাভ করিলে পুরুষ যে প্রকৃতি হইতে ভিন্ন তাহার অপরোক্ষ জ্ঞান হয়। পুরুষদ্বারা উপদৃষ্ট না হইলে প্রকৃতির কোনরূপ পরিণাম হয় না।

তা এব সবীজঃ সমাধিঃ ॥ ৪৬ ॥

তাহারাই সবীজ সমাধি।

বাহিরের বস্তু অবলম্বন করিয়া এই চারি প্রকারের সমাধি হয়, এইজন্য ইহাদের সবীজ সমাধি বলে। ইহাদের মধ্যে সবিতর্ক সমাধি সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। জীবের ভোগাবস্থা হইতে এই সমাধি কিঞ্চিৎ উন্নত, ইহা প্রায় ভোগাবস্থার তুল্য। ইহা সর্ব্বপ্রথম অবস্থা —ইহাই সমাধির আরম্ভ অবস্থা। নির্ব্বিতর্ক, সবিতর্ক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা সবিচার এবং তদপেক্ষা নির্ব্বিচার শ্রেষ্ঠ। নির্ব্বিচার পর্য্যন্ত, চিন্তা করিবার কোন না কোন একটী বিষয় থাকে এবং এই ধ্যানের বিষয় যত সূক্ষ্ম হইবে ততই উচ্চাবস্থার সমাধি হইবে এবং তাহার ফল তত অধিক শ্রেষ্ঠ হইবে। এই সবীজ সমাধির অনুষ্ঠানে সংসারের হাত হইতে একেবারে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না; তবে এস্থান হইতে শীঘ্র পতন হয় না। নির্ব্বিচার সমাধির অবস্থা পার

হইলে জ্ঞানালোকের উদয় হয়, সেই অসীম জ্ঞানশক্তি অবলম্বন করিয়া যোগী অনন্ত জ্ঞানসমুদ্রে উপনীত হন।

নির্ব্বিচারবৈশারদ্যেঽধ্যাত্মপ্রসাদঃ ॥ ৪৭ ॥

নির্ব্বিচার সমাধির বৈশারদ্য হইলে অধ্যাত্মপ্রসাদ হয়।

নির্ব্বিচার সমাধিও সবীজ সমাধি, তাহাতে বাহিরের অবলম্বন থাকে, সুতরাং তাহাতেও মলিনতা থাকে; যখন এই মলিনতার অপসারণে বৈশারদ্য হয় অর্থাৎ যখন চিত্ত আর রজস্তমোমল দ্বারা অভিভূত হয় না, যখন চিত্ত পরিষ্কার ও স্বচ্ছ হয় তখন যোগীর অধ্যাত্মপ্রসাদ লাভ হয় অর্থাৎ প্রকাশ গুণের উৎকর্ষ হয়। তখন পূর্ণজ্ঞান জন্মায় এবং যোগী যাহা দর্শন করেন তাহা সত্য। তাঁহার ভ্রান্তিদর্শন হয় না। এই জ্ঞান প্রত্যক্ষ জ্ঞান। ইহা পরের মুখে শুনিয়া, পুস্তক পাঠ করিয়া, বা অনুমান বা আগম সাহায্যে হয় নাই। ইহা প্রত্যক্ষ দ্বারা হইয়াছে। ইহা অপরোক্ষ জ্ঞান। এইরূপ সমাধি খুব উন্নত। সিদ্ধপুরুষেরা এইরূপ সমাধি দ্বারা প্রজ্ঞালাভ করিয়া চরম বিশেষ সকল দর্শন করিয়াছেন এবং তাহাই ইতর-জনসাধারণকে উপদেশ দান করেন। এই প্রজ্ঞাকে ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা বলে। ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা সম্পূর্ণ নির্ম্মল। সাধারণ প্রজ্ঞা সমল।

ঋতম্ভরা তত্র প্রজ্ঞা ॥ ৪৮ ॥

সেই অবস্থায় যে প্রজ্ঞা হয়, তাহার নাম ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা।

ঋতম্ভরা অর্থ সত্যম্ভরা। এই প্রজ্ঞালাভ হইলে জীবের সর্ব্বজ্ঞতালাভ হয়। জীবাত্মা এতাবৎকাল প্রকৃতির দৃশ্যই দর্শন করিতেছিলেন, কিন্তু যে

সাক্ষিচৈতন্যের বর্ত্তমানতায় এই দৃশ্য দেখিতেছিলেন, সেই সাক্ষিচৈতন্যের দিকে দৃষ্টিপাত করেন নাই, এক্ষণে জীবাত্মার সমুদয় দৃশ্যের অপলাপ হওয়াতে যে সাক্ষিচৈতন্যের আলোকে এই সমুদয় দৃশ্য দেখিতেছিলেন, সেই সাক্ষিচৈতন্যের দিকে দৃষ্টি পড়ে। যেমন কোন ধনী কোন মহোৎসব উপলক্ষে একটী খুব বড় উজ্জ্বল আলোক জ্বালাইয়া দেন এবং সেই আলোকের নিম্নে লোকজনকে আদর অভ্যর্থনা করেন; কিন্তু গভীর রাত্রিতে যখন উৎসবের সমুদয় লোকজন চলিয়া যায় এবং উৎসবক্ষেত্র কোলাহলবিহীন হয়, তখন সেই উৎসবস্বামী—যে বড় আলোকটীর সাহায্যে এই সমস্ত বাহিরের দ্রব্যাদি দেখিতেছিলেন, সেই আলোকটীর প্রতি দৃষ্টিপাত করেন; সেইরূপ জীবাত্মার বাহিরের সমুদয় বিষয় আবর্জ্জনা পরিষ্কার হইলে সেই সাক্ষিচৈতন্যের দিকে দৃষ্টি পড়ে অর্থাৎ যাহা দ্বারা সমুদয় দেখিতেছিলেন ও বুঝিতেছিলেন এক্ষণে তাহাকেই দেখেন এবং চৈতন্যস্বরূপ ও জীবের অস্মিতাভাবকে অবভাসিত করিয়া, তাহার অবভাসকরূপে বর্ত্তমান থাকেন। সাধারণতঃ আমরা যাহা প্রত্যক্ষ করি তাহা আপেক্ষিক সত্য কিন্তু যোগী ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা হইলে যাহা প্রত্যক্ষ করেন, তাহা সম্পূর্ণ সত্য। এইজন্য ইহাকে ঋতম্ভরা বা সত্যম্ভরা প্রজ্ঞা বলে।

শ্রুতানুমানপ্রজ্ঞাভ্যামন্যবিষয়া বিশেষার্থত্বাৎ ॥ ৪৯ ॥

এই প্রজ্ঞা শ্রুত ও অনুমানজাত প্রজ্ঞা হইতে ভিন্নবিষয়া, যেহেতু তাহা বিশেষবিষয়ক।

শুনিয়া যে জ্ঞান হয় বা অনুমান দ্বারা যে জ্ঞান হয়, তাহা সত্যজ্ঞান নহে তাহা ভ্রান্তিজ্ঞান। শ্রুতানুমান দ্বারা বিশেষবিষয়ক জ্ঞান হইতে পারে না। তাহার দ্বারা সামান্যবিষয়ক জ্ঞান হয়।

তজ্জঃ সংস্কারোঽন্যসংস্কারপ্রতিবন্ধী ॥ ৫০ ॥

তাহা হইতে জাত অর্থাৎ সেই সমাধি হইতে জাত ঋতম্ভরা প্রজ্ঞার যে সংস্কার, তাহা অন্য বৈষয়িক সংস্কারের প্রতিবন্ধী অর্থাৎ প্রতিকূল।

সমাধিপ্রজ্ঞার সংস্কার চিত্তে পড়ে ও সংগৃহীত হয়। এই সংস্কার কি আমাদের অনিষ্ট করে? না—ইহা অনিষ্ট করে না, বরং তদ্বিপরীত। ইহা আমাদের ইষ্টের কারণ হয়; কারণ এই সংস্কার বিদ্যাসংস্কার। ইহা আমাদের অবিদ্যা সংস্কারকে ধ্বংস করে, আমাদের বিক্ষেপ সংস্কারকে নষ্ট করে ও চিত্তকে স্থির করে। চিত্ত স্থির হইলে, চিত্তে বিক্ষেপ না হইলে আর ব্যুত্থান হয় না। এই প্রজ্ঞাকৃত সংস্কার, ব্যুত্থান সংস্কারকে নষ্ট করে। এইহেতু ইহা আমাদের অপকার করে না।

চিত্তমধ্যে দুইপ্রকার সংস্কার থাকে,—জ্ঞানসংস্কার ও ক্রিয়া-সংস্কার। জ্ঞানসংস্কার দ্বারা আমাদের স্মৃতি উৎপন্ন হয় এবং ক্রিয়া-সংস্কারের দ্বারা আমাদের কার্য্যচেষ্টা হয়। এ সকল সংস্কার আপনা আপনি উৎপন্ন হয়—ইহাদের উপর সাধারণ জীবের কোন ক্ষমতা নাই। ইহারা উৎপন্ন হইবেই হইবে এবং সেই সংস্কার দ্বারা বাধ্য হইয়া জীবকে কার্য্য করিতে হইবে। জীব মনে করে যে এই কার্য্যের উপর তাহার কর্ত্তৃত্ব আছে, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ ভ্রম। সাধারণ জীব এইসকল সংস্কারের সম্পূর্ণ বশীভূত, কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞাসম্পন্ন সাধক ও উন্নত যোগিগণ এই সংস্কারের বশীভূত নহেন। সাধারণ লোকের মনে যখন যে বাসনার উদয় হয় ও কার্য্যচেষ্টা হয়, তাহারা বিনা বিচারে তাহাই করে। কার্য্য ভাল কি মন্দ তাহা বিচার করিতে চাহে না এবং বিচার করিবার ক্ষমতাও নাই। সাধকের চিত্ত হইতে যে সকল বাসনার উদয় হয় বা যে সকল কার্য্যচেষ্টা হয়, সাধক তাহা ভাল করিয়া বিচার করেন এবং তাহা আত্মার মঙ্গলকর হইলে—করেন,

নচেৎ তাহা ত্যাগ করেন। সাধারণ জীব এই সংস্কারের সম্পূর্ণ অধীন; কিন্তু সাধক এই সংস্কারকে সংযত করিতে পারেন।

এই সংস্কার আবার ক্লিষ্ট অর্থাৎ অবিদ্যামূলক ও অক্লিষ্ট অর্থাৎ বিদ্যামূলক। বিদ্যাসংস্কার অবিদ্যাসংস্কারকে ধ্বংস করে। সম্প্রজ্ঞাত সমাধিজাত—সংস্কার বিদ্যামূলক. এইজন্য তাহা অবিদ্যামূলক ক্লিষ্ট-সংস্কারকে ধ্বংস করে। অবিদ্যাসংস্কার দূরীভূত হইলে জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা হয় অর্থাৎ পরাজ্ঞান হয়। পরাজ্ঞান হইলে পরাবৈরাগ্য হয় ও পরাভক্তি হয়

তস্যাপি নিরোধে সর্ব্বনিরোধাৎ নির্বীজঃ সমাধিঃ ॥৫১॥

তাহারও নিরোধ হইলে অর্থাৎ সেই সম্প্রজ্ঞাত সংস্কারেরও নিরোধ হইলে সর্ব্বনিরোধ হয় অর্থাৎ সমুদয় সংস্কারের নিরোধ হয় এবং তাহা হইতে নির্ব্বীজ সমাধি উৎপন্ন হয়।

সম্প্রজ্ঞাত সমাধিদ্বারা চিত্তে উক্ত সমাধির সংস্কার পড়ে। এই সংস্কারের নিরোধ হইলেই অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি হয়। অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি হইলে দ্রষ্টা পুরুষ স্বরূপে স্থিত হন। পুরুষ সদাকালই দ্রষ্টা ছিলেন, আছেন এবং থাকিবেন। চিত্ত ব্যুত্থিত হইলে উপদৃষ্ট হয়, আর শান্ত হইলে উপদৃষ্ট হয় না। এইরূপ লৌকিক দৃষ্টিতে পুরুষকে বদ্ধ আর মুক্ত বলা হয়।

সমাধিপাদ সমাপ্ত।

সাধন-পাদঃ।

তপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ ॥ ১ ॥

তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রণিধান ক্রিয়াযোগ।

ক্রিয়াযোগ ব্যতীত যে জ্ঞান, তাহা কাঁচা জ্ঞান, তাহা পাকা জ্ঞান নহে।" কর্ম্মের অনুষ্ঠান ভিন্ন পাকা জ্ঞান হয় না। নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠানে পাকা জ্ঞান হয় এবং সেই জ্ঞান মুক্তির হেতু। শুদ্ধ পুস্তক পাঠ বা তর্ক করিয়া বেড়াইলে পাকা জ্ঞান হইবে না। পাকা জ্ঞান লাভ করিতে হইলে, পরিশ্রম আবশ্যক। বিনা পরিশ্রমে কেহ কখনও এ জগতে কোন বিষয়ে সাফল্যলাভ করিতে পারে নাই। কেবল বাক্যব্যয়ে অপরোক্ষানুভূতি হয় না। প্রাণপণে মহর্ষি পতঞ্জলির উপদিষ্ট "ক্রিয়াযোগ" অনুষ্ঠান করিতে হইবে। এই ক্রিয়াযোগ ত্রিবিধ,—তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রণিধান। তপঃ দ্বারা শরীর ও ইন্দ্রিয়ের পরিশুদ্ধি হয়; স্বাধ্যায় দ্বারা মন, অহঙ্কার ও বুদ্ধির পরিশুদ্ধি হয় এবং ঈশ্বরপ্রণিধান দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয় অর্থাৎ চিত্তের রজস্তমোমল বিদূরিত হয়। আমরা যে কয়টী উপকরণ লইয়া জগতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি সেই উপকরণগুলির পরিশুদ্ধি না হইলে তাহাদের সম্যক্-জ্ঞান বা অপরোক্ষানুভূতি কিছুই হইবে না। অপরোক্ষানুভূতি ভিন্ন আমরা মুক্তি পাইব না। যিনি যত উগ্রচেষ্টা দ্বারা এই ক্রিয়াযোগ অবলম্বন করিয়া সাধনা করিবেন, তিনি তত শীঘ্র কৃতকার্য্য হইবেন।

আমরা তিনপ্রকার দেহ লইয়া এই জগতে বিচরণ করিতেছি। (১) স্থূলদেহ, (২) সূক্ষ্মদেহ ও (৩) কারণদেহ। অন্নের দ্বারা স্থূলদেহ নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহাকে অন্নময় কোষ বলে। প্রাণ, মন ও বুদ্ধিদ্বারা সূক্ষ্মদেহ হইয়াছে। ইহাদের যথাক্রমে প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময়

কোষ বলে। অস্মিতাদ্বারা কারণদেহ হইয়াছে। ইহাকে আনন্দময় কোষ বলে। জীবাত্মা এই পঞ্চকোষের আবরণে বদ্ধ হইয়াছেন। এই পঞ্চকোষ হইতে মুক্তি পাইলে জীবাত্মা মুক্ত হইবেন। সর্ব্ব বাহিরে অন্নময়, তদভ্যন্তরে প্রাণময়, তদভ্যন্তরে মনোময়, তদভ্যন্তরে বিজ্ঞানময় ও সকলের অভ্যন্তরে আনন্দময় কোষ অবস্থিত। এই কয়টী কোষের মলিনতা দূর না হইলে অপরোক্ষানুভূতি হয় না। এইজন্য এই স্থূলদেহের সংস্কার জন্য তপঃ, সূক্ষ্মদেহের সংস্কার জন্য স্বাধ্যায় ও কারণ-দেহের সংস্কার জন্য ঈশ্বরপ্রণিধান আবশ্যক। শুদ্ধ যে ধর্ম্মকার্য্যের জন্য ইহাদের সংস্কার আবশ্যক, তাহা নহে; সাধু অসাধু, ধনী দরিদ্র, সরল কপট, রাজা প্রজা, যোগী ভোগী সকলেরই এই সংস্কার আবশ্যক। এই সংস্কারকার্য্য ভিন্ন আমাদের শরীর ও মন, পীড়িত এবং অসুস্থ হয়। এই সংস্কার সাধন করিলে শরীর ও মন সুস্থ থাকে। শরীর ও মন পীড়িত হইলে, কেহই কোন কার্য্য ভাল করিয়া করিতে পারে না; কিন্তু শরীর ও মন সুস্থ থাকিলে আমাদের সকল কার্য্যই সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। অতএব এই ক্রিয়াযোগ সাধন করিলে, সকলেই উপকৃত হইবেন। কাহারও কোন ক্ষতি হইবে না। যতকাল ইহাদের সংস্কারকার্য্য সাধিত না হয়, ততকাল আমরা ইহাদের বশবর্ত্তী হইয়া সামান্য ভৃত্যের ন্যায় ইহাদের সেবা করিতে বাধ্য হই; আর ইহাদের সংস্কারকার্য্য সাধিত হইলে, আমরা ইহাদের প্রভু হইয়া আমাদের সুবুদ্ধি অনুসারে ইহাদিগকে পরিচালিত করিতে পারি। শরীরের বশবর্ত্তী হইয়া ও আলস্যে অভিভূত হইয়া আমরা বেলা ৮টা পর্য্যন্ত নিদ্রা যাই। মানুষের কর্ত্তব্য ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান করা, কিন্তু আমরা তখন উঠিতে পারি না। চক্ষুর বশবর্ত্তী হইয়া আমরা কুদৃশ্য দর্শন করিয়া আত্মাকে কলুষিত করি। কর্ণের বশবর্ত্তী হইয়া আমরা কু-কথা শ্রবণ করিয়া আত্মাকে কলুষিত করি। এইহেতু ক্রিয়াযোগ

দ্বারা ইহাদের সংস্কার আবশ্যক। যেমন অরণ্য হইতে বন্য অশ্ব ধরিয়া আনিয়া, অগ্রে তাহাকে শিক্ষিত করিয়া লইতে হয়, তৎপরে তাহাকে গাড়ীতে যুতিতে হয়; নচেৎ শিক্ষিত করিবার পূর্ব্বে তাহাকে গাড়ীতে যুতিলে সে গাড়ী ভাঙ্গিয়া ফেলে ও আরোহীকে বিনষ্ট করে; সেইরূপ দুর্বৃত্ত শরীর ও ইন্দ্রিয় সংস্কৃত না করিয়া জগতে ব্যবহারপরায়ণ হইলে, আমাদের শরীর ধ্বংস হয় ও আত্মা কলুষিত হয়। এই হেতু আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই ক্রিয়াযোগ অনুষ্ঠান করা উচিত। অসংস্কৃত শরীরদ্বারা সর্ব্বদা পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান হয়। অসংস্কৃত মনোমধ্যে সর্ব্বদা পাপচিন্তার উদয় হয়। অসংস্কৃতবুদ্ধি হিতাহিতজ্ঞান-শূন্য পশুবুদ্ধির ন্যায়। সেইজন্য ক্রিয়াযোগ দ্বারা ইহাদের শোধন করা আবশ্যক। অসংস্কৃত জীবন সর্ব্বভূতের দাস। সংস্কৃত জীবন সর্ব্বভূতের প্রভু। অসংস্কৃত জীবন অতীব দুর্ব্বল ও কাপুরুষ। সংস্কৃত জীবনের ক্ষমতা অসীম। তিনি সর্ব্বভূতের উপর আধিপত্য স্থাপন করেন। শাস্ত্রে এই ক্রিয়াযোগ সম্বন্ধে নানাপ্রকার অনুষ্ঠান আছে। একজনে সকলপ্রকার অনুষ্ঠান করিতে পারে না। যাহার পক্ষে যে অনুষ্ঠান শ্রেয়ঃ সে তাহাই গ্রহণ করিবে। যদি নিজে বুঝিতে না পারে, তাহা হইলে, গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিবে।

স্বাধ্যায় দ্বারা সূক্ষ্মদেহ সংস্কৃত হয়—প্রাণ, মন ও বুদ্ধির মলিনতা কাটিয়া যায়। ইষ্টমন্ত্র জপ ও অধ্যাত্মগ্রন্থের আলোচনাকে স্বাধ্যায় বলে। প্রাণ, মন ও বুদ্ধির গতি সর্ব্বদাই বাহিরের দিকে। বাহিরের বিষয়ে ইহারা বড়ই আসক্ত। এই বিষয়াসক্তিই ইহাদের মলিনতা। বিষয় বিষস্বরূপ। এই বিষয়াসক্তিত্যাগের জন্য ইহাদিগকে আর একটী আসক্তির জিনিস্ দিতে হইবে। আর একটী আসক্তির দ্রব্য না পাইলে, ইহারা বিষয়াসক্তি ত্যাগ করিবে না। বিষয়াসক্তির পরিবর্ত্তে ইহাদিগকে ভগবদাসক্তি প্রদান কর। বিষয় বাহিরের জিনিস, আর

ভগবান্ ভিতরের জিনিস; সুতরাং ইহাদের বাহিরের গতি নিরোধ করিয়া ভিতরের দিকে আনিতে হইবে। বাহিরের বিষয়েও সুখ আছে আবার ভিতরের বিষয়েও সুখ আছে। বাহিরের সুখ অস্থায়ী আর ভিতরের সুখ স্থায়ী। বাহিরের সুখ অল্প আর ভিতরের সুখ অধিক। বাহিরের সুখ সমল আর ভিতরের সুখ নির্ম্মল। আত্মা একবার ভিতরের সুখের আভাস পাইলে আর বাহিরের বৈষয়িক সুখের দিকে ধাবিত হইবে না। সে ভিতরের সুখের আভাস পায় নাই; তাই বাহিরে ছুটাছুটী করিতেছে। আত্মার এই বহির্ম্মুখ গতি নিবারণ করিবার জন্য ও আত্মাকে অন্তর্ম্মুখী করিবার জন্য এই স্বাধ্যায়রূপ ক্রিয়াযোগ আবশ্যক।

ঈশ্বর প্রণিধান। ভগবানে সর্ব্বকর্ম্মের ফল অর্পণ পূর্ব্বক নিষ্কাম-ভাবে কর্ম্মকরার নাম ঈশ্বর প্রণিধান। প্রারব্ধের সংস্কারহেতু আমাদের কার্য্য করিতেই হইবে। আমরা কার্য্য করিতে বাধ্য। কখন কার্য্যের দ্বারা সুখ হইবে, কখন বা দুঃখ হইবে। আমার সুখদুঃখ আমিই সৃষ্টি করিয়াছি—ইহার জন্য অন্য কেহ দায়ী নয়। আমার প্রারব্ধে যখন সুখ আসিবার হয়—তখন সুখ আসে এবং যখন দুঃখ আসিবার হয়—তখন দুঃখ আসে। এই প্রারব্ধের সুখ ও দুঃখকে কেহ বাধা দিতে পারে না। ইহা আসিবেই। আমাদের কর্ম্মানুযায়ী আমাদের সংস্কার হয়। এই সংস্কার চিত্তে অঙ্কিত আছে। অনাদি অনন্তকাল হইতে আমরা এই জন্মমৃত্যুপ্রবাহে ভ্রমণ করিতেছি এবং অনাদি অনন্তকালের কর্ম্মসংস্কার আমাদের চিত্তে অঙ্কিত হইয়া আছে। অসংখ্য অসংখ্য সংস্কার আমাদের চিত্তে অঙ্কিত আছে। যখন শৃগাল হইয়া জন্মিয়াছি, তখন শৃগালের সংস্কার আমাদের চিত্তে অঙ্কিত হইয়াছে। যখন কুকুর হইয়া জন্মিয়াছি, তখন কুকুরের সংস্কার চিত্তে অঙ্কিত হইয়াছে। যখন বিড়াল হইয়া জন্মিয়াছি, তখন বিড়ালের সংস্কার

চিত্তে অঙ্কিত হইয়াছে। আবার যখন মানুষ হইয়া জন্মিয়াছি, তখন মানুষের সংস্কার চিত্তে অঙ্কিত হইয়াছে। এই অনাদি অনন্তকালের কোটী কোটী জন্মের সংস্কার আমাদের চিত্তে অঙ্কিত হইয়া আছে। এই কোটী কোটী সংস্কারের মধ্যে কতকগুলি সংস্কারের বোঝা ঘাড়ে করিয়া আমরা মানব জন্ম লইয়াছি। যে সংস্কারগুলির বোঝা লইয়া মানবজীবন অতিবাহিত করিতেছি, তাহাই প্রারব্ধ সংস্কার; আর বাকী যে সংস্কারগুলি পিছনে পড়িয়া রহিল, তাহার নাম সঞ্চিত সংস্কার। সঞ্চিত সংস্কারের কার্য্য বর্ত্তমান মনুষ্যজন্মে হইবে না। বর্ত্তমান জীবনে শুদ্ধ প্রারব্ধ সংস্কারের ফল ভোগ করিতে হইবে। আর আমরা নূতন করিয়া যে কর্ম্ম ইহজীবনে আরম্ভ করিব তাহার সংস্কারও চিত্তে পড়িবে এবং সেই সংস্কারের ফল ইহজন্মে হইতেও পারে নাও হইতে পারে, কিন্তু প্রারব্ধ সংস্কারের ফল আমাদিগকে ভোগ করিতেই হইবে। ফলকামনাই চিত্তের সংস্কার। সেইজন্য ফলকামনা করিয়া যে কর্ম্ম করিবে তাহার সংস্কার চিত্তে পড়িবে এবং ফলকামনা শূন্য হইয়া যে কর্ম্ম করিবে, তাহার সংস্কার চিত্তে পড়িবে না; সুতরাং নূতন সংস্কারের জন্ম হইবে না বরং পুরাতন সংস্কারগুলি ক্ষয় হইয়া যাইবে। চিত্তে যতদিন সংস্কার থাকিবে ততদিন চিত্ত মলিন থাকিবে। সংস্কারই চিত্তের মলিনতা, অতএব ফলকামনা ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করিলে আমাদের চিত্তের মলিনতা দূর হইবে ও চিত্ত পরিষ্কার হইবে। এইহেতু যে কোন সৎকার্য্য করিবে, তাহার ফল ভগবানে অর্পণ করিয়া করিবে। নিজের ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য কর্ম্ম করিলে, তাহা ইন্দ্রিয়ে অর্পিত হইবে আর ভগবৎ তৃপ্তির জন্য কর্ম্ম করিলে, তাহা ভগবানে অর্পিত হইবে। ভগবানে কর্ম্মার্পণ নিতান্ত সহজ নহে। পুরোহিতগণ ঠাকুর পূজা করিয়া ভগবানে কর্ম্মফল অর্পণ করেন। কিন্তু তাঁহাদের দৃষ্টি নৈবেদ্য ও দক্ষিণার উপর থাকে। নৈবেদ্য ও দক্ষিণা বেশী

হইলে মনটা সন্তুষ্ট হয়, আর নৈবেদ্য ও দক্ষিণা কম হইলে মনটা বিরক্ত হয়। এইরূপ পূজাতে ভগবানে কর্ম্মফল অর্পণ হয় না। ইহা নিজের ইন্দ্রিয় ও মনের চরণে অর্পিত হইল। ইহাকে ঈশ্বরার্পণ বা ঈশ্বরপ্রণিধান বলে না। সেই হেতু কর্ম্মফলের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া, কেবলমাত্র তাঁহার দিকে চাহিয়া চাহিয়া সমুদয় কর্ত্তব্যকার্য্যগুলি করিয়া যাও। সুখ আসে আসুক, আর দুঃখ আসে আসুক; তাহার দিকে লক্ষ্য করিও না। সমভাবে সুখ ও দুঃখ সহ্য করিয়া যাইবে। বৈষয়িক সুখও দুঃখের কারণ; সেইহেতু বৈষয়িক সুখও আমাদের শত্রু। এইজন্য যেমন দুঃখকে সহ্য করিতে হয়, সেইরূপ সুখকেও সহ্য করিতে হয়। অতএব সুখ ও দুঃখ সমভাবে সহ্য করিয়া, কেবলমাত্র ঈশ্বরপ্রীতির জন্য কর্ত্তব্যকার্য্য সকল করিয়া যাও, তাহা হইলে, আর চিত্তে নূতন সংস্কারের দাগ পড়িবে না এবং পুরাতন সংস্কারগুলিও ক্রমে ক্ষয় হইয়া চিত্ত পরিষ্কার হইবে। চিত্ত পরিষ্কার হইলেই চিত্ত স্থির হইবে। এই চিত্তস্থৈর্য্যই সকল সাধনের মূল উদ্দেশ্য।

এই ক্রিয়াযোগের দ্বারা চিত্তে নূতন কোন প্রকার শক্তি উদ্ভূত হয় না। চিত্তমধ্যেই অসীম অনন্ত শক্তি নিহিত আছে, তবে সেই শক্তি অপ্রকাশিত আছে। চিত্তের রজস্তমোমলের দ্বারা সেই শক্তি আবরিত হইয়া প্রকাশ হইতে পারিতেছে না। ক্রিয়াযোগের দ্বারা এই রজস্তমোমল বিদূরিত হইলে চিত্তের সেই শক্তি প্রকাশিত হয়।

শক্তি মূলতঃ একা। যে শক্তিদ্বারা আমরা ভাল কার্য্য করি, সেই শক্তির সাহায্যেই আমরা মন্দ কার্য্য করি। ভাল কার্য্য করিলে তাহার ফল সুখ, আর মন্দ কার্য্য করিলে তাহার ফল দুঃখ। সকলেই সুখ পাইতে চায়। দুঃখ পাইতে কেহ চায় না। যাহার বুদ্ধি যেমন সে সেইরূপ কার্য্য করে। যাহার বুদ্ধি সৎ, যাহার হিতাহিত জ্ঞান আছে,

সে আত্মার উন্নতিকর কার্য্য করিয়া সুখ পায়; আর যাহার বুদ্ধি অসৎ, যাহার হিতাহিত জ্ঞান নাই, যাহার বুদ্ধিতে ময়লা আছে, সে কোন্ কার্য্য আত্মার হিতকর আর কোন্ কার্য্য আত্মার অহিতকর তাহা বুঝিতে না পারিয়া—প্রকৃতির বশে অবশভাবে যাহা সম্মুখে উপস্থিত হয়, তাহাই নির্ব্বিচারে করিয়া যায়। এইরূপে সাধারণ লোক আত্মাকে দিন দিন অধঃপাতিত করে। বুদ্ধির এই মলিনত্ব কাটাইতে হইলে ক্রিয়াযোগ আবশ্যক। দৃঢ় যত্ন ও অধ্যবসায়ের সহিত ক্রিয়াযোগের অনুষ্ঠান করিলে, বুদ্ধির এই মলিনতা কাটিয়া গিয়া বুদ্ধি পরিষ্কার হয়, তখন আমরা সকল বিষয় ভাল করিয়া দেখিতে ও বুঝিতে পারি এবং আমাদের শক্তিকে অবনতিকর নীচকার্য্যে ব্যয় না করিয়া, উন্নতিকর উচ্চকার্য্যে লাগাইতে পারি। এইরূপ করিলে শক্তির সুব্যবহার হয় ও সেই মহাশক্তির পূজা করা হয়। আমরা শক্তিকে নীচকার্য্যে লাগাইয়া শক্তির অবমাননা করিতেছি। শক্তির অবমাননা করিলে, মহাশক্তির অপমান করা হইল; মহাশক্তিকে অপমান করিলে, অশ্রদ্ধা করিলে, তাঁহার পূজা না করিলে, আমাদের মঙ্গল কি করিয়া হইবে! আমরা মহাশক্তির অবমাননা করিয়া,—পাশবিক ভোগে মত্ত হইয়া, অধঃপাতে যাইতেছি এবং দৈবভোগে বঞ্চিত হইতেছি। এই মহাশক্তির আরাধনা কর, দৈবভোগপ্রাপ্ত হইবে। আশ্বিন মাসে যেরূপে মহাশক্তির পূজা হয় তাহাতে মহাশক্তির প্রকৃত আরাধনা হয় না—তাহাতে মহাশক্তির অপূজা হয়। অগ্রে শক্তিকে চিনিতে শিক্ষা কর। শক্তিকে না চিনিয়া কিরূপে শক্তির পূজা করিবে। ঠাকুরদালানে মা দুর্গার প্রতিমাকে বসাইয়া যেরূপভাবে পূজা করিতেছ, উহাতে মহাশক্তির পূজা হয় না। যথার্থ অধিকারীর পক্ষে মহাশক্তির পূজায় প্রতিমার আবশ্যকতা নাই, নৈবেদ্য বা ধূপধূনার আবশ্যকতা নাই। ভক্তিভরে মহর্ষি পতঞ্জলি উপদিষ্ট ক্রিয়াযোগ অনুষ্ঠান করিলেই তোমার প্রকৃত শক্তি-পূজা হইবে; তখন

তুমি অসীম ও অনন্ত শক্তির অধিকারী হইতে পারিবে আর শক্তির অবমাননা করিলে শক্তিহীন হইয়া উৎসন্ন যাইবে।

সমাধিভাবনার্থঃ ক্লেশতনূকরণার্থশ্চ ॥ ২ ॥

সমাধি ভাবনার জন্য আর ক্লেশকে তনু অর্থাৎ ক্ষীণ করিবার জন্য উপরোক্ত ক্রিয়াযোগ অবলম্বন করিতে হয়।

ক্রিয়াযোগের দ্বারা শরীর, ইন্দ্রিয় ও মন প্রভৃতির মল কাটিয়া যায়। এই মলিনতা পরিষ্কার হইলেই ধ্যান ও সমাধির সুবিধা হয়। রজোগুণের চাঞ্চল্য ও তমোগুণের জড়তাই শরীর, ইন্দ্রিয় ও মনের মলিনত্ব। যখন এই রাজস চাঞ্চল্য ও তামস জড়তা দূরীভূত হয়, তখন ক্লেশও ক্ষীণ হয় এবং সমাধিও অভিমুখীন হয়। ক্লেশকে ক্ষীণ করিয়া তৎপরে নষ্ট করিতে হয়। কোন জন্তুকে কয়েকদিন খাইতে না দিলে তাহার বল ক্ষীণ হইয়া যায় এবং সে ক্রমে ক্রমে মরিয়া যায়; সেইরূপ শরীর, ইন্দ্রিয় ও মনের নিকট হইতে পাশবিক আসক্তি টানিয়া লইলেই, তাহাদের পাশবিক স্বভাব বিদূরিত হইয়া দেবভাব উৎপন্ন হয়। এই পাশবিক স্বভাবই রাজস চাঞ্চল্য ও তামস জড়তা এবং দেবভাবই সাত্ত্বিকতা। শরীর, ইন্দ্রিয় ও মনে যতক্ষণ পশুভাব বর্ত্তমান থাকিবে, ততক্ষণ সমাধি হইবে না। এই পাশবিক সংস্কারই ক্লিষ্টসংস্কার। চিত্ত হইতে ক্লিষ্টসংস্কার ধ্বংস হইলে, আর আমাদের ক্লেশের উদয় হয় না। "আমি শরীর" ইহা অবিদ্যাজাত ক্লিষ্টসংস্কার। সমাধিদ্বারা মহত্তত্ত্বদর্শন হইলে, তখন "আমি শরীর নহি" এই জ্ঞান প্রকৃষ্টরূপে উৎপন্ন হয়। তখন শরীরের সুখ ও দুঃখে, আমার সুখ দুঃখ অনুভব হয় না। তখন শরীরের সুখে আমি সুখী হই না এবং শরীরের দুঃখে

আমি দুঃখী হই না। তখন আমার সুখদুঃখে সমজ্ঞান হয়। "আমি শরীর নহি" ইহা অক্লিষ্টসংস্কার বা বিদ্যাসংস্কার বা প্রজ্ঞাসংস্কার।

অবিদ্যাঽস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ পঞ্চক্লেশাঃ ॥ ৩ ॥

উপরোক্ত ক্লেশ পাঁচ প্রকার। অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ।

বস্তুতঃ আমাদের ক্লেশ নাই। এই ক্লেশজ্ঞান, মিথ্যাজ্ঞান বা ভ্রান্তিজ্ঞান। ইহা বিপর্য্যয়জ্ঞান। এই ভ্রান্তিজ্ঞান লইয়া, যাহা "আমি" নহি, তাহাকে "আমি" মনে করিতেছি। এইজন্যই এই ক্লেশ ভোগ করিতেছি। যখন প্রকৃত "আমাকে" জানিতে পারিব, তখন এই ভ্রান্তিদর্শন বা বিপর্য্যয়জ্ঞান নষ্ট হইবে। অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশই এই সমুদয় ক্লেশের মূল কারণ। ক্রিয়াযোগদ্বারা এই অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ নষ্ট হইলে, আমরা ক্লেশের হাত হইতে মুক্তি পাই।

অবিদ্যাক্ষেত্রমুত্তরেষাং প্রসুপ্ততনুবিচ্ছিন্নোদারাণাম্ ॥ ৪ ॥

অবিদ্যাক্ষেত্রে (১) প্রসুপ্ত, (২) তনু, (৩) বিচ্ছিন্ন ও (৪) উদার এই চারি অবস্থায় ক্লেশ অবস্থিত আছে।

(১) প্রসুপ্ত অর্থাৎ নিদ্রিত। নিদ্রিত কিন্তু মৃত নহে। ক্লেশের সংস্কার তখন নিদ্রিত অবস্থায় আছে। জাগরিত হইলে উদার অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। নিদ্রিত অবস্থায় সেই সংস্কারের কার্য্য হয় না। আমাদের নিদ্রার সময় আমরা যেমন কোন কার্য্য করিতে পারি না, আবার জাগরিত হইয়া কার্য্য করি; সেইরূপ প্রসুপ্ত ক্লেশসকল সুপ্ত অবস্থায়

আমাদের ক্লেশ দান করে না, কিন্তু জাগরিত হইয়া অর্থাৎ উদার অবস্থায় তাহারা কার্য্য আরম্ভ করে এবং সেই কার্য্যের দ্বারা আমরা ক্লেশ পাই। ক্রিয়াযোগদ্বারা আমরা এই প্রসুপ্ত ক্লেশকে দগ্ধ করিতে পারি; তখন ইহারা আর কার্য্যকর হয় না। যেমন বীজ দগ্ধ হইলে তাহা হইতে আর অঙ্কুরোৎপন্ন হয় না, তেমনি ক্লেশবীজ দগ্ধ হইলে, তাহার কার্য্যও বন্ধ হইয়া যায়, তাহা হইতে আর ক্লেশের উৎপত্তি হয় না। ক্রিয়াযোগ-দ্বারা সমাধি হইলে এই ক্লেশবীজ ধ্বংস হইয়া যায়। এই প্রকার মুক্তপুরুষের সম্মুখে বিষয় আসিলেও তাহা আর তাঁহার ক্লেশবীজকে কার্য্যক্ষম করিতে পারে না: এইজন্য এই সকল মহাপুরুষ বিষয়ের মধ্যে বিচরণ করিয়াও নির্লিপ্ত থাকিতে পারেন। তাঁহারা বিষয়ে আসক্ত হন না। বিষয়ের সুখ দুঃখ তাঁহাদিগকে বিচলিত করিতে পারে না, তাঁহারা সকল অবস্থাতেই নির্ব্বিকারভাবে জীবন যাপন করেন। প্রসুপ্ত ক্লেশও যেমন কার্য্যকর নয়, দগ্ধবীজ ক্লেশও তদ্রূপ কার্য্যকর নয়; তবে প্রসুপ্ত ক্লেশ উত্তেজক কারণ পাইলেই জাগরিত হইয়া কার্য্যকর হইবে: কিন্তু দগ্ধবীজ ক্লেশ উত্তেজক কারণ সম্মুখে পাইলেও আর কার্য্যকর হইবে না।

(২) তনু। ক্রিয়াযোগ সাধন করিতে করিতে ক্লেশের বল ক্ষীণ হইয়া যায়; কিন্তু তাহা একেবারে মরিয়া যায় না। ক্লেশের বল ক্ষীণ হইলে আর প্রবলভাবে কার্য্য করিতে পারে না; সুতরাং সাধককেও প্রবলভাবে আক্রমণ করিয়া—প্রবল সুখ ও দুঃখ উৎপাদন করিতে সক্ষম হয় না।

(৩) বিচ্ছিন্ন। আমাদের চিত্তে কাম, ক্রোধ, লোভ, ক্ষমা, দয়া, রাগ, দ্বেষ প্রভৃতি নানাপ্রকার সংস্কার আছে; কিন্তু একই সময়ে দুইটী সংস্কার কার্য্যকর হয় না। যখন রাগসংস্কার কার্য্য করিতেছে তখন দ্বেষসংস্কার বিচ্ছিন্ন থাকে। আবার যখন দ্বেষসংস্কার কার্য্যকর

হয় তখন রাগসংস্কার বিচ্ছিন্ন থাকে। রাগ ও দ্বেষ উভয় সংস্কারই বর্ত্তমান আছে, তবে একটীর কার্য্যকালে অন্যটী নিষ্কর্ম্মা অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন থাকে। অনুরাগভরে যে স্ত্রীকে আমরা একসময়ে প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়জ্ঞানে ভালবাসিয়া থাকি, সেই স্ত্রীকে অসচ্চরিত্রা দেখিলে আবার আমরা দ্বেষভাবাপন্ন হইয়া তাহার উপর নানাপ্রকার অত্যাচার করিয়া থাকি। স্ত্রীকে অনুরাগে ভালবাসিবার সময় আমাদের রাগসংস্কার উদার ছিল এবং দ্বেষসংস্কার বিচ্ছিন্ন ছিল।

(৪) উদার। যে সংস্কার বর্ত্তমানে কার্য্যকর থাকিয়া আমাদিগকে ক্লেশ প্রদান করিতেছে, তাহা উদার।

অনিত্যাশুচিদুঃখানাত্মসু নিত্যশুচিসুখাত্মখ্যাতিরবিদ্যা ॥ ৫ ॥

(১) অনিত্যে নিত্যজ্ঞান, (২) অশুচিতে শুচিজ্ঞান, (৩) দুঃখে সুখজ্ঞান ও (৪) অনাত্মাতে আত্মজ্ঞান—ইহাদিগকে অবিদ্যা বলে।

(১) অনিত্যে নিত্যজ্ঞান—দেহ অনিত্য, ইহা চিরকাল থাকিবে না; কিন্তু আমরা মনে করি যে, এই দেহ চিরকাল সমভাবে থাকিবে। যুবক যুবতীরা এই দেহকে চিরস্থায়ী জ্ঞান করিয়া, অহঙ্কারে মত্ত হয় এবং নানাপ্রকার কাম, ক্রোধ ও লোভাদির কার্য্য করে। এই দেহকে আমরা এতদূর নিত্য বলিয়া ভাবি যে, অতিবৃদ্ধাবস্থায় নানাপ্রকার ব্যাধি ও জরাগ্রস্ত হইয়াও আমরা নিজেদের চিরজীবী ও অমর ভাবি এবং দেহের যত্নেই আমাদের জীবনের অত্যল্প অবশিষ্টকাল বৃথা অতিবাহিত করি। একবারও মনে ভাবি না যে, আমাদের এই দেহ ত্যাগ হইলে শৃগাল ও কুকুরের খাদ্যরূপে পরিণত হইবে।

"অষ্টকুলাচল-সপ্তসমুদ্রাঃ ব্রহ্মপুরন্দরদিনকররুদ্রাঃ।
ন ত্বং নাহং নায়ং লোকস্তদপি কিমর্থং ক্রিয়তে শোকঃ ॥"

—মোহমুদ্গরঃ।

অর্থাৎ "হিমালয় প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ অষ্ট কুলপর্ব্বত, সপ্ত মহাসমুদ্র, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, সূর্য্য, রুদ্র, তুমি, আমি ও এই লোক কিছুই চিরকাল থাকিবে না, অতএব আর বৃথা শোক কর কেন?" এইপ্রকার অনিত্য বস্তুতে যে নিত্যজ্ঞান, তাহা একমাত্র অবিদ্যাদ্বারাই সংঘটিত হয়। ইহাকেই অবিদ্যা বলে।

(২) অশুচিতে শুচিজ্ঞান—এই দেহ সর্ব্বদাই অশুচি, ইহাতে বিপরীত শুচিজ্ঞান। শ্লেষ্মা, মূত্র ও মলাদি পরিপূর্ণ এই অশুচি দেহকে পবিত্র জ্ঞান করিয়া তাহার আলিঙ্গনে সুখবোধ করা, অবিদ্যা ও অজ্ঞানের কার্য্য। দেহ সর্ব্বদাই দুর্গন্ধ ঘর্ম্মাদিতে পরিলিপ্ত থাকিলেও এই দুর্গন্ধ দেহকে চন্দনের ন্যায় সুগন্ধি মনে করিয়া, পাশবিক কামভাবে মত্ত হইয়া আমরা তাহা পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন ও চুম্বনাদি করিয়া সুখ অনুভব করি। ইহা অবিদ্যার কার্য্য।

(৩) দুঃখে সুখজ্ঞান—বিষয় সর্ব্বদুঃখের আকর। বিষয়ে কিছুমাত্র সুখ নাই। ইহার অর্জ্জনে দুঃখ, রক্ষণে দুঃখ, ক্ষয় ও ব্যয়ে দুঃখ। বিষয়ের কোন অংশই সুখের নহে। এইরূপ দুঃখবহুল বিষয়কে সুখজ্ঞান করা—অবিদ্যার কার্য্য।

অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যং নাস্তি ততঃ সুখলেশঃ সত্যম্।
পুত্রাদপি ধনভাজাং ভীতিঃ সর্ব্বত্রৈষা কথিতা নীতিঃ॥

—মোহমুদ্গরঃ।

অর্থাৎ "অর্থকে সর্ব্বদাই অনর্থের বা অনিষ্টের কারণ বলিয়া ভাবিবে, এই অর্থ হইতে একটুও সুখ হয় না। অর্থবান্ ব্যক্তি সর্ব্বদাই শত্রুবেষ্টিত থাকে এমন কি তাহার নিজের ঔরসজাত পুত্রেরাই অর্থলাভের জন্য পিতাকে হত্যা পর্য্যন্ত করিতে কুণ্ঠিত হয় না; ঋষিদিগের এই নীতিবাক্যকে সর্ব্বদা সমাদর করিবে।"

যাবদ্বিত্তোপার্জ্জনশক্তস্তাবন্নিজপরিবারো রক্তঃ।
তদনু চ জরয়া জর্জ্জরদেহে বার্ত্তাং কোঽপি ন পৃচ্ছতি গেহে॥"
—মোহমুদ্গরঃ।

অর্থাৎ "তুমি যতদিন অর্থ উপার্জ্জন করিয়া আত্মীয়কুটুম্বগণের ভরণপোষণ করিবে, ততদিন তাহারা তোমার তোষামোদ করিবে, সর্ব্বদা সুখ্যাতি করিবে ও তোমার গুণগান করিবে। আর যখনই তুমি বৃদ্ধ ও জরাগ্রস্ত হইয়া হাত গুটাইবে অর্থাৎ তাহাদিগকে কিছু দিতে পারিবে না, তখন তাহারা একদিনের জন্যও তোমার দেহের কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতে আসিবে না। তুমি নিজ জীর্ণ পর্ণকুটীরে মরণাপন্ন অবস্থায় পতিত হইয়া থাকিলেও, তাহারা একবারও তোমার দরজায় উঁকি মারিবে না।"

(৪) অনাত্মাতে আত্মজ্ঞান—দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি ইহারা আত্মা না হইলেও, ইহাদিগকে আত্মা বলিয়া জ্ঞান। ইহাও অবিদ্যার কার্য্য।

দৃগ্দর্শনশক্ত্যোরেকাত্মতেবাঽস্মিতা॥ ৬॥

দৃক্‌শক্তি ও দর্শনশক্তির একাত্মতাকে অস্মিতা বলা হয়।

দৃক্‌শক্তি পুরুষ এবং দর্শনশক্তি বুদ্ধি। এই দুই শক্তি পরস্পর মিলিত হইয়া একবোধ হইলেই পুরুষের ভোগ বা বন্ধন হয় এবং তত্ত্বজ্ঞানের পর এই দুই শক্তির পৃথক্ বোধ হইলেই পুরুষের মুক্তি হয়। পুরুষ বাস্তবিক বদ্ধ নহেন, কেবল শরীর, ইন্দ্রিয় ও মন প্রভৃতির উপর অভিমান করিয়া তাহাদের কার্য্যকে নিজের কার্য্য বলিয়া মনে করেন এবং এইরূপে তাহাদের সুখদুঃখকে নিজের সুখদুঃখ বলিয়া মনে করেন, সুতরাং পুরুষ বদ্ধ হন। পুরুষ অজ্ঞানে এইরূপ ভুল করেন। বুদ্ধির বা চিত্তের মলিনতাহেতু পুরুষের যথার্থজ্ঞান না হইয়া এইরূপ বিপর্য্যয়-

জ্ঞান হয়। চিত্তে যতদিন রাগ দ্বেষ প্রভৃতি সংস্কার বিদ্যমান থাকিবে, ততদিন পুরুষের এই ভ্রান্তি ঘুচিবে না। ক্রিয়াযোগ অবলম্বনে চিত্ত হইতে রাগদ্বেষাদি ময়লা কাটিয়া গিয়া চিত্ত বিশুদ্ধ হইলে, পুরুষের যথার্থজ্ঞান হয়; তখন পুরুষ নিজের ভুল বুঝিতে পারেন এবং তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইলে এই রাগদ্বেষ এবং সুখদুঃখাদির হাত হইতে অব্যাহতি পান। এই শরীরকে "আমি" জ্ঞান করা, ইন্দ্রিয়কে "আমি" জ্ঞান করা, মনকে "আমি" জ্ঞান করা, বুদ্ধিকে "আমি" জ্ঞান করা, ইহাদিগের নাম "অস্মিতা"। এই অস্মিতা আমাদের একটী ক্লেশ। আমাদের এই ভ্রান্তিযুক্ত অভিমান এত বিস্তৃত হইয়াছে যে, শুদ্ধ নিজের শরীর নহে, পুত্রকলত্রাদির শরীরেও আমরা আত্মাভিমান করি। তাহাদের শরীরের সুখদুঃখে আমরা নিজেদের সুখী ও দুঃখী জ্ঞান করি। শুদ্ধ পুত্রকলত্রাদির শরীরে আমরা আত্মাভিমান করিয়াই ক্ষান্ত হই নাই, ঘর, বাড়ী, বাগান, পুকুর, ইট, কাঠ, গরু, বাছুর প্রভৃতির উপরও আমরা আত্মাভিমান করিয়া, ইহাদের উন্নতিতে সুখবোধ এবং অবনতিতে দুঃখবোধ করি।

সুখানুশয়ী রাগঃ ॥ ৭ ॥

সুখানুশয়ী ক্লেশবৃত্তিকে রাগ বলা যায়।

এই "রাগ" অর্থাৎ অনুরাগ বা আসক্তি কোথা হইতে আসে? ইহা চিত্তের সংস্কার হইতে আসে। পূর্ব্বজন্মে যে সকল আসক্তির কার্য্য করিয়াছিলে, তাহার সংস্কার চিত্তে পড়িয়া আছে, সেই সংস্কার হইতে রাগের উৎপত্তি হয়। মনে কর তুমি পূর্ব্বজন্মে মাংসাহার খুব ভালবাসিতে, তোমার মাংস না হইলে চলিত না। পূর্ব্বজন্মে অত্যন্ত মাংসাহার করিবার জন্য, সেই মাংসাহারের আসক্তি তোমার চিত্তের

সংস্কারে বর্ত্তমান আছে। আর বর্ত্তমান জীবনে চিত্ত হইতে সেই আসক্তির উদয় হইতেছে এবং সেইজন্য তুমি মাংস খাইবার জন্য ছট্‌ফট্ করিতেছ। পূর্ব্বজন্মের সেই সংস্কার হইতে তোমার মাংস খাইবার ইচ্ছা জন্মিবে, তৎপরে সেই ইচ্ছা প্রবল হইলে তোমার মাংস খাইবার তৃষ্ণা জন্মিবে। তৎপরে সেই তৃষ্ণাদ্বারা পীড়িত হইয়া তুমি অত্যন্ত লোভী হইয়া পড়িবে। এইরূপে প্রথমে ইচ্ছা, তৎপরে তৃষ্ণা, ও তৎপরে লোভ হইবে। রাগের এই তিনটী অবস্থা। এই লোভের দ্বারা তুমি বাধ্য হইয়া অবশভাবে মাংসাহার করিবে। এই প্রকার বিষয়ের লোভে আমরা হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হই এবং অনেক পাপকার্য্য করিয়া জীবনকে কলুষিত করি ও ভবিষ্যতে তজ্জন্য দুঃখভোগ করি। এই রাগকে একটী ক্লেশবৃত্তি বলা যায়।

দুঃখানুশয়ী দ্বেষঃ ॥ ৮ ॥

দুঃখানুশয়ী ক্লেশবৃত্তিকে দ্বেষ বলা যায়।

আমাদের চিত্তে যেমন রাগের সংস্কার থাকে বলিয়া আমরা রাগের কার্য্য করি, তেমনই দ্বেষের সংস্কার থাকে বলিয়া আমরা দ্বেষের কার্য্য করি। এই দ্বেষ হইতে আমরা কষ্ট পাই, সেইজন্য দ্বেষকেও একটী ক্লেশবৃত্তি বলা হইয়াছে।

স্বরসবাহী বিদুষোঽপি তথারূঢ়োঽভিনিবেশঃ ॥ ৯ ॥

অবিদ্বানের ন্যায় বিদ্বানেরও যে স্বভাব-প্রসিদ্ধ ক্লেশ, তাহাকে অভিনিবেশ বলে।

সামান্য ক্রিমিকীট হইতে ব্রহ্মা পর্য্যন্ত সকল জীবেরই মৃত্যুভয়

আছে। এই মৃত্যুভয় পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের মৃত্যুসংস্কারজাত। ইহজন্মে কেহ কখনও মরে নাই। সুতরাং পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সংস্কারের স্মৃতি হইতেই এই মরণভয় উপস্থিত হয়। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে মরিবার সময় যে কষ্ট হইয়াছিল, তাহার স্মৃতি আমাদের সংস্কারের মধ্যে আছে; এইজন্য সেই সকল স্মৃতি আমাদের মনে উঠিয়া আমাদের ক্লেশদান করে। এইরূপ মৃত্যুভয় হইতে আমরা প্রমাণ করিতে পারি যে, আমাদের পূর্ব্বজন্ম ছিল ও সেই জন্মে মরিয়াছিলাম। ইহাতে পূর্ব্বজন্ম সিদ্ধ হয়। এই মরণত্রাসকে অভিনিবেশ ক্লেশ বলা যায়।

তে প্রতিপ্রসবহেয়াঃ সূক্ষ্মাঃ ॥ ১০ ॥

এই সূক্ষ্ম ক্লেশসকলকে প্রতিপ্রসবের দ্বারা অর্থাৎ প্রতিলোম গমনের দ্বারা লয় করিতে হয়।

চিত্তের সংস্কার হইতেই চিত্তের ক্লেশ উৎপন্ন হয়। এই সংস্কার হইতে আসক্তি উৎপন্ন হয়। আসক্তি যত কমিবে, সংস্কারও তত কমিবে। আসক্তি যত বর্দ্ধিত হইবে, সংস্কারও তত বৃদ্ধি পাইবে। চিত্তের সমুদয় সংস্কার যখন ক্ষয় হইয়া যাইবে, তখন চিত্তের লয় হইবে, তখন মুক্তি হইবে। আসক্তি ক্ষয় করিবার জন্য বৈরাগ্য অবলম্বন করিবে। অবিরত বিচারদ্বারা বিষয়ের দোষদর্শন করিতে করিতে ক্রমশঃ বিষয়ে বৈরাগ্য হয়। যাহারা বিচার না করিয়া বিষয়ভোগ করে, তাহাদের বৈরাগ্য হয় না। এইরূপ বিচার করিতে করিতে ক্রমে শরীরে, ইন্দ্রিয়ে, মনে ও বুদ্ধিতে আসক্তি কমিয়া আসিবে। চিত্তই ইষ্টদেবের আসন। এই চিত্তকে পরিষ্কার করিলেই তাঁহার আসন পরিষ্কৃত হইল। আসন পরিষ্কৃত হইলেই সেখানে ইষ্টদেবতার অধিষ্ঠান হয়। তখন আমাদের সাধনে সফলতা লাভ হয়। চিত্তে ভগবানের

অধিষ্ঠান হইলে চিত্ত আর চিত্ত থাকে না। তখন চিত্ত "সত্ত্ব" নামে অভিহিত হয়। চিত্তে যতক্ষণ কামনার স্রোত চলে, ততক্ষণ তাহা চিত্ত; আর কামনার স্রোত নিবৃত্ত হইয়া স্থির হইলেই চিত্ত সত্ত্ব হয়।

ধ্যানহেয়াস্তদ্বৃত্তয়ঃ। ১১॥

ধ্যানের দ্বারা ইহাদের বৃত্তি নষ্ট করিতে হইবে।

অবিদ্যা ও অস্মিতাদি পাঁচটী ক্লেশ চিত্তে সূক্ষ্মবীজরূপে বর্ত্তমান থাকে। ইহা হইতে সুখ, দুঃখ ও মোহাদি স্থূলবৃত্তিসকল উৎপন্ন হয়। একাগ্রতা ধ্যানের দ্বারা এই স্থূলবৃত্তি নষ্ট করিতে পারা যায়।

একটী সুস্বাদ আম্র খাইলে, তাহার মিষ্টরসাস্বাদ চিত্তের মধ্যে সংস্কাররূপে রহিয়া গেল। সেই সংস্কার যখন পুনর্ব্বার উদ্বুদ্ধ হইবে তখন আবার সেই আম্র খাইবার ইচ্ছা হইবে এবং সেই আম্রসংগ্রহ জন্য অনেক চেষ্টা ও উদ্বেগ সহ্য করিতে হইবে। পরে তাহা সংগ্রহ করিয়া আবার যেমন তাহার রসাস্বাদন করা হইবে, অমনিই তাহার সেই মিষ্টরসের সংস্কার চিত্তে পতিত হইবে এবং পুনরায় সেই সংস্কার উদ্বুদ্ধ হইলে আবার সেই আম্রসংগ্রহের চেষ্টা করিতে হইবে। অনেকে মনে করেন যে, ভোগ করিতে করিতে কামনার তৃপ্তি হয় এবং তখন ভোগে আপনা আপনিই বিরক্তি আসে; এটী সম্পূর্ণ ভুল। কামনার তৃপ্তিসাধন করিয়া কখনই কামনার দমন হয় না। কামনার উদর কেহ কখনও পূরণ করিতে পারে নাই। অনেকে বলে খুব ভোগ করিয়া যাও। প্রবল উদ্যমের সহিত ভোগ করিয়া যাও। এইরূপ করিলে একসময়ে না একসময়ে ভোগে অরুচি আসিবে এবং বৈরাগ্য উৎপন্ন হইবে। অত্যন্ত ভোগ করিতে করিতে ভোগে যে অরুচি আসে, তাহা বৈরাগ্য নয়, তাহা অনাসক্তি,

নয়,—তাহা ইন্দ্রিয়ের দুর্ব্বলতা মাত্র। যেমন অত্যধিক কার্য্য করিলে শরীর ক্লান্ত হয়, তেমনি অত্যধিক ভোগ করিলেও ইন্দ্রিয় ক্লান্ত ও দুর্ব্বল হয়। ইন্দ্রিয় দুর্ব্বল হইলে ভোগে অক্ষম হয়, কিন্তু মনের মধ্যে ভোগ করিবার ইচ্ছা বর্ত্তমান থাকে। মনের মধ্যে ভোগের আসক্তি ত্যাগ হয় না; পুনরায় ইন্দ্রিয় সবল হইলে, আবার সে ভোগ করিবে। কিন্তু ধ্যান দ্বারা ভোগাসক্তি কমিয়া যায়। ধ্যান দ্বারা এমন একটী আনন্দ পাওয়া যায় যাহা বিষয় ভোগের আনন্দ অপেক্ষা অনেক বেশী। সেইজন্য সাধক ধ্যানানন্দ ত্যাগ করিয়া বিষয়ানন্দ ভোগ করিতে ইচ্ছা করেন না। সাধক আসনে বসিয়া যখন ধ্যানে নিমগ্ন হন, তখন ইহলোক ও পরলোকের সমুদয় ঐশ্বর্য্যকে তিনি কাকবিষ্ঠাবৎ তুচ্ছ জ্ঞান করেন। বিষয়ীরা একবার ধ্যানানন্দ পাইলে আর বিষয়ে আসক্ত হইবে না। এই ধ্যানানন্দ যে কিরূপ, তাহার আভাস পর্য্যন্ত বিষয়ীরা পায় নাই, এইজন্য তাহারা কোনমতে বিষয়াসক্তি ত্যাগ করিতে চাহে না। এইজন্য সুখ, দুঃখ ও মোহাদি—চিত্তের স্থূলবৃত্তিসকল ত্যাগ করিতে হইলে ধ্যানের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে।

ক্লেশমূলঃ কর্ম্মাশয়ো দৃষ্টাদৃষ্টজন্মবেদনীয়ঃ ॥ ১২ ॥

ক্লেশমূলক কর্ম্মাশয় দৃষ্টজন্মবেদনীয় ও অদৃষ্টজন্মবেদনীয়।

কর্ম্মাশয় অর্থাৎ কর্ম্মের আধার অর্থাৎ কর্ম্মের ভাণ্ডার। যে ঘরে কর্ম্ম সঞ্চিত থাকে, সেই ঘরকে কর্ম্মাশয় বলে। তুমি কোন একটী কামিনীকে মুহূর্ত্তের জন্য দর্শন করিলে, তোমার চিত্তে সেই কামিনীর মূর্ত্তির ছাপ পতিত হইল এবং তাহা সেইস্থানে রহিয়া গেল। কামিনী-মূর্ত্তি তোমার সম্মুখে নাই বটে; কিন্তু সেই মূর্ত্তি তোমার চিত্তে আছে।

তোমার চক্ষুর সম্মুখ হইতে কামিনীমূর্ত্তি অপসারিত হইল বটে; কিন্তু তোমার চিত্ত হইতে সেই মূর্ত্তি অপসৃত হইল না। তোমার চিত্তমধ্যে সেই মূর্ত্তি অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে, ইহাকে মুছিয়া ফেলা বড় কঠিন। এক্ষণে বাহিরের কামিনীমূর্ত্তি তোমার অনিষ্ট করিবে না, কিন্তু তোমার চিত্তস্থ সেই মূর্ত্তি তোমার ধ্বংসসাধন করিবে। চিত্তের মধ্যস্থ এই অঙ্কিত মূর্ত্তিই তোমার কর্ম্মাশয়। এই কর্ম্মাশয় হইতে তোমার মনে সেই কামিনীমূর্ত্তি দেখিবার বাসনা পুনঃ পুনঃ জাগিবে। এই কর্ম্মাশয়ই তোমার সর্ব্বনাশ সাধন করিবে। বাহিরের স্থূলদ্রব্য আমাদের সর্ব্বনাশ করে না এই অভ্যন্তরের কর্ম্মাশয়ই আমাদিগের অনিষ্ট করে। বাহিরের কেহ আমাদের অপকার করে না, ভিতরের কর্ম্মাশয়ই আমাদের অপকার করে। এই কর্ম্মাশয়ই আমাদের যতপ্রকার ক্লেশের মূল। বাহিরের লোকের দ্বারা বা বাহিরের ঘটনা দ্বারা আমরা কষ্ট পাই না, বাহিরের কিছু আমাদের কষ্টের কারণ নয়। আমাদের কষ্টের জন্য বাহিরের কাহারও উপর দোষ দেওয়া উচিত নহে। আমাদের কষ্টের কারণ আমরা নিজেরাই সৃষ্ট করিয়াছি। আমাদের কষ্টের কতকগুলি কারণ আমরা ইহজন্মে সৃষ্টি করিয়াছি এবং অপরগুলি পূর্ব্বজন্মে সৃষ্টি করিয়াছি। ইহজন্মে যে সকল কর্ম্ম আমরা অতি তীব্রভাবে সম্পন্ন করি, তাহার ফল ইহজন্মেই ভোগ করি। ইহজন্মে সেই কর্ম্মগুলি আমরা করিয়াছি বলিয়া, সেই কর্ম্মগুলি আমাদের দৃষ্ট বলিয়া, সেই কর্ম্মফলকে "দৃষ্টজন্মবেদনীয়" বলে। আর পূর্ব্বজন্মে যে কর্ম্মগুলি করিয়া আসিয়াছি, তাহা আমাদের মনে থাকে না; সুতরাং তাহা আমরা দর্শন করিতেও পারি না এবং সেই সকল অদৃষ্টকর্ম্মোৎপন্ন যে ফল আমরা ভোগ করি, তাহাকে "অদৃষ্টজন্মবেদনীয়" বলে। হঠাৎ কোন ইষ্ট বা অনিষ্ট হইলে লোকে যদি বুঝিতে পারে যে, এই ইষ্ট বা অনিষ্ট ভোগের কোন কার্য্যই ইহজন্মে করে নাই; তাহা

হইলে, তাহাদিগের বুঝা উচিত যে, পূর্ব্বজন্মে তাহারা এমন কোন কার্য্য করিয়া আসিয়াছে, যাহার জন্য এই বর্ত্তমান ইষ্ট বা অনিষ্ট সংঘটিত হইয়াছে। কারণ ভিন্ন কার্য্য হয় না। জগতে যত কিছু ঘটনা হইতেছে, তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী কোন না কোন কারণ নিশ্চয়ই বর্ত্তমান আছে। কতকগুলি কারণকে আমরা দেখিতে পাই ও বুঝিতে পারি, ইহারা "দৃষ্টজন্মবেদনীয়" আর কতকগুলি কারণ আমরা দেখিতে পাই না বা বুঝিতে পারি না ইহারা "অদৃষ্টজন্মবেদনীয়"। মোটের উপর ইহা স্থির নিশ্চয় জানিও যে, তোমার বিনা দোষে তুমি কোন কষ্ট পাইতেছ না। তুমি যে সকল কষ্ট পাইতেছ, তাহা তোমার নিজের দোষে—অপর কাহারও দোষে নয়। তুমি তোমার কষ্টের জন্য অপরকে দোষী করিও না। অপরকে দোষী করিলে, তোমার কষ্ট নিবারিত হইবে না। তোমার ছেলেরা তোমার সেবা করে না বা তোমায় খাইতে দেয় না, তাহা তোমার নিজের দোষ। তোমার সম্পত্তি কেহ নষ্ট করিল, তাহা তোমার নিজের দোষ। তোমার শরীর পীড়াগ্রস্ত হইয়াছে, তাহা তোমার নিজের দোষ। তোমার মন চঞ্চল, তাহা তোমার নিজের দোষ। আমরা ইহলোকে যে সকল কষ্ট পাইতেছি, সে সকলই আমাদের নিজেদের দোষে উৎপন্ন হইয়াছে। আমরা যাহাকে "অদৃষ্ট" বলি, তাহা আমাদের পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল। "অদৃষ্ট"—শূন্য হইতে আসে না। "অদৃষ্ট" বিনা কারণে হয় না। পূর্ব্বজন্মের ভাল কাজ থাকিলে, তুমি হঠাৎ তাহার সুফল প্রাপ্ত হও; আর পূর্ব্বজন্মের মন্দ কাজ থাকিলে, তুমি হঠাৎ তাহার কুফল প্রাপ্ত হও। সকলই তোমার কর্ম্মফল। ঈশ্বরের কোন পক্ষপাতিত্ব নাই। তিনি উপযুক্ত পাত্রকে যোগ্য ফল দান করেন। তিনি, যাহার যেরূপ কার্য্য, তাহাকে সেইরূপ ফল দান করেন। তিনি সৎকার্য্যের অসৎফল, বা অসৎকার্য্যের সৎফল কাহাকেও দান করেন না; অতএব তোমার

দুঃখ নিবারণ জন্য অপরের উপর দোষ চাপান ভাল নয়। অপরের স্কন্ধে দোষারোপ করিয়া নিজেকে নির্দ্দোষ বলিয়া প্রমাণ করিতে যাইও না। তুমি প্রকৃত নির্দ্দোষ হইলে, নির্দ্দোষই থাকিবে। লোকে তোমায় নির্দ্দোষ বলিলে তোমার দোষ কমিবে না; তুমি যাহা আছ তাহাই থাকিবে। তুমি সোণা হইলে সোণাই থাকিবে, লোহা হইলে লোহাই থাকিবে। লোকে তোমায় ভাল বা মন্দ করিতে পারিবে না। লোকে তোমার চিত্তের ময়লা পরিষ্কার করিয়া দিবে না। তোমার চিত্তের ময়লা তোমায় নিজেকেই পরিষ্কার করিতে হইবে। শ্রীগীতায় উক্ত আছে "আত্মাই আত্মার বন্ধু এবং আত্মাই আত্মার শত্রু"। অতএব অপর কেহ তোমার শত্রু হইতে পারে না। আমাদের সঞ্চিত কর্ম্মাশয়ই আমাদের শত্রু। এই কর্ম্মাশয় ক্ষীণ করিবার সাধন সংসারেই ভাল হয়। জ্ঞান লইয়া সংসারে থাক ও কর্ম্মাশয় ক্ষীণ কর; তোমার মুক্তি শীঘ্র ও সহজে হইবে। সংসারের কর্ত্তব্য প্রাণপণে ও পূর্ণরূপে পালন কর—তোমার মুক্তি শীঘ্র হইবে। ঐ যে তোমার পুত্র, তুমি পূর্ব্বজন্মে ঐ পুত্রের নিকট ঋণী ছিলে, এজন্মে সে তাহার প্রাপ্য পাইবার নিমিত্ত তোমার নিকট আসিয়াছে—তুমি তাহার ঋণ পরিশোধ করিয়া দাও। আবার অপর পুত্র পূর্ব্বজন্মে তোমার সাধন পথের সহায় ছিল, সে এজন্মেও তোমার সাধনের সাহায্য করিবে। পুত্র বা কন্যা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত,—১) ঋণদাতা পুত্র, ২ মিত্র পুত্র এবং (৩) উদাসীন পুত্র। (১) ঋণদাতা পুত্র—পিতার নিকট আদায় করিয়া লয়, পিতাকে কিছু দেয় না। (২) মিত্র পুত্র—পিতাকে সকল বিষয়ে সাহায্য করিয়া থাকে। (৩) উদাসীন পুত্র—কাহারও ভালতেও নাই আর মন্দতেও নাই। এইরূপে পুত্র, কন্যা, প্রতিবেশী, আত্মীয় ও কুটুম্বাদি—যাহাদের সহিত তোমার কোন না কোন প্রকার পূর্ব্বজন্মের সম্বন্ধ আছে, তুমি যদি তাহাদের ঋণশোধ না কর, তাহাহইলে, তোমার চিত্তে

সেই ঋণের সংস্কার থাকিয়া যাইবে এবং তুমি মুক্ত হইতে পারিবে না। এইজন্য তোমার চারিপাশে যাহারা তোমাকে বেষ্টন করিয়া আছে, যত শীঘ্র পার তাহাদের ঋণ পরিশোধ কর; তাহাহইলে, তুমিশীঘ্র শীঘ্র মুক্ত হইবে। তুমি কাহারও নিকট অর্থঋণে ঋণী, তাহার টাকা ফেলিয়া দাও—নিষ্কৃতি পাইবে। কাহারও নিকট সেবারূপ ঋণ করিয়াছ, তাহার সেবা কর, ঋণ হইতে মুক্ত হইবে। কাহারও নিকট অন্নঋণে বদ্ধ, তাহাকে অন্ন দিয়া পালন কর—নিষ্কৃতি পাইবে। যাহার সহিত যখন যে কোনরূপ ব্যবহার করিবে, তাহাকে ঈশ্বরজ্ঞানে করিবে। বিরক্তভাবে কাহারও সেবা করিও না। যখন যাহার সেবা করিবে, সন্তুষ্টমনে করিবে। মনে করিবে তুমি ভগবানের সেবা করিতেছ। আর সেবা করিয়া কর্ম্মফল আকাঙ্ক্ষা করিও না। কর্ম্মফলের আশা না করিয়া সেবা করিবে, তাহাহইলেই, তোমার সংস্কার ক্ষয় হইবে। আর যদি কর্ম্মফলের আশা কর, তাহাহইলে, তোমার চিত্তে পুনরায় কর্ম্মের সংস্কার সঞ্চিত হইবে। জানিয়া রাখ যে, সংস্কার ক্ষয় করিবার জন্যই তোমার সাধনা, সংস্কার সঞ্চয় করিবার জন্য নহে। সংস্কার সঞ্চিত হইলে বন্ধনের উপর বন্ধন পড়িল আর ক্ষয় হইলে, তুমি মুক্ত হইলে। তাই বলি, তুমি যে সকল শত্রু বা মিত্রদ্বারা বেষ্টিত আছ তাহাদিগের সহিত যথোপযুক্ত ব্যবহার কর। তাহাদিগের প্রতি তোমার যে কর্ত্তব্য তাহা পালন কর। বৃদ্ধ পিতামাতাকে বা তোমার অভিভাবককে অসহায় অবস্থায় ফেলিয়া সন্ন্যাসী সাজিও না। অক্ষম স্ত্রী পুত্রাদি ত্যাগ করিয়া বৈরাগী ও সন্ন্যাসী হইও না। তোমার সম্মুখে ভগবান্ যে কর্ত্তব্য ধরিয়াছেন তাহা ত্যাগ করিয়া নিজসুখের অনুসন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইও না। কর্ত্তব্যের মধ্যে থাকিয়া, আত্মস্মৃতি বজায় রাখিয়া, সুখে ও দুঃখে নির্ব্বিকার হইয়া, ভগবানে কর্ম্মার্পণ করিয়া—তাঁহার দিকে চাহিয়া চাহিয়া কর্ম্ম করিয়া

যাও। এরূপ করিলে, তুমি শীঘ্র মুক্ত হইবে। একেবারে একদিনে মুক্ত হওয়া যায় না, সম্পূর্ণ মুক্ত হইতে হইলে—নিরন্তর প্রবলউদ্যম-সহকারে সাধন করিতে হইবে। ভাবিও না যে এই দেহপাত হইলেই তোমার নিষ্কৃতি হইবে। চিত্তপাত না হইলে নিষ্কৃতি নাই। স্থূলদেহপাত হইলেও সূক্ষ্মদেহের সহিত চিত্ত থাকে ও পুনরায় কর্ম্মানুযায়ী গো, শূকর, মনুষ্য প্রভৃতির দেহ সৃষ্টি করে। তাই বলি, বাহিরের জগৎ আমাদের বন্ধনের কারণ নহে; চিত্তে সঞ্চিত অনাদি কর্ম্মসংস্কারই আমাদের বন্ধনের কারণ। উত্তমরূপে বিচার করিলে বুঝিতে পারিবে, ফলকামনা করিয়া বিষয়ের সম্পর্ক করিলেই চিত্তে সংস্কার পড়িবে। চিত্তস্থ অনুরাগ ও দ্বেষই আমাদের সংস্কারের কারণ। বিষয়ের সহিত "আমিত্ব" ভাব স্থাপন করিলে এই রাগ ও দ্বেষ উৎপন্ন হয়। বিষয় "আমি", বিষয় "আমার" এই ভাব মনে রাখিলে রাগ দ্বেষও উৎপন্ন হইবে। বিষয়ের উপর হইতে এই "আমি" ও "আমার" ভাব ত্যাগ করিয়া ভগবানে এই "আমি" ও "আমার" ভাব ন্যস্ত কর, তাহা হইলেই, তোমার "আমিত্ব" বা "অস্মিতা" ক্লেশের লয় হইবে। ইষ্টদেবের গাঢ় ধ্যানে যখন সাধকের ধ্যানানন্দ উদিত হয়, তখন বিষয়ের প্রতি "আমি" ও "আমার" ভাব কমিয়া যায় এবং ক্রমশঃ সেই ভাব একেবারে লয় হয়।

যতদিন তোমার চিত্তে সামান্যমাত্রও সংস্কারবীজ থাকিবে, ততদিন তোমার মুক্তি নাই। এই বীজকে একেবারে ধ্বংস করিতে হইবে। যেমন অতি ক্ষুদ্র সর্ষপাকার বটবীজ হইতে বৃহৎ বটবৃক্ষ উৎপন্ন হয়, তেমনই অতি ক্ষুদ্র সংস্কারবীজ হইতে বৃহৎ সংসারের উৎপত্তি হয়।

সতিমূলে তদ্বিপাকো জাত্যায়ুর্ভোগাঃ ॥ ১৩ ॥

চিত্তে অবিদ্যাদি ক্লেশ থাকিলে, সেই ক্লেশানুযায়ী ধর্ম্মাধর্ম্ম সংস্কার-সমূহ, (১) জাতি, যেমন মনুষ্য, গো প্রভৃতি; ও সেই জাতির অনুরূপ (২) পরমায়ু; এবং কর্ম্মানুযায়ী (৩) সুখদুঃখভোগ—এই তিন প্রকার বিপাকের সৃষ্টি করে।

বাহ্যজগৎ আমাদের কষ্টের কারণ নহে। ভগবান্ আমাদের কষ্ট দিবার জন্য এই বাহ্যজগৎ সৃষ্টি করেন নাই। বিষয় আমাদের বন্ধনের কারণ নহে। বিষয়ে আসক্তিই আমাদের বন্ধনের কারণ। অনাসক্তভাবে বিষয়ভোগ করিলে বন্ধন হয় না। আসক্তি হইতেই চিত্তের সংস্কার হয়। যতদিন অবিদ্যাদি ক্লেশসকল থাকিবে, ততদিন আসক্তিও থাকিবে এবং ততদিন জন্মমৃত্যুপ্রবাহে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে। এই ভিন্ন ভিন্ন সংস্কার হইতে আমাদের ভিন্ন ভিন্ন জাতির সৃষ্টি হয় যেমন গো, মহিষ, মানব, শূকর ইত্যাদি। এই সংস্কার হইতে সেই জাতির অনুরূপ পরমায়ু হয়। এই সংস্কার হইতে সুখদুঃখাদি ভোগ হয়। মনে কর, ইহজীবনে কোন লোক অত্যন্ত মাংসপ্রিয়। মাংস না হইলে তাহার আহারে তৃপ্তি হয় না। সে সমুদয় জীবনকাল মাংস আহার করিয়া কাটাইয়াছে এবং তাহার চিত্তে মাংসাহারের সংস্কার দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইয়াছে। সে পরজন্মে, যে জাতিতে মাংস খাইবার বেশ সুবিধা হয়, সেই জাতি প্রাপ্ত হইবে। হয়ত সে পরজন্মে ব্যাঘ্র হইয়া জন্মাইবে এবং ব্যাঘ্রের পরিমিত আয়ুঃ ও সেই মাংসাহার-রূপ ভোগ প্রাপ্ত হইবে। মনে কর, এজন্মে কোন লোক মৎস্য খাইতে এবং ছিপ লইয়া সর্ব্বদাই মৎস্য ধরিতে ভালবাসে। সর্ব্বদাই ছিপ লইয়া পুকুরধারে বসিয়া থাকে। সে পরজন্মে বকপক্ষী আর নয়ত ভোঁদড় হইয়া জন্মাইবে; এবং সেই জাতির অনুরূপ পরমায়ু ও ভোগ

পাইবে। এজন্মে যে অত্যন্ত হিংসা ও দ্বেষ লইয়া জীবন যাপন করিয়াছে এবং হিংসা ও দ্বেষের সংস্কার উৎপন্ন করিয়াছে; সে পরজন্মে ক্রূর-প্রকৃতি সর্প হইয়া জন্মাইবে। এজন্মে যে মোক্ষের জন্য সাধন করিয়া জীবন কাটাইয়াছে, পরজন্মে সে যোগিকুলে যোগী হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে। আমরা ইহজন্মে যে প্রকৃতির কার্য্য করিব, পরজন্মে সেই প্রকৃতি অনুযায়ী জাতি, আয়ুঃ ও ভোগ প্রাপ্ত হইব। এইজন্য ইহজন্মে সাবধান হইয়া কার্য্য করা কর্ত্তব্য। মন্দ হইতে কাহার ইচ্ছা? সকলেরই ভাল হইবার ইচ্ছা। আমাদের ইহজন্মে এরূপ কার্য্য করা উচিত যেন পরজন্মে খুব ভাল জন্ম প্রাপ্ত হই। ইহজন্মে আমাদের চিত্তে যেরূপ সংস্কার সংগ্রহ করিব, পরজন্মে আমরা সেইরূপ জন্মগ্রহণ করিব। ইহজন্মে দেবতার সংস্কার হইলে, পরজন্মে দেবতা হইব; নারকীর সংস্কার হইলে, নারকী হইব। শূকরের সংস্কার হইলে, শূকর হইব। অতএব আমরা চেষ্টা ও যত্ন করিলে, আমাদের পরজন্মের জাতি, আয়ুঃ ও ভোগ ইহজন্মের কার্য্যের দ্বারা গঠিত করিয়া লইতে পারি। এ স্বাধীনতা মানুষের আছে। ইতর প্রাণীদের এ স্বাধীনতা নাই। আমরা ইচ্ছা করিলে পাপপথে যাইতে পারি এবং ইচ্ছা করিলে পুণ্যপথেও যাইতে পারি। পুণ্য হইতে ধর্ম্মসংস্কার হয়, তাহার ফল সুখ, আর পাপ হইতে অধর্ম্মসংস্কার হয়, তাহার ফল দুঃখ। সুতরাং আমরা নিজেরাই আমাদের জাতি, আয়ুঃ ও ভোগের সৃষ্টিকর্ত্তা। তাই বলি, নিজের গর্ত্ত নিজেই খনন করিয়া, এখন তাহাতে পড়িয়া যন্ত্রণায় হা হুতাশ করিলে আর কি হইবে! দৃঢ় সাধন অবলম্বন করিলে, মুক্তি লাভ হইবে।

কর্ম্মাশয় দুইপ্রকার। পুণ্য কর্ম্মাশয় ও পাপ কর্ম্মাশয়। পুণ্যকর্ম্ম জন্য পুণ্য কর্ম্মাশয় আর পাপকর্ম্ম জন্য পাপ কর্ম্মাশয় হয়। আমরা কতকগুলি কর্ম্মাশয় লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি। এইগুলি আমাদের প্রারব্ধ

কর্ম্মাশয়। প্রারব্ধ কর্ম্মাশয়ের ফল আমাদিগকে ভোগ করিতেই হইবে। এই প্রারব্ধ কর্ম্মাশয়ের ফলভোগ জন্য, আমরা তদনুরূপ জাতি, আয়ুঃ ও ভোগ প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহজীবনে মুক্ত হইবার পরেও এই প্রারব্ধ ভোগ জন্য দেহ জীবিত থাকে। ইহজীবনে যাঁহারা মুক্ত হইবেন, মুক্তি হইলেই তাঁহাদের দেহপাত হইবে না। প্রারব্ধ কর্ম্মের ফলভোগ যতদিন না শেষ হয়, ততদিন তাঁহাদিগকে দেহধারণ করিয়া থাকিতে হয়। তৎপরে প্রারব্ধভোগ শেষ হইলেই তাঁহাদের দেহপাত হইবে। আমাদের চিত্তে এই প্রারব্ধ কর্ম্মের অসংখ্য সংস্কার পড়িয়া আছে। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি পুণ্য সংস্কার ও কতকগুলি পাপ সংস্কার। আমাদের ইহজীবনের তীব্র পুণ্যকার্য্যের দ্বারা পাপসংস্কার ক্ষয় হইতে পারে, আবার তীব্র পাপকার্য্যের দ্বারা পুণ্যসংস্কারও ক্ষয় হইতে পারে। এই হেতু তোমার প্রারব্ধ সংস্কারের মধ্যে যদি কোন পাপ সংস্কার থাকে, তজ্জন্য ভীত বা নিরাশ হইও না। তীব্রভাবে পুণ্যকার্য্য করিয়া যাও, তাহাহইলেই, সেই পাপ সংস্কার ক্ষয় হইয়া যাইবে। যদি তোমার চিত্তে হিংসারূপ পাপ সংস্কার থাকে, তাহাহইলে, অহিংসারূপ পুণ্য সংস্কারের কার্য্য করিয়া যাও—হিংসাসংস্কার ক্ষয় হইবে। যদি ক্রোধরূপ পাপসংস্কার থাকে, তাহাহইলে, ক্ষমারূপ পুণ্যকার্য্য কর— ক্রোধসংস্কার ক্ষয় হইয়া যাইবে। যদি তুমি কামুক হও, তাহাহইলে, পূর্ণব্রহ্মচর্য্য পালন কর—তোমার কামসংস্কার ক্ষয় হইয়া যাইবে; যদি তুমি মিথ্যাবাদী হও, তাহাহইলে, সর্ব্বদা সত্য কথা কহ;—এই মিথ্যাকথনের সংস্কার ক্ষয় হইয়া যাইবে। যদি তোমার চুরির সংস্কার থাকে, তাহাহইলে, দানের কার্য্য কর—চুরির সংস্কার ক্ষয় হইয়া যাইবে। আমাদের চিত্তে যে ভাবের সংস্কার থাকিবে, আমরা তাহার বিপরীত ভাবের কার্য্য করিলেই আমাদের সেই সংস্কার ক্ষয় হইয়া যাইবে। সংস্কার হইতেই আমাদের মনে কার্য্যের ইচ্ছা জন্মে।

যাহার মনে চুরি করিবার ইচ্ছা হয়, তাহার চুরির সংস্কার আছে। যাহার মনে মিথ্যাকথা বলিবার ইচ্ছা হয়, তাহার মনে মিথ্যাকথার সংস্কার আছে। এইরূপভাবে বিচার করিলে, আমাদের মনে কখন কোন সংস্কারের উদয় হয় তাহা আমরা বুঝিতে পারি এবং এইরূপে আমরা পূর্ব্বজন্মে কিরূপে জীবনযাপন করিয়াছি, তাহাও কতকটা জানিতে পারি। আমাদের চিত্তে কতটা পুণ্য এবং কতটা পাপ-সংস্কার আছে, তাহাও আমরা জানিতে পারি এবং তাহা জানিতে পারিলে আমরা তাহার প্রতিবিধানও করিতে পারি এবং সেই সংস্কার ক্ষয় করিয়া আমরা মুক্ত হইতে পারি। অতএব ইচ্ছা করিলে মুক্তও হইতে পারি আর ইচ্ছা করিলে বদ্ধও হইতে পারি। তোমার ইচ্ছার উপর সমুদয় নির্ভর করিতেছে। সাবধান! এজগতে তোমার অপর কোন বন্ধু বা শত্রু নাই। তোমার মনই তোমার একমাত্র বন্ধু বা শত্রু। যদি সুখী হইতে চাও, তাহাহইলে, শাস্ত্র অবহেলা করিও না। তোমার মলিন বুদ্ধিতে যাহা করিতেছ, সেইসকল তোমারই অনিষ্টের কারণ হইতেছে। অতএব বুদ্ধিকে নির্ম্মল কর; যথাযথ বস্তুর বিচার করিতে সমর্থ হইবে।

তে হ্লাদপরিতাপফলাঃ পুণ্যাপুণ্যহেতুত্বাৎ ॥ ১৪ ॥

তাহারা অর্থাৎ এই জাতি, আয়ুঃ ও ভোগ, জীবকে পুণ্যহেতু হ্লাদ অর্থাৎ সুখ এবং অপুণ্যহেতু পরিতাপ অর্থাৎ দুঃখ প্রদান করে।

"যে যে ভাব অন্তরেতে করিয়া স্মরণ,
কলেবর পরিত্যাগ করে জীবগণ,
সেই সেই ভাবে চিত্ত নিবিষ্ট থাকায়,
কৌন্তেয়! দেহান্তে জীব সেই ভাব পায়।"

সমুদয় জীবনে যে কার্য্য করা হয়, তাহার সংস্কার চিত্তে গ্রথিত হয় এবং মৃত্যুকালে জীব সেইরূপভাবে ভাবিত হয় ও পরজন্মে তাহার অনুরূপ দেহপ্রাপ্তি ঘটে। জীব একটী নূতন দেহ প্রাপ্ত হইলে, তাহার পূর্ব্বদেহের কথা বিস্মৃত হয়। যেমন স্বপ্নকালে যদি একজন দরিদ্র ভিখারী রাজদেহ প্রাপ্ত হয়, তখন সে নিজেকে রাজা বলিয়া মনে করে, সে যে জাগ্রদবস্থায় ভিখারী ছিল, তাহা তাহার মনে হয় না; সেইরূপ আমরা পরজন্মে যদি শূকরদেহ প্রাপ্ত হই, তাহাহইলে, আমরা যে কখনও মানুষ ছিলাম তাহাও আমাদের মনে হইবে না। আমাদের মনে হইবে—আমরা চিরকালই শূকর। আমরা এজন্মে মানুষ হইয়া জন্মিয়াছি আমরা যে পূর্ব্বজন্মে হয়ত শূকর ছিলাম, তাহা আমাদের আদৌ মনে হয় না। আমরা মনে ভাবি যে আমরা চিরকালই মানুষ। আমাদের অন্তর্নিহিত ভাবই বাহিরে মূর্ত্তিরূপে প্রকাশিত হয়। ভাব আমাদের সূক্ষ্ম ও অদৃশ্যমূর্ত্তি। সেই সূক্ষ্ম অদৃশ্যমূর্ত্তিই বাহিরের স্থূলমূর্ত্তিরূপে প্রকটিত হয়। একটী ক্ষুদ্র বটবীজের মধ্যে একটী বৃহৎ স্থূল বটবৃক্ষের ভাবমূর্ত্তি সূক্ষ্মভাবে থাকে; পরে কালক্রমে তাহা প্রকাশিত হইয়া স্থূলবৃক্ষরূপে আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। আমাদের অন্তরস্থ ভাবই আমাদের মূর্ত্তি। মৃত্যুকালে মুমূর্ষু ব্যক্তির মনে যে ভাব থাকে, তাহার পরজন্মে সেই মূর্ত্তি হয়। অতএব আমরাই আমাদের দেহাদি গঠিত করি। পাপকার্য্যের দ্বারা পাপদেহ হয় আর পুণ্যকার্য্যের দ্বারা পুণ্যদেহ হয়। যে কার্য্যে অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ বর্দ্ধিত হয়, তাহা পাপকার্য্য; আর যে কার্য্যে অবিদ্যাদির ক্ষয় হয়, তাহা পুণ্যকার্য্য। অবিদ্যা বর্দ্ধিত হইলে দুঃখ হয়, আর অবিদ্যার ক্ষয় হইলে সুখ হয়। ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, ধী, বিদ্যা, সত্য ও অক্রোধ এই দশটী পুণ্যকার্য্য। ইহারা অবিদ্যা নষ্ট করে ও সুখ উৎপাদন করে আর ক্রোধ, লোভ, হিংসা ও

অসত্যাদি পাপকার্য্য। ইহারা অবিদ্যা বর্দ্ধিত করে ও দুঃখ উৎপাদন করে।

পরিণামতাপসংস্কারদুঃখৈর্গুণবৃত্তিবিরোধাচ্চ দুঃখমেব সর্ব্বং বিবেকিনঃ ॥ ১৫ ॥

তত্ত্বজ্ঞ যোগীদিগের নিকট বিষয়মাত্রই দুঃখের হেতু, যেহেতু বিষয়ের পরিণাম, তাপ ও সংস্কার দুঃখ আছে এবং প্রকৃতির সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের পরস্পরের মধ্যে সর্ব্বদাই বিরোধ চলিতেছে।

যেখানে সত্ত্ব, রজঃ ও তম সেইখানেই কলহ। সত্ত্ব কখনও রজঃ ও তমকে জয় করিতেছে, রজঃ কখনও সত্ত্ব ও তমকে জয় করিতেছে এবং তম কখনও সত্ত্ব ও রজঃকে জয় করিতেছে। কখনও সত্ত্বগুণের প্রাবল্য, কখনও রজোগুণের প্রাবল্য এবং কখনও বা তমোগুণের প্রাবল্য। এইরূপে গুণসকল এক মুহূর্ত্তের জন্যও কলহ ত্যাগ করে না। দিবারাত্র তাহারা কলহ লইয়া আছে। প্রকৃতির সর্ব্ববিষয়ই এই তিন গুণে নির্ম্মিত। রূপ বল, রস বল, শব্দ বল, গন্ধ বল বা স্পর্শ বল সকল বিষয়ই এই ত্রিগুণে নির্ম্মিত, সুতরাং সকল বিষয়ের মধ্যেই দিবারাত্র কলহ লাগিয়া আছে। যে গৃহস্থের পরিবারবর্গ সর্ব্বদাই কলহে নিযুক্ত, তাহার গৃহে শান্তি থাকিতে পারে না। তাহার সংসারে সর্ব্বদাই অশান্তি। যে বিষয়ের মধ্যে সর্ব্বদাই এইরূপ গুণের কলহ লাগিয়া আছে, তাহার মধ্যেই বা শান্তি কিরূপে থাকিবে? তত্ত্বজ্ঞানী বিবেকী যোগীরা ইহা বুঝিতে পারেন, সেইজন্য তাঁহারা কোন বিষয়েই সুখ দেখিতে পান না। আবার সকল বিষয়ের পরিণাম দুঃখ আছে। একটী সুমিষ্ট আম্র ভক্ষণ করিবার পর, তাহার মিষ্টরসের সংস্কার চিত্তে রহিয়া গেল এবং ভবিষ্যতে তোমার মনে পুনরায় সেই মিষ্টরস ভোগের জন্য

ইচ্ছা জন্মিবে এবং পুনরায় তোমাকে সেই আম্র সংগ্রহ করিয়া খাইতে হইবে। একটী কামিনীর রূপ দর্শন করিবার পর তোমার চিত্তে সেই রূপের ছাপ পড়িল এবং পুনরায় তোমার তাহাকে দেখিবার ইচ্ছা হইবে। সুতরাং রূপ ও রসাদি সমুদয় বিষয়ের পরিণাম ও সংস্কার দুঃখ আছে। এইহেতু বিবেকিগণ এই রূপ ও রসাদি বিষয়ে সুখ খুঁজিয়া পান না। অবিবেকিগণই বিষয়ে সুখ অনুভব করে। কামোন্মত্ত নরেরা নারীশরীরের সঙ্গলাভের জন্য দেহ ও মর্ম্মের সমুদয় সাররত্ন বিসর্জ্জন দেয়। লোভপরতন্ত্র বিষয়ী ব্যক্তিগণ ক্ষণিক, অস্থায়ী ও সর্ব্বদুঃখের আকর বিষয়লাভ কামনায় জগতের সকল দুষ্কার্য্যই করিতে পারে। রসলোভী পেটুক জিহ্বার স্বাদ মিটাইবার জন্য ইন্দুর, বিড়াল প্রভৃতি জন্তুর মাংসভোজনেও উদ্যোগী হয়।

ভোগ যতই করিবে ততই কর্ম্মাশয়ের বৃদ্ধি হইবে। বিষয়ভোগে সুখ অনুভব হইলে আমাদের চিত্তে সুখজ কর্ম্মাশয় হয়। এই সুখজ কর্ম্মাশয় হইতে ভবিষ্যতে সুখ পাইবার লালসা জন্মে। বিষয়ভোগে দ্বেষ হইলে, আমাদের দ্বেষজ কর্ম্মাশয় উৎপন্ন হয় এবং ভবিষ্যতে সেই কর্ম্মাশয় হইতে মনে বিদ্বেষভাব উৎপন্ন হয়, এইরূপ কতকগুলি বিষয় হইতে আমাদের মোহ হয়, তাহাতে আমাদের মোহজ কর্ম্মাশয় প্রস্তুত হয়। অতএব কর্ম্মাশয় এই তিনপ্রকার ;—(১) সুখজ কর্ম্মাশয়, (২) দ্বেষজ কর্ম্মাশয় এবং (৩) মোহজ কর্ম্মাশয়। প্রত্যেক বিষয় ভোগকালেই সুখ, দ্বেষ বা মোহ ইহাদের একটী না একটীর উদয় হয়। অবিবেকী বিচারহীন বিষয়ীর নিকট বৈষয়িক সুখে সুখবোধ হইলেও, বিবেকীর নিকট তাহা দুঃখ বলিয়া বোধ হয়। অবিবেকী মাত্র বর্ত্তমান বিষয়ভোগের সময়ে সুখবোধ করে, কিন্তু পরিণামে দুঃখ পায়। কিন্তু বিবেকী বর্ত্তমান বিষয়সুখ ভোগের সময়েও দুঃখ অনুভব করেন। সাত্ত্বিক বৃত্তি হইতে সুখ, রাজসবৃত্তি হইতে দুঃখ

এবং তামসবৃত্তি হইতে মোহ উৎপন্ন হয়। সকল বিষয়ই এই তিনগুণে নির্ম্মিত, অতএব প্রতি বিষয়ের মধ্যেই সুখ, দুঃখ ও মোহ মিশ্রিত আছে। জাগতিক এমন কোন বিষয় নাই, যাহাতে কেবল সুখ বর্ত্তমান আছে এবং দুঃখ ও মোহের লেশমাত্রও নাই। ত্রিগুণের মধ্যে যত বিষয় আছে, তাহাতে সুখ, দুঃখ ও মোহ থাকিবেই থাকিবে। এইজন্য যতদিন বিষয়াসক্তি থাকিবে, ততদিন নির্ম্মল সুখ পাইবে না। বিষয়াসক্তি ত্যাগ করিয়া আত্মদর্শন হইলে, তবে সেই নির্ম্মল সুখের অধিকারী হইবে। "ত্যাগেন অমৃতমশ্নুতে"।

হেয়ং দুঃখমনাগতম্ ॥ ১৬ ॥

অনাগত দুঃখ হেয়।

দুঃখ তিন প্রকার। গত অর্থাৎ অতীত, বর্ত্তমান অর্থাৎ যাহা এক্ষণে ভোগ হইতেছে এবং অনাগত অর্থাৎ যাহা ভবিষ্যতে আসিবে। এই তিন প্রকার দুঃখের মধ্যে ভবিষ্যৎ দুঃখই প্রতিকারযোগ্য। যে দুঃখ অতীত হইয়াছে, তজ্জন্য শোক করা বৃথা, তাহাতে শোক করিয়া কোনও ফল নাই। ছেলে মরিয়া গিয়াছে, এখন তজ্জন্য যতই শোক করনা কেন, সে ছেলে আর ফিরিয়া আসিবে না; অতএব তজ্জন্য শোক করা বৃথা। তাহাতে নিজের অনিষ্ট ব্যতীত ইষ্ট নাই। বর্ত্তমান সময়ে যে দুঃখ ভোগ করিতেছ, ভোগ হইলেই তাহার শেষ হইবে। কাহারও জীবনে সুখ বা দুঃখ চিরস্থায়ী নয়। সুখ আসে আবার চলিয়া যায়। দুঃখও আসে আবার চলিয়া যায়। ইহারা চিরস্থায়ী নয়। সুখের সময় মনে করিও না যে তোমার এই সুখ চিরস্থায়ী। এই সুখের পর দুঃখ আসিবেই আসিবে। আবার দুঃখের সময় মনে করিও না যে এই দুঃখ চিরস্থায়ী; কারণ ইহার পর সুখ আসিবেই আসিবে।

এইজন্য বর্ত্তমান সুখে উন্মত্ত হইও না, আর দুঃখেও অভিভূত হইও না। অনাগত দুঃখ এখনও আসে নাই। আমরা চেষ্টা করিলে সেই দুঃখের হাত হইতে ত্রাণ পাইতে পারি। আমাদের চিত্তের মধ্যে সুখ ও দুঃখের সংস্কার আছে। যখন সুখের সংস্কার উদ্বুদ্ধ হয়, তখন আমরা সুখকর কার্য্য করি এবং সুখ পাই। যখন দুঃখসংস্কার উদ্বুদ্ধ হয়, তখন আমরা দুঃখকর কার্য্যে প্রবৃত্ত হই ও দুঃখ পাই। যে সকল দুঃখসংস্কার এখনও উদ্বুদ্ধ হয় নাই, যে সকল দুঃখসংস্কারের বীজ এখনও অঙ্কুরিত হয় নাই—আমরা চেষ্টা করিলে সেই সকল বীজ ক্ষীণ করিতে পারি। অতএব অনাগত দুঃখমাত্রই হেয় অর্থাৎ ত্যজ্য বা প্রতিকারযোগ্য।

দ্রষ্টৃদৃশ্যয়োঃ সংযোগো হেয়হেতুঃ ॥ ১৭ ॥

দ্রষ্টা পুরুষের এবং দৃশ্য প্রকৃতির যে সংযোগ, তাহা হেয়হেতু।

দ্রষ্টা পুরুষের সহিত দৃশ্য প্রকৃতির সংযোগের একতা অনুভবই সংসার বা দুঃখের কারণ এবং এই দ্রষ্টা ও দৃশ্যের বিয়োগ অনুভবই মুক্তি বা সুখের কারণ। অতএব যতদিন দ্রষ্টা ও দৃশ্য অভেদভাবে অবস্থিতি করিবে, ততদিন দুঃখও অনিবার্য্য।

অনাগত দুঃখের হাত হইতে আমরা পরিত্রাণ পাইতে পারি। দুঃখের কারণ জানা থাকিলে, দুঃখ প্রতিকারের উপায় জানা থাকিলে এবং দুঃখ যদি প্রতিকারযোগ্য হয়, তাহাহইলে, আমরা ভবিষ্যৎ দুঃখ নিবারণ করিতে পারি। পথের উপর কণ্টক বিস্তৃত আছে, যদি আমরা নগ্নপদে সেই পথে যাতায়াত করি, তাহাহইলে, সেই কণ্টক আমাদের পদে বিদ্ধ হইয়া আমাদিগকে ক্লেশদান করে; কিন্তু যদি জুতা পায়ে দিয়া সেই পথে বিচরণ করি, তাহাহইলে, আর সেই

কণ্টক বিদ্ধ হইয়া আমাদিগকে কষ্ট দিতে পারিবে না। আমাদের ক্লেশের কারণ কণ্টকের তীক্ষ্ণতা এবং পদতলের ভেদ্যতা। কণ্টকের বিদ্ধ করিবার শক্তি আছে এবং পদতলের বিদ্ধ হইবার যোগ্যতা আছে; এই হেতু পদতল, কণ্টকের সহিত একত্র সংলগ্ন হইলে বিদ্ধ হইয়া যায়। যদি কণ্টক সূক্ষ্মতাবশতঃ বিদ্ধ করিবার শক্তি না পাইত কিম্বা পদতল কোমল না হইয়া, লৌহের ন্যায় কঠিন হইত ও তাহার বিদ্ধ হইবার যোগ্যতা না থাকিত, তাহাহইলে, ঐ কণ্টক আমাদের পদতল বিদ্ধ করিতে পারিত না এবং আমরাও তজ্জন্য ক্লেশ পাইতাম না। এক্ষণে কণ্টক ও পদতল যাহাতে একত্র যুক্ত হইতে না পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে পারিলে অর্থাৎ কণ্টক ও পদতল একত্র সংযুক্ত না হইলে, আমরা সেই ক্লেশ হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারি। পদতল স্বাভাবিক অবস্থায় ক্লেশশূন্য এবং কণ্টকও জড়, সুতরাং তাহার মধ্যেও ক্লেশ নাই; কেবল উভয়ের সংযোগবশতঃ ক্লেশের উৎপত্তি হয়। সেইরূপ চৈতন্যের মধ্যে দুঃখ নাই, বুদ্ধিও জড় সুতরাং তাহার মধ্যেও দুঃখ আসিতে পারে না; তবে চৈতন্য ও বুদ্ধি একত্র যুক্ত হইলেই ক্লেশ উৎপন্ন হয়। লৌহ কৃষ্ণবর্ণ, শীতল ও দাহিকাশক্তিবিহীন; আর অগ্নি লোহিতবর্ণ, উষ্ণ ও দাহিকাশক্তিবিশিষ্ট। কিন্তু যখন লৌহ ও অগ্নি একত্র মিলিত হয়, তখন লৌহ স্বভাবতঃ কৃষ্ণবর্ণ হইলেও অগ্নির ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া রক্তবর্ণ হয়; স্বাভাবিক শীতল হইলেও অগ্নির ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া উত্তপ্ত হয় এবং স্বভাবতঃ দাহিকাশক্তিহীন হইলেও অগ্নির ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া দাহিকাশক্তিবিশিষ্ট হয়। লৌহ যেমন অগ্নির সহিত মিলিত হইয়া অগ্নির ধর্ম্ম গ্রহণ করে ও অগ্নিস্বরূপ হইয়া যায়, চৈতন্যও সেইরূপ বুদ্ধির সহিত মিলিত হইয়া বুদ্ধির ধর্ম্ম গ্রহণ করেন ও বুদ্ধির মত হইয়া যান অর্থাৎ নিজেকে চৈতন্য মনে না করিয়া—আত্মবিস্মৃত হইয়া মনে করেন, "আমি সুখদুঃখযুক্ত বুদ্ধি, আমি সুখদুঃখহীন চৈতন্য

নহি।" এই হেতু দ্রষ্টৃ পুরুষ চৈতন্য ও দৃশ্য বুদ্ধির একত্র সংযোগ হইলে— আমরা সুখ দুঃখ অনুভব করি। বাস্তবিক চৈতন্য দুঃখশূন্য এবং বুদ্ধিও জড়। যখন এই দুইয়ের একত্র সংযোগ হয় তখন চৈতন্য বুদ্ধির ধর্ম্মে ধর্ম্মান্বিত হইয়া সুখদুঃখ অনুভব করেন। পুরুষের এই বুদ্ধির সহিত বিয়োগ ঘটিলেই আর দুঃখ হইবে না অর্থাৎ চৈতন্য যখন জানিতে পারিবেন যে, "আমি চৈতন্য, আমি সুখদুঃখবিহীন, আমি বুদ্ধি নহি—বুদ্ধি আমা হইতে পৃথক্, বুদ্ধির ধর্ম্ম সুখদুঃখ আমার নহে, আমি নির্লিপ্ত, আমি বুদ্ধির সহিত লিপ্ত নহি, বুদ্ধির সহিত লিপ্ত হইয়া আমার দুঃখ হইয়াছিল," তখন পুরুষের জ্ঞান প্রকাশ পাইবে, তখন পুরুষের বিবেক প্রকাশ পাইবে এবং তিনি চিরকালের জন্য দুঃখের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবেন। চৈতন্য দুঃখভোগী নন এবং বুদ্ধিও জড়স্বভাববশতঃ দুঃখভোগ করিতে পারে না, তবে কে এই দুঃখভোগ করে? এই চৈতন্য ও বুদ্ধির সংযোগবশতঃ একটি আমিত্বের সৃষ্টি হয়। চৈতন্য বুদ্ধির সহিত যুক্ত হইলে, এই "আমিভাবের" উদয় হয়। এই "আমি" সুখদুঃখ ভোগ করে। চৈতন্যের বুদ্ধির সহিত বিয়োগ ঘটিলে এই আমিত্বের লয় হয়; তখন পুরুষ মুক্ত—তখন সুখ-দুঃখবোধ আর থাকে না। এই আমিত্ব, অভিমান বা অস্মিতার উদ্ভবই সকল সুখদুঃখের কারণ। দ্রষ্টা ও দৃশ্যের সংযোগ হইলেই "আমিভাব" আসিল ও তাহার সহিত সুখদুঃখ আসিল এবং দ্রষ্টা ও দৃশ্যের বিয়োগ হইলেই এই "আমিভাব" লয় পাইল এবং ক্লেশেরও অন্ত হইল। অবিদ্যা বা অজ্ঞানই এইরূপ সংযোগ সংঘটন করে। এইহেতু অস্মিতার মূলে অবিদ্যা আছে।

পুরুষ দৃশ্যে অভিমান করিলেই দৃশ্য থাকে, আর পুরুষ এই-অভিমান ত্যাগ করিলেই দৃশ্য থাকে না। পুরুষ যতক্ষণ যে দৃশ্যে অভিমান করিবেন, ততক্ষণ সেই দৃশ্য ব্যক্ত বা প্রকাশিত থাকিবে আর পুরুষের

অভিমান ত্যাগ হইলেই, তাহা অব্যক্ত বা অপ্রকাশিত হইবে। যতক্ষণ জগতে অভিমান আছে—ততক্ষণ জগৎ আছে; যতক্ষণ শরীরে অভিমান আছে—ততক্ষণ শরীর আছে। যতক্ষণ ইন্দ্রিয়ে অভিমান আছে ততক্ষণ ইন্দ্রিয় আছে। যতক্ষণ পুত্রকলত্রাদিতে অভিমান আছে ততক্ষণ তাহারাও আছে। যতক্ষণ ঘরবাড়ীতে অভিমান আছে ততক্ষণ তাহারা আছে। যতক্ষণ এই সকল দ্রব্যে আমাদের অভিমান থাকিবে ততক্ষণ আমরা বদ্ধ, আর অভিমান ত্যাগ হইলেই মুক্ত। সেইজন্য "আমি" ও "আমার" ভাব ত্যাগ কর—মুক্ত হইবে।

বুদ্ধি দৃশ্য। বুদ্ধি প্রকৃতির একটী বিকার। প্রকৃতি তিন গুণে নির্ম্মিত; সুতরাং বুদ্ধিও তিনগুণে নির্ম্মিত। বুদ্ধির মধ্যে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ আছে। বুদ্ধির সত্ত্বগুণের প্রাবল্যে সুখ, রজোগুণের প্রাবল্যে দুঃখ এবং তমোগুণের প্রাবল্যে মোহ উৎপন্ন হয়। চৈতন্যের সঙ্গ হইলে বুদ্ধির এইসকল গুণকার্য্য হয়। চৈতন্যের সঙ্গ না হইলে, হয় না—অব্যক্তভাবে থাকে। মুক্তপুরুষের চৈতন্যও বুদ্ধির সঙ্গ করে এবং তাহাতেও বুদ্ধির সুখদুঃখ উৎপন্ন হয়, কিন্তু মুক্তপুরুষ বিবেকী। তিনি জানেন "আমি বুদ্ধি নহি" সেইজন্য তিনি সেই সুখদুঃখের সহিত লিপ্ত হন না। বায়ু, সুগন্ধ ও দুর্গন্ধ, উভয় স্থানেই বহমান হইয়াও যেমন উক্ত সুগন্ধ বা দুর্গন্ধে লিপ্ত হয় না; সূর্য্য যেমন বিষ্ঠা ও চন্দনের উপর কিরণ বিতরণ করিয়াও নির্লিপ্ত থাকেন; পাঁকাল মাছ যেমন পাঁকের মধ্যে থাকিলেও তাহার গায়ে পাঁক লাগে না; পদ্মপত্রে যেমন জল লিপ্ত হয় না; মুক্তপুরুষেরাও সেইরূপ বুদ্ধির সুখদুঃখে নির্লিপ্তভাবে অবস্থান করেন; কারণ তাঁহারা দ্রষ্টৃস্বরূপ থাকেন এবং এই দৃশ্য হইতে আপনাদের স্বতন্ত্র দর্শন করিয়া কেবল সাক্ষিস্বরূপে অবস্থান করেন। বুদ্ধির সুখে তাঁহারা সুখী হন না এবং বুদ্ধির দুঃখেও তাঁহারা দুঃখী হন না। অবিবেকী সংসারীরা বুদ্ধির কার্য্যকে

নিজের কার্য্য বলিয়া মনে করে এবং বুদ্ধির সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী হয়। এই অহঙ্কারই সর্ব্বদুঃখের মূল। আবার আসক্তি হইতে ভোগের আকাঙ্ক্ষা হয়। যাহার ভোগাকাঙ্ক্ষা যত বেশী, তাহার অহঙ্কার তত বেশী ও বৈরাগ্য তত কম। যাহার আসক্তি ও ভোগাকাঙ্ক্ষা যত কম, তাহার অহঙ্কার তত কম ও বৈরাগ্য তত বেশী। ইষ্টপ্রাপ্তি হইলেই আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয়। এই বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া সাধন কর। অভ্যাস ও বৈরাগ্য সর্ব্বসাধনের মূল।

প্রকাশক্রিয়াস্থিতিশীলং ভূতেন্দ্রিয়াত্মকং
ভোগাপবর্গার্থং দৃশ্যম্ ॥ ১৮ ॥

দৃশ্য মাত্রই প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতিশীল, ভূতেন্দ্রিয়াত্মক ও পুরুষের ভোগ ও অপবর্গরূপ অর্থ সাধন করে।

যে দৃশ্যের সহিত সংযোগবশতঃ পুরুষ বদ্ধ হন, সেই দৃশ্য কি? তাহার স্বরূপ কি? তাহার কার্য্য কি? দৃশ্য নিজপ্রয়োজন সাধনার্থ কার্য্য করে কিম্বা পরপ্রয়োজনার্থ কার্য্য করে অর্থাৎ দৃশ্য স্বার্থ কি পরার্থ তাহা ভাল করিয়া বুঝা চাই। দৃশ্য সম্বন্ধে ভাল করিয়া না বুঝিলে উত্তমরূপে সাধন করিতে পারিবে না।

প্রকৃতিই দৃশ্য। কতকগুলি দৃশ্য স্থূল যেমন রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ ও স্পর্শ ইত্যাদি; আর কতকগুলি সূক্ষ্ম যেমন রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র, শব্দতন্মাত্র, গন্ধতন্মাত্র ও স্পর্শতন্মাত্র ইত্যাদি। দৃশ্য স্থূলই হউক বা সূক্ষ্মই হউক, সকল দৃশ্যই তিনটী গুণের দ্বারা নির্ম্মিত। সত্ত্ব, রজঃ ও তম এই তিন গুণ। সত্ত্বগুণ প্রকাশশীল অর্থাৎ বিষয় প্রকাশ করে; সুতরাং সত্ত্বগুণের দ্বারা আমরা বিষয়কে জানিতে পারি। রজোগুণ

ক্রিয়াশীল অর্থাৎ পরিবর্ত্তনশীল; সুতরাং রজোগুণের দ্বারা কার্য্য বা বিষয়ের মধ্যে একটী পরিবর্ত্তন আসে। তমোগুণ স্থিতিশীল অর্থাৎ বিষয়কে সম্পূর্ণ আবৃত করিয়া রাখে, তখন বিষয় অপ্রকাশিত থাকে। তমোগুণ আবরণের ন্যায়, অন্ধকারের ন্যায়। কোন বিষয়ে আবরণ থাকিলে আমরা তাহা দেখিতে পাই না। অন্ধকারের মধ্যে আমরা কিছুই দেখিতে পাই না। হাঁড়ির মধ্যে ভাত আছে কিন্তু তমোরূপ সরাদ্বারা আবৃত আছে। রজোগুণ সেই আবরণটী অর্থাৎ সরাটী খুলিয়া দেয়, তখন সত্ত্বগুণ সেই ভাতকে প্রকাশ করে। অন্ধকার ঘরে অনেক দ্রব্য আছে কিন্তু অন্ধকারের আবরণ জন্য তাহাদের প্রকাশ নাই, আমরা তাহাদের দেখিতে বা জানিতে পারি না। রজোগুণরূপ প্রদীপ জ্বলিতে লাগিল, তখন সত্ত্বগুণের আলোকে সেই সকল দ্রব্য প্রকাশিত হইল। তমোগুণ কার্য্য করিতে দেয় না এবং প্রকাশ হইতে বাধা দেয়। কার্য্য না হইলে প্রকাশ হয় না। নিদ্রা তমোগুণের একটী কার্য্য। নিদ্রার দ্বারা আমাদের শরীর ও ইন্দ্রিয় জড় হইয়া যায়। নিদ্রা ইহাদিগকে কার্য্য করিতে দেয় না। নিদ্রা শরীর ও ইন্দ্রিয়কে জড়ভাবে কার্য্যবিহীন করিয়া রাখে। নিদ্রাকালে আমাদের শরীর আছে কিনা তাহাও আমরা জানিতে পারি না। নিদ্রা, শরীরের ক্রিয়া ও প্রকাশকে নিরুদ্ধ করিয়া রাখে। এইজন্য তমোগুণ প্রকাশ ও ক্রিয়ার রোধনশীল। আমাদের চিত্তে নানাপ্রকার সংস্কার আছে, তমোগুণ সেই সকল সংস্কারকে আবৃত করিয়া গোপনভাবে রাখিয়াছে, রজোগুণের কার্য্যদ্বারা সেই সংস্কার প্রকাশিত হইবে। মনে কর তুমি খুব ভাল গান গাহিতে পার। সেই গীতশক্তি তোমার মধ্যে অপ্রকাশাবস্থায় আছে। পরে তোমার গান গাহিবার ইচ্ছা হইল ও এই ইচ্ছা ক্রিয়ায় পরিণত হইল। তখন যে গান এতক্ষণ অপ্রকাশিতভাবে তোমার চিত্তে সংস্কাররূপে ছিল, তাহা ক্রিয়ার দ্বারা বাহিরে প্রকাশ পাইল।

আমাদের মধ্যে সকল সংস্কারই অপ্রকাশিতভাবে অবস্থান করিতেছে, কারণ পাইলেই রজোগুণের সাহায্যে তাহারা প্রকাশিত হয়। কাম, ক্রোধ, লোভ ও হিংসাদি যাবতীয় সংস্কার আমাদের চিত্তে তমোগুণ-প্রভাবে নিদ্রিত, অব্যক্ত ও অপ্রকাশিতভাবে আছে, কারণ পাইলেই তাহারা রজোগুণের দ্বারা উদ্রিক্ত বা জাগরিত হইয়া কাম, ক্রোধ, লোভ ও হিংসাদি কার্য্য করিয়া, চিত্তের সেই সকল অব্যক্ত সংস্কারকে বাহিরে ব্যক্ত বা প্রকাশিত করিবে। একটী ক্ষুদ্র বটবীজের মধ্যে একটী বৃহৎ বটবৃক্ষ অব্যক্তভাবে আছে। রজোগুণের সাহায্যে তাহা ভবিষ্যতে একটী বৃহৎ বটবৃক্ষরূপে বাহিরে প্রকাশ পাইবে। অতএব সত্ত্বগুণের কার্য্য প্রকাশ, রজোগুণের কার্য্য ক্রিয়া বা পরিবর্ত্তন এবং তমোগুণের কার্য্য স্থিতি বা আবরণ।

এখন দৃশ্যের স্বরূপ কি? দৃশ্যের উপাদান কি? কোন্ কোন্ উপকরণে দৃশ্য পদার্থ নির্ম্মিত হইয়াছে? দৃশ্য—প্রকৃতি মাত্র। প্রকৃতির স্থূল এবং সূক্ষ্ম তত্ত্বগুলিই দৃশ্য। দৃশ্য বলিতে, যাহা আমরা চক্ষুদ্বারা দেখিতে পাই, শুদ্ধ সেইগুলিই দৃশ্য, এরূপ বুঝিও না। আমরা চক্ষুদ্বারা রূপ দর্শন করি—রূপ একটী দৃশ্য। আমরা কর্ণদ্বারা শব্দ শ্রবণ করি—শব্দ একটী দৃশ্য। আমরা রসনাদ্বারা রস আস্বাদন করি—রস একটী দৃশ্য। আমরা নাসিকাদ্বারা গন্ধ আঘ্রাণ করি—গন্ধ একটী দৃশ্য। এইরূপে পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয় রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ ও স্পর্শকে আমরা দৃশ্য বলি, ইহারা স্থূল বিষয়। বাহিরের ইন্দ্রিয়সাহায্যে আমরা বাহিরের স্থূল বিষয় গ্রহণ করি আর ভিতরের ইন্দ্রিয়সাহায্যে অর্থাৎ অন্তঃকরণের সাহায্যে আমরা এই স্থূলরূপাদির সূক্ষ্মতন্মাত্র গ্রহণ করি। স্থূল ইন্দ্রিয় দ্বারা স্থূলরূপ গ্রহণ হয়, সূক্ষ্মরূপ গ্রহণ করা যায় না। সাধন করিলে অন্তঃকরণের এই সূক্ষ্মরূপ গ্রহণের ক্ষমতা হয়। এই সমুদয় দৃশ্য প্রকৃতির অংশ। প্রকৃতি তিন গুণে নির্ম্মিত; সুতরাং এই সমুদয়

দৃশ্যও তিন গুণে নির্ম্মিত সুতরাং তিনটী গুণের সাম্যাবস্থারূপ অব্যক্তাবস্থাই ইহার স্বরূপ।

ইহাদের কার্য্য করিবার অর্থ কি? ইহারা কি নিজপ্রয়োজনে কার্য্য করে অথবা পরপ্রয়োজনে কার্য্য করে? ইহারা স্বার্থ না পরার্থ? প্রকৃতির কার্য্যে প্রকৃতির নিজের কোন স্বার্থ নাই। প্রকৃতি পুরুষের প্রয়োজনে কার্য্য করে। প্রকৃতি পুরুষের ভোগের জন্য কার্য্য করে অথবা কার্য্যদ্বারা পুরুষের অপবর্গ বা মুক্তি সাধন করে। প্রকৃতির কার্য্যদ্বারা পুরুষ সুখদুঃখ ভোগ করেন কিম্বা সুখদুঃখের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া অপবর্গ বা মোক্ষলাভ করেন। প্রকৃতির কার্য্যদ্বারা পুরুষ বদ্ধও হইতে পারেন এবং মোক্ষও পাইতে পারেন। বদ্ধ হইবার জন্যও যেমন প্রকৃতির প্রয়োজন, মোক্ষ পাইবার জন্যও সেইরূপ প্রকৃতির প্রয়োজন। প্রকৃতিকে আমরা যেরূপভাবে কার্য্য করাইব প্রকৃতি সেইভাবে কার্য্য করিবে। প্রবৃত্তি পথে যাইতে হইলেও প্রকৃতির সাহায্য আবশ্যক এবং নিবৃত্তি পথে সাধন করিতে হইলেও প্রকৃতির সাহায্য আবশ্যক। এইজন্য বলা হয়—প্রকৃতির কার্য্য তাহার নিজের স্বার্থে নহে, কিন্তু পরার্থে অর্থাৎ পুরুষপ্রয়োজন সাধনার্থ। এইরূপ প্রকৃতি অর্থাৎ দৃশ্য, পুরুষের ভোগের নিমিত্তও হয়, আবার অপবর্গ বা মোক্ষের নিমিত্তও হয়।

বিশেষাবিশেষলিঙ্গমাত্রালিঙ্গানি গুণপর্ব্বাণি ॥ ১৯ ॥

বিশেষ, অবিশেষ, লিঙ্গমাত্র ও অলিঙ্গ এই চারি প্রকারের গুণপর্ব্ব অর্থাৎ ত্রিগুণের সম্মিলিত ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা বা রূপ।

অবিশেষ গুণপর্ব্ব শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র ও গন্ধতন্মাত্র; এই পাঁচটী তন্মাত্র হইতে বিশেষ গুণপর্ব্ব আকাশ, বায়ু;

অগ্নি, জল ও ভূমি উৎপন্ন হইয়াছে এবং অবিশেষ গুণপর্ব্ব অস্মিতা হইতে বিশেষ গুণপর্ব্ব শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা ও ঘ্রাণ এই পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং এই জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অধিপতি মন, এই এগারটী করণবর্গ উৎপন্ন হইয়াছে। সুতরাং অবিশেষ গুণপর্ব্ব হইল ছয়টী অর্থাৎ পঞ্চতন্মাত্র ও অস্মিতা এবং বিশেষ হইল ষোড়শটী অর্থাৎ পঞ্চ ভূত, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মন। এই ছয়টী অবিশেষ আবার লিঙ্গমাত্র মহত্তত্ত্ব হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। আবার এই লিঙ্গমাত্র মহত্তত্ত্ব, অলিঙ্গ প্রকৃতি বা অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। প্রকৃতির অপর নাম প্রধান। এই অব্যক্ত প্রকৃতি কোন কিছু হইতে উৎপন্ন হয় নাই। ইহা অনাদি। এইটী প্রকৃতির চরম সূক্ষ্মাবস্থা। এইস্থানে তিনটী গুণের কোন কার্য্য হয় না। এখানে ইহারা সাম্যাবস্থায় থাকে, এই কারণে প্রকৃতি অব্যক্ত অর্থাৎ অপ্রকাশিত। ছয় অবিশেষ, ষোড়শ বিশেষ, এক লিঙ্গমাত্র মহত্তত্ত্ব ও এক প্রধান এই সর্ব্বসমেত চতুর্ব্বিংশতিসংখ্যক প্রকৃতির গুণপর্ব্ব। ইহারা সকলেই তিনটী গুণের মিশ্রণে নির্ম্মিত। প্রকৃতির সমস্ত দ্রব্যই তিনটী গুণের মিশ্রণে উৎপন্ন হইয়াছে। একটী গুণ বা দুইটী গুণের দ্বারা কিছুই হয় নাই। যেখানেই দেখিবে, তিনটী গুণই দেখিতে পাইবে।

কারণ হইতে কার্য্যের উৎপত্তি হয়। অব্যক্ত কারণ, ইহার কার্য্য মহত্তত্ত্ব; আবার মহত্তত্ত্ব কারণ, ইহার কার্য্য অস্মিতা; আবার অস্মিতা কারণ, ইহার কার্য্য পঞ্চতন্মাত্র ও একাদশ ইন্দ্রিয়; আবার পঞ্চতন্মাত্র কারণ, ইহাদের কার্য্য পঞ্চভূত। পঞ্চভূতই শেষ কার্য্য। পঞ্চভূতই সৃষ্টির শেষ স্থূলাংশ। পঞ্চভূত হইতে আর কোন কার্য্য উৎপন্ন হয় নাই। এইরূপে প্রকৃতির অনুলোম পরিণামে সৃষ্টিপ্রক্রিয়া হয়। আবার প্রকৃতির প্রতিলোম পরিণামে প্রলয় সাধিত হয় অর্থাৎ কার্য্য কারণে

লীন হয়। যেমন পঞ্চভূত পঞ্চতন্মাত্রে, পঞ্চতন্মাত্র ও ষোড়শেন্দ্রিয় অস্মিতাতে, অস্মিতা মহত্তত্ত্বে এবং মহত্তত্ত্ব প্রকৃতিতে লীন হইয়া প্রলয় উৎপাদন করে।

পঞ্চভূত যথা,—ক্ষিতি, অপ্‌, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম। স্থূল মাটী, পাথর, ও কাঠ প্রভৃতি ক্ষিতির অংশ। আমাদের শরীরের হাড় ও মাংস প্রভৃতি ক্ষিতির অংশ। জল অপের অংশ। আমাদের শরীরের রক্ত ও রসভাগ অপের অংশ। তেজ ও উষ্ণতা প্রভৃতি তেজের অংশ। আমাদের শরীরের উষ্ণতা তেজের অংশ। অগ্নির উষ্ণতা তেজের অংশ। মরুৎ অর্থাৎ বায়ু। আমাদের শরীরের মধ্যে বায়ু আছে। বক্ষঃস্থলে ফুস্‌ফুসের মধ্যে ও উদরে অন্ত্রমধ্যে বায়ু আছে। ব্যোম অর্থাৎ আকাশ। আমাদের শরীরে আকাশের অংশ আছে, যেমন মুখগহ্বর, নাসিকাগহ্বর প্রভৃতিতে। এই হেতু জানা যায় যে ব্রহ্মাণ্ডে যাহা কিছু আছে, তাহার সমুদয় আমাদের শরীরে আছে। ব্রহ্মাণ্ডে এমন কোন দ্রব্য নাই, যাহা আমাদের শরীরে নাই। আমাদের শরীরের মাংস ও হাড়কে ক্ষিতি বলি। বাস্তবিকই ইহারা মাটী—কেননা ইহারা মাটী হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, আবার মৃত্যুর পর মাটীতেই মিশাইয়া যাইবে। মাটী হইতে চাল, ডাল প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। চাল ও ডাল মাটীর রূপান্তর মাত্র। তাহারা মাটী ভিন্ন আর কিছু নয় কেবল রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে। আবার চাল ডাল খাইয়া আমাদের শরীরে মাংসবৃদ্ধি হয়। অতএব মাংস, চাল ও ডালের রূপান্তর মাত্র। এই হেতু মাংসও যে বস্তু, চালডালও সেই বস্তু, কেবল রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে। জগতে কোন দ্রব্যের সম্পূর্ণ লয় নাই। কোন দ্রব্যেরই লয় হয় না। কেবল এক রূপ হইতে অন্য রূপ গ্রহণ করে। মাটী, চাল ও ডালের রূপ গ্রহণ করে; আবার চাল ও ডাল, মাংসের রূপ গ্রহণ করে; আবার মাংস, মাটীর রূপ গ্রহণ করে। এইপ্রকারে পদার্থসকল

ক্রমান্বয়ে এক রূপ ত্যাগ করিয়া অন্য রূপ গ্রহণ করিতেছে। মানুষ মরিয়া গেলে মাটীতে পুঁতিয়া ফেলিলে, মানুষের হাড় মাংস পচিয়া মাটী হইয়া যায়। সেই মাটীতে ধান, ডাল বা অন্য কোন শস্য রোপিত হইলে, সেই রূপান্তরিত মাটী হইতে আবার চালডাল উৎপন্ন হয়। সেই চাল ও ডাল মানুষে খাইলে, মানুষের শরীর তৈয়ারী হয়। গরুতে খাইলে গরুর শরীর তৈয়ারী হয়। কুকুরে খাইলে কুকুরের শরীর তৈয়ারী হয়। অতএব তোমার শরীরের মাংসদ্বারা কুকুর বিড়ালের শরীর নির্ম্মিত হইতে পারে এবং কুকুর বিড়ালের মাংসদ্বারাও তোমার শরীর নির্ম্মিত হইতে পারে। আজ তোমার শরীরে যে মাংস আছে, কাল সেই মাংস কুকুর বিড়ালের শরীরে যাইতে পারে এবং আজ কুকুরের শরীরে যে মাংস আছে কাল তোমার শরীরেও সেই মাংস প্রবেশ করিতে পারে। অতএব পৃথিবীর সমুদয় শরীরই এক ক্ষিতি ভিন্ন অন্য কিছু নয়। সমুদয় শরীরই এক ভিন্ন দুই নয়। অতএব শরীরের জন্য অহঙ্কার করিও না। এইরূপ বিচার করিলে আমরা বুঝিতে পারিব যে, পৃথিবীর জলময় অংশ সমুদয়ই এক ভিন্ন দুই নয়। আজ ঐ কুকুর যাহা প্রস্রাব করিল, তাহা মাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল এবং মাটী হইতে তাহার জলীয়াংশ সূর্য্যকিরণ দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া আকাশে উঠিয়া মেঘরূপে পরিণত হইল, তৎপরে সেই মেঘ হইতে বারিবর্ষণ হইয়া তোমার পিপাসা নিবারণ করিল। অতএব তুমি প্রতি মুহূর্ত্তে কুকুর ও বিড়ালের প্রস্রাব পান করিতেছ। অতএব তোমার অহঙ্কার কেন? এইপ্রকার বিচার করিলে আমরা বুঝিতে পারিব যে, জগতের সমুদয় তেজ এক ভিন্ন দুই নয়। তোমার শরীরের উষ্ণতা, কুকুরের শরীরের উষ্ণতা, বায়ুর উষ্ণতা, জলের উষ্ণতা, সূর্য্যের উষ্ণতা, ও অগ্নির উষ্ণতা সকলই এক উষ্ণতা, দুই নয়। এইরূপ মরুৎ এবং ব্যোমও একভিন্ন দুই নয়।

অতএব ব্রহ্মাণ্ডে একত্ব ভিন্ন দ্বিত্ব নাই। ভ্রান্তিতে দুই বলিয়া বোধ হয়। ভ্রান্তি চলিয়া গেলে, এক বোধ হইবে। এইরূপে আমরা বুঝিতে পারি যে, জগতের সমুদয় স্থূলভূত যাহা লৌকিক দৃষ্টিতে ভিন্ন ভিন্ন বোধ হইতেছে, তাহা এক ব্যতীত দুই নয়। ব্যষ্টি বুদ্ধিতে ভিন্ন দর্শন। সমষ্টি বুদ্ধিতে একদর্শন। এই সমষ্টি স্থূলভূতের নাম বিরাট্ পুরুষ। যেমন ভিন্ন ভিন্ন ব্যষ্টি স্থূলভূত নাই একমাত্র সমষ্টি বিরাট্ পুরুষই বর্ত্তমান, তেমনই ভিন্ন ভিন্ন ব্যষ্টি সূক্ষ্মদেহও নাই একমাত্র সমষ্টি সূত্রাত্মা বা হিরণ্যগর্ভই বর্ত্তমান। আমার মধ্যে যে মন, তোমার মধ্যে যে মন, ঐ কুকুরের মধ্যে যে মন, ঐ গাছের মধ্যে যে মন, আমরা লৌকিক দৃষ্টিতে এ সকল মনকে ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া বোধ করি; কিন্তু পারমার্থিক দৃষ্টিতে এই সমুদয় ব্যষ্টি মন এক সমষ্টি মনের অংশমাত্র। একমাত্র মহামনই বর্ত্তমান, অন্য মন নাই। সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন দর্শনেন্দ্রিয় বা শ্রবণেন্দ্রিয় প্রভৃতি নাই। সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডে একমাত্র দর্শনেন্দ্রিয়। আমাদের দর্শনেন্দ্রিয় তাহারই অংশ। সেইরূপ সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডে একমাত্র শ্রবণেন্দ্রিয়, আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয় তাহারই অংশমাত্র। যেমন ভূতসকল এক, তেমনি তন্মাত্রসকলও এক। ভূতবর্গ সত্য নয়, তন্মাত্রই সত্য। কারণ ভূতবর্গ তন্মাত্র হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। যেমন তন্মাত্র সমুদয় এক, তেমনই অস্মিতা সমুদয়ও এক। তন্মাত্র সত্য নয়, অস্মিতাই সত্য। কারণ তন্মাত্র অস্মিতাতে লয় পায়। যেমন সমুদয় অস্মিতা এক, তেমনই সমুদয় মহত্তত্ত্বও এক। অস্মিতা মহত্তত্ত্বে লীন হয় সুতরাং অস্মিতা মিথ্যা—একমাত্র মহত্তত্ত্বই সত্য। আবার মহত্তত্ত্বও অলিঙ্গ অব্যক্তে লীন হয়; সুতরাং মহত্তত্ত্বও মিথ্যা—একমাত্র অব্যক্তই সত্য। অব্যক্ত অনির্ব্বচনীয়, কারণ তাহা বাক্য দ্বারা বলা যায় না।

আমাদের করণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয় দ্বিবিধ। বাহ্যকরণ ও অভ্যন্তরকরণ বা অন্তঃকরণ। করণ অর্থাৎ যে যন্ত্র সাহায্যে আমরা কোন কার্য্য

করি, যাহা দ্বারা করা যায় তাহাকে করণ কহে। করণ—"আমি" নহি। করণ আমার যন্ত্র। করণ সুখদুঃখ ভোগ করে না। ভোগ করি "আমি"। বাটালী ছুতার মিস্ত্রীর করণ, করাত ছুতার মিস্ত্রীর করণ। ছুতার মিস্ত্রী সেই বাটালী ও করাত সাহায্যে কাষ্ঠ কর্ত্তন করে; সুতরাং বাটালী বা করাত ছুতার মিস্ত্রী নহে। ইহারা তাহার যন্ত্র। সেইরূপ ইন্দ্রিয় "আমি" নহি। ইন্দ্রিয় আমার যন্ত্র। আমি চক্ষুরূপ যন্ত্রদ্বারা দৃশ্য বিষয়ের রূপ দর্শন করি, এইজন্য চক্ষুকে দর্শনেন্দ্রিয় বলে। আমি কর্ণরূপ যন্ত্রদ্বারা শব্দবিষয়ের জ্ঞান আহরণ করি, সেই-জন্য কর্ণকে শ্রবণেন্দ্রিয় বলে। এইরূপ নাসিকা ঘ্রাণেন্দ্রিয়, জিহ্বা রসনেন্দ্রিয় ও ত্বক্ স্পর্শেন্দ্রিয়। সেইরূপ বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়। এই ইন্দ্রিয় আবার দুই প্রকার,—স্থূল ও সূক্ষ্ম। মৃত্যুর পর স্থূল ইন্দ্রিয় পড়িয়া থাকে কিন্তু সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় প্রাণাদির সহিত দেহত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। জাগ্রৎ অবস্থায় স্থূল ইন্দ্রিয়ের কার্য্য হয়। স্বপ্নাবস্থায় স্থূল ইন্দ্রিয় নিষ্কর্ম্মা হইয়া জড়ভাবে পড়িয়া থাকে। স্বপ্নাবস্থায় কেবল সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের কার্য্য হয়। আবার সুষুপ্তি অবস্থায় স্থূল বা সূক্ষ্ম কোন ইন্দ্রিয়েরই কার্য্য হয় না। স্থূলভূতদ্বারা স্থূল ইন্দ্রিয় ও সূক্ষ্মভূতদ্বারা সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় নির্ম্মিত হইয়াছে। মন আর একটী সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়। এই এগারটী ইন্দ্রিয় অস্মিতা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এই তন্মাত্রও অস্মিতা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

অস্মিতা বা অহম্ভাব বা "আমিভাব"। ইহাকে অহঙ্কার বা অভিমানও বলা হয়। দ্রষ্টা ও দৃশ্যের সংযোগ হইতে এই অস্মিতার উৎপত্তি। দ্রষ্টা ও দৃশ্যের সংযোগ না হইলে, অভিমানও হয় না। দ্রষ্টা ও দৃশ্যের সংযোগ অর্থাৎ দৃশ্য বস্তুতঃ স্বতন্ত্র হইলেও, দ্রষ্টা মনে করেন যে "আমিই দৃশ্য। আমি দ্রষ্টা নহি। দৃশ্যের কার্য্য আমার কার্য্য।" এই প্রকারে দ্রষ্টা দৃশ্যের উপর অভিমান করেন। এই প্রকারে অভিমান

উৎপন্ন হয়। বিষয়ে আসক্তি থাকিলেই এইরূপ অভিমান হয়। দ্রষ্টা বিষয়ভোগ করিবার জন্য দৃশ্যের উপর অভিমান করেন। এই আসক্তি ত্যাগ হইলেই অর্থাৎ বিষয়বৈরাগ্য হইলেই দৃশ্যের উপর দ্রষ্টার অভিমান ত্যাগ হয়। এই অস্মিতা মহত্তত্ত্ব হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। সুতরাং অস্মিতা মহত্তত্ত্বে লীন হয়।

মহত্তত্ত্ব। "আছি" এইরূপ বোধমাত্র মহত্তত্ত্ব। সুষুপ্তির অব্যবহিত পরে জাগরিত হইবার সময় যে প্রথম বোধ ভাসে, তাহাই মহত্তত্ত্ব। সর্ব্বপ্রথম "আছি" এই বোধমাত্র হয়। তৎপরে "আমি আছি" এই বোধ হয়। "আমি আছি" শুদ্ধবোধ নহে, ইহা অস্মিতা বোধ। এই মহত্তত্ত্ব হইতে অস্মিতা বোধ হয় এবং অস্মিতা এই মহত্তত্ত্বে লীন হয়।

প্রকৃতির উল্লিখিত চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের প্রকৃষ্ট জ্ঞান হইলে, তৎপরে দ্রষ্টার স্বরূপ জ্ঞান হয়। এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব যে দ্রষ্টা হইতে পৃথক্, তখন দ্রষ্টা তাহা বুঝিতে সক্ষম হন। এইজন্য তত্ত্বজ্ঞান হওয়া বিশেষ আবশ্যক। তত্ত্বজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হইলে, যোগী ইচ্ছামাত্রেই দেহকে আপন গৃহের ন্যায় পৃথক্ বলিয়া অনুভব করিতে সক্ষম হইবেন।

দ্রষ্টা দৃশিমাত্রঃ শুদ্ধোঽপি প্রত্যয়ানুপশ্যঃ ॥ ২০ ॥

দ্রষ্টৃপুরুষ দৃশিমাত্র অর্থাৎ সাক্ষিমাত্র, তাঁহার অন্য কোন গুণ নাই। তিনি মাত্র দর্শন করেন। এই দর্শন দ্বারা তাঁহার কোনরূপ বিকার বা পরিণাম হয় না। তিনি অবিকারী, জ্ঞাতা ও অপরিণামী; কিন্তু বুদ্ধি বিকারী, জ্ঞাতা ও পরিণামী। তিনি "চিৎস্বরূপ"; তিনি "স্ববোধ" মাত্র। অন্য কাহারও সাহায্য বিনা যে বোধ তাহাই স্ববোধ। কিন্তু বুদ্ধি স্ববোধ নহে, কারণ চৈতন্যের আভাস ব্যতীত বুদ্ধির বোধ উৎপন্ন হয় না। বুদ্ধি জড়, চৈতন্যের আভাস পাইয়া

চেতনবৎ হয়, তখন বুদ্ধির বোধ উৎপন্ন হয়। চৈতন্য বুদ্ধির মধ্যে প্রবেশ করিয়া বুদ্ধির জড়ত্ব বিনাশ করেন। তখন বুদ্ধি চৈতন্যমত হইয়া যায়। যেমন অগ্নি লৌহে প্রবিষ্ট হইলে, লৌহ অগ্নিরূপ ন্যায় হইয়া যায়, তখন লৌহদ্বারা হস্ত দগ্ধ হয় তেমনই চৈতন্য নিজের অবিকারিত্ব ও অপরিণামিত্ব বিস্মৃত হইয়া, ভ্রমবশতঃ আপনাকে বিকারী ও পরিণামী মনে করেন; ইহাকেই "প্রত্যয়ানুপশ্য" বলে। দ্রষ্টা তখন নিজে শুদ্ধ দ্রষ্টা, একথা ভুলিয়া যান। তখন দ্রষ্টার আত্ম-বিস্মৃতি হয়। এই আত্মবিস্মৃতিই বন্ধন, আর আত্মস্মৃতিই মুক্তি। দ্রষ্টা যখন দ্রষ্টৃস্বরূপে থাকেন, তখন তিনি মুক্ত আর যখন স্বরূপভ্রষ্ট হইয়া বুদ্ধি হইয়া যান, তখন তিনি বদ্ধ। এইরূপ কেন হয়? দ্রষ্টার আত্মবিস্মৃতি হয় কেন? তিনি নিজের স্বরূপ ভুলিয়া বুদ্ধিকে, আমি বলেন কেন? অবিবেক বা অজ্ঞতাবশতঃ ইহা হয়। বিবেক বা জ্ঞান হইলে এই ভ্রান্তি দূর হয়। পুরুষ শুদ্ধ হইলেও তিনি প্রত্যয়ানু-পশ্য দ্বারা বদ্ধ হন। এখানে বুদ্ধিই পুরুষের প্রত্যয় বা দৃশ্য বা বৃত্তি। পুরুষ বুদ্ধির সহিত একভাবাপন্ন হন। পুরুষ দর্শন করেন যেন তিনিই বুদ্ধি। পুরুষ বুদ্ধি হইতে উৎপন্ন প্রত্যয় সকলকে অনুদর্শন করেন, তাই তাঁহাকে "প্রত্যয়ানুপশ্য" বলে। এইরূপে বুদ্ধির সহিত একতা অনুভব করিয়া তিনি বুদ্ধির সুখে ও দুঃখে, সুখী ও দুঃখী হন; প্রকৃত পক্ষে তাঁহার মধ্যে সুখদুঃখ নাই। তিনি শুদ্ধ ও মুক্ত।

তদর্থ এব দৃশ্যস্যাত্মা ॥ ২১ ॥

পুরুষের অর্থই অর্থাৎ পুরুষের প্রয়োজনই—পুরুষের ভোগ ও অপবর্গই দৃশ্যের আত্মা বা স্বরূপ।

পুরুষের প্রয়োজন যার নাম, দৃশ্যের স্বরূপও তাহাই। পুরুষের

ভোগের জন্য পুরুষ দৃশ্য দর্শন করেন অথবা অপবর্গের জন্য দৃশ্য দর্শন করেন। পুরুষ দর্শন করিলেই দৃশ্য থাকে, আর পুরুষ দর্শন না করিলে দৃশ্যও থাকে না। অতএব দৃশ্যের অস্তিত্ব পুরুষের দর্শনের উপর নির্ভর করিতেছে। পুরুষের দর্শন অর্থাৎ পুরুষের ভোগ বা অপবর্গ। অতএব পুরুষের ভোগ বা অপবর্গই দৃশ্যের আত্মা অর্থাৎ পুরুষের ভোগ বা অপবর্গের জন্যই দৃশ্য বর্ত্তমান আছে; দৃশ্যের নিজের ভোগের জন্য নহে। দৃশ্য নিজে ভোগ করে না। পুরুষের ভোগের জন্যই দৃশ্য। দৃশ্য পরার্থ অর্থাৎ পুরুষের অর্থ বা প্রয়োজন সাধন করে আর পুরুষ স্বার্থ। পুরুষ নিজের ভোগজন্য দৃশ্য উৎপন্ন করেন। অতএব পুরুষের অর্থই দৃশ্যের স্বরূপ। দৃশ্য ও পুরুষার্থ এক। যেখানে পুরুষার্থ নাই সেখানে দৃশ্যও নাই।

পুরুষের ভোগ করিবার যোগ্যতা আছে এবং প্রকৃতির ভোগ দিবার যোগ্যতা আছে। পুরুষ যেমন ভোগ করিবার জন্য লালায়িত, প্রকৃতি তেমনই ভোগ দিবার জন্য লালায়িত। প্রকৃতি রূপের হাট বসাইয়াছেন, পুরুষের ভোগের জন্য। প্রকৃতি নিজে রূপ ভোগ করেন না। রূপ, নিজে রূপ ভোগ করে না, তাহা অপরে ভোগ করে। প্রকৃতির যত কিছু চেষ্টা সব পুরুষের জন্য, নিজের জন্য নহে। তাই অনন্তরূপবতী প্রকৃতি ক্ষণে ক্ষণে রূপ পরিবর্ত্তন করিয়া পুরুষের মনোমত বেশ ধারণ করিয়া—পুরুষের সম্মুখে নৃত্য করিতেছেন আর অজ্ঞান নর সেই প্রকৃতি সতীকে চিনিতে না পারিয়া, তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া পাশবিক ভোগে মত্ত হইতেছে, কিন্তু যিনি জ্ঞানী তিনি প্রকৃতির স্বভাব বুঝিতে পারিয়াছেন এবং তজ্জন্য তাঁহার রূপে মুগ্ধ না হইয়া, তাঁহার অনন্ত মূর্ত্তির অনন্ত লীলা দর্শন করিতেছেন। মাত্র সাক্ষিস্বরূপে দর্শন করিতেছেন, লীলার আসক্ত হইয়া মুগ্ধ হইতেছেন না। প্রকৃতি কি কেবল রূপের ভোগ দিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন?

না তাহা নহে। প্রকৃতি যেমন একদিকে রূপের হাট বসাইয়াছেন, অন্যদিকে তেমনই রসের হাট বসাইয়াছেন—মিষ্ট, তিক্ত যাহা চাহিবে, তাহাই পাইবে। আবার অন্যস্থানে গন্ধদ্রব্যের হাট বসাইয়াছেন, তোমার যাহা অভিরুচি তাহাই ভোগ কর। আবার অপর স্থানে নানাপ্রকার শব্দের হাট বসাইয়াছেন, তুমি প্রাণ ভরিয়া শব্দ শ্রবণ কর। আবার অপর স্থানে কমনীয় স্পর্শসুখ দান করিতেছেন তাহাও তুমি ইচ্ছামত অনুভব কর। যদি রূপ, রস, গন্ধ ও শব্দে তোমার আশা পূর্ণ না হইয়া থাকে, তাহাহইলে, প্রকৃতিকে আলিঙ্গন কর স্পর্শসুখও পাইবে। প্রকৃতির ভাণ্ডারে যত কিছু আছে আজ সব তোমার সম্মুখে ধরিয়া আনিয়া দিতেছেন। তোমার যাহা ইচ্ছা গ্রহণ কর। প্রকৃতির হৃদয়ের সর্ব্বস্বধন আজ তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছে—তোমার ভোগের জন্য। ইহাতে প্রকৃতির কোনও স্বার্থ নাই ; তুমি যদি পশু হও, তাহাহইলে, পাশবিক ভোগে মত্ত হও—প্রকৃতি তোমাকে নিরস্ত করিবেন না। তুমি যদি দেবতা হও, তাহাহইলে, দেবভাবে ভোগ কর, তাহাও প্রকৃতি নিবারণ করিবেন না। পশুভাবে ভোগ কর—পুনঃ পুনঃ সংসারে নিপতিত হইয়া যন্ত্রণা ভোগ করিবে, আর দেবভাবে ভোগ কর—সংসার হইতে নিষ্কৃতি পাইবে। তুমি পুরুষ—নিজে কি তাহা জান—আর প্রকৃতিকে চিনিতে শিক্ষা কর—মুক্ত হইবে ; আর আত্মবিস্মৃত হইয়া মুগ্ধচিত্তে পশুর ন্যায় ভোগে আসক্ত হও—পশুর ন্যায় যন্ত্রণার পর যন্ত্রণা পাইবে। প্রবৃত্তি মার্গ ত্যাগ কর। নিবৃত্তি মার্গ গ্রহণ কর। ইন্দ্রিয় চরিতার্থতা ত্যাগ কর। ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করিতে শিখ। অষ্টাঙ্গ যোগ অবলম্বন কর, মুক্ত হইবে।

কৃতার্থং প্রতিনষ্টমপ্যনষ্টং তদন্যসাধারণত্বাৎ ॥ ২২

কৃতার্থ পুরুষের নিকট দৃশ্য নষ্ট হইলেও, অকৃতার্থ পুরুষের নিকট তাহা নষ্ট হয় না।

সর্ব্বজীবে যখন একই চৈতন্যের অধিষ্ঠান, তখন একটী জীব মুক্ত হইলেই সর্ব্বজীবের মুক্তি পাওয়া উচিত। তাহা কেন হয় না?

সর্ব্বজীবের চৈতন্য অংশ যদিও এক কিন্তু উপাধি অংশ এক নয়, এই হেতু একজন কৃতার্থ হইলে সকলে কৃতার্থ হয় না। জীব নিজের সংস্কারানুযায়ী কার্য্য করে ও তৎফল প্রাপ্ত হয়। সকল জীবের সংস্কার তুল্য নয় এইজন্য সকল জীব সমান ফল পায় না। কাহারও সৎ সংস্কার, কাহারও অসৎ সংস্কার, কাহারও প্রবৃত্তি-সংস্কার, কাহারও নিবৃত্তি সংস্কার, কাহারও সাত্ত্বিক ভাব, কাহারও রাজসিক ভাব আর কাহারও বা তামসিক ভাব। কাহারও সাধনের উদ্যম উত্তম, কাহারও মধ্যম এবং কাহারও বা অধম। এই সকল কারণে সাধারণতঃ একটী জীব কৃতার্থ হইলে সকল জীব কৃতার্থ হয় না। যেমন একজাতীয় দীপ-শিখা ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের কাচের মধ্য দিয়া ভিন্ন ভিন্ন রং প্রকাশ করে সেইরূপ একই চৈতন্য ভিন্ন ভিন্ন আবরণের মধ্যে অবস্থিত থাকিয়া ভিন্ন ভিন্ন ভাব প্রকাশ করেন। একই সভামধ্যে যেমন শত লোক নৃত্যগীতাদি দেখিতে গিয়া, কেহ বা নর্ত্তকীর নৃত্যে মোহিত হয়, কেহ বা তাহার সুমিষ্টস্বরে মোহিত হয়, আবার কেহ বা তাহার বেশভূষায় মোহিত হয়; তেমনি এই জগৎ রঙ্গমঞ্চে জীব ভিন্ন ভিন্ন সংস্কার ও ভাব লইয়া লীলা করিতেছে, এই হেতু একটী জীব কৃতার্থ হইলে, সকলে একসঙ্গে কৃতার্থ হইতে পারে না।

স্বস্বামিশক্ত্যোঃ স্বরূপোপলব্ধিহেতুঃ সংযোগঃ ॥ ২৩ ॥

স্বশক্তি ও স্বামিশক্তি এই উভয় শক্তির স্বরূপ উপলব্ধির হেতু সংযোগ।

স্বশক্তির স্বরূপ অর্থাৎ অচেতন জড় প্রকৃতির যে ভোগ্যবিষয় হইবার যোগ্যতা, তাহাই তাঁহার স্বরূপ এবং স্বামিশক্তির স্বরূপ অর্থাৎ বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ পুরুষের যে ভোগ করিবার যোগ্যতা আছে, তাহাই তাঁহার স্বরূপ। এই উভয়ের স্বরূপ যখন সংযুক্ত হয় অর্থাৎ ভোগ্য ও ভোক্তৃভাবে অবস্থান করে তখন তাহাকে সংযোগ বলে। পুরুষ ও প্রকৃতির পরস্পর এইরূপ ভোগ্য ও ভোক্তৃভাবে উপলব্ধির কারণ— তাহাদের সংযোগ। সংযোগ না হইলে এইরূপ ভোগ্য ও ভোক্তৃভাব হয় না।

পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগ কি পদার্থগত সংযোগ? না, ইহা পদার্থগত সংযোগ নহে। জলের সহিত জলের বা তৈলের সহিত তৈলের পদার্থগত সংযোগ হয় কারণ এস্থলে উভয় পদার্থই একজাতীয়। কিন্তু পুরুষ চেতন ও প্রকৃতি অচেতন, ইহাদের পদার্থগত সংযোগ হইতে পারে না। তাহাহইলে, ইঁহাদের সংযোগ কোন্‌ভাবে হয়? ইহাদের পদার্থগত সংযোগ হয় না বটে কিন্তু ভাবের মিলন হয় ও ভাবের বিশ্লেষ হয়। এইরূপে ভাবের মিলনে ভোগ ও ভাবের বিশ্লেষে অপবর্গ সাধিত হয়। পুরুষ যখন ভোক্তৃভাবের পরিচয়ে দৃশ্যের প্রতি আগ্রহ সহকারে মিলিত হন তখন তাঁহার ভোগ বা সংসারাবস্থা, আর যখন ভোগের অবসানে ভোগের অসারতা বুঝিতে পারিয়া প্রকৃতির সংসর্গ ত্যাগ করেন তখন তাঁহার মুক্তির অবস্থা। পুরুষ স্বভাবের অধীন নন, তিনি স্বাধীন। প্রকৃতি স্বভাবের অধীন। পুরুষ ভোগের ইচ্ছা করিয়া যখন প্রকৃতির সংসর্গ করেন, তখন প্রকৃতিকে বাধ্য হইয়া

পুরুষের ভোক্তৃভাবের অভাব পূরণ করিতে হয়। প্রকৃতি তাঁহার সম্পত্তি পুরুষকে না দিয়া থাকিতে পারেন না। পুরুষ ইচ্ছামত এই ভোগ ব্যাপারে লিপ্ত থাকিতে পারেন এবং নাও পারেন। অবিদ্যা বাসনাই এই সংযোগের হেতু। জীবের মধ্যে যে অবিদ্যা বাসনা সংস্কাররূপে বর্ত্তমান আছে তাহাই উদ্বুদ্ধ হইয়া এইরূপ পুরুষ প্রকৃতির মিলন ঘটাইয়া দেয়।

তস্য হেতুরবিদ্যা ॥ ২৪ ॥

অবিদ্যাই তাহার হেতু অর্থাৎ অবিদ্যাই পুরুষপ্রকৃতিসংযোগের হেতু।

অবিদ্যা। যাহা যে বস্তু নহে তাহাকে সেই বস্তু বলিয়া জানা। শরীরকে আত্মা বলিয়া জানা। দুঃখের বস্তুকে সুখের বস্তু বলিয়া জানা। এইরূপ বিপরীত জ্ঞান বা বিপর্য্যয় জ্ঞানকে বা অজ্ঞানকে অবিদ্যা বলে। বিদ্যা দ্বারা অর্থাৎ জ্ঞানদ্বারা এই অবিদ্যা নষ্ট হয়। যতদিন ভ্রান্তিজ্ঞান থাকিবে, যতদিন অবিবেক থাকিবে, ততদিন পুরুষ প্রকৃতির এই সংযোগ হইবে। বিবেক হইলে, এই ভ্রান্তি নষ্ট হয়, তখন এইরূপ সংযোগ হয় না এবং পুরুষও মুক্ত হন।

তদভাবাৎ সংযোগাভাবো হানং তদ্দৃশেঃ কৈবল্যম্ ॥ ২৫ ॥

তাহার অর্থাৎ সেই অবিদ্যার অভাব হইতে সংযোগাভাব হয়। এবং সেই সংযোগের অভাবকে "হান" বলে, তাহাই দ্রষ্টার কৈবল্য।

হেয় দুঃখ, হেয়কারণ সংযোগ এবং সংযোগের কারণ অবিদ্যা। একণে এই অবিদ্যাকে নষ্ট করিতে পারিলে সংযোগ নষ্ট হইবে এবং

সংযোগের অভাব হইলে দুঃখ নষ্ট হইবে। এই অবিদ্যার অভাবকেই "হান" বলে। এই "হানই" দ্রষ্টার কৈবল্য। কৈবল্য অর্থে কেবল। কেবল দ্রষ্টা মাত্র—অন্য কিছুই নাই। দ্রষ্টা ও দৃশ্যের সংযোগ থাকিলে, অর্থাৎ যতক্ষণ দ্রষ্টা, বুদ্ধির সহিত একাত্মভাবে মিলিত থাকেন, ততক্ষণ কৈবল্য হয় না। যখন এই একাত্মভাবের অভাব হয় অর্থাৎ যখন দ্রষ্টার বুদ্ধ্যাদি দর্শন হয় না, তখন এইরূপ অদর্শনকে হান বা কৈবল্য বলে।

যতক্ষণ দেখা ব্যাপার, জানা ব্যাপার থাকিবে, ততক্ষণ সংযোগ ব্যাপারও থাকিবে। যতক্ষণ এটা দেখিব, ওটা দেখিব; এটা শুনিব, ওটা শুনিব; এটা খাইব, ওটা খাইব; এই সকল আসক্তির কার্য্য থাকিবে, ততক্ষণ সংযোগও থাকিবে এবং কৈবল্য হইবে না। যখন আসক্তিত্যাগ হয় অর্থাৎ যখন বৈরাগ্য হয়, তখন দেখিবার আর কিছু থাকে না, তখন শুনিবার আর কিছু থাকে না, তখন খাইবার আর কিছু থাকে না সুতরাং ভোগস্পৃহা লইয়া পুরুষকে আর বুদ্ধির প্রতি দর্শন করিতে হয় না। এইরূপ অদর্শন হইলে বৈরাগ্য হয় এবং আমরা সমস্ত দুঃখের হাত হইতে অব্যাহতি পাই। এইরূপ কৈবল্যাবস্থা পুরুষের জড় পাষাণবৎ অবস্থা নহে,—ইহা জ্ঞানের চরমসীমা এবং আনন্দের পরাকাষ্ঠা। অবিদ্যাযুক্ত অজ্ঞানাবস্থায় বুঝিবার ও জানিবার আগ্রহ ছিল, এক্ষণে পূর্ণজ্ঞান হওয়াতে সমস্ত বুঝা ও জানা শেষ হইয়াছে, এক্ষণে বুঝিবার এবং জানিবার কিছুই অবশিষ্ট নাই; সুতরাং তাহার জন্য আগ্রহ বা চেষ্টাও নাই। যাহা জানিবার তাহা জানা হইয়াছে, যাহা দেখিবার তাহা দেখা হইয়াছে, যাহা পাইবার তাহা পাওয়া হইয়াছে। জীবাত্মার সকল অভাব পূর্ণ হইয়া, জীব এক্ষণে শিব হইয়াছে। আনন্দের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে।

বিবেকখ্যাতিরবিপ্লবা হানোপায়ঃ ॥ ২৬ ॥

অবিপ্লবা বিবেকখ্যাতি হানের উপায়।

অবিপ্লবা অর্থাৎ মিথ্যাজ্ঞান রহিত বা অবিবেক রহিত। যে বিবেকখ্যাতি শুদ্ধ সত্যজ্ঞানে পূর্ণ, যাহাতে কণামাত্রও মিথ্যাজ্ঞান নাই তাহাকে অবিপ্লবা বিবেকখ্যাতি বলে। যে জ্ঞানের প্রবাহের মধ্যে বিচ্ছেদ নাই, যে জ্ঞানপ্রবাহ নিরন্তর একভাবে বিচ্ছেদশূন্য অবস্থায় বর্ত্তমান, যে জ্ঞানপ্রবাহ কোনরূপ সন্দেহ বা অন্য কিছু দ্বারা ভগ্ন না হইয়া তৈলধারার ন্যায় বিচ্ছেদরহিত তাহাকে অবিপ্লব বলে। আর বিবেকখ্যাতি কাহাকে বলে? প্রথমতঃ আমরা শাস্ত্র পাঠ করিয়া বা শ্রীগুরুর উপদেশে বিবেকজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া, তৎপরে তাহা যুক্তিদ্বারা চিন্তা করিয়া অর্থাৎ মনন করিয়া সম্যক্ বুঝিবার প্রয়াস পাই। এইরূপ মনন করিতে করিতে সেই জ্ঞান অধিকতর দৃঢ় ও স্পষ্ট হয়। তৎপরে যোগের অষ্টাঙ্গ সাধন করিতে করিতে সেই জ্ঞান ক্রমশঃ আরও অধিকতর স্পষ্ট হয়, এইরূপ করিতে করিতে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি হয়। সম্প্রজ্ঞাত সমাধি হইলে অবিদ্যাকৃত দৃশ্যবিষয়ক মিথ্যাজ্ঞান আর প্রকাশ পায় না। সেই সকল মিথ্যাজ্ঞানের বীজ তখন ধ্বংস হইয়া যায়। মিথ্যাজ্ঞানবীজ ধ্বংস হইলে আমাদের মন হইতে বিষয়াসক্তি লোপ পায় এবং বিষয়াসক্তি বিনষ্ট হইলে যখন চিত্তে আর বিষয়ের কামনাস্রোত প্রবাহিত হয় না অর্থাৎ চিত্তে আর কোন বৈষয়িক কামনা থাকে না, তখন চিত্ত সুনির্ম্মল হয়। এই সুনির্ম্মল চিত্তে সমাধিজনিত যে সত্যজ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাকে বিবেকখ্যাতি বলে। বিবেকখ্যাতি হইলে মিথ্যাজ্ঞান দগ্ধবীজবৎ হয়। এইরূপ বিবেকখ্যাতিকে "অবিপ্লবা বিবেকখ্যাতি" বলে। এই অবিপ্লবা বিবেকখ্যাতি হইতেই হান সিদ্ধ হয় এবং হানসিদ্ধি হইলেই কৈবল্য হয়।

তস্য সপ্তধা প্রান্তভূমিঃ প্রজ্ঞা ॥ ২৭ ॥

সেই বিবেকখ্যাতিলব্ধ যোগীর সপ্তপ্রকার প্রান্তভূমি প্রজ্ঞা হয়।

প্রান্তভূমি কাহাকে বলে? প্রান্ত=প্রকৃষ্ট অন্ত (অবসান) হইয়াছে যাহার, তাহা প্রান্ত; ভূমি=অবস্থা। অর্থাৎ যিনি প্রজ্ঞার চরম অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন, যাহা হইতে আর শ্রেষ্ঠতর অবস্থা নাই। প্রজ্ঞার এইরূপ ভূমি বা অবস্থাকে "প্রান্তভূমি প্রজ্ঞা" বলে। এই প্রজ্ঞা সাত প্রকার। তন্মধ্যে প্রথম চারি প্রকারে কর্ত্তব্যের সমাপ্তি এবং শেষ তিন প্রকারে চিত্তের চরিতার্থতা প্রাপ্তি হয়।

প্রথম প্রজ্ঞাতে বিষয় যে সর্ব্বাবস্থাতেই এবং সকল সময়েই দুঃখপ্রদ ইহার সম্যক্ জ্ঞান হয় এবং সাধক বিষয়াসক্তি ত্যাগ করিয়া বৈরাগ্যবান্ হন এবং ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিকে সংযত করিয়া বিষয় হইতে নিবৃত্ত করেন।

দ্বিতীয় প্রজ্ঞাতে অষ্টাঙ্গযোগসাধনদ্বারা অবিদ্যাদি ক্লেশ সকল ক্ষীণ হওয়াতে, সে সকল বিষয়ে যোগীর আর কোন কর্ত্তব্য থাকে না এবং ইন্দ্রিয়াদি সংযম চেষ্টার নিবৃত্তি হয়।

তৃতীয় প্রজ্ঞাতে তত্ত্বসাক্ষাৎকার হইয়া, তত্ত্ব বিষয়ে সম্যক্ সত্যজ্ঞান পরিস্ফুট হয় এবং সে সম্বন্ধে জানিবার বা জিজ্ঞাসা করিবার আর কিছুই বাকী থাকে না; সুতরাং তাঁহার সকল জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি হয় এবং নিরোধ সমাধি হইয়া হানের সম্যক্ উপলব্ধি হয়।

চতুর্থ প্রজ্ঞাতে হানোপায় লাভ হওয়াতে, তাঁহার অষ্টাঙ্গযোগের কর্ত্তব্যের শেষ হয়। এইখানে সাধন কার্য্যের অবসান হয়। সাধন করিবার আর কিছু বাকী থাকে না। সাধক সাধন কার্য্য হইতে অব্যাহতি পান। এইরূপে চারিপ্রকারের প্রজ্ঞালাভ হইলে, আর তাঁহাকে সাধনকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতে হয় না। অপর তিন প্রকার

প্রজ্ঞা আপনা হইতে উৎপন্ন হয় ও সাধক চিত্ত হইতে সম্যক্ বিমুক্ত হন। তৎপরে পরবৈরাগ্যের উদয়ে জ্ঞানের চরমসীমা প্রাপ্ত হন। ইহাই প্রান্তসীমা, তৎপরে কৈবল্য।

পঞ্চম প্রজ্ঞাতে ভোগ ও অপবর্গ নিষ্পন্ন হইয়াছে। ভোগের নিবৃত্তিই অপবর্গ। যতক্ষণ ভোগ আছে তভক্ষণ অপবর্গ নাই। ভোগের নিবৃত্তিই অপবর্গ। এখানে সাধকের সর্ব্বভোগের নিবৃত্তি হইয়াছে এবং অপবর্গপ্রাপ্তি ঘটিয়াছে।

ষষ্ঠ প্রজ্ঞাতে চিত্তের শাশ্বতিক নিরোধ সম্পন্ন হয়। চিত্তের স্পন্দন চিরকালের জন্য নিবৃত্ত হয়। যেমন পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে প্রস্তরখণ্ড একবার নিম্নে পতিত হইলে পুনরায় আর শৃঙ্গোপরি উঠিতে পারে না সেইরূপ গুণসকল পুরুষ হইতে বিচ্যুত হইয়া পুনরায় পুরুষে সংযুক্ত হয় না।

সপ্তম প্রজ্ঞাতে সাধক সমুদয় গুণসম্বন্ধশূন্য ও কেবলী হন। এই প্রকার "কেবলী" কৈবল্য নয়, কিন্তু কৈবল্য প্রাপ্তির উপায় স্বরূপ চরম প্রজ্ঞা। এই কেবলীরূপ চরমপ্রজ্ঞা লয় হইলে পুরুষের কৈবল্য হয়।

যোগাঙ্গানুষ্ঠানাদশুদ্ধিক্ষয়ে জ্ঞানদীপ্তিরাবিবেকখ্যাতেঃ ॥২৮॥

যোগানুষ্ঠান হইতে চিত্তের অশুদ্ধিক্ষয় হইলে বিবেকসাক্ষাৎকার পর্য্যন্ত ক্রমশঃ জ্ঞানদীপ্তি অর্থাৎ জ্ঞানের প্রকাশ হয়।

বিবেকসাক্ষাৎকার আবশ্যক। বিবেকসাক্ষাৎকার না হইলে জ্ঞান হইবে না। জ্ঞান না হইলে, অজ্ঞান যাইবে না। অজ্ঞান দূরীভূত না হইলে, তুমি মানুষ হইবে না। তুমি পশু থাকিয়া যাইবে। আত্মচৈতন্য চিরমুক্ত ও শুদ্ধ। তবে কাহার অশুদ্ধি ক্ষয় করিতে হইবে? চিত্তের অশুদ্ধি ক্ষয় করিতে হইবে। চিত্তের সংস্কার ক্ষয়

হইলেই চিত্তের শুদ্ধি হইল। চিত্তের বাসনা ক্ষয় হইলেই—চিত্তশুদ্ধি হইল। এই চিত্তশুদ্ধির জন্য অষ্টাঙ্গযোগ সাধনা। সাধনদ্বারা চিত্তের রজঃ ও তমোগুণের ক্ষয় হয় এবং সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি হয়। ইহাকেই চিত্তশুদ্ধি বলে।

যোগাঙ্গের অনুষ্ঠানে জ্ঞানদীপ্তি হয়। জ্ঞান সকলেরই আছে। কাহারও রজঃ ও তমোগুণের দ্বারা আবৃত আছে আর কাহারও বা আবরণহীন হইয়া প্রকাশ পাইতেছে। অল্প অল্প জ্ঞান অনেকেরই আছে। তাহাদের জ্ঞানের বাতি মিটি মিটি জ্বলিতেছে। যতই সাধন করিবে, ততই রজঃ ও তমোমল নষ্ট হইবে এবং জ্ঞানপ্রদীপ উজ্জ্বল, উজ্জ্বলতর ও পরিশেষে উজ্জ্বলতম হইয়া জ্বলিবে! যখন চিত্তের রজঃ ও তম আবরণ একেবারে নষ্ট হইয়া যাইবে; যখন পূর্ণ সত্ত্বগুণ প্রকাশ পাইবে; যখন বিষয় সংস্কার আদৌ থাকিবে না; যখন বিষয় কামনার আর উদ্রেক হইবে না; যখন বিষয়বৈরাগ্য পূর্ণরূপে অধিষ্ঠিত হইবে; তখন বুঝিবে যে তোমার জ্ঞানপ্রদীপ পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে; তখন তোমার বিবেক দর্শন হইয়াছে। ইহাকেই বিবেকখ্যাতি বলে। এই জ্ঞান একেবারে হঠাৎ আসিয়া পড়ে না, অল্পে অল্পে বাড়ে। তুমি যতই সাধন করিবে, জ্ঞানও ততই বর্দ্ধিত হইবে। ইহা ক্রমশঃ ধীরে ধীরে বাড়িবে। বহুকাল লাগিবে, ধৈর্য্য ধরিয়া সাধন করিয়া যাও। নিরাশ হইয়া সাধন ত্যাগ করিও না।

কামিনীকাঞ্চন আমাদের দুঃখের কারণ কিন্তু তুমি মনে করিতেছ সুখের কারণ। তুমি অবিদ্যার দ্বারা মোহিত হইয়া আছ, তাই কামিনীকাঞ্চনে দুঃখবোধ না করিয়া, সুখবোধ করিতেছ। ইহার নাম বিপর্য্যয়বোধ, অবিদ্যা বা অজ্ঞান। সাধন করিতে করিতে এই অজ্ঞান কাটিয়া যাইবে; তখন কামিনীকাঞ্চন দুঃখের হেতু বলিয়া জানিতে পারিবে, তখন বুঝিবে যে তোমার জ্ঞানদীপ্তি হইয়াছে।

কামিনীকাঞ্চন যে দুঃখের কারণ তাহা শ্রবণ করিয়াও অনেক লোক সেই মোহে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়া থাকে; ইহার কারণ তাহাদের জ্ঞানদীপ্তি প্রকাশ পায় নাই। আবার অনেকে ইহা শুনিয়া সাবধান হইয়া যায় এবং সাধন অবলম্বন করে। ইহাদের জ্ঞানদীপ্তি প্রকাশ পাইয়াছে, তবে মিটি মিটি জ্বলিতেছে—অস্ফুটভাবে জ্বলিতেছে। সাধন করিতে করিতে এই জ্ঞানদীপ্তি স্ফুটতর হইবে ও ক্রমে পূর্ণজ্ঞান প্রকাশ পাইবে। চিত্তের অশুদ্ধি যতই ক্ষয় হইতে থাকিবে, জ্ঞানদীপ্তি ততই অধিক জ্বলিবে। যখন পূর্ণজ্ঞান হইবে, তখন কামিনীকাঞ্চনে পূর্ণ বৈরাগ্য হইবে এবং বিবেকখ্যাতি হইবে।

অজ্ঞানের বশীভূত না হইয়া কার্য্য করাকে "যোগানুষ্ঠান" বলে। সাধারণ লোকে অজ্ঞানের বশে কার্য্য করে। সাধারণ লোকে জীবহিংসা করে, অসত্য কথা বলে, চুরি করে। অজ্ঞানে এই সব কার্য্য করে। এই সকল পাপকার্য্যে সুখ নাই, দুঃখ আছে, তবুও করে। অজ্ঞানদ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া তাহারা এইরূপ করে। এইজন্য অহিংসাব্রত গ্রহণ কর, সত্য বলিতে প্রাণপণ কর, অস্তেয়াদি সাধন কর, তাহা হইলে, তোমার অজ্ঞান নষ্ট হইবে এবং জ্ঞানদীপ্তি প্রকাশ পাইবে। জ্ঞানের আলোক জ্বলিলে তুমি পূর্ব্ব পাপকার্য্যসাধনের দোষ বুঝিতে পারিবে। এখন তুমি বুঝিতে পারিতেছ না, কারণ তোমার মন অন্ধকারে পূর্ণ। যেমন অন্ধকার ঘরের মধ্যে কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না, তেমনি অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে পূর্ণ বুদ্ধিতে কিছুই বিচার করা যায় না। তুমি দুঃখের বিষয়কে সুখের বলিয়া গ্রহণ করিতেছ। যখন মনের মধ্যে জ্ঞানের প্রদীপ জ্বলিবে, তখন সেই বিবেকরূপ আলোকদ্বারা ভালমন্দ বুঝিতে পারিবে এবং তখন তোমার পূর্ব্ব মূর্খতা এবং অজ্ঞতার বিষয় সম্যক্ বুঝিতে পারিবে। জগতের অধিকাংশ লোকই এই অজ্ঞানে আবৃত এইজন্য তাহারা বৈষয়িক ভোগবিলাস ত্যাগ করিতে

চায় না। এইজন্য তাহারা সাধন করিতে ইচ্ছা করে না; কিন্তু যদি তাহারা একবার কষ্ট করিয়া সাধন পথ অবলম্বন করে, তাহাহইলে, তাহারা ক্রমশঃ শান্তির পথেই যাইবে, অশান্তি পাইবে না। এইজন্য প্রথমে শাস্ত্রের উপর বিশ্বাস করিয়া সাধন অবলম্বন কর। সাধন করিতে করিতে তোমার মনের ময়লা নিশ্চয়ই কাটিয়া যাইবে এবং তুমি অনন্ত সুখের অধিকারী হইতে পারিবে।

যমনিয়মাসনপ্রাণায়ামপ্রত্যাহারধারণাধ্যান-সমাধয়োঽষ্টাবঙ্গানি ॥ ২৯ ॥

যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই আটটী যোগের অঙ্গ।

এই আটটী যোগাঙ্গের মধ্যে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম ও প্রত্যাহার এই পাঁচটী বহিরঙ্গ সাধনা। বহিরঙ্গ সাধনা করিয়া চিত্ত পরিষ্কার না করিলে অন্তরঙ্গ সাধনা হইবে না। চিত্ত পরিষ্কৃত হইলে, তবে সেই চিত্তে ধারণা, ধ্যান ও সমাধি হয়। অপরিষ্কৃত চিত্তে ধ্যান করা যায় না। যাহারা চিত্ত পরিষ্কার না করিয়া ধ্যান করিবার চেষ্টা করে তাহাদের ধ্যান বা সমাধি হয় না। যাহার চিত্ত যত অধিক পরিষ্কার, তাহার চিত্তের ধারণাশক্তি তত অধিক। যাহার চিত্ত যত অধিক ময়লা, তাহার ধারণাশক্তিও তত কম। ধারণা কাহাকে বলে? কোনও বিষয় চিত্তে একাগ্রভাবে অধিকক্ষণ ধরিয়া রাখার নাম ধারণা। ইষ্টদেবের মূর্ত্তিই হউক বা কোন মনুষ্যের মূর্ত্তিই হউক বা কোন প্রাকৃতিক তত্ত্বই হউক, তাহাকে চিত্তে একাগ্রভাবে, অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায়, ধরিয়া রাখার নাম ধারণা। চিত্তে রজোমল থাকিলে চিত্ত চঞ্চল হয়। ধ্যান করিতে চেষ্টা করিলে ধ্যান ভাঙ্গিয়া যায়।

আবার চিত্তে তমোমল থাকিলে, ধ্যান করিবার সময় সাধক ঘুমাইয়া পড়ে, ধ্যান হয় না। সেইজন্য চিত্তের রজঃ ও তমোমল পরিষ্কৃত না হইলে চিত্তে ধারণা, ধ্যান বা সমাধি হওয়া অসম্ভব। সর্ব্বপ্রথম ধারণা; ধারণা অধিকক্ষণ স্থায়ী হইলে তাহাকে ধ্যান বলে, এবং ধ্যান গাঢ় হইলে তাহাকে সমাধি বলে। ধারণা, ধ্যান ও সমাধি একই প্রকার জিনিস; তবে পাতলা ও পুরু। যেমন দুগ্ধ পাতলা কিন্তু ক্ষীর পুরু। ক্ষেত্রে বীজ বপনের পূর্ব্বে ক্ষেত্রে লাঙ্গল ও মই দিয়া ক্ষেত্রের মাটী চূর্ণ করিয়া লইতে হয়, তৎপরে বিদা দিয়া তাহার মধ্যস্থ কাঁটাগাছ ও বন্যলতাদি পৃথক্ করিয়া ফেলিতে হয়, এইরূপে ক্ষেত্র পরিষ্কৃত করিয়া, তাহাতে বীজ বপন করিলে, তাহা হইতে উত্তম ফসল পাওয়া যায়। সেইরূপ পূর্ব্বোক্ত যমাদি পাঁচটী সাধনদ্বারা চিত্তক্ষেত্রকে পরিষ্কৃত করিয়া ধারণাবীজ রোপণ করিলে তাহা হইতে ধ্যান ও সমাধিরূপ উৎকৃষ্ট ফল উৎপন্ন হয়। আর ক্ষেত্রস্থ মাটী সংস্কৃত না করিয়া যদি ক্ষেত্রে বীজ বপন করা যায় তাহাহইলে, যেমন তাহা হইতে কোন ফসল পাওয়া যায় না, সেইরূপ অসংস্কৃত চিত্তে ধারণা, ধ্যান বা সমাধি হয় না। এইজন্য যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম ও প্রত্যাহার উত্তমরূপে সাধন করিবে, তাহা হইলে, তোমার চিত্ত শীঘ্র নির্ম্মল হইয়া ধারণা, ধ্যান ও সমাধির উপযুক্ত হইবে। তখন তোমার মানবজীবন সফল হইবে। বিবেকরত্ন, জ্ঞান-রত্ন ও সমাধিরত্ন উপার্জ্জন কর, আর দুঃখ পাইবে না। নচেৎ ব্রহ্মাণ্ডের সমুদয় অধিকার প্রাপ্ত হইলেও, তুমি যে পশু, সেই পশুই থাকিয়া যাইবে।

অহিংসাসত্যাস্তেয়ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহা যমাঃ ॥ ৩০ ॥

অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ এই পাঁচটী যম।

অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ এই পাঁচটী ব্রত পালন করিলে, যোগের প্রথম অঙ্গ "যম" পালন করা হইল। যম পালন করিলে আমাদের শরীর, ইন্দ্রিয় ও মনের স্বেচ্ছাচার নিবারিত হইয়া ইহাদিগকে শাস্ত্রসম্মত আচারে নিয়োজিত করে। স্বেচ্ছাচার পাপ ও দুঃখের কারণ। শাস্ত্রবিহিত আচার পুণ্য ও সুখের কারণ। চক্ষুঃ রূপ দেখিবার ইচ্ছা হইল; তৎক্ষণাৎ পতঙ্গের অগ্নিতে ঝাঁপ দিবার ন্যায় চক্ষু রূপের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। ইহাতে সুখ হইবে কি দুঃখ হইবে তাহার বিচার করিল না। সেইরূপ কর্ণ, জিহ্বা প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও হস্তপদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয় যখন যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতেছে। ইহাকে স্বেচ্ছাচার বলে। ইহাদের স্বেচ্ছাচার করিতে দিলে আমরা দুঃখের হাত হইতে নিস্তার পাইব না। ইহাদিগকে সংযত করিতে হইবে; ইহাদিগকে শাস্ত্রানুযায়ী সুপথে চালাইতে হইবে, তবে আমাদের সুখ হইবে। "যম" ব্রতের অনুষ্ঠানে আমাদের শরীর, ইন্দ্রিয়াদি ও মন সংযত হইয়া শাস্ত্রানুযায়ী কার্য্য করিতে অভ্যাস করে এবং অভ্যস্ত হইলে, দুঃখের পরিবর্ত্তে পরম সুখের অধিকারী হয়। যথেচ্ছাচার মানুষকে পশু করে। বিচারপূর্ব্বক আচরণই মনুষ্যত্বের পরিচায়ক।

অহিংসা। শরীরদ্বারা, বাক্যদ্বারা বা মনদ্বারা কাহারও হিংসা না করা। কোন প্রাণীর মনে কোন প্রকার কষ্ট না দেওয়া। সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ সাধন দ্বারা এই অহিংসা ব্রতের সাহায্য হয়। মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা সাধন করিয়া অহিংসা সাধন হয়। অহিংসা সাধন করিতে হইলে স্বার্থত্যাগ আবশ্যক। স্বার্থত্যাগ করিতে না পারিলে অহিংসা সাধন হয় না। পরের শরীরের মাংস ভক্ষণ

করিয়া নিজের শরীর পুষ্ট করা অপেক্ষা অধিক হিংসা আর কি হইতে পারে? যে অপরকে হিংসা করে, অনন্ত সংসার তাহার প্রতি হিংসাচরণ করিবে। জগতে কেহ তাহার বন্ধু হয় না। সকলেই তাহার শত্রু হয়। সৃষ্টিকর্ত্তার নিকটও সে হিংসার পাত্র হয়। "অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ"। অহিংসা পালন করিয়া চিত্তশুদ্ধি করিবে।

সত্য। মনের মধ্যে যাহা আছে তাহা অবিকৃত ভাবে প্রকাশ করার নাম সত্য। সত্যের তুল্য ধন নাই। যে বাক্য সত্য এবং অপরের অনিষ্টের হেতু হয় না, তাহাই যথার্থ সত্য। সেই হেতু সর্ব্বদা বিচারপূর্ব্বক সর্ব্বভূতহিতকর সত্য বাক্য বলিবে। যাহাদের অধিক কথা কহা অভ্যাস, তাহারা সত্যসাধন করিতে পারিবে না। সত্যসাধন করিতে হইলে, খুব অল্প কথা কহিবে বা মৌন অভ্যাস করিবে। অপরে কোন দোষ করিলেও তাহার আলোচনা বা চর্চ্চা করিবে না এরূপ করিলে অপরের মনে কষ্ট দেওয়া হইবে। সাধারণ উপন্যাস, নাটক প্রভৃতি পাঠ করিবে না। ইহাতে চিত্তমধ্যে অনেক কাল্পনিক বিষয় প্রবেশ করিয়া চিত্তকে মলিন করে ও মনকে সত্যপ্রবণ হইতে দেয় না। নানাপ্রকার বৃথা চিন্তায় চিত্ত পূর্ণ থাকিলে, তাহার মধ্যে তত্ত্বচিন্তা স্থান পাইবে না। অতএব এ সমস্ত বৃথা কল্পনা ও চিন্তা ত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা ভগবচ্চিন্তা লইয়া থাকিবে। তাহাহইলে মন সত্যপ্রবণ হইবে। মিথ্যাবাক্য যদি অপরের শ্রেয়ঃ সাধন করে, তাহা হইলে, তাহাও সত্য মধ্যে পরিগণিত হয়, আবার সত্যবাক্যও যদি অপরের শ্রেয়ঃ পথের কণ্টক হয়, তাহাহইলে, তাহাও মিথ্যা মধ্যে পরিগণিত হয়।

অস্তেয়। অশাস্ত্রপূর্ব্বক পরের দ্রব্য গ্রহণ করিলে "স্তেয়" হয়। সেইরূপ "স্তেয়"আচরণ না করাকে"অস্তেয়"বলে। অন্যায়রূপে উপার্জ্জিত অর্থদ্বারা ধর্ম্মোপার্জ্জন হয় না। পরকে না বলিয়া তাহার দ্রব্য গ্রহণ

করিলে স্তেয় হয়। যাহা তোমার ন্যায়সঙ্গত প্রাপ্য নহে, তাহা লইলে তোমার স্তেয় হয়। তুমি পুরোহিত হইয়া যদি যজমানের ঠাকুর শাস্ত্রবিধি অনুযায়ী যথাযথ পূজা না করিয়া দক্ষিণা গ্রহণ কর, তাহা-হইলে, তোমার স্তেয় হইবে। তুমি ছাত্রের গৃহশিক্ষক হইয়া যদি তাহাকে উপযুক্তরূপে পাঠ শিক্ষা না দিয়া, অভিভাবকের নিকট মাসিক বেতন গ্রহণ কর, তাহাহইলে, তোমার স্তেয় হইবে। তুমি কাহারও নিকট চাকুরী করিতে গিয়া, যদি কোন প্রকারে তোমার প্রভুকে প্রবঞ্চনা কর, তাহাহইলে, তোমার স্তেয় হইবে। যদি তুমি দোকানদার হইয়া খাঁটি জিনিস বলিয়া খরিদ্দারকে ভেজাল দ্রব্য বেচিয়া প্রতারিত কর, তাহাহইলে, তোমার স্তেয় হইবে। যদি তুমি চিকিৎসক হইয়া রোগীর নিকট উপযুক্ত দর্শনী লইয়াও তাহার আরোগ্যের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা না কর, তাহাহইলে, তোমার স্তেয় হইবে।

ব্রহ্মচর্য্য। দেহের বীর্য্যরক্ষাকে ব্রহ্মচর্য্য বলে। ব্রহ্মচর্য্য এক্ষণে প্রত্যেক বালকবালিকার মূলমন্ত্র হওয়া আবশ্যক। অযথা শুক্রক্ষয় না করাকে ব্রহ্মচর্য্য বলে। এই ব্রহ্মচর্য্যহীন হইয়াই আমাদের বালক-বালিকাগণ শারীরিক ও মানসিক উন্নতিলাভ করিতে পারিতেছে না। সচরাচর বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা কুসঙ্গীর দ্বারা প্ররোচিত হইয়া ১২।১৩ বৎসর বয়স হইতেই এই অনর্থপাতের সূত্রপাত করে। পুত্রের রক্ষার জন্য পিতামাতা দায়ী। যে পিতামাতা এই দায়িত্ব গ্রহণ না করে— তাহারা পশু। যে পিতামাতা ছেলেদের এই অব্রহ্মচর্য্য হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা না করে, তাহারা এই অপরাধের জন্য কঠোর দণ্ড পাইবে। যে পিতামাতা এই দায়িত্ব গ্রহণ করিতে অক্ষম, তাহাদের সন্তান উৎপাদন করা উচিত নয়। খাইতে পাই বা না পাই তাহাতে ক্ষতি নাই, বংশবৃদ্ধি চাই! ছেলেদের খাওয়াইতে পারি বা না পারি, বংশবৃদ্ধি করিতেই হইবে! বর্ত্তমান সময়ে দুগ্ধ অত্যন্ত মহার্ঘ,

অধিকাংশ বালককে সূতিকাগৃহ হইতেই দুগ্ধের পরিবর্ত্তে ভাতের মাড বা বার্লি প্রভৃতি খাওয়াইয়া পালন করা হয়। এই সকল ফেন খাওয়া ছেলে ১২।১৩ বৎসর বয়স হইতে না হইতেই গোপনে বা অসৎসঙ্গে শুক্র ক্ষয় করিতে আরম্ভ করে। ইহাদের উন্নতি কি করিয়া হইবে? অনেককে অল্প বয়সেই চশমা ব্যবহার করিতে হয়। এই প্রকারের অধিকাংশ বালকই যৌবনের পূর্ব্বে বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হয়। অনেকেরই চক্ষু কোটরগত, মুখের হাড বাহির হইয়া পড়িয়াছে, গলার স্বর পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, বাল্যের সে মিষ্টস্বর আর নাই। মুখমণ্ডলে ব্রণাদি বাহির হইয়া মুখমণ্ডলকে বিকৃত করিয়াছে, পরিপাকশক্তি ও স্মরণশক্তি কমিয়াছে। কাহারও অম্লের পীড়া হইয়াছে, কাহারও বা যক্ষ্মারোগ, কাহারও বা হাপানি রোগ আরম্ভ হইয়াছে। ইহারা যৌবনকালের স্বভাবসিদ্ধ স্বাস্থ্যলাভ করিতে পারে না। তৎপরে ১৭।১৮ বৎসর বয়স হইতেই এই দুর্ব্বল, রুগ্ন ও কঙ্কালসার জীবের পবিত্র পরিণয়কার্য্য সমাধা হয়। তৎপরে যাহা হইবার তাহা হয়। এইসকল বালক অল্পবয়সেই মানবলীলা সংবরণ করে ও পরে পশুযোনি প্রাপ্ত হয়। দুর্ল্লভ মানব জন্ম প্রাপ্ত হইয়া, এই জন্মমরণপ্রবাহ হইতে কিরূপে অব্যাহতি পাওয়া যায়, তাহা অনেকেই জানে না। ইহারা জানে যে উদরের ও উপস্থের সুখই জগতে মানুষের একমাত্র প্রার্থনীয়, এইজন্য এইসকল নরপশু উদর ও উপস্থের চরিতার্থতা ভিন্ন অন্য কিছু জানে না। যতদিন ছেলেমেয়েদের এই ব্রহ্মচর্য্যের ব্যবস্থা না হইবে, ততদিন উন্নতি সুদূরপরাহত। ফুটবল খেলায় উন্নতি হইবে না, সন্তরণ প্রতি-যোগিতায় বা ভ্রমণ প্রতিযোগিতায় উন্নতি হইবে না, সাহেবদের রীতি নীতির অনুকরণ করিয়া—টেবিলে বসিয়া খানা খাইতে পারিলেই উন্নতি হইবে না। দেশের বর্ত্তমান নেতৃবৃন্দ স্থিরচিত্তে চিন্তা করিলে বুঝিতে পারি-বেন দেশের প্রকৃত উন্নতি কিসে? যাহারা এখনও নিজ শরীরের নেতা

হইতে পারে নাই, যাহারা এখনও নিজ ইন্দ্রিয়কে সংযত করিতে পারে নাই, যাহারা এখনও নিজ মনকে বশে আনিতে পারে নাই, তাহারা কিরূপে অপরকে পরিচালিত করিবে? যে লোক নিজের মঙ্গলামঙ্গল জানে না, সে দেশের মঙ্গলসাধন কি করিয়া করিবে? অগ্রে আত্মোন্নতি কর, তৎপরে দেশের উন্নতি করিতে পারিবে। উন্নতি কাহাকে বলে জান না। অবিদ্যার বশবর্ত্তী হইয়া আজ অবনতিকেই উন্নতি বলিয়া মনে করিতেছ। যা অন্নপূর্ণার দেশ, আজ অন্নের কাঙ্গাল! ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সহর কলিকাতায় আজ বিশুদ্ধ দুগ্ধ বা ঘৃত পাওয়া যায় না। আমরা এতই উন্নতিলাভ করিয়াছি যে, ছেলেরা আজ উচ্চবিদ্যালাভ করিয়াও একমুষ্টি অন্নের ভিখারী। বিদ্যাশিক্ষার চরম ফল দাসত্ব! ছেলেরা শরীরের বল হারাইয়াছে, মনের বল হারাইয়াছে। ছেলেরা অপদার্থ হইয়া পড়িয়াছে। বাঁশে ঘুণ ধরিলে, বাঁশের যে অবস্থা হয়, আজ এই দেশের ছেলেদেরও সেই অবস্থা হইয়াছে। এই বালকবালিকারাই আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ আশা। ইহাদিগকে যত্ন করিয়া শাস্ত্রানুযায়ী লালনপালন কর। ইহাদের দ্বারা দেশের মঙ্গল হইবে। গাছের গোড়ায় পোকা ধরিলে যেমন সে গাছের ভাল ফল হয় না, তেমনই আজকাল মানুষের গোড়ায় অব্রহ্মচর্য্যরূপ কীট প্রবেশ করিয়া মানুষকে অপদার্থ করিতেছে। ছেলেদের কোন দোষ নাই, তাহারা অজ্ঞান। দোষ পিতামাতার—দোষ সমাজের—দোষ দেশের। নিজের উন্নতি সাধন করিতে হইলে যেমন নিজের দোষের বিষয় চিন্তা করিতে হয় এবং সেই দোষগুলি পরিত্যাগ করিতে হয়; তেমনই দেশের উন্নতি করিতে হইলে দেশের দোষগুলি বিচার করিতে হয় এবং সেইসকল দোষ পরিত্যাগ করিতে হয়, তবে দেশের উন্নতি হয়। যতদিন পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিবে, যতদিন পরের অনুগ্রহের ভিখারী হইয়া থাকিবে; ততদিন তোমার নিজের বা

দেশের উন্নতি হইবে না। নিজের পরিশোধন কর। নিজের ইন্দ্রিয়ের ও মনের দাসত্ব ত্যাগ কর। নিজ ইন্দ্রিয় ও মনের প্রভু হও, তবে দেশের মঙ্গল করিতে পারিবে। তুমি নিজেই নিজ ইন্দ্রিয়ের দাস; এরূপ অবস্থায় অপরকে দাসত্বশৃঙ্খল হইতে কি করিয়া মুক্ত করিবে? আগে নিজে মানুষ হও, পরে অপরকে মুক্ত করিও! নিজের দোষ সংশোধন কর, পরে সমাজের দোষ সংশোধন করিও! নির্ব্বীর্য্য বাঙ্গালী আজ বিলাসের দাস, অলসতার দাস, সে কি করিয়া দেশ উদ্ধার করিবে? এখনও তোমরা বিলাস ত্যাগ করিতে পারিলে না, এখনও আলস্য ত্যাগ করিতে পারিলে না, যদি প্রকৃত স্বদেশভক্তি থাকিত তাহাহইলে তোমরা বহুদিন পূর্ব্বে সমুদয় বিলাস ত্যাগ করিতে। স্বদেশভক্তি তোমাদের মুখে, অন্তরে নহে; স্থিরভাবে চিন্তা করিয়া দেখ একথা ঠিক কিনা? আজ যদি দেশের জন্য তোমরা প্রকৃত দুঃখী হইতে, আজ যদি দেশের জন্য তোমাদের চক্ষু হইতে প্রকৃত শোকাশ্রু পতিত হইত, তাহাহইলে, উন্নতিলাভও শীঘ্র ঘটিত। ছেলেদের কোনও দোষ নাই। দোষ পিতা, মাতা,অভিভাবক ও শিক্ষকদের। কোমলপ্রাণ বালকগণ অতি সরল, তাহাদের মন অতি উচ্চ ও উদার। এই সমাজের একটী দোষের কথা বলি—বিবাহের পণপ্রথা। আমি এমন অনেকগুলি ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, পাত্রের অর্থপিশাচ পিতা দরিদ্র কন্যাকর্ত্তার নিকট হইতে বরপণ পাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিয়াছে এরূপ অবস্থায় উদারস্বভাব পুত্র পিতাকে পণগ্রহণ হইতে বঞ্চিত করিয়া বিনাপণে কন্যাকে বিবাহ করিয়া কন্যার পিতার মহোপকার সাধন করিয়াছে। ছেলেদের মন বড়দের অপেক্ষা অনেক উন্নত ও সরল। এই ছেলেদের রক্ষা করিতে পারিলে আমাদের প্রকৃত দেশরক্ষা হয়। ছেলেদের রক্ষা করিতে হইলে, গ্রামে গ্রামে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের প্রতিষ্ঠা চাই। ছেলেদের চরিত্র উন্নত করা চাই। শুদ্ধ M. A. বা B. A. পাশ করিয়া কোনও সুফল

হইবে না—যদি চরিত্র উন্নত না হয়। লেখাপড়া না শিখিয়াও যদি চরিত্র উন্নত হয়—তাহাও ভাল। বর্ত্তমানে দেশের নেতৃবৃন্দের মধ্যে কয়েকজন মহাপুরুষ আছেন, তবে তাঁহাদের সংখ্যা খুব অল্প। তাঁহারা সকলের নমস্য ও পূজনীয়। তাঁহাদের নিদেশ সকলেরই আন্তরিক-ভাবে পালন করা কর্ত্তব্য।

"স্মরণং কীর্ত্তনং কেলিঃ প্রেক্ষণং গুহ্যভাষণম্।
সঙ্কল্পোঽধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়ানিষ্পত্তিরেবচ॥
এতন্মৈথুনমষ্টাঙ্গং প্রবদন্তি মনীষিণঃ।
বিপরীতং ব্রহ্মচর্য্যমনুষ্ঠেয়ং মুমুক্ষুভিঃ॥"

কামভাবে স্ত্রীলোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, অব্রহ্মচর্য্য হয়। কাম-ভাবে স্ত্রীলোকের বিষয়ে শ্রবণ করিলে, অব্রহ্মচর্য্য হয়। কামভাবে স্ত্রীলোকের সঙ্গে ক্রীড়া করিলে বা তাহাকে স্পর্শ করিলেও, অব্রহ্মচর্য্য হয়। অর্থাৎ কামভাবে কায়ের দ্বারাই হউক বা মনের দ্বারাই হউক বা বাক্যের দ্বারাই হউক, যে কোনপ্রকারেই হউক স্ত্রীসম্বন্ধ করিলে, অব্রহ্মচর্য্য হয়। অব্রহ্মচর্য্যের বিষয় স্মরণ হইলেই তাহাকে মন হইতে তাড়াইয়া দিবে। কোনমতে মনে রাখিবে না। মন হইতে তাড়াইতে পারিলেই তুমি নিশ্চিন্ত হইবে। আর যদি মন হইতে না তাড়াও, যদি মনে মনে সেই বিষয়ে চিন্তা করিতে থাক; তাহাহইলে, তাহা তোমাকে ক্রমশঃ পাপপথে লইয়া যাইবে। তুমি কোনমতেই সামলাইতে পারিবে না। অবশেষে দুঃখের গভীর গহ্বরে পতিত হইবে। ব্রহ্মচর্য্য পরমধন। ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা ও পালন জন্য প্রাণপণ করিবে। হে বালকগণ! ২৫ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে কোনমতেই বিবাহ করিবে না। ১২ বৎসর বয়স হইতে খুব সাবধানে থাকিবে। অসৎ বালক বা অসৎ বালিকার সঙ্গ করিবে না। সর্ব্বদা সৎসঙ্গ করিবে। কুরুচিপূর্ণ উপন্যাস বা পত্রিকা পাঠ করিবে না। ব্রহ্মচর্য্যের বিরুদ্ধ খাদ্য আহার করিবে না। সর্ব্বদা

সাত্ত্বিক খাদ্য আহার করিবে। পরিমিত আহার বিহার করিবে। পরিমিত নিদ্রা যাইবে। অধিক রাত্রি জাগরণ বা অধিক নিদ্রা ভাল নয়। শীতল জলে প্রত্যহ স্নান করিবে ও ব্রহ্মচর্য্যের অন্যান্য নিয়মাবলী পালন করিবে। এগ্রন্থে ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে অধিক লেখা সম্ভব নহে। আজকাল ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে অনেক গ্রন্থ বাহির হইয়াছে। সেই সকল গ্রন্থপাঠে ব্রহ্মচর্য্যের নিয়মাবলী জানিতে পারিবে। ব্রহ্মচর্য্য মহামূল্য রত্ন। জগতে লক্ষ টাকার বিনিময়েও একবারের নিমিত্তও শুক্রক্ষয় করিবে না। বহুদিন যাবৎ শরীরে বীর্য্য রক্ষা করিলে উর্দ্ধরেতা হওয়া যায়। উর্দ্ধরেতা মহাপুরুষদিগের ক্ষমতা অসীম। সুখের বিষয়, আজকাল অনেক স্থানে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম স্থাপিত হইয়াছে এবং অনেক মহাপুরুষ এইসকল আশ্রমের উন্নতিকল্পে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন—তাঁহারাই দেশের প্রকৃত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী।

পুরুষদের ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে যে নিয়ম, স্ত্রীলোকদেরও সেই নিয়ম পালন করা আবশ্যক। বালকদের যেমন বালিকার সঙ্গ নিষিদ্ধ, বালিকাদেরও সেইরূপ বালকের সঙ্গ নিষিদ্ধ। বালকদের উন্নতি যেমন আবশ্যক, বালিকাদের উন্নতিও সেইরূপ আবশ্যক। ছেলেদের বিবাহে আমরা টাকা পাইব, ছেলেরা উপার্জ্জন করিয়া আমাদের টাকা আনিয়া দিবে, আর মেয়েরা সংসারের আবর্জ্জনাস্বরূপ—মেয়েদের বিবাহে আমাদের টাকা খরচ হইবে; এইজন্য আমরা ছেলেদের যেরূপ যত্ন করি, মেয়েদের সেইরূপ অযত্ন করি। এরূপ আচরণ লোকের চক্ষে বিধিসঙ্গত হইতে পারে; কিন্তু পরমপিতা পরমেশ্বরের দৃষ্টিতে কখনই ন্যায়সঙ্গত নহে। অতএব যদি নিজের মঙ্গল চাও, যদি দেশের মঙ্গল চাও, ছেলেদের জন্য যেরূপ যত্ন ও পরিশ্রম করিতেছ, মেয়েদের জন্যও তাহা কর; তাহা না হইলে, সমাজ ও দেশ অধঃপাতে যাইবে।

অপরিগ্রহ। মাত্র শরীর রক্ষার জন্য যাহা আবশ্যক, তাহার অধিক দ্রব্যের আকাঙ্ক্ষা ভাল নহে। তদপেক্ষা অধিক দ্রব্য গ্রহণের আবশ্যকতা নাই। অধিক ভোগ্যবস্তু সম্মুখে থাকিলে যোগসিদ্ধি হয় না। যাহাদের যোগসিদ্ধি আবশ্যক তাহারা অধিক ভোগ্যদ্রব্যের সংগ্রহ করিবে না। বিনা আবশ্যকে, বৃথা পরিগ্রহ মহাপাপ। যদি তোমার অধিক ধন থাকে, তাহাহইলে, তুমি তাহার সদ্ব্যয় কর। যদি তুমি তাহা আবদ্ধ রাখিয়া, শুদ্ধ নিজের ভোগের জন্য স্তূপীকৃত করিয়া রাখ, তাহাহইলে, তোমার পরিগ্রহ হইবে—তোমার মহাপাপ হইবে। মহাপাপ হইবে—কারণ অর্থ তোমার নয়। অর্থ সেই পরমপিতা পরমেশ্বরের। তিনি তোমাকে অর্থের রক্ষকস্বরূপ রাখিয়াছেন। তাঁহার অর্থ তাঁহার কার্য্যে ব্যয় কর। যাহার অভাব আছে তাহার অভাব পূরণ কর। তাহা না করিলে তোমার পরিগ্রহ করা হইল। মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ প্রয়োজনাতিরিক্ত বিষয় সর্ব্বথা ত্যাগ করিবেন।

জাতিদেশকালসময়ানবচ্ছিন্নাঃ সার্ব্বভৌমা মহাব্রতম্ ॥৩১॥

এই পাঁচটী যোগাঙ্গ যখন জাতি, দেশ, কাল ও সময়ের দ্বারা অনবচ্ছিন্ন হয় তখন তাহাদিগকে সার্ব্বভৌম মহাব্রত বলে।

জাতি—যেমন মৎস্যব্যবসায়ী জেলেরা মৎস্যহিংসা করে। দেশ—যেমন তীর্থে হনন করিতে নাই। কাল—যেমন বিশেষ বিশেষ তিথিতে হনন করিতে নাই। সময়—যেমন যজ্ঞে পশু হনন। এইরূপ, বাছিয়া বাছিয়া যাহারা সময়ে সময়ে হিংসা করে, তাহাদের অহিংসা সম্বন্ধে সার্ব্বভৌম মহাব্রত সিদ্ধ হয় না। সর্ব্বস্থলে, সর্ব্বকালে, যে কোন জাতি হউক না কেন, যদি সর্ব্ববিষয়ে ব্যভিচারশূন্য হইয়া অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ ব্রত পালন করে, তাহাহইলে, তাহাকে

সার্ব্বভৌম মহাব্রত বলে। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মুমুক্ষু যোগীরা সর্ব্বথা ও সর্ব্বপ্রকারে এই মহাব্রত পূর্ণভাবে পালন করেন।

শৌচসন্তোষতপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ ॥ ৩২ ॥

শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রণিধান নিয়ম।

শৌচ দুইপ্রকার—আভ্যন্তরশৌচ ও বাহ্যশৌচ। বাহ্যশৌচ দ্বারা শরীর পরিষ্কৃত হয় ও সুস্থ থাকে এবং আভ্যন্তরশৌচ দ্বারা মন পরিষ্কৃত হয় ও সুস্থ থাকে। মাটী ও জল প্রভৃতি ব্যবহারে এবং পবিত্র ও সাত্ত্বিক খাদ্য আহার দ্বারা বাহ্যশৌচ হয়; আর মনের ময়লা পরিষ্কার করিবার জন্য যে সকল সাধন করা হয়, তাহাতে আভ্যন্তরশৌচ হয়। যোগী সর্ব্বদা নিজ শরীর ও বাসস্থানের চতুষ্পার্শ্ব পরিষ্কৃত রাখিবেন ও পবিত্র স্বাস্থ্যকর স্থানে বাস করিবেন। রাজসিক ও তামসিক আহার ত্যাগ করিবেন; কোন প্রকার উত্তেজক বা মাদক-দ্রব্য সেবন করিবেন না। অনেকে ভ্রমবশতঃ চিত্তস্থির করিবার জন্য গাঁজা প্রভৃতি মাদকদ্রব্য ব্যবহার করে। ইহাতে চিত্ত স্ববশে থাকে না। চিত্তকে স্ববশে আনয়ন করাই যোগের উদ্দেশ্য। সুতরাং মাদক দ্রব্যাদি যোগের বিঘ্নকর।

সন্তোষ নিজের অবস্থায় সর্ব্বদা সন্তুষ্ট থাকা আবশ্যক। আমার অবস্থা আমার দ্বারাই সৃষ্ট হইয়াছে। পূর্ব্বজন্মের সংস্কারানুযায়ী আমার ইহজন্মের অবস্থা গঠিত হইয়াছে। পূর্ব্বজন্মে যাহার শক্রতা করিয়া আসিয়াছি—ইহজন্মে সে আমার শক্রতা করিবে। পূর্ব্বজন্মে যাহার উপকার করিয়া আসিয়াছি, ইহজন্মে সে আমার উপকার করিবে। পূর্ব্বজন্মে যাহাকে প্রতারিত করিয়াছি, ইহজন্মে সে আমাকে প্রতারিত করিবে। পূর্ব্বজন্মে যাহার মাংস ভক্ষণ করিয়া আমার শরীর পুষ্ট

করিয়াছি, ইহজন্মে সে আমার মাংস ভক্ষণ করিয়া তাহার শরীরের পুষ্টিসাধন করিবে। পূর্ব্বজন্মে যাহার ঋণ পরিশোধ করি নাই, ইহজন্মে সে তাহার প্রাপ্য আদায় করিবার জন্য আমার নিকট আসিবে। ইহাদের মধ্যে কেহ বা স্ত্রীরূপে আসিয়াছে, কেহ বা পুত্ররূপে আসিয়াছে, কেহ বা কন্যারূপে আসিয়াছে, কেহ বা আত্মীয়, কুটুম্ব বা প্রতিবাসিরূপে আসিয়াছে। অতএব আমার পূর্ব্বজন্মজাত কর্ম্মের ফলানুযায়ী আমি ইহজন্মে আমার শত্রু ও মিত্রাদির দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়াছি। আমার চিত্তে পূর্ব্বজন্মের সংস্কার পড়িয়া আছে। আমাকে সেই সকল সংস্কারানু-যায়ী সুখ এবং দুঃখ ভোগ করিতেই হইবে। আমার প্রারব্ধ সংস্কার আমি ভোগ করিতেছি। ইহাতে কখনও সুখ আসিতেছে, আবার কখনও বা দুঃখ আসিতেছে। এই সুখদুঃখ ক্ষয় হইয়া আমার চিত্ত পরিষ্কৃত হইতেছে। যদি আমি এই সুখে উন্মত্ত হই কিম্বা এই দুঃখে অভিভূত হই, তাহাহইলে, পুনরায় আমার চিত্তে এই রাগ ও দ্বেষের সংস্কার নূতন করিয়া পড়িবে ও নূতন সংস্কারের সৃষ্টি করিবে এবং পুনরায় আমাকে পরজন্মে এই সকল নূতন সংস্কার ভোগ করিতে হইবে; সুতরাং আমাদের পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতেই হইবে। সুখের সংস্কার হইলে, সুখভোগ করিবার জন্য পুনরায় দেহধারণ করিতে হইবে এবং দুঃখের সংস্কার হইলে পুনরায় দেহধারণ করিয়া দুঃখভোগ করিতে হইবে। ভোগ থাকিলেই দেহ ধারণ করিতে হইবে কারণ দেহ ধারণ ভিন্ন ভোগ নিষ্পন্ন হয় না। ফলকামনা করিয়া কর্ম্ম করিলেই নূতন সংস্কার হইবে এবং ফলভোগ করিতেই হইবে। ফলকামনাশূন্য হইয়া কর্ম্ম করিলে, আর নূতন সংস্কার হইবে না এবং ফলভোগও করিতে হইবে না। সুতরাং দেহ ধারণ করিতেও হইবে না। এইজন্য তোমার সংস্কার অনুযায়ী, তুমি পুত্র, কন্যা, দৌহিত্র, দৌহিত্রী, আত্মীয়, কুটুম্ব ও প্রতিবাসিগণকে প্রাপ্ত

হইয়াছ—ইহাদের দ্বারা তোমার পূর্ব্বজন্মের সংস্কার ক্ষয় করাইয়া লইবার জন্য; সুতরাং ইহাদের দ্বারা উপকৃত হইয়া বা অপকারপ্রাপ্ত হইয়া মনকে বিকৃত করিও না। সুখদুঃখ সমভাবে গ্রহণ করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ কর, তাহাহইলে, আর নূতন সংস্কার হইবে না. কর্ম্মের ফলভোগ করিতে হইবে না এবং পুরাতন সংস্কারগুলি ক্ষয় হইয়া চিত্ত পরিস্কৃত ও স্থির হইবে। এইজন্য তুমি যে অবস্থায় আছ, সেই অবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকিয়া সাধন করিয়া যাও। সুখে ও দুঃখে বিচলিত হইও না। নিজের দুরবস্থা জন্য দুঃখিত হইও না। প্রাণপণে কর্ত্তব্য পালন কর ও সর্ব্বদা "সন্তোষ"কে মনে রাখিও। কোন অবস্থাতেই অসন্তুষ্ট হইও না। "যাহা পাইয়াছি, তাহাই যথেষ্ট"—ঐইরূপ ভাব সর্ব্বদা মনের মধ্যে জাগরূক রাখিবে। "সন্তোষ" মহামূল্য রত্ন। যিনি এই সন্তোষরত্ন কণ্ঠে ধারণ করিয়াছেন, তিনিই প্রকৃত ধনবান্। তাঁহার কোন অভাব নাই এবং তিনি সর্ব্বদাই সুখী। সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডলাভ করিয়াও সুখী হইতে পারিবে না—যদি সন্তোষরত্নে বঞ্চিত হও। তাই বলি, সন্তোষরত্নকে সাবধানে রক্ষা করিবে, যেন আসক্তিরূপ চোর আসিয়া তাহাকে চুরি করিয়া না লয়।

তপঃ—কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি ব্রত, একাদশ্যাদি উপবাস প্রভৃতি তপঃ মধ্যে গণ্য। সর্ব্বাপেক্ষা ভাল তপস্যা—ইন্দ্রিয় ও মনের নিগ্রহ; ইন্দ্রিয় ও মনের স্বেচ্ছাচার নিবারণ করা। তপঃসিদ্ধ হইলে ইন্দ্রিয় ও মন আমাদের বশে থাকে, আমরা শীত গ্রীষ্ম সহ্য করিতে পারি, আমরা ক্ষুধা পিপাসায় কাতর হই না। আমরা তিতিক্ষু হই। যাহারা অল্প ক্ষুধা পিপাসা বা শীত গ্রীষ্ম সহ্য করিতে পারে না, তাহাদের সাধনা হইবে না।

স্বাধ্যায়—মোক্ষশাস্ত্রাধ্যয়ন ও ইষ্টমন্ত্রজপ। স্বাধ্যায়দ্বারা চিত্ত একাগ্র ও প্রফুল্ল হয়, বিষয়াসক্তি কমিয়া যায় ও ঈশ্বরাসক্তি বর্দ্ধিত হয়। সংসারীর পক্ষে স্বাধ্যায় অতি শ্রেষ্ঠ সাধনা। সকল সংসারী

ইচ্ছা করিলে উত্তমরূপে স্বাধ্যায় সাধন করিতে পারে। বালক বালিকা, যুবক যুবতী বা বৃদ্ধ বৃদ্ধা সকলেরই স্বাধ্যায়পরায়ণ হওয়া আবশ্যক। যাহারা তাসপাশাদি খেলিবার সময় পায়, বাজে গল্প করিবার সময় পায়, আর স্বাধ্যায় করিবার সময় পায় না—তাহারা নিতান্ত হতভাগ্য। তাহাদিগকে অত্যন্ত যাতনা ভোগ করিতে হইবে।

ঈশ্বরপ্রণিধান—ভগবানে সর্ব্বকর্ম্ম অর্পণ করাকে ঈশ্বরপ্রণিধান বলে। ক্ষুদ্র শিশু যেমন স্নেহময়ী জননীর ক্রোড়ে শয়ন করিয়া নিশ্চিন্ত ও নির্ভয় হয়, সাধকও সেইরূপ নিজের অহঙ্কারভাব ত্যাগ করিয়া ও ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়া তাঁহার সমুদয় নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম ভগবানে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত ও নির্ভয় হন। নিজের ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য কর্ম্ম করিলে তাহা ভগবানে অর্পিত হয় না, তাহা ইন্দ্রিয়ে অর্পিত হয়। শুদ্ধ ভগবৎপ্রীতির জন্য কর্ম্ম করিলে ভগবানে অর্পিত হয়। পূজাদি যাহাই কর না কেন, যদি নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে, তাহা ভগবানে অর্পিত হইল না। লোকে পূজা করে—সুখ্যাতি পাইবার আশায়। লোকে আশ্রম করে—সুখ্যাতি পাইবার আশায়। লোকে কাঙ্গালীভোজন করায়—সুখ্যাতি পাইবার আশায়। এসকল কর্ম্ম ভগবানে অর্পিত হয় না। ইহাতে পাপবৃদ্ধি হয়। ইহারা মনে করে ধর্ম্ম করিতেছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহাতে সংস্কার বৃদ্ধি হয় ও পুনরায় দেহধারণ করিতে হয়। "আমি কর্ত্তা," এভাব ত্যাগ করিয়া মনে ভাবিতে হয়, "হে প্রভো! আমাকে চক্ষু দিয়াছ, তোমার কার্য্যের জন্য; আমাকে কর্ণ দিয়াছ, তোমার কার্য্যের জন্য; আমাকে হস্তপদাদি দিয়াছ, তোমার কার্য্যের জন্য; তুমি প্রীত হইবে, তাই কার্য্য করি; একার্য্যে সুখ হয় হউক, আমার তাহা দেখিবার আবশ্যক নাই। তুমি সুখ দাও, তাহাও আমার ভাল; আর দুঃখ দাও, তাহাও আমার ভাল। তোমার দান যাহাই হউক না কেন,

সবই আমার ভাল—সবই আমার মঙ্গলের জন্য—অতএব তজ্জন্য আমার ভাবনা বা চিন্তা করিবার আবশ্যক নাই।” “আমি তোমার দাস, আর তুমি আমার প্রভু। তোমার যেরূপ ইচ্ছা, আমাকে সেইরূপে রাখ, কেবল একমাত্র আকাঙ্ক্ষা—তুমি প্রীত হও। আমায় সাজাইয়া যদি তোমার সুখ হয়, আমাকে সাজাও। আমাকে খাওয়াইয়া যদি তোমার সুখ হয়, আমাকে খাওয়াও। আমাকে দণ্ড দিয়া যদি তোমার সুখ হয়, আমাকে দণ্ড দাও। আমি জানি তুমি আমার—আমি জানি আমি তোমার। আমি জানি তুমি আমার মন্দ কখনই করিবে না, অতএব আমি নিশ্চিন্ত। যদি দর্শন দিয়া প্রীত হও, তাহাহইলে, দর্শন দিও—যদি দর্শন না দিয়া প্রীত হও, তাহাহইলে, দর্শন দিও না। তোমার যাহাতে প্রীতি হয়, তাহাই কর। আমি তোমার দরশন চাহি না, আমি তোমার পরশন চাহি না—আমি মুক্তি চাহি না—আমি কৈবল্য চাহি না—আমি ধ্যান চাহি না—আমি সমাধি চাহি না—আমি স্বর্গ চাহি না—আমি মর্ত্ত্য চাহি না। আমি পুত্র চাহি না—আমি কলত্র চাহি না—আমি সম্পদ্ চাহি না—আমি চাহি কেবল তোমার প্রীতি—আর অন্য কিছুই চাহি না। তোমার প্রীতির জন্য যদি সহস্র জন্মও ধারণ করিতে হয় তাহাও আমার মঙ্গলপ্রদ। জগতের সমুদয় বিপদ আপদ বুক পাতিয়া সহ্য করিতে পারি—যদি তোমার হাসিমুখ দেখিতে পাই”। “প্রভো! হস্ত যেন তোমার প্রীতির কার্য্য ভিন্ন অন্য কার্য্য না করে। চরণ যেন তোমার অভিপ্রেত স্থান ভিন্ন অন্য স্থানে ভ্রমণ না করে। কর্ণ যেন তোমার প্রীতিপ্রদ কথা ভিন্ন অন্য কথা না শুনে। আমার সমুদয় শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি যেন সর্ব্বসময়ে তোমার প্রীতির কার্য্য ভিন্ন অন্য কার্য্য না করে”। সাধকদের মনের ভাব এইপ্রকার হইলে, তবে ঈশ্বরে সর্ব্বকর্ম্মার্পণ হয়।

বিতর্কবাধনে প্রতিপক্ষভাবনম্ ॥ ৩৩ ॥

এই যমনিয়মাদি সাধনসকল বিতর্কের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হইলে প্রতিপক্ষভাবনা দ্বারা তাহাদিগকে অপসারিত করিবে।

"হিংসারূপ" বিতর্ক, অহিংসাসাধনে বাধাদান করে। মনে হিংসার উদয় হইলে হিংসার প্রতিপক্ষ "অহিংসা" ভাবনা করিবে। এইপ্রকার "অনৃতরূপ" বিতর্কের প্রতিপক্ষ "সত্য" ভাবনা করিবে। "স্তেয়" প্রতিপক্ষ "অস্তেয়" ভাবনা করিবে। "অব্রহ্মচর্য্য" প্রতিপক্ষ "ব্রহ্মচর্য্য" ;—"পরিগ্রহ" প্রতিপক্ষ "অপরিগ্রহ" ;—"অশৌচ" প্রতিপক্ষ "শৌচ" ;—"অসন্তোষ" প্রতিপক্ষ "সন্তোষ" ;—"অতপঃ" অর্থাৎ অতিতিক্ষা" প্রতিপক্ষ "তপঃ বা তিতিক্ষা" ;—"অস্বাধ্যায়" প্রতিপক্ষ "স্বাধ্যায়" ;—"অনীশ্বর ভাবনা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়তৃপ্তি ভাবনা" প্রতিপক্ষ "ঈশ্বরপ্রীতি ভাবনা" ভাবনা করিবে। এইপ্রকার প্রতিপক্ষভাবনা দ্বারা চিত্তের কলুষিত ভাবসকল দূরীভূত হইলে, চিত্ত নির্ম্মল ও সংস্কারবিহীন হইবে।

অভ্যাসের গুণ অসাধারণ। চিত্তে যাহা অভ্যাস করিবে, চিত্ত তাহাতেই প্রতিষ্ঠিত হইবে। হিংসাভাব অভ্যাস কর, তুমি হিংসক হইবে। অহিংসাভাব অভ্যাস কর, তুমি অহিংসক হইবে। মিথ্যাকথা বলা অভ্যাস কর, তুমি মিথ্যাবাদী হইবে আর সত্যকথা বলিতে অভ্যাস কর, তুমি সত্যবাদী হইবে। নিরন্তর যাহার সঙ্গ করিবে, তাহার গুণপ্রাপ্ত হইবে। নিরন্তর সাধুসঙ্গ কর, সাধু হইবে; নিরন্তর অসাধুসঙ্গ কর, অসাধু হইবে। লৌহ চুম্বকে সংলগ্ন রাখিলে, লৌহও চুম্বক হইয়া যায়। যাহার সহিত সর্ব্বদা ঘনিষ্ঠতা হয় তাহাকেই ভালবাসিতে ইচ্ছা হয়। নিজ পুত্র দূরে অবস্থান করিলে সেও পর হইয়া যায়, আবার অন্যের পুত্র সর্ব্বদা নিকটে থাকিলে সেও আপনার

হইয়া যায়। সঙ্গের গুণ অসাধারণ। নিরন্তর সঙ্গ করিলে পরও আপনার হইয়া যায়। নিরন্তর হিংসার সঙ্গ করিলে আমরা হিংসাকে ভালবাসি, আবার নিরন্তর অহিংসার সঙ্গ করিলে আমরা অহিংসাকে ভালবাসি। যাহারা হিংসক তাহারা "অহিংসা" সাধন করিতে প্রথম প্রথম বেশ কষ্ট অনুভব করিবে; কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া সাধন করিতে করিতে তাহারা এই অহিংসাব্রতকে অত্যন্ত ভালবাসিবে এবং ভবিষ্যতে আর হিংসা করিতে পারিবে না। যাহারা মিথ্যাকথায় অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে, তাহারা "সত্য" সাধন করিতে প্রথম প্রথম অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করিবে কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া নিরন্তর সাধন করিতে করিতে সত্য ভিন্ন মিথ্যা কথা আর তাহাদের মুখ দিয়া বাহির হইবে না। সকল কার্য্যের অভ্যাসেই প্রথম প্রথম একটু কষ্ট হয়—পরে সহজ হইয়া যায়। লেখাপড়া শিক্ষা, গানবাজনা শিক্ষা—প্রতি কার্য্যেরই প্রথমে একটু কষ্ট হয়, এমন কি যাহারা ঘোর মাতাল তাহারাও প্রথম প্রথম মদ্যপান অভ্যাস করিবার সময় একটু কষ্ট অনুভব করে। চিত্ত একাগ্রতা-সহকারে যে কোন বিষয়ের অভ্যাস করিবে, তাহাতেই কৃতকার্য্য হইবে; অতএব যদি তুমি ঘোর দুরাচার হইতেও অধিক দুরাচার হও, তাহাহইলেও, নিরাশ হইও না। অভ্যাসের বলে তুমি অচিরে পরম সাধু বলিয়া গণ্য হইবে। অতএব প্রাণপণে সাধন অভ্যাস কর। ইহলোক এবং পরলোকে তোমার মঙ্গল হইবে।

বিতর্কা হিংসাদয়ঃ কৃতকারিতানুমোদিতা লোভ-ক্রোধমোহপূর্ব্বকা মৃদুমধ্যাদিমাত্রা দুঃখা-জ্ঞানানন্তফলা ইতি প্রতিপক্ষভাবনম্ ॥ ৩৪ ॥

হিংসাদি বিতর্কসকল কৃত, কারিত ও অনুমোদিত; লোভ, ক্রোধ

ও মোহপূর্ব্বক সম্পাদিত, এবং মৃদু, মধ্য ও অধিমাত্র। ইহারা অনন্ত দুঃখ ও অনন্ত অজ্ঞানের উৎপত্তির কারণ। এইরূপ চিন্তা করিয়া প্রতিপক্ষভাবনা করিলে, এই সকল বিতর্কের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

হিংসা—কৃত, কারিত ও অনুমোদিত এই তিনপ্রকার। কৃত অর্থাৎ নিজে যে হিংসা করা যায়; কারিত অর্থাৎ নিজে না করিয়া অপরের দ্বারা যে হিংসা করা হয়; অনুমোদিত অর্থাৎ একজন হিংসা করিতেছে আর একজন সেই হিংসার অনুমোদন করিতেছে; অথবা একজন হিংসা করিতেছে এবং অপরে তাহার কোন প্রতিবাদ করিতেছে না। অপরকে হিংসা করিতে দেখিয়া যদি প্রতিবাদ না করা হয়, তাহাহইলে, তাহার অনুমোদন করা হইল। কৃত হিংসা—নিজে মৎস্য কুটিলাম। কারিত হিংসা—বিধবা মাতাকে দিয়া মৎস্য কাটাইয়া ভক্ষণ করিলাম। অনুমোদিত হিংসা—তুমি ছিপ ও বঁড়শী দ্বারা মৎস্য বিদ্ধ করিয়া তাহাকে খেলাইতেছ—আর আমি পুষ্করিণীর তীরে বসিয়া তোমার প্রশংসা করিতেছি। তুমি ক্রোধোন্মত্ত হইয়া তোমার ছেলেকে প্রহার করিতেছ আর আমি তোমার প্রশংসা করিতেছি। এই কৃত হিংসাদি প্রত্যেকে আবার তিন তিন প্রকার হইতে পারে, যথা—লোভপূর্ব্বক, ক্রোধপূর্ব্বক এবং মোহপূর্ব্বক। লোভপূর্ব্বক—যেমন অর্থলোভে দস্যুরা গৃহস্বামীকে নির্য্যাতন করে। ক্রোধপূর্ব্বক—যেমন কেহ আমাকে অপমান করিয়াছে, তাহাকে প্রহার করিব। মোহপূর্ব্বক—যেমন আমাদের ভোজনের নিমিত্তই ভগবান্ মৎস্যের সৃষ্টি করিয়াছেন! অতএব হিংসা নয়প্রকার হইল। এই নয়প্রকার হিংসা আবার প্রত্যেকে তিন তিন প্রকার। যথা—মৃদু, মধ্যম ও অধিমাত্র; সুতরাং হিংসা সপ্তবিংশতি প্রকার হইল। যদি আমি এই বিতর্কসকল ত্যাগ না করি, তাহাহইলে, আমাকে অনন্ত দুঃখ

ভোগ করিতে হইবে এবং আমার এই অজ্ঞান অনন্তকালের জন্য থাকিয়া যাইবে। বিতর্কাদির এইরূপ ঘোর পরিণাম হৃদয়ে চিন্তা করিয়া তাহার প্রতিপক্ষ ভাবনা করিতে হয়। আমরা সচরাচর দেখিতে পাই যে, কোন কোন লোক বৃদ্ধাবস্থায় কঠিন দুরারোগ্য পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া প্রতিক্ষণ অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। ইহারা প্রতিক্ষণ মৃত্যু ইচ্ছা করিলেও ইহাদের মৃত্যু হয় না। তুষানলের মত প্রতি পলে ইহারা রোগযন্ত্রণা সহ্য করিয়া দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত জীবিত থাকে। এই সকল লোক পূর্ব্বজন্মেই হউক বা ইহজন্মেই হউক ঘোরতর হিংসাকার্য্য সাধন করিয়া শেষজীবনে এইরূপ অবস্থায় পতিত হয়। সেই হিংসার ফল যতদিন না শেষ হয়, ততদিন তাহাদের মৃত্যু হয় না।

অহিংসাপ্রতিষ্ঠায়াং তৎসন্নিধৌ বৈরত্যাগঃ ॥ ৩৫ ॥

অহিংসা প্রতিষ্ঠিত হইলে যোগীর নিকট সমুদয় প্রাণী বৈরভাব ত্যাগ করে।

অহিংসাপ্রতিষ্ঠিত যোগীর নিকট ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুও হিংসাভাব পরিত্যাগ করে। এই কারণে মুনিদিগের আশ্রমে ব্যাঘ্র ও হরিণশিশু একত্র ক্রীড়া করিত। তোমার অহিংসা প্রতিষ্ঠিত হইলে আর কেহ তোমার হিংসা করিবে না। সকলেই তোমার মিত্র হইবে। যখন কোন কারণেই আর হিংসাবৃত্তি তোমার মনে উদিত হইবে না, তখন জানিও তোমার মনে অহিংসা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

সত্যপ্রতিষ্ঠায়াং ক্রিয়াফলাশ্রয়ত্বম্ ॥ ৩৬ ॥

সত্য প্রতিষ্ঠিত হইলে যোগী বাক্‌সিদ্ধ হন।

সত্যপ্রতিষ্ঠিত যোগী যাহাকে যাহা বলেন, তাহার তাহাই হয়। তাঁহার বাক্য অমোঘ। কাহাকেও আশীর্ব্বাদ করিলে সেই আশীর্ব্বাদের ফল ফলে এবং কাহাকেও অভিসম্পাত প্রদান করিলে তাহাও ফলে। ইচ্ছা করিলে পীড়িতের কঠিন পীড়া আরোগ্য করিতে পারেন। ইচ্ছা করিলে জগাই মাধাই এর ন্যায় পাপিষ্ঠকেও উদ্ধার করিতে পারেন। সত্যপ্রতিষ্ঠিত যোগী অন্যায়পূর্ব্বক ক্ষমতার বহির্ভূত ব্যর্থসংকল্প করেন না।

অস্তেয়প্রতিষ্ঠায়াং সর্ব্বরত্নোপস্থানম্ ॥ ৩৭ ॥

অস্তেয় প্রতিষ্ঠিত হইলে প্রকৃতিমধ্যস্থ সমুদয় রত্ন সাধকের নিকট উপস্থিত হয়।

কায়মনোবাক্যে যিনি কখনও কাহারও ধন অপহরণ করিবার ইচ্ছা পোষণ করেন না, তিনি চেতন ও অচেতন সমুদয় রত্নের অধিকারী হন। জগজ্জননী তাঁহার আবশ্যকীয় সকল দ্রব্যই তাঁহার নিকট আনিয়া দেন। শ্রীগীতাতেও উক্ত আছে "যোগক্ষেমং বহাম্যহং" অর্থাৎ আমিই ভক্তের যোগক্ষেম বহন করি। অস্তেয় প্রতিষ্ঠিত হইলে যোগীর মুখভাব এরূপ পরিবর্ত্তিত হয় যে, তাঁহার মুখের দিকে তাকাইলেই যেন তাঁহাকে কিছু দিতে ইচ্ছা করে, আর তিনি সেই দান গ্রহণ করিলে যেন দাতা কৃতকৃতার্থ হয়। আমি যেন তাঁহাকে কিছু না দিয়া থাকিতে পারি না। আমি যেন তাঁহাকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারি না। কেন দিতে ইচ্ছা করে, কেন ভালবাসিতে ইচ্ছা করে, তাহার কারণ

খুঁজিয়া পাই না। যেন তাঁহাকে দিতে না পারিলে, যেন তাঁহাকে ভালবাসিতে না পাইলে, আমার প্রাণে দারুণ বেদনা অনুভব করি। তিনি যেন আমার কতই বিশ্বাসের পাত্র। আমি তাঁহার নিকট নিশ্চিন্তভাবে সর্ব্বস্ব গচ্ছিত রাখিতে পারি। তিনি আমাদের মধ্যে থাকিলে, আমাদের মনে কতই ভরসা হয়। তিনি যেন আমাদের পরম আশ্বাসস্থল।

ব্রহ্মচর্য্যপ্রতিষ্ঠায়াং বীর্য্যলাভঃ ॥ ৩৮ ॥

ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠিত হইলে বীর্য্যলাভ হয় অর্থাৎ সাধক মহাশক্তিশালী পুরুষ হন।

ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠিত হইলে, শরীরের, মনের ও বুদ্ধির বল বর্দ্ধিত হয়। ইন্দ্রিয়ের তেজ বর্দ্ধিত হইয়া সূক্ষ্ম ও অলৌকিক বিষয়সকল দর্শন শ্রবণাদি করিবার সামর্থ্য হয়। আমরা প্রকৃষ্টরূপে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হই। বৃক্ষের সার না থাকিলে যেমন বৃক্ষ আর ফলোৎপাদন করিতে পারে না, তেমনই দেহের বীর্য্যক্ষয় হইলে দেহদ্বারা আর কোন কার্য্য হয় না। দেহ নানাপ্রকার পীড়ার আস্পদ হয় এবং অকালে বিনষ্ট হইয়া যায়। ব্রহ্মচর্য্যহীন মানবেরা জ্ঞানলাভ করিতে পারে না। তাহাদের উপদেশ অপরের মনকে বিদ্ধ করিতে পারে না; সুতরাং তাঁহাদের উপদেশ কেহ পালন করে না। ব্রহ্মচর্য্যহীন ব্যক্তিরা সাধারণ পশু অপেক্ষাও অধম ও নিকৃষ্ট। নিম্নশ্রেণীর পশুগণও যখন তখন বীর্য্যক্ষয় করে না, তাহারাও প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ী যথাসময়ে বীর্য্যক্ষয় করে, কিন্তু মানুষ এতদূর কামমোহিত যে ইহারা দিবারাত্র যখন ইচ্ছা বীর্য্যক্ষয় করিতে প্রস্তুত। যেন বীর্য্যক্ষয়জনিত আনন্দলাভই মানবজীবনের একমাত্র সার্থকতা। অতএব অযথা শুক্রক্ষয় করিয়া উৎসন্ন যাইও

না—বীর্য্যরক্ষা কর। অষ্টাঙ্গযোগ সাধন কর—ধারণা, ধ্যান ও সমাধি হইবে এবং এই জীবনেই সর্ব্বশক্তিমান্ ও সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারিবে।

অপরিগ্রহস্থৈর্য্যে জন্মকথন্তাসংবোধঃ ॥ ৩৯ ॥

অপরিগ্রহস্থৈর্য্য হইলে জন্ম জন্মান্তরের বিষয় স্মরণ হয়।

আমি কে? কি ছিলাম? কোথা হইতে আসিলাম? কোথায় যাইব? পরেই বা কি হইব? অপরিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইলে, ইত্যাদি প্রকার পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্ম ও ভবিষ্যৎ জন্ম জানিতে পারা যায়।

শৌচাৎ স্বাঙ্গজুগুপ্সা পরৈরসংসর্গঃ ॥ ৪০ ॥

শৌচ সাধন হইতে স্ব-অঙ্গের প্রতি অর্থাৎ নিজ দেহের প্রতি জুগুপ্সা অর্থাৎ ঘৃণা হয় এই জন্য পরের সহিত সংসর্গ করিতে ইচ্ছা হয় না।

শরীর সর্ব্বদাই মলিন হইতেছে, এইজন্য সর্ব্বদাই স্নানাদি করিয়া ইহাকে পরিষ্কার রাখিতে না পারিলে, গাত্রে বিষম দুর্গন্ধ হয়। যাহারা অধিক পিঁয়াজ খায়, তাহাদের গায়ে পিঁয়াজের গন্ধ বাহির হয়। এক একজনের গায়ে এত উৎকট দুর্গন্ধ যে তাহার নিকটে বসিয়া থাকিতেও অত্যন্ত কষ্টবোধ হয়। শরীর হইতে অনবরত বিষ্ঠা, মূত্র, ঘর্ম্ম ও শ্লেষ্মা প্রভৃতি নানাপ্রকার ক্লেদ নির্গত হইতেছে; এইপ্রকার ঘৃণিত ও অপবিত্র শরীরকে শৌচপরায়ণ ব্যক্তিরা আলিঙ্গন করিতে পারেন না। যাহারা অশৌচপরায়ণ, তাহারাই এই পূতিগন্ধযুক্ত দেহ আলিঙ্গনে সুখ অনুভব করে।

সত্ত্বশুদ্ধিসৌমনস্যৈকাগ্র্যেন্দ্রিয়জয়াত্মদর্শনযোগ্যত্বানি চ॥ ৪১॥

শৌচ হইতে সত্ত্বশুদ্ধি হয় অর্থাৎ চিত্ত বিশুদ্ধ হয়; সত্ত্বশুদ্ধি হইতে সৌমনস্য লাভ হয় অর্থাৎ মনে শান্তি আসে; মনের শান্তি হইলে একাগ্রতা হয় অর্থাৎ চিত্ত একাগ্র হয় এবং সৎকর্ম্মে একাগ্রতা জন্মে, একাগ্রতা হইতে ইন্দ্রিয়জয় হয়। ইন্দ্রিয়জয় হইতে আত্মদর্শনের যোগ্যতা হয়।

শৌচ দুইপ্রকার। আভ্যন্তরিক শৌচ ও বাহ্য শৌচ। বাহ্য শৌচ দ্বারা শরীর পরিষ্কৃত হয় এবং আভ্যন্তরিক শৌচদ্বারা মন বা চিত্ত পরিষ্কৃত হয়। যমাদি সাধন করিতে করিতে চিত্তমল বিদূরিত হয়। চিত্তের মলই মনের অশান্তির কারণ। চিত্ত হইতে মল বিদূরিত হইলে, মনও শান্ত হয়। মনে শান্তি না থাকিলে, কোন কাজে মন যায় না—একমন দিয়া কোন কাজ করা যায় না। মনে শান্তি থাকিলে, একমন দিয়া সকল কার্য্যই করা যায়; এইরূপে চিত্তের একাগ্রতা সাধিত হয়। শুদ্ধ একাগ্র চিত্ত ভিন্ন ইন্দ্রিয় জয় করা যায় না এবং জিতেন্দ্রিয় না হইলে ধারণা, ধ্যান বা সমাধিও হয় না। সমাধি না হইলে আত্মদর্শন হয় না। চিত্তে ধারণা, ধ্যান ও সমাধির যোগ্যতা হইলেই আত্মদর্শনের যোগ্যতা হয়।

সন্তোষাদনুত্তম সুখলাভঃ ॥ ৪২ ॥

সন্তোষ হইতে অনুত্তম সুখলাভ হয়।

তৃষ্ণাক্ষয়জনিত সুখই নির্ম্মল সুখ। তৃষ্ণাক্ষয় না হইলে সন্তোষ-সাধন হয় না। যতদিন বিষয়ে তৃষ্ণা থাকিবে, ততদিন সন্তোষসাধন হইবে না। সন্তোষ পরমরত্ন। সন্তোষবান্ ভিখারী ছিন্ন ও জীর্ণবস্ত্র

পরিধান করিয়া, দিবসান্তে একমুষ্টি অন্নগ্রহণ করিয়া এবং জীর্ণকুটীরে অবস্থান করিয়া যে সুখলাভ করে, রাজরাজেশ্বরগণ তাঁহাদিগের অট্টালিকামধ্যে নানাপ্রকার ভোগের উপকরণে পরিবেষ্টিত হইয়াও সে সুখ প্রাপ্ত হন না। ধনীর জীবনে সে সুখ আকাশকুসুমবৎ। বিষয়াসক্তি আমাদের সর্ব্বসুখের কণ্টক। কাম, ক্রোধ ও লোভাদি রিপু যতদিন হৃদয়ে রাজত্ব করিবে, ততদিন সন্তোষরত্ন লাভ হইবে না। সর্ব্বদা নিজের অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিবে। অধিক ভোগ আকাঙ্ক্ষা করিবে না। ইন্দ্রিয় ও মনের নিগ্রহ করিবে। এইরূপ করিতে করিতে তোমার বিষয়াসক্তি কমিয়া যাইবে, তখন সন্তোষের উদয় হইবে। তোমার আর বিষয়তৃষ্ণা থাকিবে না। বিষয়তৃষ্ণা পরম শত্রু। ইহার উদর পূর্ণ করা অসম্ভব। এ পর্য্যন্ত কেহই ইহার উদর পূর্ণ করিতে পারে নাই। যাহার বিষয় তৃষ্ণা যত অধিক তাহার ক্লেশও তত অধিক। যাহার বিষয়তৃষ্ণা যত কম—তাহার ক্লেশও তত কম। অতএব বিষয়তৃষ্ণা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

কায়েন্দ্রিয়সিদ্ধিরশুদ্ধিক্ষয়াৎ তপসঃ ॥ ৪৩ ॥

তপস্যার দ্বারা অশুদ্ধির ক্ষয় হইলে তপস্বী, অণিমা, লঘিমা প্রভৃতি কায়সিদ্ধি এবং দূরদর্শন, দূরশ্রবণ, প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সিদ্ধি প্রাপ্ত হন।

আমাদের শরীরের ও ইন্দ্রিয়ের কতকগুলি অদ্ভুত ক্ষমতা আছে। ইচ্ছা করিলে আমরা শরীরকে খুব ছোট করিতে পারি, একটী ক্ষুদ্র পিপীলিকাবৎ হইতে পারি এবং ইচ্ছা করিলে আমরা তূলার্দ্ধ ন্যায় লঘুও হইতে পারি। এ ক্ষমতা আমাদের মধ্যে আছে। সেইরূপ ইচ্ছা করিলে আমরা অনেক দূরের বস্তু দেখিতে পারি এবং অনেক দূরের কথা শুনিতে পারি। এ ক্ষমতাও আমাদের ইন্দ্রিয়ের আছে।

এই ক্ষমতাগুলিকে সিদ্ধি বলে। এই সিদ্ধি অস্বাভাবিক নহে। ইহা স্বাভাবিক শক্তি। শরীরের ও ইন্দ্রিয়ের এই শক্তি আবৃত আছে, প্রকাশিত নাই। কিসে আবৃত করিয়াছে?—অশুদ্ধি অর্থাৎ মলিনতা। এই অশুদ্ধির ক্ষয় হইলেই আমাদের শরীরের ও ইন্দ্রিয়ের এই অণিমা, লঘিমা, দূরদর্শন ও দূরশ্রবণ প্রভৃতি স্বাভাবিক শক্তি আপনা আপনি প্রকাশ পাইবে। এ শক্তি বাহির হইতে সঞ্চয় করিতে হয় না। ইহা আমাদের অধিকারভুক্ত স্বাভাবিক শক্তি। শরীর ও ইন্দ্রিয়ের মলিনতা এই স্বাভাবিক শক্তিকে প্রকাশিত হইতে দিতেছে না। এই মলিনতা দূর হইলে এই শক্তি আপনিই প্রকাশিত হইবে। কি করিয়া এই মলিনতা দূর হইবে?—তপস্যার দ্বারা; যেমন বস্ত্র মলিন হইলে আমরা ক্ষার-সহযোগে তাহার শুভ্রতা সম্পাদন করি। বস্ত্র স্বাভাবিক শুভ্রই ছিল এবং এখনও শুভ্রই আছে, তবে মলিনতার আবরণে সেই শুভ্রতা আবরিত হইয়াছিল; এক্ষণে ক্ষারসহযোগে যেমন সেই মলিনতা কাটিয়া গেল অমনি সেই বস্ত্রের স্বাভাবিক শুভ্রতা প্রকাশ পাইল। নূতন করিয়া বস্ত্রের শুভ্রতা আনিতে হইল না। সেইরূপ মানবমাত্রেরই শরীরে ও ইন্দ্রিয়ে এই সকল সিদ্ধি বর্ত্তমান আছে; তপস্যার দ্বারা মলিনতা কাটিয়া গেলেই এই সকল সিদ্ধি আপনিই প্রকাশ পাইবে। সাধক ইচ্ছা না করিলেও প্রকাশিত হইবে। তবে যোগীরা এই তপস্যাকে সিদ্ধির জন্য প্রয়োগ করেন না; পরমার্থপ্রাপ্তিই তাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য। অনেকে এইরূপ সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া অর্থ উপায়ের একটী পন্থা করিয়া লয় এবং সাধারণ লোকের নিকট এই সিদ্ধি দেখাইয়া অর্থ উপার্জ্জন করে। ইহারা যোগভ্রষ্ট হইয়া অধোগতি প্রাপ্ত হয়। অতএব সাবধান!—সিদ্ধির কথা সর্ব্বদা গোপন রাখিবে, কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না। প্রকাশ করিলে অহঙ্কার বর্দ্ধিত হইয়া তোমাদের পাপপথে লইয়া যাইবে। সিদ্ধি পাও বা না পাও সেদিকে

আদৌ লক্ষ্য রাখিবে না। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া সাধনপথে অগ্রসর হইবে। ভোগবৃত্তিই শরীরের ও ইন্দ্রিয়ের মলিনতা আনয়ন করে। বৈরাগ্যবৃত্তিই তাহাদের শুদ্ধিসাধন করে। প্রবৃত্তিপথে শরীর ও ইন্দ্রিয় মলিন হয়। নিবৃত্তিপথে ইহারা শুদ্ধ হয়। তপস্যাদি এই ভোগবৃত্তি নিবারণ করিয়া বৈরাগ্যবৃত্তি আনয়ন করে। ভোগবৃত্তি যতই বর্দ্ধিত হইবে—মলিনতাও তত বৃদ্ধি পাইবে। ভোগবৃত্তি যত কমিবে—মলিনতাও তত কমিবে। অতএব সর্ব্বদা তপস্যার দ্বারা শরীর ও ইন্দ্রিয়ের শুদ্ধি সম্পাদন করিবে।

বাহির হইতে দেখিলে সকল মানুষের শরীর ও ইন্দ্রিয় একপ্রকারের দেখায় এবং পাশ্চাত্যবিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতেরা এই শরীর ও ইন্দ্রিয়ের স্থূল উপাদান একই প্রকার বলিয়া জানেন। স্থূল উপাদান এক হইলেও সূক্ষ্ম উপাদান এক নহে। মানুষের সংস্কার অনুযায়ী, প্রকৃতি অনুযায়ী ও সাধন অনুযায়ী এই সূক্ষ্ম উপাদান বিভিন্ন প্রকারের হয়। যাঁহার সাত্ত্বিক সংস্কার, সাত্ত্বিক প্রকৃতি ও সাত্ত্বিক সাধন তাঁহার এই সূক্ষ্ম উপাদান, রাজস তামস সংস্কার, প্রকৃতি ও সাধনসম্পন্ন মনুষ্যের সূক্ষ্ম উপাদান হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। সাধন করিতে করিতে এই সূক্ষ্ম উপাদান পরিবর্ত্তিত হয়। রাজস তামস প্রকৃতির মনুষ্য সাত্ত্বিক সাধন করিলে, তাহার রাজস তামস সূক্ষ্ম উপাদান সাত্ত্বিক হইয়া যায়; আবার সাত্ত্বিক প্রকৃতির মনুষ্য রাজস তামস সাধন করিলে, তাহার সাত্ত্বিক উপাদান পরিবর্ত্তিত হইয়া রাজস তামসে পরিণত হয়। সাধন অনুযায়ী আমাদের শারীরিক ও ঐন্দ্রিয়িক সূক্ষ্ম উপাদানগুলিরও পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। যাঁহার উপাদান সাত্ত্বিক প্রকৃতির—তাঁহার দেবপ্রকৃতি; যাহার উপাদান রাজস প্রকৃতির—তাহার মনুষ্যপ্রকৃতি; যাহার উপাদান তামস প্রকৃতির—তাহার পশুপ্রকৃতি। পশুপ্রকৃতি উন্নত হইয়া মনুষ্যপ্রকৃতি হয় এবং মনুষ্যপ্রকৃতি উন্নত হইয়া দেবপ্রকৃতি হয়; আবার দেবপ্রকৃতি অবনত হইয়া মনুষ্যপ্রকৃতি হয় এবং মনুষ্য-

প্রকৃতি অবনত হইয়া পশুপ্রকৃতি হয়। মানুষের মধ্যে তিন রকম মানুষ দেখিতে পাওয়া যায়,—(১) দেব-মানুষ, (২) মানুষ-মানুষ ও (৩) পশু-মানুষ। পশুমানুষেরা অত্যন্ত কঠোর সাধন করিলে তবে দেবমানুষ হইতে পারিবে। পশুমানুষদের আমরা রাক্ষস, অসুর প্রভৃতি বলিয়া থাকি, ইহারা প্রায় সাধন করে না। দিবারাত্র বিষয়ভোগে ব্যস্ত। অষ্টাঙ্গযোগের সাধনে, শারীরিক ও ঐন্দ্রিয়িক সূক্ষ্ম উপাদানগুলি পরিবর্ত্তিত হইয়া দেবপ্রকৃতিবিশিষ্ট হয়, তখন সেই শরীর ও ইন্দ্রিয়ের ক্ষমতা দৈবতাদিগের ন্যায় হয় অর্থাৎ অণিমা, লঘিমা, দূরদর্শন, দূরশ্রবণ প্রভৃতি সিদ্ধিলাভ হয়। যাঁহাদের উপাদান পশু ও মানবপ্রকৃতির তাহাদের মধ্যেও এইসকল ক্ষমতা আছে—তবে অপ্রকাশিতভাবে। তপস্যার দ্বারা তাহাদের শরীর ও ইন্দ্রিয়ের মল অপনোদিত হইলে, তাহারা পশু ও মনুষ্যপ্রকৃতি হইতে উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়া দেবপ্রকৃতি প্রাপ্ত হয় এবং দেবতাদের গুণ ও ঐশ্বর্য্যেরও অধিকারী হয়। এইজন্য ঋষি বলিয়াছেন যে, তপস্যার দ্বারা অশুদ্ধিক্ষয় হইলেই কায় ও ইন্দ্রিয়ের সিদ্ধি হয়।

স্বাধ্যায়াদিষ্টদেবতাসম্প্রয়োগঃ ॥ ৪৪ ॥

স্বাধ্যায় হইতে ইষ্টদেবতার সহিত সাক্ষাৎকার হয়।

স্বাধ্যায় অর্থে ইষ্টমন্ত্রের জপ ও মোক্ষশাস্ত্রের অধ্যয়ন। খুব দৃঢ়তার সহিত সাধন করিয়া যাও—কত কি দেখিতে পাইবে! দেব, ঋষি, সিদ্ধ, মুনি ও যোগীদিগের সহিত তোমার সাক্ষাৎ হইবে! তুমি দ্বার অর্গলবদ্ধ করিয়া ঘরের মধ্যে বসিয়া থাকিলেও, সেই ঘরের মধ্যেই তাঁহাদের আবির্ভাব হইবে! তুমি তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইবে, তাঁহাদিগের কথা শুনিতে পাইবে এবং তাঁহাদের সহিত কথা কহিতে

পারিবে। তোমায় তীর্থক্ষেত্রে বৃথা ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেবতা দর্শনের চেষ্টা করিতে হইবে না। এইরূপ ঘরের মধ্যে বসিয়া যে দেবদর্শন, তাহাই প্রকৃত দেবদর্শন। দেবদর্শনের উপযুক্ত ইন্দ্রিয় না হইলে দেবদর্শন হয় না। পুরীর মন্দিরের মধ্যে জগন্নাথদর্শন হয়—তাঁহাদের, যাঁহাদের ইন্দ্রিয় পশু ও মনুষ্যপ্রকৃতি ত্যাগ করিয়া দেবপ্রকৃতির হইয়াছে। আর পশু ও মনুষ্যপ্রকৃতি লইয়া জগন্নাথ দর্শন করিতে গেলে জগন্নাথদর্শন হয় না। পশু ও মনুষ্যভাবের উপযোগী দ্রব্যই দর্শন হয়। বড়লোক হইলেই জগন্নাথদর্শন হয় না। শরীর ও ইন্দ্রিয়কে দেবভাবে পরিণত করিতে পারিলেই ঘরের মধ্যে বসিয়াও জগন্নাথদর্শন হয়। খুব কাতর হইয়া, অতিব্যাকুলভাবে ঘরের খিল বন্ধ করিয়া চক্ষের জলে ঘরের মেঝে ভাসাইয়া দাও। তিনি না আসিয়া থাকিতে পারিবেন না। কিন্তু কাতর হইবে কে? যে পশু, যাহার ব্যবহার পশুবৎ, যে বিষয়-লম্পট—তাহার মনে সে কাতরতা আসিবে কেন? তাহাকে ধিক্! সে তীর্থদর্শন করিতে আসিয়া, ভগবানকে না দেখিয়া পরস্ত্রীর রূপ দর্শন করিতেছে ও অপরাপর সমুদয় ইন্দ্রিয়কে পশুর ভোগে নিযুক্ত করিয়াছে! তাহার শরীর ও ইন্দ্রিয়ের উপাদান পশুপ্রকৃতি ত্যাগ করিতে পারে নাই; সুতরাং তীর্থে গমন করুক বা যেখানেই যাক, তাহার ভিতর হইতে সেই পশুপ্রকৃতিই প্রকাশ পাইবে। পশুর শরীর ও ইন্দ্রিয় হইতে দেবতার গুণ প্রকাশিত হইতে পারে না। তাহার তীর্থগমন বৃথা। তীর্থস্থান তাহার আগমনে অপবিত্র ও কলুষিত হয়। বর্ত্তমান-কালে যাহারা তীর্থদর্শন করে, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই এই প্রকৃতির। তীর্থভ্রমণের উদ্দেশ্য ইহারা জানে না। ইহারা যায়—পাঁচটা জিনিস ক্রয় করিতে ও নানাপ্রকার লোক ও দৃশ্য দর্শন করিতে। তাই বলি—তীর্থভ্রমণ করিতে হইবে না! নিজ ঘরে বসিয়া সমুদয় তীর্থের কাজ হইবে। তোমার শরীর ও ইন্দ্রিয় দেবপ্রকৃতির হইলে,

তুমি যাঁহাকে ডাকিবে, সেই দেবতাই তোমার নিকট আসিবেন। খুব দৃঢ়তার সহিত সাধনে অগ্রসর হও। খুব জোর—খুব জোর—দিবারাত্র ইষ্টমন্ত্রের জপ, ধ্যান, মোক্ষশাস্ত্রাধ্যয়ন ও সৎসঙ্গ কর এবং ফলকামনাবিহীন হইয়া সৎকার্য্য কর—তোমার নিশ্চয়ই ইষ্টদেবতার সহিত সাক্ষাৎকার হইবে। তাহাহইলেই জীবন কৃতার্থ হইবে।

সমাধিসিদ্ধিরীশ্বরপ্রণিধানাৎ ॥ ৪৫ ॥

ঈশ্বরপ্রণিধান হইতে সমাধিসিদ্ধি হয়।

ঈশ্বরপ্রণিধান অর্থে ঈশ্বরে সর্ব্বকর্ম্মার্পণ, ঈশ্বরে সর্ব্বভাবার্পণ। সমুদয় কর্ম্ম, সমুদয় ভাব ঈশ্বরে অর্পণ করিয়া, ফলকামনাশূন্য হইয়া তাঁহার একান্ত শরণাপন্ন হইবে। তদ্ভাবে ভাবিত হইয়া, ঈশ্বরময়চিত্ত হইয়া যাইবে। ঈশ্বরে তন্ময়ভাব প্রাপ্ত হইলে, তোমার সমাধিসিদ্ধি হইবে।

সঙ্গই আমাদের উন্নতি ও অবনতির কারণ। সর্ব্বদা যাহার সঙ্গ করিব, তাহার ভাবে ভাবান্বিত হইব। সর্ব্বদা ঈশ্বরের সঙ্গ করিলে, তাঁহাতে আমাদের সমুদয় ভাব মিশাইয়া দিলে, আমরা ঐশ্বরিক ভাবে ভাবান্বিত হইব। স্থূলবিষয়ের সঙ্গ করিলে, আমাদের মন স্থূলবিষয়ে আকৃষ্ট হইয়া, প্রবৃত্তিপথে ধাবিত হইয়া অধোগতি প্রাপ্ত হইবে; আবার সূক্ষ্মবিষয়ের সঙ্গ করিলে, মন স্থূলবিষয় ত্যাগ করিয়া অর্থাৎ প্রবৃত্তিপথ ত্যাগ করিয়া নিবৃত্তিমার্গে বিচরণ করিবে ও উন্নতিলাভ করিবে। আমরা যতই স্থূল ত্যাগ করিয়া সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর ও সূক্ষ্মতম বিষয় ধ্যান করিব, ততই ক্রমশঃ আমাদের অধিকতর ও অধিকতম উন্নতি হইবে। ঈশ্বরতত্ত্ব সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্মতত্ত্ব, সুতরাং ঈশ্বরে সমুদয় ভাব অর্পণ করিয়া তাঁহার ধ্যান করিতে পারিলে আমরা শীঘ্রই সমাধি প্রাপ্ত হইব। সমাধিসিদ্ধি

হইলে আমরা একস্থানে বসিয়া দেশদেশান্তরের সমুদয় সংবাদ প্রাপ্ত হইব। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সমুদয় বিষয় জানিতে পারিব। সাধন করিতে করিতে এইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত না হইলে সাধন বৃথা। দৃঢ়তার সহিত সাধন কর—কত অদ্ভুত অলৌকিক বিষয় দেখিতে পাইবে ও জানিতে পারিবে—জগতের ইটকাঠ, বাগানবাড়ী বা টাকাকড়ি তাহার নিকট অতি তুচ্ছ ও হেয়। সাধন কর—রত্নপ্রাপ্ত হইবে, সুবর্ণখণ্ড পায়ে ঠেলিয়া তুমি মাটীর ঢেলা আঁচলে বাঁধিতেছ। তুমি অন্ধ, তাই মাটীর ঢেলাকেই উচ্চসম্পদ্ মনে করিয়াছ। সাধন কর—তোমার চক্ষু উন্মীলিত হইবে, তখন বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে পারিবে। B. A. বা M. A. পাশ করিলে এ চক্ষু ফুটিবে না। ঋষি-প্রদর্শিত সাধন ভিন্ন—এ চক্ষু ফুটিবে না। তুমি B. A. বা M. A. যতই পাশ কর না কেন—তুমি লক্ষপতি হও না কেন ;—তুমি যে অন্ধ, সেই অন্ধই থাকিয়া যাইবে !

স্থিরসুখমাসনম্ ॥ ৪৬ ॥

স্থিরভাবে ও সুখে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত উপবেশন করাকে আসন বলে।

আসনসিদ্ধ না হইলে ধারণা, ধ্যান, সমাধি কিছুই হইবে না। আসনসিদ্ধ হইলে, শরীর স্থির হয় এবং শরীর স্থির হইলে, চিত্ত স্থির হয়। আবার চিত্ত স্থির হইলেও শরীর স্থির হয়, অতএব উভয় দিক্ হইতে সাধন করিবে। চিত্তস্থির করিবার জন্য যোগের অন্যান্য অঙ্গ সাধন করিবে এবং শরীর স্থির করিবার জন্য আসন অভ্যাস করিবে। চিত্তের সহিত শারীরিক কার্য্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। চিত্তে যে ভাবের উদয় হয়, শরীরে সেইভাব প্রকাশ পায়। চিত্তে ক্রোধের উদয় হইলে শরীরের একপ্রকার সংস্থান হয় এবং ক্ষমার উদয় হইলে

অন্যপ্রকার সংস্থান হয়, সুতরাং চিত্তের ভাবানুযায়ী শরীরের সংস্থানের পরিবর্ত্তন হয়। আবার শরীরের বিশেষ বিশেষ সংস্থান অর্থাৎ আসন অভ্যস্ত হইলে, আমাদের চিত্তের ভাব পরিবর্ত্তিত হয়। শরীরের যে যে প্রকার সংস্থান অভ্যস্ত হইলে চিত্তে উচ্চ ভাবের উদয় হয়, তাহাই যোগসম্পর্কীয় আসন। যোগের অনুকূল আসনে অভ্যস্ত হইলে চিত্তে নীচ ভাবের উদয় হয় না, পরন্তু শুদ্ধভাবের স্ফুরণ হয়। এইজন্য শরীরের স্থিরতা চিত্তস্থিরতার সাহায্য করে এবং চিত্ত স্থির করিলে শরীর স্থিরতার সাহায্য হয়। চিত্ত স্থির করিতে পারিলে প্রাণবায়ুও স্থির হয় এবং আপনা আপনি কুম্ভক হয়।

আসন দুই প্রকার। (১) যাহার উপর আমরা উপবেশন করি এবং (২) দেহকে যেরূপভাবে উপবেশন করাই। প্রথমে কুশাসন, তাহার উপর মৃগচর্ম্ম ও তাহার উপর কোমল কার্পাসনির্ম্মিত বস্ত্র বিছাইলে উত্তম আসন হয়। নিরাসনে বসিয়া সাধনার কোন কার্য্য করিতে নাই। মাটীর উপর শয়ন বা উপবেশন করিলে, পৃথিবী আমাদের শক্তি হরণ করেন। সুতরাং বিনা আসনে কোন ধর্ম্মকার্য্য করিবে না। আসনে উপবেশন করিলে পার্থিব আকর্ষণ আর কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না। দ্বিতীয় আসন—এই দেহকে কৌশলবিশেষে সংস্থাপন। দেহসম্বন্ধে বহুপ্রকার আসন আছে। যেরূপ আসন অভ্যস্ত হইলে যাহার শরীর নিশ্চল হয় ও সুখবোধ হয়, সেইরূপ আসনই তাহার পক্ষে হিতকর। অধিকাংশ সাধকের পক্ষে মুক্তপদ্মাসন খুব ভাল। এই আসন যত অল্প বয়স হইতে অভ্যাস হয়, ততই ভাল। অধিক বয়সে আসন অভ্যাস হয় না, কারণ তখন পায়ের হাড় মোটা হইয়া যায় ও হাঁটু মুড়িতে অত্যন্ত কষ্টবোধ হয়। যে কোন আসনই কর না কেন—মেরুদণ্ড ঠিক সোজাভাবে রাখিয়া উপবেশন করিতে হইবে। এই মেরুদণ্ডের মধ্যে সুষুম্না নাড়ী আছে। এই নাড়ীপথ

দিয়া শক্তি ঊর্দ্ধে উঠে। এই মেরুদণ্ড গুহ্যদ্বার হইতে আরম্ভ করিয়া মস্তকের নিম্নভাগে আসিয়া শেষ হইয়াছে। এই গুহ্যদ্বারের নিকট হইতে কুণ্ডলিনী শক্তি ঊর্দ্ধে উঠিয়া মস্তকের মধ্যে সহস্রার পর্য্যন্ত যায়। সাধক সাধনদ্বারা যতই উন্নতিলাভ করিবেন, এই শক্তি ততই ঊর্দ্ধে উঠিবে। চিত্ত যত পরিষ্কার ও স্থির হইবে—এই শক্তি তত ঊর্দ্ধে উঠিবে। বিষয়াসক্তি কমিয়া বৈরাগ্য যতই বর্দ্ধিত হইবে, এই শক্তি ততই ঊর্দ্ধে উঠিবে। যাহার শক্তি যত ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে, সে তত উন্নতিলাভ করিয়াছে। মেরুদণ্ড সোজা থাকিলে, সুষুম্নাও সোজা থাকে, বাঁকিয়া থাকিলে সুষুম্নাও বাঁকিয়া যায়। যাহারা সর্ব্বদা পিঠ কুঁজা করিয়া বসে, তাহাদের শিরদাঁড়া বাঁকিয়া যায়। পিঠ কুঁজা করিয়া বসিয়া লেখাপড়া করা ভাল নয়। ছেলেদের শিরদাঁড়া বড় কোমল। ছোট ছোট ছেলেদের শিরদাঁড়া যাহাতে বাঁকিয়া না যায়, সে বিষয় সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিবে। ছেলের ছয় মাস বয়স হইতে না হইতে, অনেকে ছেলেকে বসাইবার জন্য চেষ্টা করে। ইহাতে তাহাদের সেই কোমল শিরদাঁড়া বাঁকিয়া যায় এবং চিরকালের জন্য তাহারা কষ্টভোগ করে। অতি অল্পবয়স্ক কচি কচি ছেলেদের অনেকে কোলে করিয়া লইয়া বেড়ায় ইহাও অত্যন্ত খারাপ অভ্যাস। ছেলেদের শিরদাঁড়া শক্ত না হইলে, আমোদ করিবার জন্য তাহাদিগকে লইয়া এরূপ অভ্যাস করাইও না। অসময়ে এইরূপ কদভ্যাসের কুফল তাহারা যাবজ্জীবন ভোগ করে। এই কদভ্যাসের জন্য ভবিষ্যৎ জীবনে তাহারা ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর কঠিন পীড়াগ্রস্ত হয়, এমন কি ইহার ফলে পক্ষাঘাত পর্য্যন্তও হয়। নল সোজা থাকিলে যেমন তাহার মধ্য দিয়া জল সহজে যাতায়াত করিতে পারে, সেইরূপ সুষুম্না সোজা থাকিলে শক্তি তাহার মধ্যে সহজে যাতায়াত করিতে পারে। যাহাদের সুষুম্না বক্র তাহারা উচ্চ ভাবনা বা উচ্চ ধারণা করিতে পারে না—তাহাদের সমাধি হয় না।

সুষুম্না যত সোজা থাকিবে, উচ্চ ধারণা ও সমাধির তত সুবিধা হইবে। সেইজন্য আসন করিতে বসিয়া মেরুদণ্ড সোজা রাখিবে। পদ্মাসন করিতে হইলে, বাম উরুর উপর দক্ষিণ চরণ ও দক্ষিণ উরুর উপর বাম চরণ রাখিয়া মেরুদণ্ডকে সরলভাবে রাখিয়া উপবেশন করিবে। এক চরণ উরুর উপরে ও অপর চরণ উরুর নিম্নে রাখিলে বীরাসন হয়। সর্ব্বপ্রকার আসন বর্ণনা করা এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে। যাহাদের কৌতূহল হইবে, তাহারা অন্য গ্রন্থ দেখিয়া লইবে। তবে গুরুর উপদেশানুযায়ী এইসকল বিষয় শিক্ষা করা খুব ভাল। আসনসিদ্ধ হইলে, দেহ স্থির হয়। দেহ স্থির হইলে, চিত্ত স্থির হয়। প্রথম প্রথম অভ্যাসে বড় কষ্টবোধ হয়—পরে অভ্যস্ত হইলে সুখানুভব হয়। যাহারা সর্ব্বদা হাত পা নাড়ায় এবং চঞ্চল, তাহাদের শীঘ্র আসন অভ্যাস হয় না। আসনে বসিয়া ইষ্টধ্যান করিলে, আসন শীঘ্র ও সহজে অভ্যাস হয়। যেমন আসন অভ্যস্ত হইয়া দেহ স্থির হইলে চিত্ত স্থির হয়, তেমনই চিত্ত স্থির অভ্যাস করিলে দেহও স্থির হয়।

প্রযত্নশৈথিল্যানন্তসমাপত্তিভ্যাম্ ॥ ৪৭ ॥

প্রযত্নশৈথিল্য ও অনন্তসমাপত্তিদ্বারা আসনসিদ্ধ হয়।

প্রযত্নশৈথিল্য অর্থাৎ আমাদের শরীরের স্বাভাবিক চেষ্টাদির শিথিলতা অর্থাৎ শরীরকে মড়ার মত অবশভাবে রাখা। আসন করিতে বসিয়া হাত, পা এইপ্রকারে অবশভাবে ছাড়িয়া দিবে ও তৎসঙ্গে ইষ্টাদি কোন অনন্ত বিষয়ের ধ্যান করিবে। এইপ্রকার করিলে শীঘ্র আসনসিদ্ধি হয়। এইরূপ করিতে করিতে ক্রমশঃ শরীর লঘু বোধ হইবে ও অবশেষে শূন্যবৎ বোধ হইবে। সাধক যেন শরীর নহেন, সাধক যেন অনন্ত আকাশের সহিত মিশিয়া গিয়াছেন—এইরূপ বোধ হইবে।

তততা দ্বন্দ্বানভিঘাতঃ ॥ ৪৮ ॥

আসন জয় হইলে শীতোষ্ণ, ক্ষুধা তৃষ্ণা প্রভৃতি দ্বন্দ্বের দ্বারা চিত্ত আর অভিভূত হয় না।

তস্মিন্ সতি শ্বাসপ্রশ্বাসয়োর্গতিবিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ ॥ ৪৯ ॥

আসনজয় হইলে শ্বাসপ্রশ্বাসের যে গতিবিচ্ছেদ হয়, তাহা প্রাণায়াম।

প্রাণায়াম=প্রাণের আয়াম অর্থাৎ প্রাণশক্তি বিরাম বা বিশ্রাম। প্রাণশক্তির কার্য্য দিবারাত্র চলিতেছে। এই প্রাণশক্তিকে বিশ্রাম দান করাই প্রাণায়াম। আমাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সর্ব্বদা কার্য্য করিলে, সর্ব্বদা চঞ্চল থাকিলে, আমাদের দুঃখের কারণ হয়। এই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কার্য্য হইতে বিশ্রাম পাইলে আমাদের সুখ হয়। যতক্ষণ শরীর চঞ্চল থাকে, ততক্ষণ চিত্তও চঞ্চল থাকে। শরীর স্থির হইলে চিত্তও স্থির হয়। যতক্ষণ প্রাণ চঞ্চল থাকে, ততক্ষণ চিত্তও চঞ্চল থাকে, প্রাণ স্থির করিলে চিত্তও স্থির হয়। চিত্তস্থিরতাই আমাদের সাধনের উদ্দেশ্য। ধ্যানের দ্বারা চিত্ত প্রধানতঃ স্থির থাকে। শরীরের স্থিরতা দ্বারা ও প্রাণের স্থিরতা দ্বারা চিত্তস্থিরতার সাহায্য হয়। শরীর ও প্রাণের স্থিরতার সহিত চিত্তস্থিরতার নিকটসম্বন্ধ। এইজন্য একটীর স্থিরতা, অপর দুইটীর স্থিরতার সাহায্য করে। শরীর ও চিত্ত স্থির করিতে অভ্যাস করিলে প্রাণ আপনিই স্থির হইয়া আসে। আসন ও চিত্ত সম্যক্ স্থির হইলে প্রাণের গতির বিচ্ছেদ হয় অর্থাৎ অনবরত ২৪ ঘণ্টা প্রাণের যে গতি হইতেছিল, তাহার বিচ্ছেদ অর্থাৎ বিরাম হয়; —অনবরত আমাদের যে শ্বাসপ্রশ্বাসকার্য্য চলিতেছিল, এক্ষণে

সেই শ্বাসপ্রশ্বাস অনবরত হয় না। মধ্যে মধ্যে তাহাদের কার্য্য বন্ধ হয়। সাধারণ অবস্থায় আমরা দিবারাত্র শ্বাসপ্রশ্বাস লইয়া থাকি, কিন্তু সাধকেরা শ্বাস প্রশ্বাস এবং অধিকন্তু কুম্ভক লইয়া থাকেন। প্রাণের বিশ্রাম হইলেই কুম্ভক হয়। কুম্ভক হইলে চিত্ত স্থির হয়। আবার চিত্ত স্থির হইলে কুম্ভক হয়। চিত্ত স্থির করিয়া কুম্ভক হয়, আবার কুম্ভক করিয়াও চিত্ত স্থির হয়। চিত্ত স্থির করা কার্য্যটা আভ্যন্তর সাধনা, আর বাহিরে নাক টিপিয়া বায়ু স্থির করা কার্য্যটা বাহিরের সাধনা। অনেকে চিত্ত স্থির না করিয়া—বাহিরে নাক টিপিয়া কুম্ভক সাধনা করে। তাহাদের সাধনার প্রকৃষ্ট ফল হয় না। চিত্ত চঞ্চল হইয়া চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে থাকে, আর চিত্তের এইরূপ চঞ্চল অবস্থায় সাধক নাক টিপিয়া কুম্ভক অভ্যাস করিতে থাকে; ইহাতে নানাপ্রকার দুরারোগ্য পীড়ার সৃষ্টি হয়। ইহাতে অনেকে হৃৎপিণ্ডপীড়া ভোগ করে—অনেকে আবার উন্মাদ হয়। অনেক অশিক্ষিত ও হিতাহিতবিচারশূন্য গুরু অনধিকারী শিষ্যকে প্রাণায়ামের উপদেশ দিয়া, তাহার ইহকালের সুখশান্তি নষ্ট করিয়াছে। এরূপ দৃষ্টান্ত আমি অনেকস্থলে দেখিয়াছি। এরূপ অনেক হৃৎপিণ্ডপীড়াগ্রস্ত ও উন্মাদ রোগী আমার কাছে চিকিৎসার্থ আসিয়াছে। প্রাণায়াম ছেলেখেলার জিনিস নহে। পুস্তক পাঠ করিয়া বা অশিক্ষিত গুরুর নিকট প্রাণায়াম শিক্ষা করিও না—উৎসন্ন যাইবে। পরকালের কিছুই হইবে না অধিকন্তু ইহকালের অবশিষ্ট জীবন হাঁপানি ও বুক ধড়ফড়ানি লইয়া দিবারাত্র ব্যতিব্যস্ত হইবে। অধিকাংশ কুলগুরু এবং সন্ন্যাসবেশধারী ভণ্ড গুরু প্রাণায়াম বিষয়ে কিছুই জানে না। শিষ্যের অর্থশোষণ করিবার জন্য ইহারা শিষ্যদিগকে প্রাণায়াম শিক্ষা দেয়। ইহারা কেবল ৪ বার পূরক, ১৬ বার কুম্ভক ও ৮ বার রেচকের কথামাত্র জানে—আর কিছুই জানে না। প্রাণায়াম কাহাকে বলে? ইহার

উদ্দেশ্যই বা কি? প্রাণায়ামকালে কোন কোন শারীর যন্ত্রে কি কি প্রকার কার্য্য হয়? প্রাণায়ামের দ্বারা শরীর বা মনের উপর কিরূপ ক্রিয়া হয়?—এইসকল ভণ্ড তপস্বী কিছুই জানে না। এইসকল প্রতারকের হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করা বড়ই দুষ্কর। ইহারা পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের অধিক অনিষ্টসাধন করে, কারণ স্ত্রীলোকেরা প্রায়ই দুর্ব্বলহৃদয়া এবং অত্যন্ত ভক্তিমতী। পুস্তক পাঠ করিয়া বা অশিক্ষিত গুরুর নিকট হইতে প্রাণায়াম শিক্ষা করিবে না।

প্রাণশক্তিকে সংযত করার নাম প্রাণায়াম। আমাদিগের প্রাণশক্তি অসংযত। প্রাণশক্তিকে সচরাচর প্রাণবায়ু বলে। যে বায়ু নিশ্বাস প্রশ্বাসের সহিত প্রবাহিত হয়, তাহা প্রাণবায়ু বা প্রাণশক্তি নহে। যে বায়ু নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করে, তাহা সাধারণ বায়ু। তবে প্রাণশক্তি কি এই বায়ুর মধ্যে নিহিত আছে?—না, তাহাও নহে। প্রাণশক্তি আমাদের শরীরের মধ্যে আছে। সাধারণ লোকে এই বায়ুকেই প্রাণশক্তি মনে করে। প্রাণশক্তি দ্বারা আমাদের বক্ষঃস্থল (ফুস্‌ফুস্) প্রসারিত হইলে, বাহিরের বায়ু নাসিকা দিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ লাভ করে এবং বক্ষঃস্থল সঙ্কুচিত হইলে ভিতরকার বায়ু নাসিকা দিয়া বাহির হইয়া যায়। যেমন কামারের হাপোরের ভিতর বায়ু প্রবেশ করে আবার তাহা হইতে নির্গত হয়, যেমন হারমোনিয়ামের মধ্যে এক পথ দিয়া বায়ু প্রবেশ করে আবার স্বরযন্ত্র পথ দিয়া বাহির হয়, তেমনি আমাদের বক্ষঃস্থলে বায়ু প্রবেশ করিতেছে ও বাহির হইতেছে। বক্ষঃস্থলের কতকগুলি মাংসপেশীর সঙ্কোচন ও প্রসারণে, বক্ষঃস্থল সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হইতেছে; সুতরাং বলিতে হইবে যে, এই সকল মাংসপেশী শ্বাসপ্রশ্বাসের কর্ত্তা; কিন্তু এই সকল মাংসপেশীও আবার শ্বাসপ্রশ্বাসের কর্ত্তা নহে। এই সকল মাংসপেশী যে সকল

স্নায়ু দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে—সেই সকল স্নায়ুর আদেশ ব্যতীত বক্ষঃস্থল সঙ্কুচিত বা প্রসারিত হইবে না। এই সকল স্নায়ু কাটিয়া দিয়া—যদি ঐ মাংসপেশীর সহিত সম্বন্ধবিহীন করা যায়, তাহা হইলে, ঐ সকল মাংসপেশীর আর কোন ক্ষমতা থাকে না এবং বক্ষঃস্থলও সঙ্কুচিত বা প্রসারিত হয় না, সুতরাং শ্বাসপ্রশ্বাসও বন্ধ হইয়া যায়। আবার ঐ সকল স্নায়ু মেডুলা অবলঙ্গেটা (Medulla Oblongata) নামক স্নায়ুগুচ্ছবিশেষ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সুতরাং মেডুলাই উহাদের কর্ত্তা। এই মেডুলা হইতে শ্বাসপ্রশ্বাস নিয়ন্ত্রিত হয়। যদি কোন কারণে মেডুলার কোন বিকার উপস্থিত হয়, তাহা হইলে, শ্বাসপ্রশ্বাসেরও বিকার উপস্থিত হয়। মেরুদণ্ডের মধ্যে যে মজ্জা আছে তাহাকে কশেরুকা মজ্জা (Spinal Cord) বলে এবং মাথার মধ্যে মস্তিষ্ক (Brain) আছে। এই মস্তিষ্ক ও কশেরুকা মজ্জার সহিত যে স্থলে মিলন হইয়াছে, সেই স্থানের নিকট মেডুলা অবলঙ্গেটা অবস্থিত। এই স্থানটী ঠিক মাথার নিম্নে ও ঘাড়ের পশ্চাৎদিকে। এই মেডুলাও শ্বাস প্রশ্বাসের হর্ত্তা কর্ত্তা নহে। মস্তিষ্কের অভ্যন্তরস্থ কোন অংশ এই মেডুলার কার্য্যের উপর কর্তৃত্ব করে, সুতরাং মস্তিষ্কের সেই অংশটী শ্বাসপ্রশ্বাসক্রিয়ার হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা। মস্তিষ্কের সেই অংশটী প্রাণশক্তির বাসা। প্রাণশক্তি সেইস্থানে বসবাস করিয়া আমাদের সমুদয় শারীর যন্ত্র পরিচালিত করিতেছে। প্রাণশক্তি এক, কেবল বিভিন্ন কার্য্যানুযায়ী, ইহাকে প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান নামে অভিহিত করা হয়। এই প্রাণশক্তিই দর্শনশক্তি, এই প্রাণশক্তিই শ্রবণশক্তি, এই প্রাণশক্তিই আঘ্রাণ, আস্বাদন ও স্পর্শনশক্তি। এই প্রাণশক্তির সাহায্যেই পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয় চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ কার্য্য করিতে সমর্থ হয়। এই প্রাণশক্তি দ্বারাই পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয় বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও

উপস্থ কার্য্য করিতে সমর্থ হয়। এই প্রাণশক্তির সাহায্যেই আমাদের ভুক্ত পদার্থের পরিপাক হয়। এই প্রাণশক্তির সাহায্যেই সেই পরিপক ভুক্ত অন্ন হইতে রক্ত প্রস্তুত হয়। এই প্রাণশক্তির সাহায্যেই বিষ্ঠা, মূত্র ও ঘর্ম্মাদি মল শরীর হইতে নিঃসৃত হয়। এই প্রাণশক্তির সাহায্যেই যকৃত পিত্তরস প্রস্তুত করে এবং মূত্রযন্ত্র মূত্র প্রস্তুত করে। আমাদের শরীরের যাবতীয় কার্য্য এই প্রাণশক্তির সাহায্যেই হয়। স্বাভাবিক অবস্থায় আমাদের দশটী ইন্দ্রিয় ও মন অসংযতভাবে কার্য্য করিতেছে। সাধন করিয়া ইহাদের সংযত না করিলে চিত্ত স্থির হয় না। এই জন্য সমুদয় শরীরকে সংযত করিতে হয়। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্; হস্ত, পদ, বাক্, পায়ু ও উপস্থ প্রভৃতি সমুদয় ইন্দ্রিয়কে সংযত করিতে হয়। মনকে সংযত করিতে হয় এবং প্রাণকেও সংযত করিতে হয়। প্রাণের এই মূল ও আদি বাসস্থান মস্তিষ্কের অভ্যন্তরস্থ অংশ বিশেষ। সেই অংশ টির নাম চিত্ত। চিত্ত মস্তিষ্কের ধূসর অংশের (Grey Matter) মধ্যে সূক্ষ্মভাবে নিহিত আছে। চিত্ত সংযত করিলে শরীরের সমুদয় কার্য্যেরই সংযম করা হয়। আমরা ধ্যানদ্বারা অভ্যন্তরের চিত্ত সংযত করি এবং বাহিরের চেষ্টা দ্বারা বাহিরের ইন্দ্রিয়গুলিকেও সংযত করি। এইরূপ ভিতর হইতে এবং বাহির হইতে—দুই দিক্ হইতে সংযম করিলে, আমরা শীঘ্র সফলতা লাভ করি। যেমন একটী বৃক্ষের মূলদেশ কর্ত্তন করিলে সমুদয় বৃক্ষটীকে ধ্বংস করা যায়, সেই-রূপ চিত্ত পূর্ণভাবে সংযত হইলে আমাদের শরীরের সমুদয় কার্য্য সংযত হয়। যেমন একটী বৃহৎ বৃক্ষের শাখাগুলি অগ্রে কর্ত্তন করিয়া বৃক্ষের মূলচ্ছেদন করিলে, সেই বৃক্ষটীকে সহজে ধ্বংস করা যায়; সেইরূপ প্রাণশক্তির শাখাপ্রশাখা ইন্দ্রিয়দিগকে সংযত করিয়া চিত্ত সংযম করিলে আমাদের উদ্দেশ্য শীঘ্র ও সহজে সিদ্ধ হয়। বাহিরের দিকে

ইন্দ্রিয়াদির সংযম এবং ভিতরে চিত্তসংযম, এই উভয় সংযম এক সঙ্গেই করিতে হয়। শুদ্ধ বাহিরের শরীর ও ইন্দ্রিয়াদির সংযম করিয়া সেই সঙ্গে চিত্ত সংযত না করিলে আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। বরং চিত্তসংযম করিয়া—বাহিরের ইন্দ্রিয়াদি সংযত না করিলেও বিশেষ ক্ষতি নাই; কিন্তু বাহিরের ইন্দ্রিয়াদির সংযম করিয়া চিত্ত-সংযম না করিলে কোনও ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না। চিত্তসংযম বা চিত্ত-স্থিরতাই সাধনার প্রধান লক্ষ্য। এইরূপ প্রাণশক্তির সংযমকে প্রাণায়াম বলে। প্রাণশক্তি সংযত হইলে, প্রাণশক্তির উপর আমাদের আধিপত্য চলে। আমরা প্রাণশক্তিকে আমাদের আবশ্যকানুযায়ী চালাইতে পারি। এই প্রাণশক্তির কার্য্যবিচ্ছেদ করিতে পারিলেই শ্বাসপ্রশ্বাসের গতিবিচ্ছেদ হয়, কারণ শ্বাসপ্রশ্বাস এই প্রাণশক্তির উপর নির্ভর করিতেছে।

নাসিকার ভিতর দিয়া শ্বাসবায়ু গ্রহণকে "পূরক", ত্যাগকে "রেচক" এবং ইহাদের গতিবিচ্ছেদ অর্থাৎ পূরকের পর রেচক না করিয়া নিশ্বাস বন্ধ করাকে, অথবা রেচকের পর পূরক না করিয়া নিশ্বাস বন্ধ করিয়া রাখাকে "কুম্ভক" বলে। একটী "পূরকান্ত কুম্ভক", অপরটী "রেচকান্ত কুম্ভক"। এই কুম্ভককে গতিবিচ্ছেদ বলে।

বাহিরে যেমন শ্বাসপ্রশ্বাসের গতিবিচ্ছেদ করিতে হয়, অভ্যন্তরেও সেইরূপ চিত্তের গতিবিচ্ছেদ করিতে হয়। চিত্তের গতিবিচ্ছেদ কাহাকে বলে? চিত্ত সর্ব্বদা চঞ্চল। চিত্তের সেই চঞ্চলতাই চিত্তের গতি। যেমন শ্বাসপ্রশ্বাস স্থির হইলে প্রাণশক্তির গতিবিচ্ছেদ হয়, সেইরূপ চিত্তচঞ্চলতা দূর হইয়া চিত্ত স্থির হইলেই চিত্তের গতিবিচ্ছেদ হয়। চিত্ত-স্থিরতাই চিত্তের গতিবিচ্ছেদ। সুতরাং যে সময় কুম্ভক হইবে, অভ্যন্তরেও যেন সেই সময়ে চিত্ত সম্পূর্ণ স্থির থাকে। এই প্রাণশক্তিই চিত্তকে চঞ্চল করে; সুতরাং চিত্ত স্থির করাও যা, প্রাণশক্তি স্থির

করাও তাই। বাহিরে কুম্ভকদ্বারা প্রাণশক্তি স্থির করা যায় এবং ভিতরে চিত্ত স্থির করিয়া ঐ প্রাণশক্তিকে স্থির করিতে হয়। জ্যোতি প্রভৃতি ধ্যানের বিষয়ে চিত্তকে স্থির রাখিতে হইবে অথবা চিত্তকে একেবারে শূন্যবৎ রাখিতে হইবে। কুম্ভকের সময় যদি চিত্তে চঞ্চলতা থাকে অর্থাৎ চিত্ত নানাদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়, নানাপ্রকার চিন্তা আসিয়া চিত্তকে আক্রমণ করে, তাহাহইলে কোন সুফল হইবে না, বরং তাহাতে অনিষ্টেরই সম্ভাবনা। এইজন্য বাহিরেও যেমন কুম্ভক করিবে, অভ্যন্তরেও সেইরূপ চিত্তকে সম্পূর্ণ স্থির রাখিবে। তাহাহইলেই যোগাঙ্গ প্রাণায়াম হইল। প্রাণশক্তিকে উভয়দিক হইতে স্থির করিতে হইবে। এইজন্য প্রথমতঃ আসন স্থির করিতে হয়, তাহাহইলে, শরীর স্থির হয়, তৎপরে ধ্যান অভ্যাসদ্বারা মনস্থির করিতে হয়। শরীর ও মন স্থির করিয়া তৎপরে কুম্ভক অভ্যাস করিতে হয়। শরীর ও মন স্থির না করিয়া কুম্ভক অভ্যাস করিলে অনিষ্ট হয়। মনের চাঞ্চল্যাবস্থায় কখনও কুম্ভক অভ্যাস করিও না। সাধারণ লোকে এই বিষয়ে বড়ই ভুল করে। তাহারা মনে করে, যে কোন উপায়ে কুম্ভক করিয়া অনেকক্ষণ থাকিতে পারিলেই সর্ব্বসিদ্ধি হইবে; কিন্তু চিত্তস্থির না করিয়া কুম্ভক করিলে অনিষ্ট হয়। এইকারণে যাহারা সংসারী এবং বিষয়ী, যাহাদের চিত্ত নানাপ্রকার বিষয় চিন্তায় বিব্রত থাকে, তাহাদের কুম্ভক করা উচিত নহে। যাহারা লোকের নিকট বাহাদুরী পাইবার জন্য কুম্ভক শিক্ষা করে, তাহাদের কথা স্বতন্ত্র; তাহারা যাহা ইচ্ছা করুক, কিন্তু যাঁহারা ত্রিতাপে তাপিত হইয়া, বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া, বিষয়ে আসক্তিহীন হইয়াছেন, যাঁহাদের চিত্ত নানাপ্রকার ভোগবিলাসের জন্য দৌড়াদৌড়ি করে না, তাঁহাদের চিত্তস্থির করা কঠিন নয়। এই প্রকার সাধকেরা চিত্ত স্থির রাখিয়া কুম্ভক অভ্যাস করিলে প্রভূত সুফল প্রাপ্ত হন।

প্রথম সাধকের পক্ষে আসন করিবার সহিত "নাড়ীশুদ্ধি" করিতে হয়। নাড়ীশুদ্ধি কাহাকে বলে? আমাদের মেরুদণ্ডের মধ্যে তিনটী নাড়ী আছে,—ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না। ইহারা আধ্যাত্মিক নাড়ী। আধিভৌতিক নাড়ী নহে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান আধিভৌতিক লইয়া ব্যবহার করিতেছে। আধিভৌতিক তত্ত্ব স্থূলতত্ত্ব। আধিভৌতিক জ্ঞান আধিভৌতিক যন্ত্রসাহায্যে হয়। আধিভৌতিক যন্ত্রসাহায্যে আধ্যাত্মিক জ্ঞান হয় না। আধ্যাত্মিক যন্ত্রসাহায্যে আধ্যাত্মিক জ্ঞান হয়। আধিভৌতিক যন্ত্রসাহায্যে স্থূলের জ্ঞান হয়, সূক্ষ্মের জ্ঞান হয় না। আধ্যাত্মিক যন্ত্রসাহায্যে সূক্ষ্মের জ্ঞান হয়। আধ্যাত্মিক যন্ত্র ব্যতীত সূক্ষ্মজ্ঞান হইতে পারে না। আধিভৌতিক উপকরণে আধ্যাত্মিক যন্ত্রও প্রস্তুত করা যায় না। এই আধ্যাত্মিক যন্ত্র যোগসাহায্যে আধ্যাত্মিক দেশে করিতে হয়। এই আধ্যাত্মিক যন্ত্র প্রস্তুত করিতে হইলে, অষ্টাঙ্গযোগ সাধন করিতে হয়। অষ্টাঙ্গযোগ সাধন করিলে, এই আধ্যাত্মিক যন্ত্র প্রস্তুত হয়। যন্ত্রের অপর নাম করণ বা ইন্দ্রিয়, এই আভ্যন্তরিক যন্ত্রের নাম অন্তঃকরণ। আমাদের বাহিরের পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয় স্থূল উপাদান দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে, এইজন্য তাহাদের দ্বারা স্থূলবস্তুবিষয়ক জ্ঞান হইতে পারে। চক্ষুর্দ্বারা স্থূলরূপের জ্ঞান হইতে পারে; কিন্তু তদ্দ্বারা সূক্ষ্মরূপ বা রূপতন্মাত্রের জ্ঞান হয় না। কর্ণদ্বারা স্থূলশব্দের জ্ঞান হইতে পারে; কিন্তু তদ্দ্বারা সূক্ষ্মশব্দ বা শব্দতন্মাত্রের জ্ঞান হয় না। নাসিকাদ্বারা স্থূলগন্ধের জ্ঞান হইতে পারে; কিন্তু তদ্দ্বারা সূক্ষ্মগন্ধ বা গন্ধতন্মাত্রের জ্ঞান হয় না। জিহ্বা দ্বারা স্থূল রসজ্ঞান হইতে পারে; কিন্তু তদ্দ্বারা সূক্ষ্মরস বা রসতন্মাত্রের জ্ঞান হয় না। স্থূল চক্ষু ও কর্ণাদি দ্বারা স্থূল রূপ ও শব্দাদির জ্ঞান হয়। সূক্ষ্ম রূপ ও শব্দাদির জ্ঞান হইতে হইলে সূক্ষ্ম চক্ষু ও কর্ণাদি আবশ্যক। রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ ও স্পর্শকে বিষয় বলে। টাকাকড়ি, ঘরবাড়ীকে.

বিষয় বলে না। বাহিরে যে সকল দ্রব্য আমরা দেখিতে পাই, তাহাদের এক অংশ দেখিতে পাই, শুদ্ধ তাহাদের রূপাংশ দেখিতে পাই— চক্ষুদ্বারা শুদ্ধ তাহাদের রূপভাগ গ্রহণ হয়। স্থূলচক্ষু শুদ্ধ তাহাদের স্থূলরূপ গ্রহণ করিতে পারে। চক্ষুদ্বারা শব্দ, স্পর্শ বা রসাদি অপর জ্ঞান হয় না। মনে কর তুমি একটী সন্দেশ দেখিলে, চক্ষুদ্বারা তোমার সেই সন্দেশের রূপভাগমাত্রের জ্ঞান হইল, কিন্তু শব্দ বা স্পর্শাদি অপর জ্ঞান হইল না। পরে তুমি সন্দেশটী স্পর্শ করিলে, তোমার স্পর্শজ্ঞান হইল। পরে তুমি সন্দেশটী নাসিকা দ্বারা আঘ্রাণ করিলে তোমার গন্ধজ্ঞান হইল। পরে তুমি সন্দেশটী জিহ্বায় সংলগ্ন করিলে তোমার রসজ্ঞান হইল। এই প্রকারে তুমি পাঁচটী স্থূল জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাহায্যে—সেই সন্দেশটীর পাঁচটী স্থূল জ্ঞানমাত্র প্রাপ্ত হইলে। ইহাতে দ্রব্যটীর সব জানা হইল না—দ্রব্যটীর সূক্ষ্ম অংশ জানা হইল না; সুতরাং দ্রব্যটীর পূর্ণজ্ঞান হইল না। প্রত্যেক দ্রব্যের সূক্ষ্মজ্ঞানই প্রধান জ্ঞান—সূক্ষ্মজ্ঞানই সত্যজ্ঞান। স্থূলজ্ঞান, সত্যজ্ঞান নহে। স্থূলজ্ঞান—ভ্রান্তিজ্ঞান; সূক্ষ্মজ্ঞানই দ্রব্যটীর মূল অবস্থার বা প্রকৃত আদিম অবস্থার জ্ঞান, আর স্থূলজ্ঞান কেবল সেই দ্রব্যটীর পরিণামজ্ঞান। দ্রব্য পরিণাম প্রাপ্ত হইলে বিকৃত হয়। দ্রব্যের বিকৃতজ্ঞান—সত্যজ্ঞান নহে। তাহা বিকৃত বা অসত্য জ্ঞান। জলজ্ঞান—মিথ্যাজ্ঞান। জল কতিপয় গ্যাসের (Gas) মিলনের পরিণাম মাত্র। গ্যাসের জ্ঞানই সত্যজ্ঞান। আমরা বাহ্য স্থূল ইন্দ্রিয়সাহায্যে যে জ্ঞান প্রাপ্ত হই, তাহা সত্যজ্ঞান নহে, তাহা মিথ্যাজ্ঞান। তাহা মূল দ্রব্যের মিলনজাত পরিণামজ্ঞান। যোগীরা তাঁহাদিগের সূক্ষ্মদর্শনদ্বারা দ্রব্যের প্রকৃত স্বরূপ দেখিতে পান। এই সূক্ষ্ম দর্শনশক্তি লাভ করিতে হইলে, অষ্টাঙ্গযোগ সাধন করিতে হয়। আমাদের শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধ্যাদির অশুদ্ধিক্ষয় হইলেই—আমাদের সূক্ষ্ম দর্শনশক্তি জন্মে।

প্রাণায়ামের পূর্ব্বে নাড়ীশুদ্ধি করিতে হয়। ইড়াদি সূক্ষ্ম নাড়ীর শুদ্ধিই নাড়ীশুদ্ধি। মেরুদণ্ডের মধ্যে এই সব নাড়ী আছে। যখন আসন অভ্যাস করিবে, সঙ্গে সঙ্গে নাড়ীশুদ্ধি করিবে। আসনে নিয়মমত উপবেশন করিয়া, প্রথমতঃ দক্ষিণ নাসিকা বন্ধ করিয়া বাম নাসিকাদ্বারা যথাশক্তি বায়ু টানিয়া লইবে। যতটা বেশী বায়ু টানিয়া লইতে পারি, ততই ভাল। তবে জোর করিয়া অত্যন্ত অধিক টানিতে যাইও না, তাহাতে অসুখ হইবে; সেইজন্য বলিলাম "যথাশক্তি" টানিবে। টানিয়া লইয়াই তৎক্ষণাৎ বাম নাসিকা বন্ধ করিয়া দক্ষিণ নাসিকাদ্বারা তাহা যথাশক্তি রেচন করিবে। পূরক করিয়া অব্যবহিত পরেই রেচক করিবে, মধ্যে কুম্ভক করিবে না। রেচক শেষ হইবার পর, তৎক্ষণাৎ দক্ষিণ নাসিকাদ্বারা পূরক করিবে এবং বাম নাসিকাদ্বারা রেচক করিবে। এইপ্রকার প্রত্যহ সহজে যতক্ষণ পার করিবে। পূরক ও রেচকের সময় বায়ু ধীরে ধীরে টানিবে ও ধীরে ধীরে ফেলিবে; যেন নাসিকারন্ধ্রের সম্মুখে তূলা ধরিলে, তাহা না নড়ে। আর বায়ু হঠাৎ একটানে তুলিবে না, বা একটানে ফেলিবে না। তুলিবার ও ফেলিবার সময় তালে তালে তুলিবে ও ফেলিবে। এইরূপ নাড়ীশুদ্ধির সময় অন্য কিছু চিন্তা করিবে না। শ্বাসপ্রশ্বাসে মন লাগাইয়া রাখিবে। শ্বাসপ্রশ্বাসের উপরেই চিত্তকে বসাইয়া রাখিবে। এইরূপে নাড়ীশুদ্ধি বহুদিন অভ্যাস করিলে আসন জয় হয়, শরীর লঘু হয়, তমোভাব কাটিয়া যায়, মনে আনন্দ হয়, উচ্চ বিষয় চিন্তা ও ধারণা করিবার শক্তি আসে, ও অন্যান্য নানাপ্রকার উপকার হয়—যাহা সাধনকালে জানিতে পারিবে। ইহাতে ফুস্‌ফুসের বলবৃদ্ধি হয় এবং ফুস্‌ফুস্ যন্ত্র প্রাণায়াম করিবার যোগ্যতা লাভ করে। নাড়ীশুদ্ধি সাধন করিবার সময়ে এই কয়টী বিষয় স্মরণ রাখিবে। (১) পূর্ণব্রহ্মচর্য্য পালন করা চাই,

(২) সাত্ত্বিক ও পরিমিত আহার চাই, (৩) নির্জ্জন ঘর চাই, (৪) গোপনে সাধন করা চাই, (৫) শরীরের কোন স্থানে আঁটিয়া কাপড় পরা থাকিবে না, (৬) ঘরটী উত্তম, বায়ুসঞ্চালনযুক্ত, পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন হওয়া চাই, (৭) উপযুক্ত আসনে উপবেশন করিবে, (৮) ধীরে ধীরে বায়ু টানিবে ও ফেলিবে, (৯) তালে তালে বায়ু টানিবে ও ফেলিবে, (১০) যথাশক্তি টানিবে ও ফেলিবে, (১১) সেই সময় মনকে শ্বাসপ্রশ্বাসের উপর একাগ্রভাবে রাখিবে, (১২) মনের মধ্যে বাহিরের কোনও চিন্তাকে স্থান দিবে না, (১৩) উদরমধ্যে যেন মল বা দূষিত বায়ু না থাকে। ব্রহ্মচর্য্যহীনেরা নাড়ীশুদ্ধি করিলে কঠিন পীড়াক্রান্ত হইবে। কুম্ভক অভ্যাসের পূর্ব্বে আসনস্থির, মনস্থির ও নাড়ীশুদ্ধি হইলে খুব ভাল হয়। আসনজয়, চিত্তস্থৈর্য্য ও প্রাণায়াম—এই তিনটীর পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে।

বাহ্যাভ্যন্তরস্তম্ভবৃত্তির্দেশকালসংখ্যাভিঃ পরিদৃষ্টো দীর্ঘসূক্ষ্মঃ ॥ ৫০ ॥

প্রাণায়াম,—বাহ্যবৃত্তি, আভ্যন্তরবৃত্তি ও স্তম্ভবৃত্তি। তাহারাও আবার দেশ, কাল ও সংখ্যার দ্বারা পরিদৃষ্ট হইয়া দীর্ঘ ও সূক্ষ্ম হয়।

প্রশ্বাসপূর্ব্বক বাহিরে প্রাণবায়ু ধারণ করিবার নাম বাহ্যবৃত্তিক প্রাণায়াম। শ্বাসগ্রহণপূর্ব্বক অভ্যন্তরে প্রাণবায়ু ধারণ করিবার নাম আভ্যন্তরবৃত্তিক প্রাণায়াম। নাড়ীশুদ্ধি উত্তমরূপে অভ্যাস হইলে পর এই বাহ্যবৃত্তিক ও আভ্যন্তরবৃত্তিক প্রাণায়াম বহুদিন অভ্যাস করিবে। বাহ্যবৃত্তি ও আভ্যন্তরবৃত্তি বহুদিন অভ্যস্ত হইলে স্তম্ভবৃত্তি সহজ হইবে। শ্বাসপ্রশ্বাস না করিয়া কতক পূরিত ও কতক রেচিত অবস্থায়—ফুসফুসের কার্য্যরোধ করার নাম স্তম্ভবৃত্তি। এই স্তম্ভবৃত্তি প্রথম প্রথম অল্প

সময়ব্যাপী হইবে; ক্রমশঃ সাধন সকলের পরিপক্বতার সহিত স্তম্ভবৃত্তিও বর্দ্ধিত হইবে। জোর করিয়া অত্যন্ত অধিককালব্যাপী স্তম্ভবৃত্তি করিতে যাইও না। দ্বিতলে উঠিতে হইলে, সিঁড়ির এক এক ধাপ করিয়া উঠিতে হয়। একেবারে লাফাইয়া উঠিতে গেলে অনিষ্ট হয়। সেইরূপ প্রত্যেক সাধনকার্য্য ধৈর্য্য ধরিয়া শাস্ত্রানুযায়ী করিয়া যাইবে। মনে রাখিবে, চিত্তস্থৈর্য্যই তোমার সকল সাধনের মুখ্য উদ্দেশ্য। সম্মুখে অনন্তকাল পড়িয়া আছে। এ জন্মে সিদ্ধি না হয় পরজন্মে হইবে। দেহ জীর্ণ হইয়া গিয়াছে—সাধনের বল নাই—তাই বলিয়া হতাশ হইও না। এঁদেহে সব সাধন না হয়—যাহা হয়, তাহাই করিবে—পুনশ্চ উপযুক্ত দেহ ধারণ করিয়া আবার সাধন চলিবে। "আমরা কতবার দেহধারণ করিয়াছি এবং সে সমস্ত পূর্ব্বদেহে কত অজ্ঞানের কার্য্য করিয়াছি—এবার নূতন দেহ পাইলে আর অজ্ঞানের কার্য্য করিব না"—মনে মনে এইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হও—তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হইবেই হইবে। ভগবান্ শ্রীগীতায় বলিতেছেন, "ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।" একবার ভগবানের প্রকৃত ভক্ত হইয়া যাও—আর বিনষ্ট হইবে না। শুধু মুখে ভক্ত নয়—অন্তরে ভক্ত হও।

বাহ্য, আভ্যন্তর ও স্তম্ভ এই তিন প্রাণায়ামবৃত্তি দেশ, কাল ও সংখ্যার দ্বারা পরিদৃষ্ট হইয়া ক্রমশঃ দীর্ঘ ও সূক্ষ্ম হয়।

দেশ পরিদর্শন। দেশ দুইপ্রকার,—বাহ্যদেশ ও আভ্যন্তরদেশ; আভ্যন্তরদেশকে আধ্যাত্মিকদেশও বলে। স্বাভাবিক প্রশ্বাসের সময় প্রশ্বাস বায়ু প্রায় নাসিকার ১২ অঙ্গুলি পর্য্যন্ত বাহিরে যায়; নাড়ীশুদ্ধি করিতে করিতে এই প্রশ্বাস বায়ু ক্রমশঃ ১২ অঙ্গুলি হইতে ১১ অঙ্গুলি, ক্রমশঃ ১০, ৯, ৮ অঙ্গুলি; এইরূপে সর্ব্বশেষে আর নাসিকার বাহিরে আসে না। নাসিকার ভিতরেই প্রশ্বাস বায়ুর শেষ হয়। এইরূপে প্রশ্বাস বায়ুর উপরে দৃষ্টি রাখিলে তাহাকে বাহ্যদেশ

পরিদর্শন বলে। আবার শ্বাস লইবার সময়, আমাদের শ্বাস বায়ু বক্ষঃস্থলকে পূর্ণ করে, তখন সেই বক্ষঃস্থলে হৃৎপ্রদেশ অনুভব করিতে হয়—ইহাকে আধ্যাত্মিকদেশ পরিদর্শন বলে। এইরূপভাবে দেশ পরিদর্শন করিলে শ্বাসপ্রশ্বাস সূক্ষ্ম ও দীর্ঘ হয় ও স্তম্ভবৃত্তি সহজ হয়।

কাল পরিদর্শন। বীজমন্ত্র জপ করিতে করিতে যে কাল স্থির রাখা তাহাকে কাল পরিদর্শন বলে। পূরকে ৪ বার, কুম্ভকে ১৬ বার ও রেচকে ৮ বার বীজমন্ত্র জপ করিবে; অথবা পূরকে ৬ বার, কুম্ভকে ২৪ বার ও রেচকে ১২ বার বীজমন্ত্র জপ করিবে। যাহার যেরূপ শক্তি, সে সেইরূপ জপ করিবে। পূরকে যতবার হইবে, কুম্ভকে তাহার চতুর্গুণ ও রেচকে তাহার দ্বিগুণসংখ্যক জপ হইবে। ইহাকে কাল পরিদর্শন বলে।

যথাশক্তি শুদ্ধ কুম্ভক অভ্যাসদ্বারাও প্রাণায়াম হয়। ইহা সকলের পক্ষেই সহজ, তবে ব্রহ্মচারী হওয়া চাই। কুম্ভকে সর্ব্বদা মন্ত্রজপ অভ্যাস করিবে। ইহাতে শ্বাসপ্রশ্বাসের সময়ের দিকে লক্ষ্য রাখিতে হয় না। তবে শ্বাসপ্রশ্বাস ধীরে ধীরে করিতে হইবে; বিশেষতঃ প্রশ্বাস অতি ধীরে ধীরে ত্যাগ করিবে। প্রত্যহ একই সময়ে অভ্যাস করিবে।

সংখ্যা পরিদর্শন। ইহা কাল পরিদর্শনেরই অনুরূপ, তবে ইহাতে জপের সংখ্যা রাখিতে হয় না। ইহাতে শ্বাসপ্রশ্বাসের সংখ্যা রাখিতে হয়।

প্রথম অভ্যাসের সময় খুব সাবধানে অভ্যাস করিবে। পুস্তক পাঠ করিয়া অভ্যাস করা ভাল নয়। সদ্‌গুরুর উপদেশ লইয়া অভ্যাস করিবে। যথাশক্তি যতটুকু সহজে পার, ততটুকু পূরক, রেচক ও কুম্ভক করিবে। সাবধানে অল্পে অল্পে প্রাণায়ামের সংখ্যা ও কাল বর্দ্ধিত করিবে। এই প্রাণায়াম বহুদিন অভ্যাস করিতে করিতে দীর্ঘকাল-

ব্যাপী রেচক ও কুম্ভক করিতে পারা যায়, ইহাকে দীর্ঘ প্রাণায়াম বলে। ইহাতে ক্রমশঃ শ্বাসপ্রশ্বাস আর বাহিরে আসে না—নাসিকার অভ্যন্তরেই বহে এবং কুম্ভক করিতেও অধিক কষ্ট হয় না—ইহাকে সূক্ষ্ম প্রাণায়াম বলে।

বাহ্যাভ্যন্তরবিষয়াক্ষেপী চতুর্থঃ ॥ ৫১ ॥

বাহ্য ও আভ্যন্তর বিষয়াক্ষেপী চতুর্থ প্রাণায়াম।

পূর্ব্বসূত্রে যে প্রাণায়ামের কথা বলা হইয়াছে, তাহা বাহ্য ও আভ্যন্তর বিষয়ের পরিদর্শনের সহিত করিতে বলা হইয়াছে, তাহাতে বাহ্য ও আভ্যন্তর বিষয় দেশ, কাল ও সংখ্যাদ্বারা পরিদর্শন করিতে হয় অর্থাৎ দেশ, কাল ও সংখ্যার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া করিতে হয়. এইরূপ দেশ, কাল ও সংখ্যার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বহুদিন প্রাণায়াম করিতে করিতে সেই প্রাণায়ামে এরূপ অভ্যস্ত হওয়া যায়, যে পরে আর দেশ, কাল ও সংখ্যার প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়াও আপনা আপনি সেই প্রাণায়াম সাধিত হয়। ইহাকেই বিষয়াক্ষেপী চতুর্থ প্রাণায়াম বলে। বিষয়াক্ষেপী অর্থাৎ বিষয়কে আক্ষিপ্ত করা হইয়াছে বা অতিক্রম করা হইয়াছে। যে কোন প্রকার প্রাণায়ামই কর না কেন, অগ্রে ধ্যান অভ্যাস করিবে। ধ্যানের সহিত প্রাণায়াম না করিলে নানাপ্রকার পীড়াগ্রস্ত হইবে। যাহাদের চিত্ত অত্যন্ত চঞ্চল, তাহাদের প্রাণায়াম করা উচিত নহে। যোগের অন্যান্য অঙ্গ উত্তমরূপে সাধন করিতে করিতে চিত্তের চঞ্চলতা কমিয়া যায়। হৃদয়মধ্যে জ্যোতি ভাবনা করিতে পার বা শূন্যবৎ ভাবনা করিতে পার। শূন্যবৎ ভাবনাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধ্যান। চিত্তস্থৈর্য্যই আমাদের মূল উদ্দেশ্য। চিত্তলয়ই সাধনার মুখ্য উদ্দেশ্য। শুদ্ধ প্রাণরোধ করিতে পারিলেই যোগসাধন হইল না।

অনেকে প্রাণরোধপূর্ব্বক মৃত্তিকামধ্যে প্রোথিত হইয়া কয়েক দিবস থাকিলেও মরে না। ইহারা লোককে বাজী দেখাইয়া অর্থ উপার্জ্জন করে। ইহাদের প্রাণায়াম যোগাঙ্গভূত প্রাণায়াম নহে। ইহাঁদের প্রাণরোধসহ চিত্ত রুদ্ধ হয় না। যে প্রাণরোধের সহিত চিত্তও রুদ্ধ হয়, তাহাই যোগাঙ্গভূত প্রাণায়াম চিত্তের সংস্কারক্ষয় ও চিত্তের স্থৈর্য্যই যোগাঙ্গভূত প্রাণায়ামের লক্ষ্য।

ততঃ ক্ষীয়তে প্রকাশাবরণম্ ॥ ৫২ ॥

তাহা হইতে প্রকাশাবরণ ক্ষীণ হয়।

প্রাণায়াম হইতে প্রকাশের আবরণ ক্ষীণ হয় (প্রকাশ—সত্ত্ব, আবরণ —তম); শরীর ও ইন্দ্রিয়াদির জাড্যভাব কাটিয়া যায়। শরীরের অলসতা কাটিয়া যায়। নিদ্রা ও তন্দ্রা প্রভৃতি তামসিক গুণের কার্য্য কমিয়া যায়। অল্প নিদ্রাতেও কোন কষ্ট হয় না। শরীর কার্য্যপটু হয়। মনের মোহভাব বিদূরিত হয়, বুদ্ধি পরিষ্কৃত হয়। সুবিচার করিবার ক্ষমতা হয়। বিবেকের উদয় হয়। বিবেকের আবরণ, অবিবেক কাটিয়া যায় এবং বিবেক উদিত হয়। বিবেকের উদয় হইলে আমাদের তত্ত্বজ্ঞান হয়: বিষয়ের ভ্রান্তিজ্ঞান বা মিথ্যাজ্ঞান দূর হইয়া যায় এবং সত্যজ্ঞানোদয় হয়। তত্ত্বজ্ঞানই সত্যজ্ঞান। আমাদের স্বাভাবিকজ্ঞান, মিথ্যাজ্ঞান। মিথ্যাজ্ঞান বা অজ্ঞান কাটিয়া যায় এবং জ্ঞানের উদয় হয়। ইহাই প্রকৃতজ্ঞান। B. A. বা M. A. পাশ দিয়া জ্ঞান হয় না; কতকগুলি পুস্তক পাঠ মাত্র হয়।

আবরণ অর্থাৎ ময়লা। স্বর্ণাদি ধাতুতে মল বা খাদ মিশ্রিত থাকিলে তাহার উজ্জ্বল আভা আবৃত হইয়া মলিন দেখায় এবং তাহাকে দগ্ধ করিলে খাদ দগ্ধ হয় এবং সেই স্বর্ণে পূর্ব্বের উজ্জ্বলতা প্রকাশ পায়।

সেইরূপ আমাদের বিবেক, মোহের আবরণে আবৃত হইয়া অপ্রকাশিত আছে—প্রাণায়ামদ্বারা সেই মোহাবরণ কাটিয়া যায়—প্রাণায়াম সেই প্রকাশের আবরণকে ক্ষয় করে। প্রাণায়ামদ্বারা আমাদের শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধ্যাদির অশুদ্ধি কাটিয়া গিয়া বিশুদ্ধভাব ধারণ করে। ইহারা বিশুদ্ধ হইলে, ইহাদের শক্তি বৰ্দ্ধিত হয়। স্বাভাবিক অবস্থায় আমাদের ইন্দ্রিয়াদির মলিনতা থাকে বলিয়া ইহারা দুৰ্ব্বল। এই ময়লা কাটিয়া গেলে ইহারা সবল হয়, তখন বিষয়ের সূক্ষ্ম উপাদান দর্শন করিবার ক্ষমতা জন্মে। তখন সূক্ষ্মদর্শনশক্তি জন্মে। তখন দূরদর্শন ও দূরশ্রবণের শক্তি জন্মে। তখন রূপতন্মাত্র ও রসতন্মাত্রাদি দর্শন করিবার সামর্থ্য জন্মে। যতক্ষণ ময়লা থাকিবে ততক্ষণ এই দর্শনশক্তি হইবে না। প্রাণায়ামের দ্বারা এই ময়লা পরিষ্কার হয় ও সমুদয় আধ্যাত্মিক সূক্ষ্মতত্ত্বের দর্শন হয়।

ধারণাসু চ যোগ্যতা মনসঃ ॥ ৫৩ ॥

ধারণা সকলে মনের যোগ্যতা হয়।

ধারণা অর্থাৎ ধরিয়া রাখা। একটী বিষয় মনের মধ্যে একাগ্রভাবে অনেকক্ষণ ধরিয়া রাখিতে পারিলে, তাহাকে ধারণা বলে। একাগ্রভাবে একঘণ্টা যদি নাম জপ করিতে পার, তাহাহইলে, সেই একঘণ্টার জন্ম তোমার মনে সেই নামকে ধরিয়া রাখা হইল। এইরূপ একাগ্রভাবে ধরিয়া রাখা বড় কঠিন। প্রথম প্রথম সাধকেরা ৫ মিনিটকালও একাগ্রভাবে জপ করিতে পারে না। জপ করিতে গেলেই মনের মধ্যে আলু কাঁচকলা উঠিয়া সেই একাগ্রতাকে ভাঙ্গিয়া দেয়। এইরূপ জপ ভাঙ্গে কেন? মন দুৰ্ব্বল বলিয়া ভাঙ্গে। মন দুৰ্ব্বল কেন? মনের মধ্যে ময়লা আছে বলিয়া। ময়লা কি?

কাম, ক্রোধ, হিংসা ও দ্বেষ প্রভৃতি। এই ময়লা আছে বলিয়া মন দুর্ব্বল এবং দুর্ব্বল মনে ধারণার যোগ্যতা নাই। মন সবল হইলে তবে ধারণার যোগ্যতা লাভ করে। প্রাণায়ামদ্বারা এই ময়লা কাটিয়া যায়—তখন মন সবল হয় এবং মন সবল ও বিশুদ্ধ হইলে সেই মনে ধারণার যোগ্যতা হয়। আগে ধারণা, পরে ধ্যান, পরে সমাধি। সমাধিই আমাদের লক্ষ্য। এইজন্য ধ্যানের সহিত প্রাণায়াম করিতে হয়। শুদ্ধ প্রাণায়াম করিলে প্রকৃষ্ট ফল হয় না।

স্ববিষয়াসম্প্রয়োগে চিত্তস্য স্বরূপানুকার ইবেন্দ্রিয়াণাং প্রত্যাহারঃ ॥ ৫৪ ॥

স্ব স্ব বিষয়ে অসম্প্রয়োগে ইন্দ্রিয়গণের যে চিত্তের স্বরূপানুকার তাহাই প্রত্যাহার।

ইন্দ্রিয়গণের নিজ নিজ বিষয়ে অসম্প্রয়োগে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণের যখন শব্দস্পর্শাদি বিষয়ে সংযোগের অভাব হয় এবং তাহারা চিত্তাকার-বিশিষ্ট হয়, তখন তাহাকে প্রত্যাহার বলে। ইন্দ্রিয়েরা বিষয়ে সংযুক্ত হয় কেন? কাহার ইচ্ছায়?—চিত্তের ইচ্ছানুযায়ী ইন্দ্রিয় বিষয়ে সংযুক্ত হয়। মন রূপ দেখিবার ইচ্ছা করিলে, চক্ষু রূপে সংযুক্ত হয়। মন শব্দ শুনিবার ইচ্ছা করিলে, কর্ণ শব্দে সংযুক্ত হয়। মন ইচ্ছা না করিলে চক্ষু বা কর্ণ, তাহাদের বিষয়ে সংযুক্ত হয় না—তখন বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়গণের সংযোগাভাব হয়। মন এক সময়ে একটীমাত্র ইন্দ্রিয়কেই বিষয়ে সংযুক্ত করিতে পারে। অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের তখন বিষয়ের সহিত সংযোগাভাব হয়। মন যখন চক্ষুদ্বারা একাগ্রভাবে রূপ দর্শন করে, তখন কর্ণাদি অপর চারিটী ইন্দ্রিয়ের বিষয়সংযোগাভাব হয়। আবার মন যখন কর্ণদ্বারা একাগ্রভাবে

শব্দ শ্রবণ করে, তখন চক্ষুরাদি অপর চারিটী ইন্দ্রিয়ের বিষয়সংযোগাভাব হয় অর্থাৎ অপর ইন্দ্রিয়গুলি তাহাদের কার্য্য হইতে বিরত থাকে অর্থাৎ অপর ইন্দ্রিয়গুলি নিষ্কর্ম্মা থাকে। এইরূপে সমুদয় ইন্দ্রিয়ের নৈষ্কর্ম্ম্যাবস্থাপ্রাপ্তি হইলেই প্রত্যাহার সাধিত হয়। মনকে চিত্তের মধ্যে কোন উচ্চ বিষয়ের ধ্যানে নিযুক্ত রাখিলে, ইন্দ্রিয়গণ নৈষ্কর্ম্ম্যাবস্থা প্রাপ্ত হয়। তখন চিত্তে ইন্দ্রিয়গণের লয় হয়। তখন ইন্দ্রিয়গণ চিত্তের স্বরূপ হইয়া যায়। ইহাদের পৃথক্ কোন কার্য্য থাকে না। চিত্তে ধারণাশক্তি হইলে আমরা যে কোন বিষয় চিত্তে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত একাগ্রভাবে চিন্তা বা ধ্যান করিতে সমর্থ হই; সুতরাং তখন ইন্দ্রিয়গণেরও কার্য্যাভাব হয়। চিত্তের ইচ্ছাতেই ইন্দ্রিয়গণ কার্য্য করে। ইন্দ্রিয়গণের এই বিষয় হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করাকে প্রত্যাহার বলে।

প্রত্যাহার বাহির হইতেও সাধিত হয় এবং ভিতর হইতেও সাধন করা যায়। বাহির হইতে যে প্রত্যাহার সাধিত হয়, তাহা পাকা হয় না; তাহা কাঁচা প্রত্যাহার। বাহির হইতে প্রত্যাহারসাধন এইরূপ—মনে কর, কোন রূপ তোমার সম্মুখে আসিল—তুমি চক্ষু বন্ধ করিয়া সেই রূপ দর্শন হইতে নিবৃত্ত হইলে, কিম্বা সেই স্থান ত্যাগ করিয়া সেই রূপ দর্শন হইতে বিরত হইলে, ইহাকে বাহির হইতে প্রত্যাহার সাধন বলে। ইহাকে কাঁচা সাধন বলে। আর চিত্তমধ্যে কোন বিষয়ের ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া যে প্রত্যাহার হয়, তাহা পাকা প্রত্যাহার। কাঁচা প্রত্যাহার ভাঙ্গিয়া যায়—পাকা প্রত্যাহার ভাঙ্গে না। প্রাণায়াম দ্বারা এই পাকা প্রত্যাহার সাধিত হয়।

ততঃ পরমাবশ্যতেন্দ্রিয়াণাম্ ॥ ৫৫ ॥

সেই প্রত্যাহার হইতে ইন্দ্রিয়গণের পরমা বশ্যতা অর্থাৎ পরাজয় হয়।

চিত্ত আধ্যাত্মিক বিষয়ে মগ্ন হইয়া একাগ্র হইলে, ইন্দ্রিয়গণের বিষয়প্রবৃত্তি লোপ পায়, তাহাদের আর বিষয়ের সহিত সংযোগ হয় না। ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রিয়জয়। শুদ্ধ বাহির হইতে জোর করিয়া ইন্দ্রিয়জয়কে, পাকা ইন্দ্রিয়জয় বলে না। পরমা বশ্যতা হইলে চিত্ত বিষয়ের আলোচনা করে না এবং ইন্দ্রিয়গণও বিষয়ে ধাবিত হয় না। তখন তাহারা স্বরূপে অবস্থান করে।

সাধন-পাদ সমাপ্ত।

বিভূতি-পাদঃ।

দেশবন্ধশ্চিত্তস্য ধারণা ॥ ১ ॥

বাহ্য বা আভ্যন্তর কোন দেশে বদ্ধ হওয়াই চিত্তের ধারণা।

যোগের আটটী অঙ্গ। তাই যোগকে অষ্টাঙ্গযোগ বলে। যথা:—(১) যম, (২) নিয়ম, (৩) আসন, (৪) প্রাণায়াম ও (৫) প্রত্যাহার—এই পাঁচটী বহিরঙ্গ সাধনা; আর (৬) ধারণা, (৭) ধ্যান এবং (৮) সমাধি—এই তিনটী অন্তরঙ্গ সাধনা। সাধন পাদে বহিরঙ্গ সাধনার বিষয় বলা হইয়াছে, এক্ষণে বিভূতি পাদে অন্তরঙ্গ সাধনার কথা বলা হইবে।

ধারণা অর্থে চিত্তকে একস্থানে ধরিয়া রাখা অর্থাৎ চিত্তমধ্যে একটীমাত্র বিষয় চিন্তা করা। চিত্তে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত একটীমাত্র বিষয় চিন্তা করিতে পারিলে অর্থাৎ তখন অন্য কোন বিষয়ের চিন্তা চিত্তে উদিত না হইলে, তাহাকে ধারণা বলে। চিত্ত রূপ চিন্তা করিতে করিতে অল্পক্ষণ পরেই যদি রস চিন্তা করে, বা শব্দ, স্পর্শ বা গন্ধ চিন্তা করে, তাহাহইলে, চিত্ত একদেশে বদ্ধ হইল না, তাহাহইলে, ধারণা হইল না। ধারণা না হইলে ধ্যান বা সমাধি হইবে না। আগে ধারণা, তারপর ধ্যান, তারপর সমাধি। অতএব চিত্ত যখন নানা-বিষয়ে ছুটাছুটী না করিয়া একটীমাত্র বিষয়ে বদ্ধ হয়, তখন তাহাকে ধারণা বলে। প্রত্যাহার সাধন ভালরূপ হইলে, তবে ধারণা হয়। প্রত্যাহার সাধনদ্বারা যখন চিত্ত একটীমাত্র বিষয় লইয়া থাকিতে পারে ও অপরাপর ইন্দ্রিয়ের বিষয় গ্রহণ না করে এবং ইন্দ্রিয়েরাও যখন পূর্ব্বের মত বিষয়ে ঝাঁপাইয়া না পড়ে, তখন ধারণা অভ্যাসের সুবিধা হয়। এইজন্য প্রত্যাহার সাধন খুব ভাল করিয়া করিতে হয়।

আমরা চিত্তকে বাহ্য বা আভ্যন্তর যে কোন দেশে বদ্ধ করিতে পারি। বাহ্যদেশ যথা,—দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি বা সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্রাদি বা বৃক্ষ, প্রস্তরাদি কোন প্রাকৃতিক বাহ্যবিষয়। আভ্যন্তর দেশ যথা,—নাভিতে, হৃদয়ে, কণ্ঠমধ্যে, বক্ষঃস্থলে, জিহ্বাগ্রে, নাসিকাগ্রে, ভ্রূমধ্যে বা মূর্দ্ধস্থ জ্যোতিঃপদার্থে।

ধারণা, ধ্যান ও সমাধি সাধনদ্বারা চিত্তসংযম হয় ও নানাপ্রকার সিদ্ধির উদয় হয়। যে কোন একটী বিষয়ে চিত্তকে স্থির করিতে পারিলে, অপর বিষয়েও চিত্ত স্থির করা যায়। চিত্তস্থিরতাই সাধনের মূল উদ্দেশ্য। চিত্ত সর্ব্বদাই চঞ্চল। এই চঞ্চলতার কারণ—হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতি চিত্তের মলিনতা। চিত্তের মলিনতা বিদূরিত হইলেই চিত্ত স্থির হয় এবং তখন ধারণাও সহজে হয়।

সচরাচর কোন দেবমূর্ত্তি বা শব্দ বা জ্যোতিতে ধারণা করাই সহজ উপায়। নির্জ্জন উপাসনাগৃহে উত্তর বা পূর্ব্বমুখ হইয়া আসনে স্থির হইয়া বসিবে; পরে তোমার চক্ষুর ঠিক সম্মুখে একটু দূরে তোমার ইষ্টদেব বা দেবীর মূর্ত্তি স্থাপন করিবে এবং একদৃষ্টে তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকিবে। ইহাকে "ত্রাটকযোগ" বলে। যতক্ষণ চক্ষুতে বিশেষ কষ্টবোধ না হয়, ততক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিবে। যথাশক্তি দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া চাহিয়া থাকিবে। অত্যন্ত জোর করিয়া ও অত্যন্ত অধিকক্ষণ চাহিবে না। তাহাহইলে চক্ষুর পীড়া হইবে। কেহ কেহ বলেন, যতক্ষণ না চক্ষু হইতে জল পড়ে ততক্ষণ চাহিবে; কিন্তু এখনকার অধিকাংশ ছেলেই ফেন খাইয়া মানুষ হইয়াছে, তাহাদের স্বাস্থ্য ভাল নহে, এইজন্য তাহারা অতটা বাড়াবাড়ি করিলে চক্ষু হারাইবে। অতএব প্রাণায়াম যেমন যথাশক্তি ধীরে ধীরে বাড়াইতে হয়, তদ্রূপ ত্রাটকযোগও ধীরে ধীরে বাড়াইবে। যখন চাহিতে চাহিতে চক্ষু ক্লান্ত হইবে, তখন চক্ষু কিয়ৎক্ষণ বন্ধ করিয়া সেই মূর্ত্তির রূপ মনে মনে চিন্তা করিবে।

চক্ষু একটু বিশ্রাম পাইলে, আবার চক্ষু খুলিয়া ঐরূপে ত্রাটক সাধন করিবে। এইরূপে যে যতটা সময় পারে, তাহা করিবে। প্রথম প্রথম প্রাতঃকালে বা ঠাণ্ডার সময় এই ত্রাটক অভ্যাস করিবে। প্রত্যহ চক্ষু চাহিয়া চক্ষুতে শীতল ও পরিষ্কার জলের ঝাপ্টা মারিবে। প্রত্যহ ৫।৬ বার এইরূপ শীতল জলের ঝাপ্টা মারিবে এবং প্রত্যেকবার অন্ততঃ ২০ বার মারিবে। এইরূপ করিলে চক্ষুর বলবৃদ্ধি হইবে। ত্রাটক করিবার সময় মুদ্রাবিশেষ অবলম্বন করিলে ফল শীঘ্র শীঘ্র পাওয়া যায়। গুরুর নিকট এই মুদ্রা শিখিয়া লইবে। এইরূপ ত্রাটক করিতে করিতে জ্যোতির্দর্শনাদি অনেক সিদ্ধিলাভ হয়। যাহারা হিপ্‌নটিজম্ (Hypnotism) শিক্ষা করে; তাহারা ত্রাটক করে। তাহারা দেব বা দেবীমূর্ত্তির পরিবর্ত্তে, নিজের ঘরে আসনে বসিয়া সম্মুখে একখানি দর্পণ রাখে এবং তাহার মধ্যে নিজের প্রতিবিম্বিত চক্ষুর উপর দৃষ্টি স্থির করিয়া রাখে অর্থাৎ চক্ষে চক্ষে মিল করিয়া চাহিয়া থাকে। তাহারা হিপ্‌নটিজম্ সিদ্ধ হয় ও নানাপ্রকার সিদ্ধি পাইয়া লোকের নিকট পয়সা উপার্জ্জন করিয়া বেড়ায়। কিন্তু সাধনের পথ, বৈরাগ্যপথ। সাধক কামিনীকাঞ্চনত্যাগী—অতএব সাবধান! যেন সিদ্ধিলাভ করিয়া প্রলোভনে পতিত না হও! সাধন করিতে করিতে প্রত্যেক সাধকের সিদ্ধি আসিবেই আসিবে। সিদ্ধি প্রকাশ করিও না—গোপন করিয়া রাখিবে। সিদ্ধির বিষয় চিন্তাও করিবে না। সিদ্ধি প্রকাশ করিলে অহঙ্কার বাড়ে ও সাধনশক্তি ক্ষয় হইয়া যায়। স্মরণ রাখিবে যে, বিষয় অর্জ্জন তোমার লক্ষ্য নয়। বিষয় ত্যাগই তোমার লক্ষ্য। স্মরণ রাখিবে যে, পার্থিব বিষয়কে কাকবিষ্ঠার ন্যায় জ্ঞান করিতে না পারিলে তোমার মুক্তি হইবে না। বিষয়ে যতই আসক্তিহীন হইবে, ততই সাধনের সুবিধা হইবে। "বৈরাগ্য ও অভ্যাস" এই দুইটাকে ত্যাগ করিও না। ইহাদের দুইটাই আবশ্যক—একটীমাত্র হইলে হইবে না।

যাঁহারা শব্দযোগ অবলম্বন করে, তাহারা শব্দে চিত্ত স্থির করে। দুইটী কাণ আঙ্গুল দিয়া বুজাইলে, কাণের মধ্যে একপ্রকার ঝিঁ ঝিঁ শব্দ শুনা যায়। তাহারা একাগ্রমনে সেই শব্দ শুনিতে থাকে, আর অন্য কোন দিকে মন দেয় না। সেই ঝিঁ ঝিঁ শব্দটী স্থূলশব্দ, তাহার মধ্যে নানাপ্রকার সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর ও সূক্ষ্মতম শব্দ আছে। প্রত্যহ অভ্যাস করিতে করিতে অভ্যাস যতই গাঢ় হইবে, ততই এই সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতম শব্দগুলি শুনিতে পাইবে। চিঁ চিঁ শব্দ, শঙ্খধ্বনি, ঘণ্টাধ্বনি, করতালনাদ, মেঘগর্জ্জন প্রভৃতি সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর অনাহতনাদধ্বনি শ্রুতিগোচর হইবে। পরিশেষে শব্দের মানসিক ভাবমাত্র বর্ত্তমান থাকিবে। তাহাই বিন্দু।

তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্ ॥ ২ ॥

সেই দেশে প্রত্যয়ের অর্থাৎ জ্ঞানবৃত্তির যে একতানতা তাহাই ধ্যান।

খণ্ড খণ্ড জ্ঞানবৃত্তিকে ধারণা বলে আর অখণ্ড বা একতান জ্ঞানবৃত্তিকে ধ্যান বলে। ধারণা—জলবিন্দুর ন্যায় খণ্ড খণ্ড জ্ঞান, আর ধ্যান—তৈলধারার ন্যায় একস্রোতে প্রবাহিত, একতান বা অখণ্ড জ্ঞান। ধারণার অভ্যাস করিতে করিতে ধ্যান হয় এবং ধ্যানের অভ্যাস করিতে করিতে সমাধি হয়। চিত্তের চঞ্চলতার জন্য ধারণা খণ্ড খণ্ড হইয়া যায়। ধ্যানে চিত্তের চঞ্চলতা থাকে না। চিত্ত স্থির থাকে। ধ্যান হইলেই বুঝিবে চিত্ত স্থির হইয়াছে। চিত্তে কর্ম্মসংস্কার বা বিক্ষেপসংস্কার যত কম হইবে, ততই ধ্যানের সুবিধা হইবে। উক্ত সংস্কারই বিক্ষেপ আনয়ন করিয়া ধ্যান ও সমাধি ভঙ্গ করে। সুতরাং একদিকে অষ্টাঙ্গযোগদ্বারা চিত্তের সংস্কার ক্ষয় করিবে ও অন্যদিকে ধ্যান অভ্যাস করিবে।

তদেবার্থমাত্রনির্ভাসং স্বরূপশূন্যমিব সমাধিঃ ॥ ৩ ॥

ধ্যেয় বিষয়ের অর্থমাত্র নির্ভাস, স্বরূপশূন্যের ন্যায় ধ্যানই সমাধি।

জপ, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি সমস্তই এক জিনিস। অনবরত জপ করিতে করিতে জপ গাঢ় হইলেই ধারণা হয়। অনবরত ধারণা অভ্যাস করিতে করিতে ধারণা গাঢ় হইলেই ধ্যান হয়। অনবরত ধ্যান অভ্যাস করিতে করিতে ধ্যান গাঢ় হইলেই সমাধি হয়। জপ, ধারণা ও ধ্যানে দুই থাকে, সমাধিতে দুই থাকে না। ধ্যানে আমি থাকি ও আমার ধ্যানের ইষ্টদেব থাকেন; কিন্তু সমাধিতে আমিত্ব লয় পায়, তখন আত্মহারা হইয়া যাই; যখন আত্মহারা হই, তখন ধ্যানের বিষয়ে আমিত্ব মিশাইয়া যায়, তখন ধ্যেয় বিষয়মাত্রই নির্ভাস হয়, তখন ধ্যাতা ও ধ্যেয় পৃথক্ থাকে না, এক হইয়া যায়। এইটী চিত্তের সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্থৈর্য্যাবস্থা। এইটীই চিত্তের চরম স্থিরতা। ইহাকে সমাধি বলে। সমাধি ভিন্ন আত্মসাক্ষাৎকার হয় না।

ত্রয়মেকত্র সংযমঃ ॥ ৪ ॥

একটী বিষয়ের ধারণা, ধ্যান ও সমাধিকে সংযম বলে।

একটী বিষয়কে অবলম্বন করিয়া ধারণা, ধ্যান ও সমাধি পর পর অব্যাহতগতিতে সম্পন্ন হইলে তাহাকে সংযম বলে। সংযম বলিলে এই তিনটী কাজ পর পর একসঙ্গেই হয় বুঝিতে হইবে।

তজ্জয়াৎ প্রজ্ঞালোকঃ ॥ ৫ ॥

সংযমকে জয় করিলে প্রজ্ঞালোক হয়।

এই সংযম যখন পরিপক্ক হয় তখন জ্ঞানালোকের উদয় হয়। প্রজ্ঞালোক অর্থে প্রজ্ঞার আলোক অর্থাৎ সমাধিপ্রজ্ঞার আলোক। এই আলোক প্রকাশিত হইলে আমাদের অলৌকিক জ্ঞান ও শক্তি লাভ হয়। চিন্তনীয় বিষয়ে জানিবার যাহা কিছু আছে, তাহার সমুদয়ই আমরা পূর্ণরূপে জানিতে পারি। স্থূলদৃষ্টিতে বস্তুর একদেশমাত্রের জ্ঞান হয়; হয় রূপজ্ঞান হয়, নয় রসজ্ঞান হয়; কিন্তু সমাধিজাত সূক্ষ্মদৃষ্টিতে আমরা সেই বস্তুবিষয়ক সমুদয় জ্ঞানই লাভ করি। স্থূলদৃষ্টিতে আমরা কোন একটী লোকের বর্ত্তমান কার্য্যপ্রণালী দেখিয়া তাহার বর্ত্তমান আচার ব্যবহার দেখিয়া, তাহার সম্বন্ধে সামান্যমাত্র জানিতে পারি, কিন্তু সমাধিজাত সূক্ষ্মদৃষ্টিতে আমরা তাহার জীবনের সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হই। ইচ্ছা করিলেই যখন সংযম করা যাইবে—তখন সংযম জয় হইয়াছে, বুঝিতে হইবে।

তস্য ভূমিষু বিনিয়োগঃ ॥ ৬ ॥

নিম্ন হইতে ক্রমশঃ পর পর উচ্চভূমিসকলে সেই সংযমের বিনিয়োগ করিবে।

যাহারা নিম্নভূমির অধিকারী, তাহারা প্রথমতঃ নিম্নভূমিতে সংযম করিবে। তাহারা একেবারে উচ্চভূমিতে সংযম করিতে পারিবে না। যখন নিম্নভূমি জয় হইবে, তখন তাহারা উচ্চভূমিতে আরোহণ করিতে পারিবে। আর প্রথম হইতেই উচ্চভূমিতে সংযম করিবার চেষ্টা করিলে, কিছুই হইবে না। যেমন দ্বিতল গৃহে উপস্থিত হইতে হইলে,

সোপানাবলীর এক এক ধাপ করিয়া উঠিতে হয়, সর্ব্বাগ্রে নিম্ন ধাপ অবলম্বন করিয়া ক্রমে উচ্চ ধাপ অবলম্বন করিতে হয়, তেমনই সাধনার নিম্নভূমিসকল অতিক্রম না করিলে, উচ্চভূমি অধিকার করা যায় না। যাহারা সাকার সাধনার অধিকারী, তাহারা একেবারে নিরাকার সাধনা অবলম্বন করিলে—কিছুই হইবে না। এই হেতু যাহারা যে ভূমির অধিকারী তাহাদের সেই স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া, পর পর ভূমি জয় করিয়া উচ্চভূমির সাধনা করা কর্ত্তব্য। নিম্নের স্থূলভূমি জয় হইলেই, তাহারা সূক্ষ্মভূমিতে যাইতে পারিবে। সাধন করিতে করিতে সাধকের নিকট এই ভূমিসকল আপনা আপনিই প্রকাশিত হয়; অপর কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে হয় না। সাধক যতই জপ, ধারণা ও ধ্যানাদি উত্তমরূপে সাধন করিবেন, ততই উচ্চ, উচ্চতর ও উচ্চতম ভূমিসকল আপনা আপনিই তাঁহার নিকট প্রকাশিত হইবে এবং তিনি কাহাকেও জিজ্ঞাসা না করিয়া সেই সেই উচ্চভূমি অবলম্বন করিয়া ক্রমশঃ উৰ্দ্ধে উঠিবেন এবং পরিশেষে সর্ব্বোচ্চ সীমা আয়ত্ত হইবে। হে বৃদ্ধের দল! তোমাদের কোন ভয় নাই! হে বৃদ্ধার দল! তোমাদেরও কোন ভয় নাই! কপাল ঠুকিয়া—কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া যাও। সদ্‌গুরুর নিকট হইতে যে ইষ্টমন্ত্র পাইয়াছ, তাহা দিবারাত্র অর্থভাবনার সহিত জপ করিয়া যাও। দিবারাত্র জপ কর। জপ, জপ, জপ। ক্রমাগত জপ। অনবরত জপ। এই জপ হইতে আপনিই ধারণা, ধ্যান ও সমাধি হইবে। জপাৎ সিদ্ধি, জপাৎ সিদ্ধি, জপাৎ সিদ্ধি। খুব দৃঢ়তার সহিত জপ কর। খালি জপ, জপ, জপ। ধারণা কাহাকে বলে, তোমার জানিবার আবশ্যক নাই। ধ্যান কাহাকে বলে, তোমার জানিবার আবশ্যক নাই। সমাধি কাহাকে বলে, তোমার জানিবার আবশ্যক নাই। স্থূল কাহাকে বলে, তোমার জানিবার আবশ্যক নাই। সূক্ষ্ম কাহাকে বলে, তোমার জানিবার

আবশ্যক নাই। প্রকৃতির চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্ব তোমার জানিবার আবশ্যক নাই। জপই তোমার একমাত্র কার্য্য। দৃঢ় অধ্যবসায় সহকারে জপ কর আর অহিংসাদি ধর্ম্মগুলি পালন করিয়া যাও, তোমার চিত্ত পরিষ্কৃত হইবে, তোমার সংস্কারক্ষয় হইবে, তোমার চিত্ত একাগ্র হইবে, সমুদয় সূক্ষ্মসৃষ্টি তোমার নিকট আপনিই প্রকাশ পাইবে। জ্ঞানালোক আপনিই জ্বলিবে। তোমার পর পর কি কর্ত্তব্য, তাহা আপনিই ভিতর হইতে প্রকাশ পাইবে। মানুষের নিকট শিক্ষার আবশ্যক হইবে না। তুমি সকল মূর্খ অপেক্ষা অধিক মূর্খ হইলেও তোমার এই কঠোর সাধনার ফলস্বরূপ—তুমি চিরশান্তি লাভ করিবে এবং পণ্ডিত হইয়াও যদি কেহ সাধনবিহীন হয়, তাহার অপেক্ষাও তুমি উচ্চভূমি প্রাপ্ত হইবে।

ত্রয়মন্তরঙ্গং পূর্ব্বেভ্যঃ ॥ ৭ ॥

যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম ও প্রত্যাহার এই পাঁচটী পূর্ব্বোক্ত বহিরঙ্গ সাধনাপেক্ষা ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই তিনটী অন্তরঙ্গ।

বহিরঙ্গ সাধনা, শরীর ও ইন্দ্রিয়াদির মালিন্য অপগত করিয়া চিত্তকে বল দান করে। তখন চিত্ত, ধারণা, ধ্যান ও সমাধির যোগ্যতা লাভ করে। বহিরঙ্গ সাধনা ত্যাগ করিলে চিত্তের ধারণাদি করিবার যোগ্যতা হয় না। এইহেতু উত্তমরূপে যমাদি বহিরঙ্গ সাধন অভ্যাস করিবে, তাহাহইলে, সহজেই ধারণা, ধ্যান ও সমাধি হইবে। এই ধারণা, ধ্যান ও সমাধি হইতে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি হয় এবং সম্প্রজ্ঞাত সমাধির অভ্যাসে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি হয়। সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে বিষয় অবলম্বন থাকে। অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি নির্ব্বিষয়।

তদপি বহিরঙ্গং নির্বীজস্য ॥ ৮ ॥

ধারণা, ধ্যান ও সমাধি, সম্প্রজ্ঞাত বা সবীজ সমাধির অন্তরঙ্গ সাধন হইলেও ইহারা অসম্প্রজ্ঞাত বা নির্বীজ সমাধির বহিরঙ্গ।

যে সমাধিতে ধ্যানের বিষয় বা বীজ থাকে, তাহাকে সম্প্রজ্ঞাত বা সবীজ সমাধি বলে; আর যাহাতে ধ্যানের বিষয় থাকে না, তাহা অসম্প্রজ্ঞাত বা নির্বীজ সমাধি। এইজন্য ধারণা, ধ্যান ও সমাধি নির্বীজ সমাধির বহিরঙ্গ এবং কেবল পরবৈরাগ্যই নির্বীজ সমাধির অন্তরঙ্গ। সবীজ সাধন না করিলে নির্বীজ সাধন করা যায় না। যতক্ষণ কোনরূপ বিষয়ে একটুও আসক্তি থাকিবে অর্থাৎ যতক্ষণ বিষয়চিন্তা থাকিবে, ততক্ষণ সবীজ, আর যখন সম্পূর্ণরূপে বিষয়াসক্তিবিহীন হইবে অর্থাৎ কোনও প্রকার বিষয়ে একটুমাত্রও আসক্তি থাকিবে না— অর্থাৎ যখন পরবৈরাগ্য হইবে তখন নির্বীজ সমাধি।

ব্যুত্থাননিরোধসংস্কারয়োরভিভবপ্রাদুর্ভাবৌ নিরোধক্ষণচিত্তান্বয়ো নিরোধপরিণামঃ ॥ ৯ ॥

ব্যুত্থান সংস্কারের অভিভব (ধ্বংস) ও নিরোধ সংস্কারের প্রাদুর্ভাব (উৎপত্তি) হইলে প্রত্যেক নিরোধক্ষণে অর্থাৎ নিরোধসময়ে একই চিত্তে অন্বিত (যুক্ত) যে পরিণাম হয়, তাহাই চিত্তের নিরোধপরিণাম।

যতক্ষণ চিত্ত আছে, ততক্ষণ চিত্তের পরিণামও আছে। চিত্ত পরিণামবিহীন হইয়া থাকিতে পারে না; কারণ চিত্ত গুণত্রয়ে নির্ম্মিত। গুণত্রয় সর্ব্বদাই পরিণামশীল। গুণত্রয় একক্ষণও স্থির হইয়া থাকিতে পারে না। গুণত্রয় স্থির হইলেই সৃষ্টিনাশ হয়। তখন প্রলয় হয়। যতক্ষণ চিত্তের সম্পূর্ণ লয় না হইবে, ততক্ষণ চিত্তমধ্যে গুণত্রয়ের

কার্য্যও চলিবে। যেখানে কার্য্য, সেখানেই পরিণাম। কার্য্যের দ্বারা দ্রব্যের অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়। যেখানে কার্য্য, সেখানেই অবস্থার পরিবর্ত্তন। কার্য্য আছে, অথচ অবস্থার পরিবর্ত্তন নাই, এরূপ হইতে পারে না। জগতের সমুদয় দ্রব্যই ত্রিগুণে নির্ম্মিত; সুতরাং পরিণামী। আমাদের শরীরের মধ্যে প্রতিক্ষণে ত্রিগুণের কার্য্য চলিতেছে; সুতরাং প্রতিক্ষণে আমাদের শরীরের পরিবর্ত্তন হইতেছে। আজ প্রাতে ৬টার সময় তোমার যে শরীর আছে, ১ ঘণ্টা পরে অর্থাৎ ৭টার সময় তোমার আর সেই শরীর থাকিবে না। ৬টার সময় তোমার শরীরের যে আকার ও অবস্থা ছিল, ৭টার সময়ে তাহার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তোমার মাংসে, তোমার অস্থিতে, তোমার রক্তে ও অন্যান্য প্রত্যেক শারীরিক উপাদানে কিছু না কিছু পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। ৬টার সময় তোমার শরীরের যে আকার ও গঠন ছিল, ৭টার সময় তাহা নাই। এই একঘণ্টায় অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তবে এই অল্প সময়ের মধ্যে আমরা সেই পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতে পারি না। প্রতিক্ষণে এই পরিবর্ত্তন এত ধীরে ধীরে সাধিত হয় যে, তাহা আমাদের লক্ষ্যের মধ্যে আসে না। একটী তিন মাসের বালককে যদি প্রত্যহ দেখিতে পাই, তাহাহইলে, আমরা তাহার প্রাত্যহিক পরিবর্ত্তন দেখিতে পাই না, কিন্তু সেই তিন মাসের বালককে যদি দশ বৎসর পরে দেখি, তাহাহইলে, আমরা তাহার পরিবর্ত্তন স্পষ্ট বুঝিতে পারি। একটী তিন মাসের বালকের ফটো (Photo) আজ তুলিয়া রাখ এবং দশ বৎসর পরে তাহার আর একটী ফটো গ্রহণ কর। এই উভয় ফটোতে অনেক প্রভেদ দেখিতে পাইবে এবং এই প্রভেদ উৎপন্ন হইতে দশ বৎসর সময় লাগিয়াছে। এইরূপ বিচার করিলে আমরা বুঝিতে পারি যে, প্রতিক্ষণে আমাদের কি শারীরিক, কি ঐন্দ্রিয়িক, কি মানসিক ও কি চৈত্তিক সমুদয় স্থূল ও সূক্ষ্ম

শরীরের পরিবর্ত্তন হইতেছে। চিত্ত আমাদের সূক্ষ্ম শরীর—চিত্ত ত্রিগুণে নির্ম্মিত, এইজন্য চিত্তমধ্যেও প্রতিক্ষণে পরিণাম হইতেছে।

চিত্তমধ্যে সংস্কার আছে। সেই সংস্কার হইতে প্রত্যয় উৎপন্ন হয়। যাহা সংস্কার, তাহা প্রত্যয় নহে। সংস্কার ভাণ্ডারস্বরূপ এবং প্রত্যয় সেই ভাণ্ডারে সঞ্চিত দ্রব্য। সংস্কার থাকিলেই যে প্রত্যয় উঠিবে তাহার কোন কারণ নাই। তিন মাসের বালকের চিত্তমধ্যে কামের সংস্কার আছে, কিন্তু তিন মাস বয়সে তাহার সেই সংস্কার হইতে কামের প্রত্যয় উঠে না। তাহার বয়স যখন ১৭।১৮ বৎসর হইবে, তখন কামের প্রত্যয় উঠিবে। অতএব সংস্কার প্রত্যয় নহে। তোমার চিত্তে ক্রোধ উৎপন্ন হইতেছে, তুমি ক্রোধের অনুভব করিতেছ, তুমি বুঝিতে পারিতেছ যে তোমার মনে ক্রোধ হইয়াছে, তুমি বুঝিতে পারিতেছ যে তোমার মনে ক্রোধের সংস্কার আছে এবং সেই সংস্কার হইতে ক্রোধ উৎপন্ন হইয়াছে। ক্রোধ উৎপন্ন হইবার পর তুমি বুঝিতে পার যে তোমার চিত্তে ক্রোধের সংস্কার আছে। এই যে ক্রোধের উৎপত্তিজ্ঞান, ইহাকেই ক্রোধের প্রত্যয় বলে। ইহার নাম প্রত্যয়। তোমার মন হইতে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যয়ের উৎপত্তি হয়। তোমার চিত্তে কখনও ক্রোধের, কখনও লোভের, কখনও ক্ষমার, কখনও দয়ার, কখনও হিংসার, কখনও অহিংসার, কখনও সত্যের, কখনও মিথ্যার, কখনও স্তেয়ের, কখনও অস্তেয়ের ইত্যাদি নানাপ্রকার প্রত্যয় বা খণ্ডজ্ঞান উদিত হয় এবং তুমিও বুঝিতে পার যে, তোমার চিত্তে এইসকল সংস্কার সঞ্চিত আছে। চিত্তে ক্রোধের সংস্কার থাকিলে—ক্রোধপ্রত্যয় উঠে। চিত্তে ক্ষমার সংস্কার থাকিলে—ক্ষমাপ্রত্যয় উঠে। যাহার চিত্তে ক্রোধের সংস্কার আছে এবং সর্ব্বদা ক্রোধের প্রত্যয় উঠে, সে ক্ষমাগুণ অবলম্বন করিলে, তাহার ক্ষমার সংস্কার সঞ্চিত হইবে এবং সেই ক্ষমার সংস্কার ক্রোধের

সংস্কারকে ধ্বংস করিবে। ক্রোধের বিপরীত—ক্ষমা। এইজন্য ক্ষমার সংস্কার ক্রোধের সংস্কারকে নষ্ট করে। ক্রোধসংস্কার উদ্বুদ্ধ হইয়া ক্রোধপ্রত্যয় উঠিলে, আমরা সেই সংস্কারকে জানিতে পারি।" ক্ষমা-সংস্কার হইতে ক্ষমাপ্রত্যয় উঠিলে আমরা সেই ক্ষমাসংস্কারকে জানিতে পারি। সংস্কার হইতে প্রত্যয় না উঠিলে, আমরা সংস্কারকে জানিতে পারি না। তোমার মধ্যে কি কি সংস্কার আছে, প্রত্যয় না উঠিলে, তাহা তুমি জানিতে পার না। সংস্কারের মধ্যে প্রত্যয় স্থিতভাবে অর্থাৎ অব্যক্তভাবে থাকে—পরে কারণ পাইলে তাহা ব্যক্ত হয়। তোমার সংস্কারে ক্রোধপ্রত্যয় আছে কিন্তু এখন তোমার ক্রোধের উদ্রেক হয় নাই, তাই তুমি তাহা জানিতে পারিতেছ না; কিন্তু তাহা তোমার মধ্যে সুপ্তভাবে আছে, কারণ পাইলেই জাগরিত হইবে বা প্রকাশিত হইবে, তখন তুমি তাহা জানিতে পারিবে। চিত্তে উভয় বিরুদ্ধ সংস্কারই বর্ত্তমান আছে। ক্রোধেরও আছে, আর ক্ষমারও আছে। তুমি ক্রোধের সংস্কার বর্দ্ধিত কর—ক্ষমার সংস্কার অভিভূত হইবে ও ক্রোধসংস্কার প্রাদুর্ভূত হইবে। তুমি ক্ষমার সংস্কার বর্দ্ধিত কর—ক্রোধের সংস্কার অভিভূত হইবে ও ক্ষমার সংস্কার বর্দ্ধিত হইবে। এই সংস্কারে সংস্কারে সর্ব্বদাই যুদ্ধ চলিতেছে। আমাদের চিত্তমধ্যে সর্ব্বদাই এই যুদ্ধ চলিতেছে। আমরা সে যুদ্ধ দেখিতে পাই না। আমরা সে যুদ্ধ বুঝিতে বা জানিতে পারি না। কিন্তু আমাদের অজানিতভাবে যুদ্ধ চলিতেছে। যুদ্ধের বিরাম নাই। আমাদের জাগ্রদবস্থায় ও স্বপ্নাবস্থায় এই যুদ্ধ নিরন্তর চলিতেছে। যাহার যে সংস্কার প্রবল হইবে, তাহার সেই সংস্কারের জয় হইবে। অতএব ক্ষমার সংস্কার বর্দ্ধিত হইলে, তোমার ক্রোধসংস্কার বিনষ্ট হইবে।

সেইপ্রকার চিত্তমধ্যে ব্যুত্থান সংস্কার ও নিরোধ সংস্কার উভয় সংস্কারই থাকে। সমাধি অভ্যাস করিয়া নিরোধ সংস্কারকে বর্দ্ধিত

কর—ব্যুত্থান সংস্কার বিনষ্ট হইবে। নিরোধ ও ব্যুত্থান পরস্পর বিরুদ্ধ স্বভাব; যেমন জল ও অগ্নি পরস্পর বিরোধী। জলের দ্বারা অগ্নি নির্ব্বাপিত হয়, আবার অগ্নির দ্বারা জল শুকাইয়া যায়। অগ্নির পরিমাণ বেশী হইলে জল শুষ্ক হয়, আর জলের পরিমাণ বেশী হইলে অগ্নি নির্ব্বাপিত হয়। সেইরূপ নিরোধের পরিমাণ বেশী হইলে ব্যুত্থান অভিভূত হয়, আর ব্যুত্থানের পরিমাণ বেশী হইলে নিরোধ অভিভূত হয়। ব্যুত্থানসংস্কারদ্বারা সমাধি ভগ্ন হয়, আর নিরোধসংস্কারদ্বারা সমাধি গাঢ় হয়। সমাধিকে গাঢ় করা আমাদের আবশ্যক। সমাধিকে নষ্ট করা আমাদের লক্ষ্য নহে। অতএব যাহাতে নিরোধসংস্কার বর্দ্ধিত হয়, তাহা করিতে হইবে। তুমি যতই নিরোধসংস্কার বর্দ্ধিত করিবে, তাহা ততই বর্দ্ধিত হইবে। যে সময়ে তুমি নিরোধসংস্কার বর্দ্ধিত কর—সেই সময়কে নিরোধক্ষণ কহে। এই নিরোধক্ষণে চিত্তের যে পরিবর্ত্তন ঘটে, তাহাকে নিরোধপরিণাম বলে। নিরোধপরিণাম বর্দ্ধিত হইলেই, সঙ্গে সঙ্গে তাহার বিরুদ্ধ ধর্ম্ম ব্যুত্থানপরিণামের ক্ষয় হইবে। এইরূপে ক্রমে ক্রমে সমাধির সময় বৃদ্ধি পাইবে ও ব্যুত্থানের সময় কমিয়া যাইবে। নিরোধ-পরিণাম যখন পূর্ণ হইবে, তখন ব্যুত্থানপরিণাম নিঃশেষে ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে এবং ব্যুত্থানপরিণামের ক্ষয় হইলেই চিত্ত সংস্কারশূন্য হইবে। চিত্ত সংস্কারশূন্য হইলেই চিত্তের লয় হইবে। নিরোধপরিণাম পূর্ণ হইলে—নিরোধপরিণাম আপনা আপনিই ক্ষয় হইয়া যাইবে। নিরোধ-পরিণামকে ক্ষয় করিবার জন্য আর অপর কাহারও সাহায্য আবশ্যক করিবে না। আমরা জোর করিয়া আমাদের ব্যুত্থানসংস্কারকে ক্ষয় করিতে পারি না। নিরোধসংস্কারই ব্যুত্থানসংস্কারের ক্ষয়ের কারণ। অতএব নিরোধসংস্কারকে বর্দ্ধিত করাই আমাদের সাধনা।

তস্য প্রশান্তবাহিতা সংস্কারাৎ ॥ ১০ ॥

সেই নিরোধসংস্কার হইতে চিত্তের প্রশান্তবাহিতা হয়।

ব্যুত্থানসংস্কার চিত্তকে চঞ্চল করে। তখন আমাদের মনে নানাপ্রকার চিন্তা উঠিয়া আমাদের অশান্তি দান করে। তখন চিত্ত চঞ্চলভাবে প্রবাহিত হয়। আর নিরোধসংস্কারে চিত্তের চঞ্চলভাব থাকে না। চিত্তমধ্যে কোনরূপ বিষয় থাকে না সুতরাং চিত্তের প্রবাহ শান্তভাব ধারণ করে, ইহাকে চিত্তের প্রশান্তবাহিতা বলে। চিত্তের অশান্ত প্রবাহ হইতে আমাদের মন চঞ্চল হওয়ায় আমরা ক্লেশভোগ করি; আর চিত্তের প্রশান্তবাহিতা হইলে আমাদের মন শান্ত ও নিশ্চিন্ত হয় এবং তখন আমাদের সমুদয় মানসিক কষ্ট দূরীভূত হয় ও আমরা শান্তিসুখ ভোগ করি। চিত্তের এই অবস্থা হইলে মানুষ সুখী হয়। সুখ টাকায় নাই, সুখ ঘরবাড়ীতে নাই, সুখ পরিবারবর্গের মধ্যে নাই। সুখ আমার চিত্তমধ্যে আছে। বিষয় আমার সুখের কারণ নহে। বিষয় আমার দুঃখের কারণ। যাহার বিষয় যত অধিক,—তাহার বিষয়চিন্তাও তত অধিক—তাহার চিত্তচাঞ্চল্যও তত অধিক। যাহার বিষয় যত কম, তাহার বিষয়চিন্তাও তত কম, তাহার চিত্তচাঞ্চল্যও তত কম এবং তাহার মানসিক কষ্টও তত কম। আবার বিষয় কষ্টের কারণ নহে। বিষয়াসক্তিই কষ্টের কারণ। যাহার বিষয়াসক্তি বেশী, সে বিষয়কেই বর্দ্ধিত করে এবং নিজের কষ্টবৃদ্ধি করে। যাহার বিষয়াসক্তি কম, সে বিষয় বর্দ্ধিত করে না; সে নিবৃত্তি পথ অবলম্বন করে, সে বৈরাগ্যবান্ হয় এবং বৈরাগ্য হইলেই বিবেক উৎপন্ন হয়। সেই সুখী। তুমি ঐ অট্টালিকাস্থিত ধনীকে সুখী মনে করিতেছ। ইহা তোমার ভ্রম। ঐ ধনী বড়ই অভাগা—অতিশয় করুণার পাত্র। উহার খাইয়া সুখ নাই—পরিয়া সুখ নাই—বেড়াইয়া সুখ নাই; কারণ

উহার চিত্ত সর্ব্বদাই বিষয়চিন্তায় বিব্রত। উহার চিত্ত ক্ষণেকের নিমিত্তও শান্তি পায় না। আর ঐ যে ভিক্ষুক ছিন্ন ও মলিন বস্ত্রে আবৃত হইয়া বৃক্ষতলে ভূমিশয্যায় শয়ন করিয়া বিশ্রাম লাভ করিতেছে—সে উপরোক্ত ধনী অপেক্ষা অনেক বেশী সুখী; কারণ উহার মন বিষয়-চিন্তায় আলোড়িত হইতেছে না।

সর্ব্বার্থতৈকাগ্রতয়োঃ ক্ষয়োদয়ৌ চিত্তস্য সমাধিপরিণামঃ ॥ ১১ ॥

চিত্তের সর্ব্বার্থতার ক্ষয় ও একাগ্রতার উদয়কে সমাধিপরিণাম বলে। সর্ব্বার্থতা=সর্ব্ব+অর্থতা অর্থাৎ সকল প্রয়োজন। চিত্তে সর্ব্বার্থতা ধর্ম্ম ও একাগ্রতা ধর্ম্ম উভয় ধর্ম্মই আছে। যেমন যেমন সর্ব্বার্থতার ক্ষয় হইবে, তেমন তেমন একাগ্রতার বৃদ্ধি হইবে। বহুবিষয়ে ব্যাপৃত থাকার অভ্যাসকে সর্ব্বার্থতা বলে এবং একটী বিষয় অবলম্বন করিয়া থাকার নাম একাগ্রতা। চিত্ত যখন বহুবিষয় ছাড়িয়া একটী বিষয় লইয়া থাকে, তখন তাহার "সমাধিপরিণাম"। পূর্ব্বসূত্রে "নিরোধ-পরিণাম" বলা হইয়াছে, এ সূত্রে "সমাধিপরিণাম" বলা হইল।

চিত্ত সর্ব্বদাই বিষয় লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছে। রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ ও স্পর্শ এই সকল বিষয় লইয়া চিত্ত সর্ব্বদা ব্যস্ত। এইরূপ নানাবিষয়ে ছুটাছুটী করাই চিত্তের সর্ব্বার্থতা। যতদিন চিত্তে এই সর্ব্বার্থতা ধর্ম্ম প্রবল থাকিবে, ততদিন সমাধিপরিণাম হইবে না। রূপ, রস ও শব্দাদি বিষয়ের আসক্তি ত্যাগ করিলে, এই সর্ব্বার্থতা ধর্ম্মের ক্ষয় হইবে। সর্ব্বার্থতা ধর্ম্মের ক্ষয় হইলেই, একাগ্রতা ধর্ম্মের উদয় হইবে এবং তাহা হইতেই সমাধি হইবে।

ততঃ পুনঃ শান্তোদিতৌ তুল্যপ্রত্যয়ৌ চিত্তস্যৈকাগ্রতাপরিণামঃ ॥ ১২ ॥

সমাধি অবস্থায় চিত্তের শান্তপ্রত্যয় ও উদিতপ্রত্যয় অর্থাৎ অতীত ও বর্ত্তমান প্রত্যয় যে চিত্তে একাকার ভাবে অবস্থান করে, তাহাই চিত্তের "একাগ্রতাপরিণাম।"

চিত্ত সর্ব্বদা চঞ্চল সুতরাং চিত্তের প্রত্যয়ও চঞ্চল। চিত্তে ক্ষণে ক্ষণে প্রত্যয়সকল উদিত ও লয়প্রাপ্ত হইতেছে। একটী প্রত্যয় উদিত হইয়া কিয়ৎক্ষণ থাকিয়া লয় পাইতেছে, আবার তৎপরে আর একটী প্রত্যয় উদিত হইতেছে। পূর্ব্ব প্রত্যয়ের লয় হইতেছে ও উত্তর প্রত্যয় উদিত হইতেছে। যে প্রত্যয় লয় প্রাপ্ত হইতেছে, তাহাকে শান্তপ্রত্যয় বলে; আর যে প্রত্যয় উদিত হইতেছে, তাহাকে উদিতপ্রত্যয় বলে। যখন এই শান্ত ও উদিত প্রত্যয় লয়প্রাপ্ত এবং উদিত না হইয়া সদৃশ প্রবাহে অবস্থান করে, তখন তাহাকে চিত্তের "একাগ্রতাপরিণাম" বলে। একাগ্রতাপরিণামের মধ্যে উঠা নামা নাই, কেবলমাত্র একভাবে, এক অপরিবর্ত্তিতভাবে অবস্থান। সাধক প্রথম জপের সময় "কৃষ্ণ" বলিল এবং "কৃষ্ণ" তাহার চিত্তে উদিত হইলেন, আবার ক্ষণপরেই লয়প্রাপ্ত হইলেন। কৃষ্ণ তাহার চিত্তে দাঁড়াইলেন না। সাধক আবার দ্বিতীয়বার "কৃষ্ণ" উচ্চারণ করিল। আবার দ্বিতীয়বার "কৃষ্ণ" ক্ষণেকের জন্য উদিত হইলেন, আবার দ্বিতীয়বার কৃষ্ণ তিরোহিত হইলেন। আবার তৃতীয়বার "কৃষ্ণ" উচ্চারণ করিল, আবার তৃতীয়বার "কৃষ্ণ" তাহার চিত্তে উদিত হইলেন, আবার ক্ষণেক পরে তিরোহিত হইলেন। এইরূপে তিনি সাধকের চিত্তে একবার উদিত ও একবার লীন হইতেছেন। সাধকের মনে যখন কৃষ্ণ এইরূপে ক্ষণে ক্ষণে আবির্ভূত ও তিরোহিত না হইয়া, একইভাবে বহুক্ষণ,

দাঁড়াইয়া থাকিবেন, তখন সাধকের একাগ্রতাপরিণাম হইবে। মনে কর কোন সাধক ৮ ঘণ্টাকাল একাগ্রতা অভ্যাস করিয়াছে। এই ৮ ঘণ্টাকাল "কৃষ্ণ" তাহার চিত্তে দাঁড়াইয়া থাকিবেন। এই ৮ ঘণ্টার মধ্যে কৃষ্ণ আর কোথাও যাইবেন না। এই ৮ ঘণ্টায়, এই "কৃষ্ণ + কৃষ্ণ + কৃষ্ণ + কৃষ্ণ + ··· + কৃষ্ণ" স্রোত একাকারে তাহার চিত্তে প্রবাহিত হইবে। এই স্রোত ভগ্ন হইবে না। এই স্রোতের মধ্যে "আলু কাঁচকলা" ভাসিবে না। অন্য কোন বিষয় বা চিন্তা আসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে ঠেলিয়া তাঁহার আসন অধিকার করিবে না। ইহাকে চিত্তের একাগ্রতাপরিণাম বলে।

একাগ্র না হইলে সমাধি হয় না। প্রত্যেক সমাধিতে একাগ্রতা-পরিণাম আছে। আবার সমাধিপরিণাম না হইলে সম্প্রজ্ঞাত যোগ হয় না। প্রত্যেক সম্প্রজ্ঞাত যোগে সমাধিপরিণাম আছে। আবার নিরোধপরিণাম না হইলে অসম্প্রজ্ঞাত যোগ হয় না। প্রত্যেক অসম্প্রজ্ঞাত যোগে নিরোধপরিণাম আছে। অভ্যাসদ্বারা একাগ্রতা বর্দ্ধিত হইলে সমাধি হয়, সমাধি বর্দ্ধিত হইলে সম্প্রজ্ঞাত যোগ হয়, সম্প্রজ্ঞাত যোগ বর্দ্ধিত হইলে অসম্প্রজ্ঞাত যোগ হয়।

এতেন ভূতেন্দ্রিয়েষু ধর্ম্মলক্ষণাবস্থাপরিণামা ব্যাখ্যাতাঃ ॥১৩

উপরোক্ত ত্রিবিধ চিত্তপরিণামদ্বারা ভূতবর্গের ও ইন্দ্রিয়াদির—ধর্ম্মপরিণাম, লক্ষণপরিণাম ও অবস্থাপরিণাম কথিত হইল।

ধর্ম্মী হইতে ধর্ম্ম প্রকাশ পায়। যাহার যাহা ধর্ম্ম, তাহা হইতে তাহার প্রকাশ হয়। ব্যাঘ্রের ধর্ম্ম প্রাণিহিংসা, এখানে ব্যাঘ্র ধর্ম্মী এবং প্রাণিহিংসা তাহার ধর্ম্ম। সাধুর ধর্ম্ম জীবে দয়া, এখানে সাধু ধর্ম্মী ও দয়া তাঁহার ধর্ম্ম। চিত্তের ধর্ম্ম ব্যুত্থান ও নিরোধ, এখানে

চিত্ত ধর্ম্মী এবং ব্যুত্থান ও নিরোধ তাহার ধর্ম্ম। ইহা চিত্তের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। ইহা তাহার কৃত্রিম ধর্ম্ম নহে। চিত্তে বিষয়সংস্কার বা ব্যুত্থানসংস্কার আছে বলিয়াই ব্যুত্থানধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয় এবং বৈরাগ্যসংস্কার বা নিরোধসংস্কার আছে বলিয়াই নিরোধধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয়। ইহাই চিত্তের ধর্ম্মপরিণাম। যেমন চিত্তে এই ধর্ম্মপরিণাম হয়, তেমনি ভূতবর্গে এবং ইন্দ্রিয়সমূহেও এই ধর্ম্মপরিণাম হয়।

এই ব্যুত্থান ও নিরোধ ধর্ম্মের লক্ষণপরিণাম আছে। অতীত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ কালের দ্বারা ইহাদের লক্ষণপরিণাম হয়। লক্ষণপরিণাম তিনপ্রকার;—অতীত, বর্ত্তমান ও অনাগত বা ভবিষ্যৎ। বর্ত্তমান লক্ষণই আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। পূর্ব্বের নিরোধলক্ষণ—যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহা অতীত; কিন্তু সেই নিরোধধর্ম্ম অতীত হইলেও, তাহা কি একেবারে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে? না, তাহা একেবারে ধ্বংস হইয়া যায় নাই। তাহা এখনও চিত্তে অবস্থান করিতেছে, তবে সামান্য ভাবে বর্ত্তমান আছে। বর্ত্তমান নিরোধধর্ম্ম এত প্রবলভাবে স্ফুট হইয়াছে যে, সেই অতীত নিরোধধর্ম্মকে কতকটা অপ্রবল ও অস্ফুট করিয়াছে, কিন্তু তাহা একেবারে ধ্বংস হয় নাই। দিবাভাগে আকাশে নক্ষত্র থাকে, রাত্রিতেও আকাশে নক্ষত্র থাকে। নক্ষত্র চিরকালই আকাশে আছে এবং একভাবেই থাকে। নক্ষত্রের জ্যোতি চিরকালই সমভাবে প্রকাশ পাইতেছে। রাত্রিতেও সেই জ্যোতি যেরূপভাবে প্রকাশ পায়—দিবাভাগেও সেই জ্যোতি সেরূপভাবে প্রকাশ পায়। দিবাভাগে নক্ষত্রের জ্যোতি আছে, পূর্ব্বে যেমন ছিল এখনও সেইরূপ আছে, তবে সূর্য্যজ্যোতি প্রখরতর বলিয়া—সূর্য্যের প্রবল ও প্রখর জ্যোতির সম্মুখে নক্ষত্রজ্যোতি সামান্যভাবে অবস্থিতি করিতেছে। সেইরূপ নিরোধ ও ব্যুত্থান লক্ষণ চিত্তে বর্ত্তমান থাকে, একেবারে ধ্বংস হইয়া

যায় না; তবে যখন যে সকল লক্ষণ অত্যন্ত প্রবল ও স্ফুট হয়, তখন তাহাদিগকে বর্ত্তমান বলিয়া থাকি। এই অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান লক্ষণসকল একসঙ্গে পরস্পরের সহিত মিলিত অবস্থাতেই থাকে। অতীত ও অনাগতের সহিত বর্ত্তমান লক্ষণের ছাড়াছাড়ি হয় না।

নিরোধধর্ম্ম ও ব্যুত্থানধর্ম্মের যেমন অতীত, বর্ত্তমান ও অনাগত তিনটী লক্ষণ আছে, তেমন ইহাদের দুইটী অবস্থা আছে—প্রবল অবস্থা ও দুর্ব্বল অবস্থা। যখন নিরোধ প্রবল হয় তখন ব্যুত্থান দুর্ব্বল হয়, আর যখন ব্যুত্থান প্রবল হয় তখন নিরোধ দুর্ব্বল হয়। উভয়েই দিবারাত্র কলহ করিতেছে। কখনও নিরোধ জিতিতেছে ও ব্যুত্থান হারিতেছে, আবার কখনও ব্যুত্থানের জয় ও নিরোধের পরাজয় হইতেছে। ইহাই ধর্ম্মসকলের অবস্থাপরিণাম।

চিত্ত ধর্ম্মী। ব্যুত্থান ও নিরোধ তাহার ধর্ম্ম। এই দুই ধর্ম্মের দ্বারা চিত্তরূপ ধর্ম্মীর পরিণাম হয়। আবার অতীত, বর্ত্তমান ও অনাগত লক্ষণের দ্বারা ব্যুত্থান ও নিরোধরূপ ধর্ম্মের পরিণাম হয়। আবার প্রবল ও দুর্ব্বল অবস্থাদ্বারা অতীত, বর্ত্তমান ও অনাগত লক্ষণের পরিণাম হয়। এইরূপ দিবারাত্র ইহাদের কার্য্য, পরিবর্ত্তন বা পরিণাম চলিতেছে। ক্ষণকালও ইহারা স্থির নহে। গুণের কার্য্য সর্ব্বদাই চলিতেছে। গুণ কখনও স্থির হইয়া বসিয়া থাকে না। যেখানে স্থিরতা নাই, সেখানে সুখ নাই। যেখানে গুণ, সেখানে অস্থিরতা—সেখানেই দুঃখ। অতএব যতক্ষণ গুণের মধ্যে থাকিবে, সুখের আশা বৃথা। "গুণের মধ্যেও থাকিব, আবার সুখীও হইব" পাগলের কথা। সিদ্ধপুরুষেরা গুণ অতিক্রম করিয়া সুখী হইয়াছেন তাঁহারা যদিও বিষয় ব্যবহার করেন, তথাপি বিষয়ে লিপ্ত হন না—যেমন পদ্মপত্রের সহিত জল সংলগ্ন হয় না।

মৃত্তিকা চিরকালই মৃত্তিকা আছে। অতীতকালেও মৃত্তিকা ছিল, এখনও আছে এবং ভবিষ্যৎকালেও থাকিবে। মৃত্তিকা কখনও স্বরূপভ্রষ্ট হইবে না। মৃত্তিকার মধ্যেই ঘট অনাগতভাবে আছে। সেই অনাগত ঘট যখন স্ফুটরূপে বাহিরে প্রকাশ হইল, তখন তাহা বর্ত্তমান ঘট হইল, আবার সেই ঘটটী ভাঙ্গিয়া গিয়া যখন মৃত্তিকার সহিত পুনঃ সংযুক্ত হইবে, তখন এই বর্ত্তমান ঘটটীর লক্ষণ অতীত হইয়া তাহা ভবিষ্যৎ ঘট হইবে। ঘটরূপ মৃত্তিকার তিনটী লক্ষণ হইল—একটী অতীত, একটী বর্ত্তমান ও একটী অনাগত; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মৃত্তিকা স্বরূপ-ভ্রষ্ট হয় নাই। অতীত লক্ষণেও মৃত্তিকা মৃত্তিকাই ছিল, বর্ত্তমান লক্ষণেও মৃত্তিকা মৃত্তিকাই রহিল, এবং অনাগত লক্ষণেও মৃত্তিকা মৃত্তিকাই থাকিবে। অতএব এই তিনটী লক্ষণ পরস্পর পরস্পরের সহিত সংযুক্ত। এই তিনটী লক্ষণের ছাড়াছাড়ি হয় না। এই ঘটটী সবেমাত্র তৈয়ারী হইয়াছে। ইহা এক্ষণে নূতন অবস্থায় আছে। ইহা দেখিতে খুব সুন্দর। ইহা সহজে ভাঙ্গিয়া যায় না। আবার ৫০ বৎসর পরে এই ঘটটীকে দেখ। তখন দেখিবে যে, ঘটের সেই পূর্ব্ব নূতন অবস্থার সৌন্দর্য্য নাই। ঘটটীতে লোনা লাগিয়া তাহা আপনা আপনি গুঁড়া হইয়া খসিয়া পড়িতেছে, এক্ষণে অত্যন্ত ভঙ্গপ্রবণ হইয়াছে। ইহা ঘটের পুরাতন অবস্থা। ইহা ঘটের দুর্ব্বল অবস্থা। ঘটের পূর্ব্বেকার সে প্রবল অবস্থা আর নাই। কিন্তু মৃত্তিকা পূর্ব্বে যেমন ছিল, এখনও সেইরূপই আছে। মৃত্তিকা স্বরূপভ্রষ্ট হয় নাই। কেবল ঘটের অবস্থাপরিণাম হইয়াছে। ইহাকেই অবস্থপরিণাম বলে। প্রকৃতির তত্ত্বসমূহের নিয়তই এই অবস্থাপরিণাম হইতেছে। প্রতি মুহূর্ত্তেই আমাদের শরীরের পরিবর্ত্তন হইতেছে। বালক হইতে যুবা, যুবা হইতে বৃদ্ধ, বৃদ্ধ হইতে মরণান্তে দেহান্তরপ্রাপ্তি ইত্যাদি অবস্থার পরিবর্ত্তন প্রতিক্ষণ হইতেছে।

একই মৃত্তিকা হইতে ঘট, শরাব, পুত্তলিকা প্রভৃতি তৈয়ারী হইয়াছে। ব্যবহারিক দৃষ্টিতে আমরা তাহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ দর্শন করিতেছি; কিন্তু মূলতঃ ইহারা সকলেই সেই একই মৃত্তিকা। একই সুবর্ণ হইতে কুণ্ডল, বলয়, হার প্রভৃতি অলঙ্কার প্রস্তুত হইয়াছে। আমরা ব্যবহারিক দৃষ্টিতে তাহাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া দর্শন করি; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মূলতঃ তাহারা একই সুবর্ণ ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। একই অব্যক্ত প্রকৃতি ব্যক্ত হইয়া সৃষ্টিসমূহে প্রকাশিত আছে, আমরা ব্যবহারিক দৃষ্টিতে ইহাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন দেখি কিন্তু মূলতঃ ইহারা সকলেই সেই এক অব্যক্ত প্রকৃতি। শরীর, শরীর নয়—মাংস ও অস্থির সমষ্টিমাত্র। মাংস ও অস্থি, মাংস ও অস্থি নয়—তাহারা চাল ডাল প্রভৃতি খাদ্য হইতে উৎপন্ন হইয়াছে; সুতরাং মাংস ও অস্থি, চাল ও ডালের সমষ্টিমাত্র। চাল ও ডাল, মাটী হইতে উৎপন্ন হইয়াছে; সুতরাং চাল ও ডাল মাটীমাত্র। আবার স্থূল ক্ষিতি গন্ধতন্মাত্র হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, আবার গন্ধতন্মাত্র অস্মিতা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, অস্মিতা মহত্তত্ত্ব হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, আবার মহত্তত্ত্ব অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে; সুতরাং প্রকৃতি ভিন্ন অপর কিছুই নাই। এই প্রকৃতি তিনটী গুণের মিশ্রণে নির্ম্মিত; সুতরাং ত্রিগুণ ভিন্ন কিছু নাই। যেখানে গুণ, সেখানেই পরিণাম। সুতরাং আমরা যাহা দেখিতেছি বা শুনিতেছি বা আঘ্রাণ করিতেছি বা আস্বাদন করিতেছি বা স্পর্শ করিতেছি—সে সকল প্রকৃত বস্তু নহে;—প্রকৃতির পরিণাম মাত্র। অতএব চিত্ত যেমন সর্ব্বদাই পরিণামপ্রাপ্ত হইতেছে, ভূত ও ইন্দ্রিয়াদিও সেইরূপ সর্ব্বদা পরিণামপ্রাপ্ত হইতেছে। সুতরাং ব্যবহারিক বা লৌকিক দৃষ্টিতে আমরা যাহাদের নানা বলিয়া দেখি, পারমার্থিক দৃষ্টিতে তাহাদের এক বলিয়া দেখি।

ব্যবহারিক দৃষ্টিতে আমরা শুদ্ধ বর্ত্তমান ধর্ম্ম দেখিতে পাই;

অতীত ও অনাগত ধর্ম্ম দেখিতে পাই না; কিন্তু অতীত ও অনাগত ধর্ম্মও থাকে, তাহারা ধর্ম্মিরূপে অব্যক্তভাবে থাকে। তাহাদের নিঃশেষে লয় হয় না। সকল ধর্ম্মই ত্রিগুণরূপে সর্ব্বদাই বর্ত্তমান আছে—তাহাদের কখনও লয় হয় না। ব্যবহারতঃ আমরা যাহাদের ধর্ম্ম ও ধর্ম্মী বলিয়া জানি; পরমার্থতঃ তাহারা গুণ ও গুণী ভিন্ন অন্য কিছু নহে।

শান্তোদিতাব্যপদেশ্য-ধর্ম্মানুপাতী ধর্ম্মী ॥ ১৪ ॥

শান্ত অর্থাৎ অতীত, উদিত অর্থাৎ বর্ত্তমান এবং অব্যপদেশ্য অর্থাৎ অনাগত ধর্ম্মসকলে যে অনুগত হয়, তাহাকে ধর্ম্মী বলে।

ধর্ম্মী চক্ষুর অগোচর। ধর্ম্মীকে চক্ষুর্দ্বারা দেখা যায় না, ধর্ম্মীর কার্য্যদ্বারা ধর্ম্মীকে বুঝিতে পারা যায়। ধর্ম্মীর মধ্যে যে শক্তি আছে, সেই শক্তি বাহিরে কার্য্যরূপে প্রকাশ পাইলে আমরা ধর্ম্মীকে জানিতে পারি। ধর্ম্মীর এই ফলজননযোগ্যতাবিশিষ্ট শক্তিকে ধর্ম্মীর ধর্ম্ম বলে। এই ধর্ম্ম তিনপ্রকার,—শান্ত, উদিত ও অব্যপদেশ্য। যে ধর্ম্ম ফলপ্রসব করিয়া শেষ হইয়া গিয়াছে—তাহা শান্ত ধর্ম্ম। যে ধর্ম্ম ফলপ্রসব করিতেছে—তাহা উদিত ধর্ম্ম। আর যে ধর্ম্ম ভবিষ্যতে ফলপ্রসব করিবে তাহা অব্যপদেশ্য ধর্ম্ম। প্রাতঃকালে ৬টার সময় এক ব্যক্তি ক্রুদ্ধ হইয়াছিল এক্ষণে ৭টার সময় তাহার ক্রোধের শান্তি হইয়াছে—এখন তাহার আর ক্রোধ নাই—এখন সে লোকটাকে দেখিলে বোধ হয় যেন সে কত ভালমানুষ—বোধ হয় যেন সে কখনও কাহারও উপর ক্রোধ করে নাই। তাহার চিত্ত হইতে ৬টার সময় যে ক্রোধ প্রকাশ পাইয়াছিল, এক্ষণে সে ক্রোধ নাই। সেই ক্রোধরূপ ধর্ম্ম শান্ত হইয়াছে; কিন্তু বিনষ্ট হয় নাই। সেই ক্রোধরূপ ধর্ম্ম তখনও তাহার

চিত্তে আছে, আবার সময় পাইলেই তাহার কার্য্য হইবে, আবার হেতু পাইলেই সে ক্রোধ পুনরায় উদিত হইবে। এই ক্রোধধর্ম্ম তাহার শান্ত ধর্ম্ম বা অতীত ধর্ম্ম। এক্ষণে ৭টার সময় তাহার ক্রোধ নাই কিন্তু লোভ হইয়াছে—এক্ষণে সে লোভী—কি খাইব—কি খাইব বলিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এই লোভধর্ম্ম তাহার বর্ত্তমান বা উদিত ধর্ম্ম। আবার বেলা ৯টার সময় হয়ত তাহার কামভাব প্রকাশ পাইবে—এই কামরূপ ধর্ম্ম, তাহার অনাগত ধর্ম্ম। বর্ত্তমান ধর্ম্মের প্রকাশকালে অতীত ধর্ম্ম শান্ত থাকে এবং অনাগত ধর্ম্ম কর্ম্মফল দিবার জন্য উন্মুখ হইয়া থাকে। এইরূপ প্রকৃতির মধ্যে অনবরত ধর্ম্মপরিণামস্রোত প্রবাহিত হইতেছে। কোন ধর্ম্ম স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া থাকে না। একটীর পর আর একটী, তার পর আর একটী এইরূপে ক্রমান্বয়ে প্রাকৃতিক স্রোত নিরন্তর প্রবাহিত হইতেছে। দিনের পর রাত্রি, রাত্রির পর দিন, মাসের পর মাস, ঋতুর পর ঋতু, বৎসরের পর বৎসর ক্রমান্বয়ে প্রবাহরূপে প্রবাহিত হইতেছে—কেহই ক্ষণকালের জন্যও স্থির হইয়া দাঁড়াইতেছে না। নিজের শরীরও ক্ষণে ক্ষণে এই প্রাকৃতিক প্রবাহের অনুসরণ করিতেছে। কিছুকাল পূর্ব্বে যে শিশু ছিল, পরে সে যুবা হইল, এক্ষণে বৃদ্ধ হইয়াছে—পরে কি হইবে তাহার স্থিরতা নাই। সেই শৈশব ও যৌবন ধর্ম্ম শান্ত হইয়াছে, এক্ষণে বার্দ্ধক্য ধর্ম্ম উদিত হইয়াছে এবং পরে ভবিষ্যৎ বা অব্যপদেশ্য ধর্ম্ম প্রকাশ পাইবে। পূর্ব্বে কত মানুষ ছিল, তাহারা কোথায় চলিয়া গেল। এক্ষণে কত মানুষ আছে ; কিন্তু ইহারাও দাঁড়াইয়া নাই—ইহারাও ক্রমাগত চলিতেছে—ক্রমাগত মৃত্যুর মুখে অগ্রসর হইতেছে—ক্ষণে ক্ষণে মৃত্যুর মুখে অগ্রসর হইতেছে। কে যেন টানিয়া লইয়া যাইতেছে—ক্ষণকাল স্থির হইয়া দাঁড়াইবে তাহার শক্তি নাই। কালের স্রোতে কে দাঁড়াইতে পারে? কালের গতি অবরোধ করিবার শক্তি কাহার আছে? সকলকেই

যাইতে হইবে। সকলকে এই প্রাকৃতিক স্রোত অনুসরণ করিতেই হইবে। মানুষ কিসের স্পর্দ্ধা করে? মানুষ চিরকাল শিশু থাকিতে পারে না। মানুষ চিরকাল যুবক থাকিতে পারে না। শরীরের একগাছি লোমের উপরও মানুষের কর্ত্তৃত্ব নাই। বৃদ্ধাবস্থায় এই কেশগুলি পক্ক হইয়া শুভ্রবর্ণ ধারণ করিবে, শরীর শিথিল ও দুর্ব্বল হইবে, জরা আসিয়া এই শরীরে বসবাস করিবে। কে তাহা নিবারণ করিতে পারে? অনাদি অনন্তকাল হইতে প্রকৃতির এই প্রবাহ চলিয়া আসিতেছে—কেহই রুদ্ধ করিতে পারে নাই। ধর্ম্মীর এই তিনটী ধর্ম্ম চিরকাল থাকিবে। বাহিরের জগতে আমরা যেমন প্রকৃতির প্রবাহ দেখিতে পাইতেছি—আভ্যন্তর জগতেও সেইরূপ প্রবাহ চলিতেছে। আজ যাহা মৃত্তিকা ও জলরূপে আছে, কাল তাহার মৃত্তিকা ও জলরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া উদ্ভিদ্রূপ হইবে এবং তৎপরে সেই উদ্ভিদ্ প্রাণীর দ্বারা ভক্ষিত হইয়া মাংস ও অস্থিরূপ ধারণ করিয়া প্রাণীর শরীর গঠিত করিবে, আবার পরে তাহা পুনরায় মৃত্তিকা ও জলে পরিণত হইবে। আজ যে বৃক্ষ হইয়া বৃক্ষরূপে দাঁড়াইয়া আছে, কাল সেই বৃক্ষ মানুষরূপে দাঁড়াইয়া থাকিবে এবং তৎপরে সেই বৃক্ষ মৃত্তিকা ও জলরূপে দাঁড়াইয়া থাকিবে। আজ যে শরীর ব্যাঘ্ররূপ ধারণ করিয়াছে, কাল সে শরীর মানুষরূপ ধারণ করিবে। আজ যে শরীর মানুষরূপে দণ্ডায়মান আছে—কাল তাহা পশু, বৃক্ষ বা প্রস্তররূপে দণ্ডায়মান থাকিবে। এইপ্রকারে প্রকৃতির বহির্দ্দেশে যেমন একটী অনন্তস্রোত প্রবাহিত হইতেছে, প্রকৃতির অন্তঃস্থলেও সেইরূপ একটী অনন্তস্রোত প্রবাহিত হইতেছে। সবই এক—একই সব। মানুষের শারীরিক উপাদান, পশুর শারীরিক উপাদান ও বৃক্ষপ্রস্তরাদির শারীরিক উপাদানে কোনও বিভিন্নতা নাই। সব এক—সব এক—সব এক। আবার একই শক্তির অধীনে এই অনন্ত প্রবাহ চলিতেছে। শক্তিও

এক। যে শক্তি তোমার শরীরে কার্য্যপ্রবাহ চালাইতেছে, সেই শক্তিই ঐ বৃক্ষের শরীরের কার্য্যপ্রবাহ চালাইতেছে। আর সেই শক্তিই ঐ প্রস্তরের মধ্যে, জলের মধ্যে, বায়ুর মধ্যে, সূর্য্যের মধ্যে, চন্দ্রের মধ্যে, নক্ষত্র ও তারকাদির মধ্যে কার্য্যপ্রবাহ চালাইতেছে। শক্তির প্রবাহ অবস্থা আমরা দেখিতে পাই—শক্তিকে দেখিতে পাই না বা শক্তি যে ধর্ম্মীর অন্তর্গত, তাহাকেও দেখিতে পাই না। যেখানে কার্য্য, সেখানেই শক্তি। শক্তি ভিন্ন কার্য্য হইতে পারে না। ঐ গোলাপ ফুলটীকে গোলাপীবর্ণে কে রঞ্জিত করিল? উহার কি কর্ত্তা নাই? কর্ত্তা ভিন্ন কার্য্য হইতে পারে না। শক্তি ভিন্ন কার্য্য হইতে পারে না। আবার যেখানে শক্তি আছে—সেখানে শক্তিমানও আছেন। শক্তিমান ভিন্ন শক্তি থাকিতে পারে না। ধর্ম্মী ভিন্ন ধর্ম্ম থাকিতে পারে না। ধর্ম্মী ধর্ম্মের আধার। আধার ভিন্ন আধেয় থাকিতে পারে না। আমরা বিনা সাধনায় এই শক্তি ও শক্তিমানের সাক্ষাৎ করিতে পারি না। সাধনাদ্বারা আমরা ইহাদের সাক্ষাৎ পাই। ইহাকেই তত্ত্বজ্ঞান বলে। তত্ত্বজ্ঞান হইলে আমাদের "পরমপুরুষার্থ" লাভ হয় ও দুঃখের একান্ত নিবৃত্তি হয়। তখন আমরা প্রাকৃতিক এই অনন্ত প্রবাহ হইতে নিষ্কৃতিলাভ করি। তখন আমরা মুক্ত—তখন আমরা স্বাধীন—তখন আমরা স্বরাজ প্রাপ্ত হই।

ক্রমান্যত্বং পরিণামান্যত্বে হেতুঃ ॥ ১৫ ॥

ক্রমের অন্যত্ব, পরিণামের অন্যত্বের হেতু।

নানাপ্রকার পরিণাম হয় কেন? নানাপ্রকার ক্রম হয় এইজন্য নানাপ্রকার পরিণাম হয়। ক্রম কাহাকে বলে? পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ অনবরত পরিবর্ত্তনশীল। ব্রহ্মাণ্ডের স্থূল ও

সূক্ষ্ম সমুদয় সৃষ্টিমধ্যেই অনবরত পরিবর্ত্তন সাধিত হইতেছে। সত্ত্ব, রজঃ ও তমের কার্য্য অনবরত চলিতেছে। এমন সময় নাই, যখন সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ কোন কার্য্য করে না। গুণের কার্য্য সর্ব্বদাই চলিতেছে। আমাদের শরীরে মাংস, অস্থি ও শোণিত প্রভৃতি স্থূলের মধ্যে এই কার্য্য সর্ব্বদা চলিতেছে। মাংস, অস্থি ও শোণিত নিরন্তর গঠিত হইতেছে ও নিরন্তর ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতেছে। এই সৃষ্টি ও ধ্বংস-নীতির বিরাম নাই। জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি প্রতি অবস্থাতেই এই সৃষ্টি ও ধ্বংস কার্য্য চলিতেছে। কার্য্য হইলেই পরিবর্ত্তন হয়। প্রতিক্ষণে মাংসের মধ্যে পরিবর্ত্তন চলিতেছে। প্রতিক্ষণে মাংসের কতক অংশ নির্ম্মিত হইতেছে ও কতক অংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতেছে। বাল্যকালে নির্ম্মাণের ভাগ বেশী আর ধ্বংসের ভাগ কম। বৃদ্ধাবস্থায় নির্ম্মাণের ভাগ কম আর ধ্বংসের ভাগ বেশী। মধ্য অবস্থায় নির্ম্মাণ ও ধ্বংসের ভাগ সমান থাকে। একটী তিন বৎসরের শিশুর মাংস ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া দশ বৎসর বয়সে অনেক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এই যে প্রতিক্ষণের ক্রমিক বর্দ্ধন—ইহা এত ধীরে ধীরে ও অল্পে অল্পে হয়—যে তাহা আমাদের প্রত্যক্ষের মধ্যে আসে না। এই ক্ষণাবচ্ছিন্ন পরিবর্ত্তনকে বা পরিণামকে "ক্রম" বলা হয়। প্রতিক্ষণেই প্রতি দ্রব্যের পরিণাম হইতেছে। এইক্ষণে আমাদের শরীরে যে যে উপাদান আছে, তাহার ক্ষণকাল পরে আর তাহা থাকিবে না। কিন্তু এই পরিণাম এত সূক্ষ্ম ও অল্প যে তাহা আমাদের ধারণায় আসে না। এইরূপে প্রতিক্ষণের কার্য্যকে "ক্রম" বলা হয়। এই ক্রমের অন্যত্ব হয় বলিয়াই পরিণামের অন্যত্ব হয়। পরিণাম তিন প্রকার যথা,—ধর্ম্মপরিণাম, লক্ষণপরিণাম ও অবস্থাপরিণাম। যে সকল ক্রম হইতে অবস্থা পরিণাম হয়, তাহাকে "অবস্থাপরিণামক্রম" বলে। ধর্ম্মপরিণাম, যেমন মৃত্তিকার ধর্ম্ম—পিণ্ডত্ব, ঘটত্ব ও চূর্ণত্ব। মৃত্তিকা, পিণ্ডত্বধর্ম্মে

পরিত্যাগ করিয়া ঘটত্বধর্ম্ম গ্রহণ করে; আবার ঘটত্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া চূর্ণত্বধর্ম্ম গ্রহণ করে, আবার চূর্ণত্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া পিণ্ডত্ব-ধর্ম্ম গ্রহণ করে। লক্ষণপরিণাম,—যেমন ঘটের অনাগত ভাব হইতে বর্ত্তমান ভাবপ্রাপ্তি এবং পিণ্ডের বর্ত্তমান ভাব হইতে অতীত ভাবপ্রাপ্তি। অবস্থাপরিণাম,—যেমন ঘটের নূতন অবস্থা হইতে পুরাতন অবস্থা-প্রাপ্তি। শরীরের স্থূল মাংসাদির যেমন পরিণাম হয়, তেমনি অন্তঃকরণের সূক্ষ্ম মন ও বুদ্ধ্যাদিরও পরিণামক্রম আছে।

পরিণামত্রয়-সংযমাদতীতানাগতজ্ঞানম্ ॥ ১৬ ॥

এই তিনপ্রকার পরিণামে চিত্তসংযম করিলে আমাদের অতীত ও অনাগত বিষয়ের জ্ঞান হয়।

সংযম কাহাকে বলে? কোন একটী বিষয়ে ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই তিনটী সাধন একত্র সাধিত হইলে, তাহাকে সংযম বলে। যাঁহাদের এইরূপ সংযম করিবার শক্তি হইয়াছে, তাঁহারা কোন দ্রব্যের ধর্ম্মপরিণাম, লক্ষণপরিণাম ও অবস্থাপরিণামের উপর সংযম করিলে, সেই দ্রব্যবিষয়ে তাঁহাদের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানবিষয়ক জ্ঞান হয়। এইজন্য তাঁহারা লোকের পূর্ব্ব জন্মের এবং ভবিষ্যৎ জন্মের কথা বলিতে পারেন। সময়ে সময়ে সাধারণ লোকেও এরূপ অনেক সত্য স্বপ্ন দেখে যাহা ভবিষ্যৎকালে ঘটিয়া থাকে। যোগীরা এইসকল বিষয় ইচ্ছা করিলেই দেখিতে পারেন। যাঁহারা প্রকৃত সাধক, তাঁহারা এই সকল শক্তি পাইলেও বাহিরে প্রকাশ করেন না। কারণ তাঁহারা সাধারণের যশঃপ্রার্থী নহেন। মোক্ষই তাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য। অনেকে এই শক্তি লাভ করিয়া বাহিরে প্রকাশ করেন, ইহাতে তাঁহাদের শক্তি ক্ষয় হইয়া যায় ও তাঁহারা মোক্ষপথভ্রষ্ট হন।

ব্যবহারিক জীবনেও আমরা কাহারও পরিণামত্রয়ের উপর সংযম করিয়া তাহার ভবিষ্যৎ জীবন স্থির করিয়া থাকি। মনে কর, আমরা তোমার কন্যার জন্য একটী পাত্র দেখিতে গিয়াছি। সেই পাত্রটীর অতীত ও বর্ত্তমান চরিত্র, কার্য্যপ্রণালী ও আচারব্যবহার দর্শনে আমরা তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের ছায়া সংগ্রহ করিয়া থাকি। যদি তাহার অতীত ও বর্ত্তমান চরিত্রাদি সৎ হয়, তাহাহইলে, সে যে ভবিষ্যৎ জীবনে কষ্ট পাইবে না—ইহা আমরা নিশ্চয় করিয়া থাকি। আর যদি তাহার অতীত ও বর্ত্তমান চরিত্রাদি অসৎ হয়, তাহাহইলে, আমরা সেরূপ পাত্রে কন্যা অর্পণ করি না; কারণ সে যে ভবিষ্যৎ জীবনে কষ্ট পাইবে—ইহা আমরা স্থির করিতে পারি। যাহাঁর বুদ্ধি যত স্থির, যত সূক্ষ্ম, সে তত স্থির ও সূক্ষ্ম বিচার করিয়া অধিকতর নিশ্চয় সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে। যোগীর সমাধিনির্ম্মলচিত্ত অতি স্থির ও অতি সূক্ষ্ম এইজন্য তিনি সাধারণ অপেক্ষা সেই ভাবী পাত্রের ভবিষ্যৎ জীবন স্পষ্টতররূপে লক্ষ্য করিতে পারেন। এমন কি যোগী অপেক্ষা নিম্নাবস্থার সাধকও—যিনি সাধনপথে যত অধিক অগ্রসর হইয়াছেন—তিনি এইসকল বিষয় ততই অধিক অনুভব করিতে পারেন। ক্রমে ক্রমে তিনি সমাধিসিদ্ধ হইলে, তাঁহার এই শক্তি পূর্ণভাবে প্রকটিত হয়। তখন তিনি ত্রিকালজ্ঞ হন।

শব্দার্থপ্রত্যয়ানামিতরেতরাধ্যাসাৎ সঙ্করস্তৎপ্রবিভাগ-সংযমাৎ সর্ব্বভূতরুতজ্ঞানম্ ॥ ১৭ ॥

শব্দ, অর্থ ও প্রত্যয়ের পরস্পর অধ্যাসবশতঃ স্মৃতিসঙ্কর হয় এবং তাহাদের প্রবিভাগে সংযম করিলে সর্ব্বভূতের শব্দজ্ঞান হয়।

শব্দ=একপ্রকার ধ্বনি এবং আমাদের শোত্ররূপ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য

পদার্থ। অর্থ=সেই শ্রোত্রেন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থের জাতি, গুণ ও ক্রিয়াদি বিষয়। প্রত্যয়=সেই অর্থের আকারে আকারিত চিত্তবৃত্তির জ্ঞান। শব্দ, অর্থ ও জ্ঞান ভিন্ন ভিন্ন বিষয় হইলেও ইহারা এক বিষয়ের মত অভিন্ন-ভাবে আমাদের মনে উদিত হয়। মনে কর "গো" একটি শব্দমাত্র, এই শব্দটী আমাদের বাগ্‌যন্ত্র হইতে উচ্চারিত হইল এবং আমাদের কর্ণ তাহা গ্রহণ করিল। এই শব্দরূপ বিষয়ের আশ্রয়স্থান আমাদের বাগ্‌যন্ত্র। ইহার অর্থ—একটী চতুষ্পদ প্রাণী, যাহা আমাদের দুগ্ধ দান করে, যাহার চারিটী পা, দুইটী শিং ও একটী লেজ আছে, যাহা আমাদের গোয়ালঘরে থাকে অর্থাৎ গোয়ালঘর যাহার আশ্রয়স্থান। ইহার প্রত্যয় অর্থাৎ জ্ঞান আমাদের চিত্তে থাকে অর্থাৎ এই প্রত্যয়ের আশ্রয়স্থান আমাদের চিত্ত। অতএব শব্দ একটী পৃথক্ বিষয়, তাহার আশ্রয়স্থান বাগ্‌যন্ত্র। অর্থ আর একটী পৃথক্ বিষয়, তাহার আশ্রয়স্থান গোয়ালঘর এবং প্রত্যয়ও একটী পৃথক্ বিষয়, তাহার আশ্রয়স্থান চিত্ত। এই তিনটী বিষয় পৃথক্ হইলেও, আমরা ইহাদের পৃথগ্‌ভাবে গ্রহণ করি না। তিনটী বিষয়কে একই বিষয়ের ন্যায় গ্রহণ করি—যেন ইহারা ভিন্ন ভিন্ন বিষয় নহে, যেন ইহারা একই বিষয়। ইহা তিনটী বিষয়ের মিশ্রিত জ্ঞান। এইরূপে বিষয় গ্রহণ করিলে আমরা কোন একটী বিষয়ের সুস্পষ্ট জ্ঞান প্রাপ্ত হই না। মনে কর তেঁতুল, গুড় ও মরিচের ঝাল দিয়া একটী সরবৎ প্রস্তুত করা হইয়াছে। সেই সরবৎ খাইয়া আমরা অম্ল, মধুর ও কটুরসের আস্বাদ মিশ্রিতভাবে পাইলাম। অম্লের স্বতন্ত্র স্ফুট আস্বাদ পাইলাম না, বা মিষ্ট বা কটু আস্বাদের স্বতন্ত্র স্ফুট জ্ঞান হইল না। ইহাদের পরস্পরের মিশ্রিত একটী জ্ঞান হইল। এইরূপ আমরা যে সকল শব্দ শ্রবণ করি এবং তাহা হইতে আমাদের যে জ্ঞান হয়, তাহা শব্দ, অর্থ ও প্রত্যয় মিশ্রিত—এইজন্য আমরা শব্দের, অর্থের বা প্রত্যয়ের স্ফুটজ্ঞান পাই না। ইহাদের

কোনটীর স্ফুটজ্ঞান পাইতে হইলে, শুদ্ধ সেইটীর উপর সংযম করিতে হইবে আর অপর দুইটী বাদ দিতে হইবে, তবেই সে বিষয়ে পূর্ণ ও স্ফুট জ্ঞান হইবে।

ভাষাদ্বারা ভাবের প্রকাশ হয়। মানসিক ভাব বাহিরে প্রকাশ করিতে হইলে, জীব ভাষার সাহায্য গ্রহণ করে। প্রত্যেক জীবই তাহার মানসিক ভাব প্রকাশ করে এবং সেই মানসিক ভাব শব্দদ্বারা প্রকাশিত হইলেও, তাহার সমজাতীয় জীব সেই ভাব গ্রহণ করিতে পারে অর্থাৎ সেই ভাব বুঝিতে পারে। ইংরাজের ভাষা ইংরাজে বুঝিতে পারে। বাঙ্গালীর ভাষা বাঙ্গালী বুঝিতে পারে। কুকুরের ভাষা কুকুর বুঝিতে পারে। বিড়ালের ভাষা বিড়াল বুঝিতে পারে। সকল জাতির মনের ভাব এক, কিন্তু ভাষা স্বতন্ত্র। ভাষার ভিন্নতা হইলেও মনের ভাবের ভিন্নতা হয় না। যে যোগী জীবের মনোভাব অবগত হইতে পারেন, তিনি তাহার ভাষাও বুঝিতে পারেন। একজন ইংরাজ বালকের ক্ষুধার উদ্রেক হইলে, সে বলে "I am hungry" (আই অ্যাম হাংরি)। একজন বাঙ্গালীর ছেলের ক্ষুধা পাইলে, সে বলে "আমার ক্ষুধা পাইয়াছে"। এ দুটী ভাষার যদিও ভিন্নতা আছে; তথাপি তাহাদের ভাবের ভিন্নতা নাই। একজন ইংরাজ বালক ক্রুদ্ধ হইয়া বলে "Dam fool", আর একজন বাঙ্গালীর ছেলে ক্রুদ্ধ হইয়া বলে "শালা বাঞ্চৎ"। ইহাদের উভয়ের ভাষার ভিন্নতা আছে বটে; কিন্তু ভাবের ভিন্নতা নাই। সমাধিসিদ্ধ যোগী সমাধি সাহায্যে এই সকল সূক্ষ্ম মনোভাব অবগত হইতে পারেন; সেইজন্য তিনি সকল প্রাণীর মনোভাব বুঝিতে পারেন।

মনের ভাবই ভাষারূপ গ্রহণ করিয়া বাহিরে প্রকাশ পায়। মনের ভাব অব্যক্ত, সাধারণে তাহা জানিতে পারে না; কিন্তু ভাষা ব্যক্ত; সাধারণ লোকে তাহা জানিতে পারে। মনোভাব মনে মনে রাখিলে,

বাহিরের লোকে তাহা জানিতে পারে না; কিন্তু ভাষা দ্বারা বাহিরে প্রকাশ করিলে, সকলেই তাহা জানিতে পারে। মনোভাবও যাহা, ভাষাও তাহা। বাগ্‌যন্ত্র দ্বারা ভাষা বা বাক্য উচ্চারিত হয়। যাহার যেরূপ বাগ্‌যন্ত্র সে সেইরূপ বাক্য উচ্চারণ করে। অব্যক্ত যতক্ষণ অব্যক্তভাবে স্থিতি করিবে, ততক্ষণ আমরা তাহা জানিতে পারিব না। অব্যক্তে স্থিতি—তমোভাব। সেই তমোদ্বারা অব্যক্তে স্থিত মনোভাব যখন রজোগুণদ্বারা পারিচালিত হয়—তখন তাহা সত্ত্বগুণ দ্বারা প্রকাশিত হয়। তমঃ স্থিতি, রজঃ কার্য্য ও সত্ত্ব প্রকাশস্বরূপ। তোমার মনে ক্রোধ আছে, কিন্তু অব্যক্তভাবে আছে কারণ এখন ক্রোধের প্রকাশ নাই। বাহিরে ক্রোধের কোন হেতু পাইলেই রজোগুণ সেই ক্রোধকে জাগরিত করিবে অর্থাৎ ব্যক্ত বা প্রকাশাবস্থায় আনিবে এবং তখন তোমার ক্রোধ বাহিরে প্রকাশ পাইবে। প্রতি জীবের মনে কাম, ক্রোধ, লোভ, হিংসা ও দ্বেষাদি একভাবেই বর্ত্তমান থাকে। ভাবের ভিন্নতা নাই। ভাষার ভিন্নতা আছে। সকলের বাগ্‌যন্ত্র সমান নহে, সেইজন্য সকলের ভাষা এক নহে। কুক্কুর স্বীয় বাগ্‌যন্ত্রানুযায়ী আপন ভাষা উচ্চারণ করে। বিড়াল স্বীয় বাগ্‌যন্ত্রানুযায়ী আপন ভাষা উচ্চারণ করে। এইরূপে প্রত্যেক প্রাণী তাহার নিজ নিজ বাগ্‌যন্ত্রানুযায়ী ভাষা উচ্চারণ করে। বাগ্‌যন্ত্র শব্দের আশ্রয়স্থান। বাগ্‌যন্ত্র হইতে শব্দ উচ্চারিত হয়। এই শব্দকে বাদ দিয়া—শুদ্ধ অর্থমাত্রে সংযম করিলে আমরা প্রাণীর মনোভাব অবগত হই। শব্দ ও অর্থাদি মিশ্রিত করিয়া গ্রহণ করিলে, মনোভাব জানিতে পারি না। চিত্ত শব্দপথ ধরিলে, সেই শব্দপথ ধরিয়া শব্দের উৎপত্তিস্থান বাগ্‌যন্ত্রে যায় এবং তৎপরে বাগ্‌যন্ত্রের ক্রিয়ার উৎপত্তিস্থান মনে যায়। এইরূপে মনে উপস্থিত হইলে, মনোভাব জানিতে পারে। মনের ভাব প্রথমে শব্দরূপ ধারণ করে—পরে সেই

শব্দ বাগ্‌যন্ত্রে আসিয়া ভিন্ন ভিন্ন বর্ণরূপ ধারণ করে। একটী বীজ মৃত্তিকায় প্রোথিত হইল, অগ্রে বৃক্ষের কাণ্ড অংশটী বীজ হইতে বাহির হয়, তৎপরে তাহার শাখাপ্রশাখা ও পত্রপুষ্পাদি প্রকাশিত হয়। সেইরূপ মনোভাব প্রথমে অব্যক্তরূপে থাকিয়া পরে শব্দ ও বর্ণাদিরূপ ধারণ করে। একই বিষয়ের তিনটী রূপ হয়। অব্যক্ত, অর্দ্ধব্যক্ত ও পূর্ণব্যক্ত। অব্যক্ত—মনোভাব, অর্দ্ধব্যক্ত—শব্দ, পূর্ণব্যক্ত—বর্ণাদি আকার। "হরিণ" এই শব্দটী মনের মধ্যে ছিল, পরে শব্দাকার ধারণ করিয়া গলার মধ্যদিয়া মুখে আসিয়া ভিন্ন ভিন্ন বর্ণাকারে প্রকাশ পাইল। হ+রি+ণ। আগে "হ" বর্ণ উচ্চারিত হইল ও লীন হইল—তৎপর "রি" বর্ণ উচ্চারিত হইয়া লীন হইল—পরে "ণ" বর্ণ উচ্চারিত হইয়া লীন হইল। এইটীই শেষবর্ণ; বাগ্‌যন্ত্রে একসঙ্গে দুইটী বর্ণ আশ্রয় করিতে পারে না—একটী বর্ণ উচ্চারিত হইয়া লীন হয়—তৎপরে আর একটী বর্ণ উচ্চারিত হইয়া লীন হয়—তৎপরে আর একটী বর্ণ প্রকাশ পায়। এই তিনটী বর্ণযোগে একটী পদ হইল। বাগ্‌যন্ত্রে পদ অবস্থিতি করে না। বাগ্‌যন্ত্রে মাত্র একটী বর্ণ অবস্থিতি করে। আমাদের কর্ণও এককালে একটীমাত্র বর্ণ গ্রহণ করে, একেবারে সমুদয় পদটী গ্রহণ করে না; কেবল মনের মধ্যে সমুদয় পদটী একভাবস্বরূপে থাকে এবং শ্রোতার মনও সমুদয় পদটী একপ্রযত্নে গ্রহণ করিতে পারে। বর্ত্তমান মনে "হরিণ" আছে। বক্তা কেবলমাত্র "হ" বর্ণটী প্রকাশ করিল এবং শ্রোতাও "হ" বর্ণটী গ্রহণ করিল। তৎপরে বক্তা যদি "রি" বর্ণটী উচ্চারণ না করে, শ্রোতাও তাহা গ্রহণ করিতে পারিবে না; সুতরাং বক্তার মনোভাব শ্রোতা জানিতে পারিবে না। যখন বক্তা তিনটী বর্ণই বাগ্‌যন্ত্র দ্বারা প্রকাশ করিবে এবং শ্রোতা এই তিনটী বর্ণই কর্ণদ্বারা গ্রহণ করিবে তখন এই তিনটী বর্ণ শ্রোতার মনে গিয়া "হরিণ" এই পদ নির্ম্মাণ করিবে। শ্রোতার কর্ণে এই পদ

নির্ম্মিত হয় না—শ্রোতার মনোমধ্যে এই পদ নির্ম্মিত হয়। তখন শ্রোতা বক্তার মনোভাব পূর্ণরূপে জানিতে পারে। সাধারণ লোকের সূক্ষ্ম দর্শনশক্তি নাই; কিন্তু যোগীর সূক্ষ্ম দর্শনশক্তি আছে। যোগী শব্দমাত্রে সংযম করিয়া ও বর্ণাদির বিনা সাহায্যে অপরের মনের মধ্যে যে পদ বিদ্যমান আছে, তাহা জানিতে পারেন অর্থাৎ অপরে মনোভাব বর্ণের দ্বারা প্রকাশ না করিলেও যোগী—সে মনোমধ্যে কি চিন্তা করিতেছে, তাহা বলিয়া দিতে পারেন। এইজন্য যোগী শব্দ, অর্থ ও প্রত্যয়ের প্রবিভাগে সংযম করিয়া সকল প্রাণীর উচ্চারিত শব্দের অর্থজ্ঞান লাভ করিতে পারেন।

সংস্কারসাক্ষাৎকরণাৎ পূর্ব্বজাতিজ্ঞানম্ ॥ ১৮ ॥

সংস্কার-সাক্ষাৎকার হইলে পূর্ব্বজন্মের জ্ঞান হয়।

সংস্কারে সংযম করিলে পূর্ব্বজন্মের জ্ঞান হয়। আমাদিগের চিত্তে সংস্কার পড়িয়া আছে। সেই সংস্কার হইতে বাসনার উদয় হয় এবং বাসনা হইতে কার্য্য হয়। আবার কার্য্য হইতে সংস্কার হয়। আমরা যে কার্য্য করি তাহার সংস্কার আমাদের চিত্তে অঙ্কিত হয়। আমরা ধর্ম্মকার্য্য করিলে ধর্ম্মসংস্কার হয়, আর পাপকার্য্য করিলে পাপসংস্কার হয়। আমরা পূর্ব্বজন্মে যে সকল কার্য্য করিয়াছিলাম, তাহাদের সংস্কার আমাদের চিত্তে আছে, তাহারা চক্ষুর্দ্বারা দৃষ্টিগোচর হয় না। তাহাহইলে কিরূপভাবে সংস্কারসাক্ষাৎকার হইবে? সংস্কার বাহিরের ইন্দ্রিয়ের দ্বারা দেখা যায় না বটে, কিন্তু ভিতরের ইন্দ্রিয় অর্থাৎ অন্তঃকরণদ্বারা দেখা যায় অর্থাৎ অনুভব করা যায়। আমরা প্রত্যেকেই চেষ্টা করিলে আমাদের এবং অপরের পূর্ব্বজন্মের সংস্কার বুঝিতে পারি।

সংস্কার হইতেই আমাদের কার্য্যবাসনা উৎপন্ন হয়। যাহার চিত্তে কামের প্রবল সংস্কার আছে—তাহার মধ্য হইতে কামবাসনা উৎপন্ন হয় এবং সে সর্ব্বদা কামের কার্য্যে রত থাকে। যাহার মনে ক্রোধবাসনা প্রবল, সে সর্ব্বদা ক্রোধের কার্য্যে রত থাকে। যাহার মনে লোভবাসনা প্রবল, সে সর্ব্বদা লোভের কার্য্য করে। এইরূপে কার্য্যপ্রণালী দেখিয়া আমরা অপরের চিত্তের ভাব বুঝিতে পারি। আমাদের নিজেদের মধ্যে কোন্ বাসনা প্রবল বা কোন্ বাসনা অপ্রবল, তাহা আমরা নিজেরাই বুঝিতে পারি। এইসকল বাসনা আমাদের চিত্তের সংস্কার হইতে বাহির হয়—সুতরাং চিত্তপরিদর্শন করা কঠিন নয়। শরীর কার্য্য করে বটে; কিন্তু চিত্তের বাসনানুযায়ী কার্য্য করে। প্রকৃতপক্ষে চিত্তই কার্য্য করে। চিত্ত শরীরকে বাধ্য করিয়া কার্য্য করায়। চিত্তে কার্য্যের বাসনা হইলে শরীর কার্য্য করে। চিত্তে কার্য্যবাসনা না হইলে শরীর কার্য্য করে না। সুতরাং চিত্তই সর্ব্বেসর্ব্বা বা চিত্তের মধ্যস্থ সংস্কারই সর্ব্বেসর্ব্বা। কোন কোন ছেলে চুরি করিতে ভালবাসে এবং সর্ব্বদা চুরি করে। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায়, সে পূর্ব্বজন্মে চোর ছিল। কোন ছেলে সৎ বা বিনয়ী, সে পূর্ব্বজন্মে সৎ বা বিনয়ী ছিল। কোন ছেলে ক্রোধী, সে পূর্ব্বজন্মে ক্রোধী ছিল। পূর্ব্বজন্মের সংস্কারানুযায়ী আমরা ইহজন্মে ব্যবসায়-পরায়ণ হই; সুতরাং আমাদের কার্য্যাবলীই আমাদের সংস্কার। যাহার মধ্যে যে সংস্কার প্রবল—সে সেই সংস্কারের উপর প্রবলরূপে সংযম করিলেই ক্রমশঃ সেই সংস্কার সম্বন্ধে পূর্ণজ্ঞান পাইবে এবং সংস্কার সম্বন্ধে পূর্ণজ্ঞান হইলেই—পূর্ব্বজন্মের জ্ঞান হইবে। সংস্কার সম্বন্ধে পূর্ণজ্ঞান হইলেই আমাদের পূর্ব্বজন্মের জাতি ও দেশ প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ের দর্শন হইবে।

যোগসিদ্ধ ভগবান জৈগীষব্য স্বীয় সংস্কারসাক্ষাৎকার করিয়াছিলেন।

তিনি জাতিস্মর ছিলেন এবং দশ মহাসর্গের জন্মপরম্পরা ও কার্য্যপরম্পরা সমস্ত দর্শন করিয়াছিলেন। ভগবান্ আবট্য তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "ভগবন্! আপনি জাতিস্মর—আপনি দশ মহাসর্গের জন্মপরম্পরা সন্দর্শন করিয়াছেন। এই দশ মহাসর্গে আপনি কোটী কোটী জন্মপরিগ্রহ করিয়াছেন এবং সেই সেই জন্মের নানাপ্রকার সুখ ও দুঃখ ভোগ করিয়াছেন। আপনি কখনও স্বর্গসুখ ভোগ করিয়াছেন এবং কখনও বা নারক ও তির্য্যগ্‌যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া নানাপ্রকার যাতনা ভোগ করিয়াছেন। বলুন দেখি, এই দীর্ঘকালব্যাপী সুখ দুঃখের মধ্যে কাহার আধিক্য দর্শন করিয়াছেন?" ভগবান্ জৈগীষব্য বলিলেন,—"আমি দেব বা মনুষ্য জন্মে যে সকল সুখভোগ করিয়াছি এবং নারক ও তির্য্যগ্‌যোনিতে যে সকল দুঃখভোগ করিয়াছি, আমার চিত্তশুদ্ধি হওয়ার পর—আমি স্পষ্ট অনুভব করিতেছি এবং আমার বেশ স্মরণ হইতেছে যে, তৎসমস্তই দুঃখ—তাহাতে সুখের লেশমাত্র নাই।" ভগবান্ আবট্য পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মহাত্মন্! ভগবৎসাধকেরা যে নিবৃত্তিপথ অবলম্বন করিয়া প্রকৃতিকে বশ করেন—সেই প্রধানবশিত্ব হইতে জাত যে নির্ম্মল সুখ—তাহাও কি সুখমধ্যে গণ্য নহে?" ভগবান্ জৈগীষব্য বলিলেন,—"নিবৃত্তিপথ-সঞ্জাত প্রকৃতিবশীকরণের সুখ—বৈষয়িক সুখ অপেক্ষা নির্ম্মল ও উৎকৃষ্ট বটে; কিন্তু কৈবল্যসুখের তুলনায় তাহাও দুঃখ বলিয়াই পরিগণিত হয়।"

প্রত্যয়স্য পরচিত্তজ্ঞানম্ ॥ ১৯ ॥

প্রত্যয়ের সংযমদ্বারা পরচিত্তের জ্ঞান হয়।

প্রত্যয় কাহাকে বলে? খণ্ড খণ্ড জ্ঞানকে প্রত্যয় বলে। চিত্ত

হইতে এই প্রত্যয় উৎপন্ন হয়। নিজের চিত্ত হইতেও প্রত্যয় উৎপন্ন হয় এবং পরচিত্ত হইতেও প্রত্যয় উৎপন্ন হয়। আগে নিজ চিত্তের প্রত্যয়ে সংযম অভ্যাস করিতে হয়। নিজ চিত্তে সংযম খুব ভালরূপে অভ্যাস করিলে পরচিত্তে সংযম করা যায়। পরচিত্তে সংযম করিলে, তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারা যায়। "আকারৈঃ ইঙ্গিতৈঃ গত্যা চেষ্টয়া ভাসনেন চ"—সাধারণ লোকে অপরের মুখ চক্ষু প্রভৃতি অবয়বের প্রতি লক্ষ্য করিয়া, অথবা তাহার ইঙ্গিতাদি দেখিয়া, অথবা তাহার গতি দেখিয়া, বা তাহার সমুদয় কার্য্যচেষ্টা দেখিয়া, বা তাহার কথা শুনিয়া তাহার মনোভাব জানিতে পারে। এইরূপে আভ্যন্তরিক মনোভাব বিশেষ ও স্পষ্টরূপে জানা যায় না, তাহা অস্পষ্ট। কিন্তু যোগী অপরের চিত্তসংস্কারজাত প্রত্যয়ে সংযম করিয়া তাহার মনোভাব সুস্পষ্টরূপে জ্ঞাত হন। অনেকে কোন সাধনা না করিয়াও স্বভাবতঃ এই ক্ষমতা পায়। চিত্তস্থিরতাই প্রধান কার্য্য। চিত্ত স্থির করিতে পারিলে, আমরা জগতে অনেক অলৌকিক ক্ষমতা প্রাপ্ত হই। তোমার চিত্তকে সম্পূর্ণ শূন্য করিয়া—অপরের দিকে তাকাইয়া বসিয়া থাক। এইরূপে কিয়ৎক্ষণ বসিয়া থাকিলে, তোমার শূন্য চিত্তে অপরের মনোভাব আসিয়া স্থান অধিকার করিবে; তখন তুমি সহজেই তাহার মনোভাব বুঝিতে পারিবে। সাধন করিতে করিতে সকল সাধকেরই অল্পাধিক এই ক্ষমতা জন্মায়, কিন্তু প্রকৃত সাধক ইহার দিকে আদৌ লক্ষ্য করেন না। এইসকল বিভূতি লইয়া নাড়াচাড়া করিলে শক্তি ক্ষয় হইয়া যায় ও সাধনপথে বিঘ্ন উপস্থিত হয়।

ন চ তৎ সালম্বনং তস্যাবিষয়ীভূতত্বাৎ ॥২০॥

তাহার সালম্বনজ্ঞান হয় না, কারণ তাহার আলম্বন যোগীর চিত্তের অবিষয়ীভূত।

পূর্ব্বসূত্রে যে পরচিত্তের জ্ঞানের কথা বলা হইয়াছে, সে জ্ঞান আলম্বনের সহিত হয় না। মনে কর, কোন লোক বাঘ দেখিয়া ভয় পাইয়াছে। সে যে ভয় পাইয়াছে তাহা যোগী বলিতে পারেন; কিন্তু ভয়ের কারণ অর্থাৎ আলম্বন যে "বাঘ" তাহা যোগী জানিতে পারেন না। এইজন্য যোগী রাগযুক্ত প্রত্যয়মাত্র জানিতে পারেন; রাগের বিষয়টী জানিতে পারেন না। রাগযুক্ত জ্ঞানে সংযম করিলে "রাগ" জানিতে পারেন, "রূপ" জানিতে পারেন না। রূপজ জ্ঞানে সংযম করিলে রূপ জানিতে পারা যায়। তাহার রূপজ জ্ঞানে সংযম করিলে বাঘ জানিতে পারা যায়। রাগজ জ্ঞান, রূপজ জ্ঞানের অবিষয়ীভূত অর্থাৎ রাগজ জ্ঞানে রূপ নাই। এইজন্য রাগজ প্রত্যয়ে সংযমদ্বারা সেই প্রত্যয়ের আলম্বন "রূপ" দর্শন করা যায় না।

কায়রূপসংযমাৎ তদ্গ্রাহ্যশক্তিস্তম্ভে চক্ষুঃপ্রকাশাঽসম্প্রয়োগেঽন্তর্দ্ধানম্ ॥ ২১ ॥

শরীরের রূপভাগে সংযম করিলে, সেই রূপের গ্রাহ্যশক্তিস্তম্ভ হইলে শরীরের রূপভাগ চক্ষুপ্রকাশের অবিষয়ীভূত হওয়াতে অন্তর্দ্ধান সিদ্ধ হয়।

চিত্ত স্থির হইলে নানাপ্রকারে চিত্তের শক্তি বর্দ্ধিত হয়। আমাদের দেহ পঞ্চভূতময়। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটীর মিলনে দেহ সৃষ্ট হইয়াছে। দেহের মধ্যে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ ব্যতীত আর কিছু নাই। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ বাদ দাও—দেহ থাকিবে না। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধজ্ঞান লইয়াই জগৎ আছে। এই পাঁচটী জ্ঞান বাদ দিলে জগৎ থাকিবে না। আমাদের ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জগতের জ্ঞান হয়। যাহার এই পাঁচটী ইন্দ্রিয়ের একটী ইন্দ্রিয়ও নাই,

তাঁহার জগৎজ্ঞান নাই। যোগীরা এই পাঁচটী ইন্দ্রিয় নিরুদ্ধ করিয়া সমাধি করেন; সমাধি অবস্থায় যোগীর নিকট হইতে জগৎ অন্তর্হিত হয়। এক একটী তন্মাত্রদ্বারা এক একটী ইন্দ্রিয় প্রস্তুত হইয়াছে। যে তন্মাত্রদ্বারা যে ইন্দ্রিয় প্রস্তুত হইয়াছে, সেই ইন্দ্রিয়দ্বারা আমরা সেই বিষয়ের জ্ঞান সঞ্চয় করি। শ্রবণেন্দ্রিয় শব্দতন্মাত্রদ্বারা প্রস্তুত, এজন্য শ্রবণেন্দ্রিয়দ্বারা আমাদের শব্দজ্ঞান হয়। স্পর্শেন্দ্রিয় (ত্বক্) স্পর্শতন্মাত্র (বায়ু) দ্বারা প্রস্তুত, এজন্য ত্বগ্‌দ্বারা আমরা স্পর্শজ্ঞান লাভ করি। দর্শনেন্দ্রিয় রূপতন্মাত্রদ্বারা প্রস্তুত, এজন্য দর্শনেন্দ্রিয়দ্বারা আমরা পদার্থের রূপভাগ গ্রহণ করি। রসনেন্দ্রিয় রসতন্মাত্রদ্বারা প্রস্তুত, এজন্য রসনেন্দ্রিয়দ্বারা আমাদের পদার্থের রসজ্ঞান লাভ হয়। ঘ্রাণেন্দ্রিয় গন্ধতন্মাত্রদ্বারা প্রস্তুত, এজন্য ঘ্রাণেন্দ্রিয়দ্বারা আমরা পদার্থের গন্ধজ্ঞান অবগত হই। যাহার চিত্তসংযম অভ্যাস হইয়াছে, সে চিত্তকে যে কোন বিষয়ে সংযত করিতে পারে। আমরা যেমন বাহিরের বস্তুতে চিত্ত সংযত করিতে পারি, তেমনই আমাদের দেহের রূপভাগের উপর চিত্ত সংযত করিতে পারি। যোগী রূপভাগের উপর চিত্তসংযম করিলে, সেই রূপভাগ যোগীর চিত্তের অধীনে আসিয়া আর অপরের দৃষ্টিগোচর হয় না। যোগী যতক্ষণ সেই রূপভাগে সংযম করিয়া সমাহিত থাকিবেন, ততক্ষণ তাঁহাকে কেহ দেখিতে পাইবে না। সেইরূপ যোগী যদি তাঁহার শব্দভাগের উপর সংযম করেন, তাহাহইলে, কেহ তাঁহার শব্দ শুনিতে পাইবে না। এইরূপ রস ও গন্ধাদি অপরাপর বিষয় সম্বন্ধেও ঐ এক নিয়ম। তিনি নিজের যে কোন তন্মাত্রকে সংযত করিয়া অপরের গ্রাহ্যভাব হইতে নিবৃত্ত রাখিতে পারেন।

সোপক্রমং নিরুপক্রমঞ্চ কর্ম্ম তৎসংযমাৎ

অপরান্তজ্ঞানং অরিষ্টেভ্যো বা ॥ ২২ ॥

সোপক্রম বা নিরুপক্রম কর্ম্মে সংযম করিলে অথবা অরিষ্টদর্শন হইতে অপরান্তের অর্থাৎ মৃত্যুর জ্ঞান হয়।

কর্ম্ম দুই প্রকার,—সোপক্রম ও নিরুপক্রম। যে কর্ম্ম ফলদানে প্রবৃত্ত হইয়াছে—তাহা সোপক্রম; আর যাহা এখনও ফলদানে প্রবৃত্ত হয় নাই কিন্তু ভবিষ্যতে দান করিবার জন্য চিত্তে স্থিতভাবে আছে—তাহা নিরুপক্রম। এই সোপক্রম ও নিরুপক্রম কর্ম্মের সংস্কার লইয়া আমরা জন্মগ্রহণ করিয়াছি ও সেই সেই সংস্কারানুযায়ী জাতি, আয়ুঃ ও ভোগ প্রাপ্ত হইয়াছি। অতএব যেরূপভাবের সংস্কার আছে—সেইরূপভাবের ভোগও হইবে এবং তদনুযায়ী আয়ুঃও হইবে; সুতরাং এইসকল কর্ম্মের উপর সংযম করিলে, আমাদের জীবিতকালের অপরান্তের অর্থাৎ মৃত্যুর জ্ঞান হয়। আয়ুঃর দুটী অন্ত। একটী জন্ম ও অপরটী মৃত্যু। জন্মদিন হইতে আয়ুঃ আরম্ভ হয় এবং মৃত্যুদিবসে অন্ত অর্থাৎ শেষ হয়। এইরূপে চিত্তস্থিত এই দুইপ্রকার কর্ম্মের উপর সংযম করিলে যোগীর মৃত্যুজ্ঞান হয় অর্থাৎ কোন্ দেশে, কোন্ কালে, কিরূপ অবস্থায় তাঁহার মৃত্যু হইবে, তাহা জানিতে পারেন।

অরিষ্টদর্শনেও আমাদের মৃত্যুজ্ঞান হয়। অরিষ্ট তিনপ্রকার,—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক। আধ্যাত্মিক যথা,—কর্ণ বন্ধ করিয়া শরীরের অভ্যন্তরস্থ শব্দ শুনিতে না পাওয়া, চক্ষু চাপিয়া ধরিয়া জ্যোতি দেখিতে না পাওয়া। এইরূপ হইলে ছয়মাসের অধিক বাঁচে না। দেহ হইতে অগ্নিদগ্ধ গন্ধ অথবা শবগন্ধ নির্গত হইলে একমাসের অধিক বাঁচে না। আধিভৌতিক যথা,—যমপুরুষদর্শন ও স্বর্গীয় পিতৃপুরুষ বা অপর কোন মৃত বন্ধুবান্ধব দেখা, অকস্মাৎ কোন বিকৃত

পুরুষ বা উলঙ্গ সন্ন্যাসী দেখা। স্বপ্নমধ্যে যদি দেখা যায় যে কোন রক্তবস্ত্র বা কৃষ্ণবস্ত্রপরিহিতা নারী দক্ষিণদিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে, তাহাহইলে, আসন্নমৃত্যু জানিবে। আধিদৈবিক যথা,—আকাশপথে দেববিমান, দেবতা বা সিদ্ধ দেখা, ভূতপ্রেত বা পিশাচাদি দেখা, গন্ধর্ব্বনগর দেখা অথবা বিপরীত দেখা, যেমন সূর্য্য পশ্চিম হইতে উদিত হইতেছে। এইসকল অরিষ্টদ্বারা মৃত্যু সন্নিকট বুঝিবে। অরির ন্যায় আমাদের ত্রাসের কারণ হয় বলিয়া, ইহাদিগকে অরিষ্ট বলে। শাস্ত্রে আছে,—"দীপনির্ব্বাণগন্ধঞ্চ সুহৃদ্বাক্যমরুন্ধতীম্। ন জিঘ্রন্তি ন শৃণ্বন্তি ন পশ্যন্তি গতায়ুষঃ।" অর্থাৎ যাহাদের মৃত্যু সন্নিকট, তাহারা দীপনির্ব্বাণগন্ধের ঘ্রাণ পায় না, সুহৃদের সদুপদেশ শ্রবণ করে না, এবং অরুন্ধতী নক্ষত্রকে দেখিতে পায় না। সাধারণ লোকেও অরিষ্ট-দর্শনে মৃত্যুস্থির করিতে পারে, কিন্তু যোগিগণ ইহা সুস্পষ্টরূপে অবগত হন।

মৈত্র্যাদিষু বলানি ॥ ২৩ ॥

মৈত্রী, করুণা ও মুদিতাতে সংযম করিলে বলসকল লাভ হয়।

"মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা"। সুখী ব্যক্তির প্রতি মৈত্রী ভাবনা, দুঃখীর প্রতি করুণা ভাবনা, পুণ্যবানের প্রতি আনন্দ ভাবনা এবং অপুণ্যবানকে উপেক্ষা করিলে চিত্তপ্রসাদ লাভ হয়—মনের অসীম বল হয়। পাপের দ্বারা মন দুর্ব্বল হয়। যাহার মনে পাপ আছে, তাহার শরীরে বল থাকিলেও মন অতি দুর্ব্বল। যাহার মনে পাপ নাই, তাহার কোনস্থলে কাহারও নিকট ভয় পাইবার কারণ নাই; সে সর্ব্বস্থলে সর্ব্বাবস্থায় নির্ভয়। তাহার শারীরিক বল না থাকিলেও মানসিক বল অসীম। মন দুর্ব্বল হইলে মনে শান্তি থাকে না। মন

সর্ব্বদাই অশান্তিতে পূর্ণ থাকে। মনে পাপ থাকিলে, রাগ, দ্বেষ, হিংসা প্রভৃতি নীচ ধর্ম্ম মনে বর্ত্তমান থাকিলে, সে কখনও সুখ পায় না। মনের এই নীচ প্রবৃত্তি দূর করিবার জন্য সাধকেরা মৈত্র্যাদি সাধন করেন। ইহাতে তাঁহাদের মনের ময়লা কাটিয়া যায় এবং মনে অসীম বল হয়। মৈত্রী, করুণা ও মুদিতা ভাবনার বিষয়, এজন্য এ তিনটীকে ভাবনা বা সমাধি করিবে। উপেক্ষা ভাবনার বিষয় নহে; সুতরাং উপেক্ষাতে সমাধি বা সংযম হয় না।

আমরা সর্ব্বদা যে জাতীয় বিষয়ের সম্পর্ক করি, আমাদের চিত্ত সেই ভাবেই অভ্যস্ত হইয়া যায়। সেই ভাবেই থাকিতে ভালবাসে। বিপরীত ভাবে থাকিতে ভালবাসে না। সর্ব্বদা সৎচিন্তা, সদিচ্ছা চিত্তে বর্ত্তমান থাকিলে, চিত্ত সৎ হইয়া যায়, আর অসচ্চিন্তা বা অসদিচ্ছা চিত্তে উদিত হয় না।

বলেষু হস্তিবলাদীনি ॥ ২৪ ॥

হস্তী প্রভৃতি বলবান্ জন্তুর বলে সংযম করিলে সেই সেই বল লাভ হয়

চিত্তের একটা অপূর্ব্ব শক্তি আছে। সে যাহা দৃঢ় ভাবনা করে, তাহাই হইয়া যায়। চিত্ত সাধুসঙ্গে সাধুত্বের ভাবনা করিলে সাধু হইয়া যায়, আবার অসাধু সঙ্গে অসাধুত্বের ভাবনায় অসাধু হইয়া যায়; কামবৃত্তির ভাবনাদ্বারা কামুক হয়, সেইরূপ বল ভাবনা করিয়া বলী হয়। হস্তিবল, সিংহবল বা বায়ুবল যে কোন বলে চিত্তসংযম করিবে, চিত্ত সেই বলে বলীয়ান্ হইবে।

প্রবৃত্ত্যালোকন্যাসাৎ সূক্ষ্মব্যবহিতবিপ্রকৃষ্টজ্ঞানম্ ॥ ২৫ ॥

জ্যোতিষ্মতী প্রবৃত্তির আলোকে ন্যাস করিলে সূক্ষ্ম, ব্যবহিত ও বিপ্রকৃষ্ট বস্তুর জ্ঞান হয়।

চিত্ত যত অধিকতর সংযত হইবে, আভ্যন্তরিক শক্তিও তত বৃদ্ধি পাইবে। অষ্টাঙ্গযোগ সাধন করিতে করিতে বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের উদয় হয় ও চিত্ত হইতে রজঃ ও তমোমল বিদূরিত হয়। স্রোতোবিহীন নির্ম্মল জলাশয়ে সূর্য্যপ্রতিবিম্বের ন্যায়—প্রকাশমান জ্ঞানজ্যোতির নিরন্তর উদয় থাকে। এই জ্ঞানজ্যোতিকেই বিষয়বতী বা জ্যোতিষ্মতী প্রবৃত্তি বলে। দর্পণে পতিত সূর্য্যপ্রতিবিম্বকে যেমন আমরা অন্ধকার ঘরের মধ্যে লইয়া গিয়া, সেখানে কোথায় কোন্ দ্রব্য আছে দেখিতে পাই; সেইরূপ এই জ্যোতিষ্মতী প্রবৃত্তির আলোকসাহায্যে আমরা সূক্ষ্ম, ব্যবহিত ও বিপ্রকৃষ্ট বস্তুর জ্ঞানলাভ করি। এই জ্যোতিষ্মতী প্রবৃত্তির সংযমদ্বারা আমরা পরমাণু প্রভৃতি সূক্ষ্ম পদার্থ, ভূগর্ভে নিহিত গুপ্ত রত্নরাজি বা উচ্চ পর্ব্বতের পরপারস্থিত দূরবর্ত্তী বিষয়ও দর্শন করিয়া তাহার জ্ঞানলাভ করিতে পারি।

ভুবনজ্ঞানং সূর্য্যে সংযমাৎ ॥ ২৬ ॥

সূর্য্যে সংযম করিলে চতুর্দ্দশ ভুবনের জ্ঞান হয়।

চন্দ্রে তারাব্যূহজ্ঞানম্ ॥ ২৭ ॥

চন্দ্রে সংযম করিলে তারাদের ব্যূহজ্ঞান হয়।

চন্দ্রে সংযম করিলে গুচ্ছাকারে অবস্থিত তারকাগণের সন্নিবেশ-পদ্ধতি অবগত হওয়া যায়।

ধ্রুবে তদ্গতিজ্ঞানম্ ॥ ২৮ ॥

ধ্রুবতারকাতে সংযম করিলে, অন্যান্য সকল তারার গতিজ্ঞান হয়।

ধ্রুবনক্ষত্র একস্থানে সর্ব্বদা স্থিরভাবে বর্ত্তমান আছে। ইহার গতি নাই। অপরাপর তারকাগণের গতি আছে। এইজন্য ধ্রুবতারকায় সংযম করিলে অপরাপর তারকার গতি জানিতে পারা যায়।

নাভিচক্রে কায়ব্যূহজ্ঞানম্ ॥ ২৯ ॥

নাভিচক্রে সংযম করিলে কায়ব্যূহজ্ঞান হয়।

যেমন সূর্য্যদ্বারে সংযম করিয়া সমুদয় ভুবনজ্ঞান হয়, সেইরূপ নাভিদ্বারে সংযম করিলে, শরীরের বাত, পিত্ত ও কফ নামক তিনটী দোষ; ত্বক্, রক্ত, মাংস, স্নায়ু, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র নামক সপ্ত ধাতু, এবং শরীরস্থ সমুদয় যন্ত্রাদি ও তাহাদের ক্রিয়াজ্ঞান হয়।

কণ্ঠকূপে ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্তিঃ ॥ ৩০ ॥

কণ্ঠকূপে সংযম করিলে ক্ষুৎপিপাসার নিবৃত্তি হয়। কণ্ঠকূপ (Larynx.)

কূর্ম্মনাড্যাং স্থৈর্য্যম্ ॥ ৩১ ॥

কূর্ম্মনাড়ীতে সংযম করিলে স্থৈর্য্য হয়।

কণ্ঠকূপের নিম্নে বক্ষঃস্থলের মধ্যে যে কূর্ম্মাকার নাড়ী (Trachea) আছে, তাহাতে সংযম করিলে স্থিরতা লাভ হয়।

মূর্দ্ধজ্যোতিষি সিদ্ধদর্শনম্ ॥ ৩২ ॥

মূর্দ্ধজ্যোতিতে সংযম করিলে সিদ্ধদর্শন হয়

প্রাতিভাদ্ বা সর্ব্বম্ ॥ ৩৩ ॥

প্রাতিভ জ্ঞানে সংযম করিলে সমস্তই জানা যায়।

সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে যেমন পূর্ব্বাকাশে সূর্য্যের আভা প্রকাশিত হয় সেইরূপ বিবেকজ্ঞান প্রকাশ হইবার পূর্ব্বে প্রাতিভ জ্ঞান প্রকাশ হয়।

প্রতিভা হইতে উৎপন্ন যে জ্ঞান তাহাকে প্রাতিভ জ্ঞান কহে। অপরের উপদেশে যে জ্ঞান হয়, তাহা প্রতিভ জ্ঞান নহে। কাহারও বিনা উপদেশে যে জ্ঞান, তাহাই প্রাতিভ জ্ঞান।

হৃদয়ে চিত্তসংবিদ্ ॥ ৩৪ ॥

হৃদয়ে সংযম করিলে সংস্কাররহিত চিত্তবিজ্ঞান হয়।

চিত্তের স্থান মস্তক কি হৃদয়, এ বিষয়ে অনেকের মতভেদ আছে। কেহ বলে মস্তক চিত্তস্থান। কেহ বলে হৃদয় চিত্তস্থান। প্রকৃত পক্ষে মস্তিষ্ক ও কশেরুকা মজ্জা মধ্যস্থ যে ধূসরবর্ণ পদার্থ (Grey matter) দৃষ্ট হয়, তাহার মধ্যেই চিত্তস্থান।

সত্ত্বপুরুষয়ো রত্যন্তাসঙ্কীর্ণয়োঃ প্রত্যয়াবিশেষো ভোগঃ পরার্থত্বাৎ স্বার্থসংযমাৎ পুরুষজ্ঞানম্ ॥ ৩৫ ॥

অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ অর্থাৎ ভিন্ন যে সত্ত্ব ও পুরুষ, তাহাদের অবিশেষ

প্রত্যয়কে ভোগ বলে, কেননা তাহা পরার্থ; সুতরাং স্বার্থসংযম করিলে পুরুষজ্ঞান হয়।

পরার্থ=পর+অর্থ=পরের প্রয়োজন। স্বার্থ=স্ব+অর্থ=নিজের প্রয়োজন। প্রকৃতি পরার্থ, আর পুরুষ স্বার্থ। প্রকৃতি নিজে ভোগ করে না, পুরুষের ভোগের জন্য প্রকৃতির বিকার হয়। সতী স্ত্রী নিজের ভোগের জন্য বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত ও বিভূষিত হয় না। তাহার সাজসজ্জা নিজের ভোগের জন্য নহে; কিন্তু স্বামীর ভোগের জন্য। হস্তে অলঙ্কার পরিধান করিলে হস্তের শোভাবর্দ্ধন হয়, তাহা হস্ত ভোগ করে না, তাহা পুরুষ ভোগ করেন। প্রাতঃকালের প্রাকৃতিক শোভা ও সৌন্দর্য্য প্রকৃতি ভোগ করে না, পুরুষ ভোগ করেন। কোকিলের কণ্ঠনিঃসৃত সুমিষ্ট স্বর কোকিলের কণ্ঠ ভোগ করে না,—কোকিলের মধ্যস্থ পুরুষ ভোগ করেন। বিষয়ভোগ প্রকৃতি করে না—পুরুষ করেন। রূপভোগ চক্ষু করে না—পুরুষ করেন। শব্দভোগ কর্ণ করে না—পুরুষ করেন। স্পর্শ ও গন্ধাদি ভোগ ত্বক্ বা নাসিকাদি করে না; কিন্তু পুরুষ করেন। পুরুষকে ভোগ করাইবার জন্যই প্রকৃতির আয়োজন। পুরুষের ভোগের নিমিত্ত প্রকৃতি সদাই প্রস্তুত। পুরুষ প্রকৃতিকে নানাপ্রকারে ভোগ করেন। ভোগ—পুরুষের বন্ধন। ভোগে পুরুষের আত্মস্মৃতি নষ্ট হয়। পুরুষ আপন স্বাতন্ত্র্য ভুলিয়া যান। পুরুষ তখন আপনাকে প্রকৃতি হইতে অভিন্নবৎ বোধ করেন। পুরুষ তখন মনে করেন, "আমি শরীর—আমি ইন্দ্রিয়—আমি মন—আমি বুদ্ধি প্রভৃতি।" পুরুষ যতক্ষণ ভোগে আসক্ত থাকেন, ততক্ষণ স্বাত্মবোধ থাকে না। পুরুষ ভোগের আসক্তি ত্যাগ করিলে—পুরুষ ভোগে বিরত হইলে, প্রকৃতি হইতে ভিন্নতাপ্রত্যয় হয়—তখন পুরুষ আপনার ভ্রম বুঝিতে পারেন এবং ভুল জানিতে পারিয়া নিজে যে কি তাহা ধরিতে পারেন এবং ধরিয়া তাহাতে সংযম করেন। এইরূপ সংযম

হইতে পুরুষজ্ঞান হয়। পূর্ব্বে প্রকৃতির সহিত অভিন্নজ্ঞান ছিল এখন প্রকৃতি হইতে ভিন্নতাজ্ঞান হইল। এখন পুরুষ দ্রষ্টৃস্বরূপ হন এবং প্রকৃতি দৃশ্যস্বরূপ হয়। এখন প্রকৃতি দৃশ্য আর পুরুষ সাক্ষিমাত্র। এই দ্রষ্টা ও দৃশ্যের অভিন্নপ্রত্যয়ই সংসার বা ভোগ বা বন্ধন। আর ভিন্নতাপ্রত্যয়ই মুক্তি।

বুদ্ধির মধ্যে তিনটী গুণ আছে,—সত্ত্ব, রজঃ ও তম। যখন রজঃ ও তমকে অভিভূত করিয়া সত্ত্বগুণ অত্যন্ত প্রকাশশীল হয়, তখন তাহাকে বিবেকপ্রত্যয় বলে। তাহা বুদ্ধির চরম সাত্ত্বিক পরিণাম। এই বুদ্ধি-সত্ত্বে পুরুষের অভিন্নতা জ্ঞানই ভোগ। ভোগে পুরুষের স্বার্থ আছে তাই পুরুষ ভোগ করেন। এই স্বার্থপুরুষ, নির্ম্মল চরম পুরুষ নহেন। স্বার্থ থাকুক বা না থাকুক, স্বরূপপুরুষ একই ভাবে থাকেন। সুতরাং স্বার্থপুরুষ স্বরূপাবস্থিত পুরুষ নহেন। স্বার্থপুরুষ অস্মিতা মাত্র। এই স্বার্থপুরুষে সংযম করিলে স্বরূপাবস্থিত পুরুষের জ্ঞান হয়। এক দিকে বিশুদ্ধ পুরুষ, আর অপরদিকে প্রকৃতি আর মধ্যস্থলে এই স্বার্থ-পুরুষ। এই স্বার্থপুরুষ যখন প্রকৃতির দিকে যান—তখন তিনি বদ্ধ; আর যখন তিনি প্রকৃতিকে ত্যাগ করিয়া পুরুষের অভিমুখে যান, তখন তিনি মুক্ত।

ততঃ প্রাতিভশ্রাবণবেদনাদর্শাস্বাদবার্ত্তা জায়ন্তে ॥ ৩৬ ॥

তাহা হইতে অর্থাৎ স্বার্থপুরুষসংযমজাত পুরুষজ্ঞান হইতে প্রাতিভ জ্ঞান বা সর্ব্বগোচরজ্ঞান, শ্রাবণজ্ঞান বা দিব্যশব্দজ্ঞান, বেদনজ্ঞান বা দিব্যস্পর্শজ্ঞান, আদর্শজ্ঞান বা দিব্যরূপজ্ঞান, আস্বাদনজ্ঞান বা দিব্যরসজ্ঞান এবং বার্ত্তাজ্ঞান বা দিব্যগন্ধজ্ঞান উৎপন্ন হয়।

বুদ্ধির সহিত যখন পুরুষের ভিন্নতাজ্ঞান হয় অর্থাৎ অভিন্নজ্ঞান

তিরোহিত হয়, তখন তাঁহার সমস্ত সূক্ষ্মবিষয়ক জ্ঞান হয়। পূর্ব্বে যে ইন্দ্রিয়দ্বারা কেবলমাত্র স্থূল বিষয়ের জ্ঞান হইতেছিল, এক্ষণে ইন্দ্রিয়গণ মলিনতাবিহীন হওয়াতে, তাহাতে সূক্ষ্মজ্ঞানের আবির্ভাব হইল। আমাদের বুদ্ধির মধ্যে সর্ব্বদা হিংসা, দ্বেষাদি অপবিত্র মলিন গুণসকল বর্ত্তমান রহিয়াছে। সেইজন্য আমাদের বুদ্ধিমধ্যস্থ বিচারশক্তি এবং জ্ঞান বিশুদ্ধ নয়। বুদ্ধি মলিন হইলেই, তাহার অধীনস্থ মন ও ইন্দ্রিয়াদিও মলিন হইবে। বুদ্ধির মধ্যেও যেমন হিংসা ও দ্বেষাদি মল বিদ্যমান আছে, মন ও ইন্দ্রিয়াদির মধ্যেও সেইরূপ মল মিশ্রিত আছে। যমনিয়মাদি যোগাঙ্গসকল পালন করিতে করিতে এই মল বিদূরিত হয়; তখন বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয়াদি নির্ম্মল ও শুদ্ধ হয়। তখন ইহাদের প্রকৃষ্ট বিশুদ্ধ জ্ঞান ও সূক্ষ্মদর্শনাদি শক্তি জন্মায়। বুদ্ধির মলিনতা অপগত হইলে, পুরুষের বিবেক উৎপন্ন হয়। তখন পুরুষ নিজে যে কি, তাহা বুঝিতে পারেন, তখন পুরুষ প্রকৃতি হইতে যে ভিন্ন তদ্বিষয়ক জ্ঞান হয় এবং তখন ইন্দ্রিয়াদিরও সূক্ষ্ম দিব্যজ্ঞান হয়।

তে সমাধাবুপসর্গা ব্যুত্থানে সিদ্ধয়ঃ ॥ ৩৭ ॥

তাহারা সমাধিতে উপসর্গ আর ব্যুত্থানে সিদ্ধি।

এইসকল সূক্ষ্মদর্শনকে সিদ্ধি বলে। ব্যুত্থানকালে অর্থাৎ ভোগকালে তাঁহারা সিদ্ধি; কিন্তু ইহারা সমাধির পরম শত্রু। নিয়মমত সাধন করিলে, প্রত্যেক সাধকই অল্পাধিক সিদ্ধিলাভ করে। নিম্নশ্রেণীর সাধকেরা এই সিদ্ধি পাইয়াই নিজেদের কৃতার্থ মনে করে এবং এই সিদ্ধিভোগেই উন্মত্ত হয়। তাহারা কৈবল্য প্রাপ্ত হয় না। আর যে সাধকেরা এইসকল সিদ্ধিকে অতি তুচ্ছ বিবেচনা করিয়া, তাহাদিগের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, সাধন ও সমাধিতে অগ্রসর হন, তাঁহারাই

কৈবল্য প্রাপ্ত হন। স্থূল বিষয় যেমন বন্ধন, সূক্ষ্ম বিষয়ও তদ্রূপ বন্ধন।

বন্ধকারণশৈথিল্যাৎ প্রচারসংবেদনাচ্চ চিত্তস্য পরশরীরাবেশঃ ॥ ৩৮ ॥

বন্ধকারণ শিথিল হইলে এবং প্রচারসংবেদন হইলে চিত্তের পরশরীরাবেশ সিদ্ধ হয়।

"আমি শরীর", "আমি ইন্দ্রিয়", "আমি মন", ও "আমি বুদ্ধি"—এরূপ জ্ঞান বন্ধের কারণ। "আমি শরীর ও ইন্দ্রিয়াদি নহি"—যখন এইরূপ জ্ঞান হইবে তখন বন্ধের কারণ শিথিল হইবে। প্রচারসংবেদন হইলে অর্থাৎ যে নাড়ীর মধ্য দিয়া চিত্ত গমনাগমন করে, সংযমদ্বারা তাহার জ্ঞান হইলে, চিত্ত পরশরীরে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয়। তখন চিত্ত অপর কাহারও মৃত বা জীবিত শরীরে প্রবেশ করিতে পারে। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য অমরক রাজার মৃতশরীরে প্রবেশ করিয়া কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন।

উদানজয়াজ্জলপঙ্ককণ্টকাদিষ্বসঙ্গ উৎক্রান্তিশ্চ ॥ ৩৯ ॥

উদানজয় হইতে জল, পঙ্ক ও কণ্টকাদির সঙ্গ হয় না এবং স্বেচ্ছায় প্রাণের উৎক্রান্তি হয়।

প্রাণবায়ুদ্বারা আমাদের শরীরের সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধ হয়। ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যের জন্য প্রাণবায়ুর ভিন্ন ভিন্ন নাম হইয়াছে। যেমন রামবাবু যখন বিচারালয়ে বিচারাসন অধিকার করিয়া বসেন—তখন তাঁহার নাম হয় ম্যাজিষ্ট্রেট। আবার যখন মদ্যপান করেন—তখন তাঁহার

নাম মাতাল। আবার যখন বেশ্যাগৃহে গমনাগমন করেন—তখন তাঁহার নাম লম্পট। সেইরূপ প্রাণবায়ুর পাঁচটী বিভিন্ন কার্য্যহেতু পাঁচটী নাম হইয়াছে; যথা,—প্রাণ, অপান, উদান, সমান ও ব্যান। ঊর্দ্ধে বহনশীল বায়ুকে "উদান" বলে। পৃথিবী আমাদের শরীরকে সর্ব্বদা নিম্নে আকর্ষণ করিতেছে। যে বায়ুর সাহায্যে পৃথিবীর আকর্ষণশক্তি অভিভূত করিয়া আমরা শরীরকে ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিতে পারি, তাহাকে "উদান বায়ু" বলে। উদান বায়ুর সাহায্যে আমরা চলিবার সময় পৃথিবী হইতে পা তুলিতে সমর্থ হই—লম্ফ প্রদান করিতে পারি। উদান বায়ুতে সংযম করিলে শরীর অত্যন্ত লঘু হয়, তখন জলের উপর দিয়া চলিতে পারা যায়, কণ্টকের উপর দিয়া চলিলে পদে কণ্টক বিদ্ধ হয় না, পঙ্কের উপর দিয়া চলিলে পঙ্কে পদ নিমগ্ন হয় না। তক্তার উপর লোহার কাঁটা মারিয়া তাহার উপর শয়ন এবং উপবেশন করিলেও কোন কষ্ট হয় না। মৃত্যুর সময় যোগী স্বেচ্ছায় প্রাণকে শরীর হইতে বিনির্গত করিতে পারেন। মৃত্যুতে তাঁহার কোন কষ্ট হয় না।

সমানজয়াজ্জ্বলনম্ ॥ ৪০ ॥

সমানজয় হইতে জ্বলন হয়।

আমরা যাহা কিছু ভোজন করি, জঠরাগ্নি সেই সমুদয় পরিপাক করে এবং সমান বায়ু সেই অন্নরসের সমনয়ন করে অর্থাৎ সেই অন্নরস শরীরের যেখানে যেমন আবশ্যক—সেইখানে সেইরূপভাবে সেই সেই শারীর যন্ত্রের পরিপোষণ করে এবং প্রয়োজনমত এই অগ্নিকে সর্ব্বশরীরে প্রেরণ করিয়া দেহের উষ্ণতাসাধন করে। এই কারণে ইহাকে "সমানবায়ু" বলে। এই সমানবায়ুকে সংযত করিলে, উক্ত

অগ্নিও আমাদের আয়ত্তে আসে। তখন যোগী ইচ্ছামত তাঁহার শরীরকে উজ্জ্বল করিতে পারেন বা ভস্মে পরিণত করিতে পারেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্র যোগাগ্নিদ্বারা স্বীয় দেহ ভস্মীভূত করিয়াছিলেন।

শ্রোত্রাকাশয়োঃ সম্বন্ধসংযমাৎ দিব্যং শ্রোত্রম্ ॥ ৪১ ॥

শ্রোত্র এবং আকাশের সম্বন্ধে সংযম করিলে দিব্য শ্রোত্রলাভ হয়।

শব্দতন্মাত্র হইতে আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে এবং শব্দতন্মাত্রের সাত্ত্বিক অংশ হইতে জ্ঞানেন্দ্রিয় শ্রোত্র এবং রাজসিক অংশ হইতে কর্ম্মেন্দ্রিয় বাক্ এবং তামসিক অংশ হইতে প্রাণ উৎপন্ন হইয়াছে। স্পর্শতন্মাত্র হইতে বায়ু এবং উক্ত তন্মাত্রের সাত্ত্বিক অংশ হইতে জ্ঞানেন্দ্রিয় ত্বক্, রাজসিক অংশ হইতে কর্ম্মেন্দ্রিয় পাণি এবং তামসিক অংশ হইতে উদান উৎপন্ন হইয়াছে। রূপতন্মাত্র হইতে তেজ বা অগ্নি উৎপন্ন হইয়াছে এবং উক্ত তন্মাত্রের সাত্ত্বিক অংশ হইতে জ্ঞানেন্দ্রিয় চক্ষু, রাজসিক অংশ হইতে কর্ম্মেন্দ্রিয় পাদ এবং তামসিক অংশ হইতে ব্যান উৎপন্ন হইয়াছে। রসতন্মাত্র হইতে অপ্ এবং উক্ত তন্মাত্রের সাত্ত্বিক অংশ হইতে জ্ঞানেন্দ্রিয় রসনা, রাজসিক অংশ হইতে কর্ম্মেন্দ্রিয় পায়ু এবং তামসিক অংশ হইতে অপান উৎপন্ন হইয়াছে। গন্ধতন্মাত্র হইতে ক্ষিতি এবং উক্ত তন্মাত্রের সাত্ত্বিক অংশ হইতে জ্ঞানেন্দ্রিয় নাসিকা, রাজসিক অংশ হইতে কর্ম্মেন্দ্রিয় উপস্থ এবং তামসিক অংশ হইতে সমান উৎপন্ন হইয়াছে। এইসকল কারণে আমরা বুঝিতে পারি যে এক শব্দতন্মাত্র হইতেই আকাশ, শ্রোত্র এবং বাক্য বা স্থূল শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে; এইকারণে ইহাদের পরস্পর এরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। আকাশের মধ্যে যত ভিন্ন জীবের শ্রোত্রেন্দ্রিয় আছে—সমুদয় শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের সহিত আকাশের সংযোগ আছে। শ্রোত্রেন্দ্রিয়

অনেক কিন্তু আকাশ এক। এই শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের স্থূল এবং সূক্ষ্ম উভয় শব্দই গ্রহণ করিবার শক্তি আছে। শ্রোত্রেন্দ্রিয় যতক্ষণ রাগদ্বেষাদির দ্বারা মলিন থাকে ও অসংযতাবস্থায় থাকে ততক্ষণ আমাদের সূক্ষ্ম শব্দজ্ঞান হয় না। শ্রোত্রেন্দ্রিয় বিশুদ্ধ হইলে এই শ্রোত্র ও আকাশের যে সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধের বিষয়ে চিত্তসংযম করিলে, আমাদের দিব্য শ্রবণ-শক্তির উদয় হয়।

যেমন চুম্বকের সহিত লৌহের সম্বন্ধ আছে, চুম্বক লৌহকে আকর্ষণ করে; সেইরূপ গন্ধের সহিত নাসিকার সম্বন্ধ আছে, গন্ধ নাসিকাকে আকর্ষণ করে। তেমনি শ্রোত্রের সহিত স্থূল ও সূক্ষ্ম শব্দের সম্বন্ধ আছে, সেই জন্য ইহারা শ্রোত্রকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। সাধারণের শ্রোত্র স্থূলশব্দ গ্রহণ করিতে পারে, সূক্ষ্মশব্দ গ্রহণ করিতে পারে না। যোগাঙ্গ সাধন করিলে যোগীদের শ্রোত্র সূক্ষ্মশব্দ গ্রহণের শক্তিলাভ করে। এইপ্রকারে শব্দ, আকাশ ও শ্রোত্র, ইহাদের পরস্পরের সম্বন্ধ স্থিরচিত্তে ধারণা, ধ্যান ও সমাধি করিলে আমাদের দিব্যশ্রোত্র লাভ হয়। তখন আমরা সকল সময়েই অত্যন্ত দূরদেশের শব্দও শুনিতে পাই। অত্যন্ত দূরবর্ত্তী দেশে বসিয়াও যদি কেহ অপরের সহিত কথোপকথন করে, আমরা তাহা শুনিতে পাই।

কায়াকাশয়োঃ সম্বন্ধসংযমাৎ লঘুতূলসমাপত্তে-শ্চাকাশগমনম্ ॥ ৪২ ॥

কায় ও আকাশের সম্বন্ধে সংযম হইতে এবং লঘুতূলসমাপত্তি হইতে আকাশগমন সিদ্ধ হয়।

যেখানে শরীর, সেখানেই আকাশ। শরীর ব্যাপ্য ও আকাশ ব্যাপক। আবার আকাশ হইতেই ক্ষিতির উৎপত্তি, সুতরাং আকাশ

হইতেই শরীরের উৎপত্তি। আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজ, তেজ হইতে অপ্ এবং অপ্ হইতে ক্ষিতি। এইরূপ শরীরের সহিত আকাশের যে সম্বন্ধ, তাহাতে সংযম করিলে এবং তুলাদি পরমাণু পর্য্যন্ত লঘু পদার্থে সংযম করিলে, যোগীর আকাশগমন সিদ্ধ হয়।

বহিরকল্পিতাবৃত্তির্মহাবিদেহা ততঃ প্রকাশাবরণক্ষয়ঃ ॥ ৪৩ ॥

দেহের বাহিরে যে অকল্পিতা বৃত্তি, তাহাকে "মহাবিদেহা" বলে। মহাবিদেহা সিদ্ধ হইলে চিত্তের সমুদয় প্রকাশাবরণ ক্ষীণ হয়।

বৃত্তি দুইপ্রকার—কল্পিতা ও অকল্পিতা। দেহের মধ্যে অবস্থান করিয়া চিত্তকে বাহিরের কোন বিষয়ে সংযত করার নাম কল্পিতা বৃত্তি। আকাশভাবনা সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম কল্পিতা বৃত্তি। "আমি দেহ নহি—আমি আকাশ" এইরূপ ভাবনা। এইরূপ কল্পিতা বৃত্তি অভ্যাস করিতে করিতে ক্রমশঃ চিত্ত আর দেহে অবস্থান করে না, আকাশে অবস্থান করে এবং আকাশময় হইয়া যায়। ইহাই চিত্তের অকল্পিতা বৃত্তি। কল্পিতা বৃত্তিকে "বিদেহধারণা" বলে, আর অকল্পিতা বৃত্তিকে "মহাবিদেহধারণা" বলে। এই "মহাবিদেহধারণা" সিদ্ধ হইলে চিত্তের প্রকাশের যে আবরণ, তাহার ক্ষয় হয় অর্থাৎ যে আবরণে আবৃত হইয়া চিত্ত প্রকাশিত হইতে পারিতেছিল না, তাহার ক্ষয় হয়। চিত্তের স্বভাব—সমস্ত বিষয় প্রকাশ করা। রজঃ ও তমোমল এবং উহাদের ধর্ম্মাধর্ম্মাদি কার্য্য চিত্তের উপর আবরণ পাতিত করিয়াছে। "মহাবিদেহধারণা" হইলে ঐ আবরণ নষ্ট হইয়া যায় এবং তখন চিত্ত সমুদয় বিশ্বসংসার প্রকাশ করিতে পারে এবং যোগী সর্ব্বজ্ঞ হন।

স্থূলস্বরূপসূক্ষ্মান্বয়ার্থবত্ত্বসংযমাৎ ভূতজয়ঃ ॥ ৪৪ ॥

স্থূল, স্বরূপ, সূক্ষ্ম, অন্বয় ও অর্থবত্ত্ব এই পাঁচটী ভূতরূপের সংযম হইতে ভূতজয় হয়।

প্রথম রূপ "স্থূল"। ভূতের আকার ও গুণকে স্থূলরূপ বলে। মনে কর সন্দেশ একটী ভূত। এই সন্দেশের আকার গোল বা চতুষ্কোণ। ইহার মধ্যে রসগুণ আছে, তাহা মিষ্ট। ইহার মধ্যে গন্ধগুণ আছে। ইহার মধ্যে স্পর্শাদি অপরাপর গুণও আছে। এই আকার ও গুণ লইয়া ইহার স্থূলরূপ।

দ্বিতীয় রূপ "স্বরূপ"। সন্দেশের মধ্যে ক্ষিতির অংশ আছে। সন্দেশের কাঠিন্যই সেই ক্ষিতির স্বরূপ। সন্দেশের মধ্যে অপের ভাগ আছে। সেই অপের স্নেহভাগই অপের স্বরূপ। সন্দেশের মধ্যে উষ্ণতা আছে, তাহাই তেজের স্বরূপ। সন্দেশের মধ্যে সঞ্চরণশীল বায়ু আছে, এই বায়ুর গুণ প্রমাণিতা। প্রমাণিতাই সন্দেশমধ্যস্থ বায়ুর স্বরূপ। সন্দেশের মধ্যে অবকাশ বা আকাশ আছে, সেই আকাশের সর্ব্বগামিতাই তাহার স্বরূপ। ক্ষিতির কাঠিন্যই ক্ষিতির স্বরূপ। অপের স্নেহই অপের স্বরূপ। তেজের উষ্ণতাই তেজের স্বরূপ। বায়ুর প্রমাণিতাই বায়ুর স্বরূপ। আকাশের সর্ব্বগামিতাই আকাশের স্বরূপ। ভূতের এই স্ব স্ব সামান্য রূপই—ইহার স্বরূপ।

তৃতীয় রূপ "সূক্ষ্ম"। আমরা বাহিরে যে শব্দ শ্রবণ করি, তাহা স্থূলশব্দ। এই স্থূলশব্দ সাতপ্রকার, যথা :—সা, ঋ, গা, মা, পা, ধা, নি। স্থূলশব্দে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার শব্দ পাওয়া যায়। এই সকল শব্দ যখন পরমাণুর আকার ধারণ করে, যখন এত সূক্ষ্ম হয়, যে তাহা অপেক্ষা অধিক সূক্ষ্ম হইতে পারে না, তখন তাহাকে "তন্মাত্র" বলে। তন্মাত্রে ভিন্ন ভিন্ন শব্দ নাই—তখন তাহা শব্দমাত্র। সেইরূপ স্থূলরসে মিষ্ট,

তিক্ত প্রভৃতি নানাপ্রকার রস আছে। এই স্থূলরস যখন অত্যন্ত সূক্ষ্ম হয়, তখন তাহাকে রসতন্মাত্র বলে। সেইরূপ স্থূলগন্ধ যখন অত্যন্ত সূক্ষ্ম হয়, তখন তাহাকে গন্ধতন্মাত্র বলে। এই রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র, শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র ও গন্ধতন্মাত্রই ভূতবর্গের তৃতীয় রূপ। সুতরাং ভূতগণের সূক্ষ্মরূপ ভূতকারণ তন্মাত্র, তাহা সামান্যবিশেষাত্মক।

চতুর্থ রূপ "প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি"। ইহারাই ভূতের "অন্বয়রূপ"। প্রতি ভূতের সহিত এই প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতিভাব অন্বিত থাকে। সেইজন্য ইহারা ভূতবর্গের অন্বয়রূপ। বটবৃক্ষ পূর্ব্বে বীজের মধ্যে অব্যক্তভাবে ছিল। পরে ক্রিয়াদ্বারা তাহা বাহিরে বৃক্ষরূপে প্রকাশিত হইল। এইজন্য প্রত্যেক ভূতে এই প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতিভাব আছে। ইহারাই ভূতের অন্বয় রূপ।

পঞ্চম রূপ "অর্থবত্ত্ব"। অর্থবত্ত্ব অর্থাৎ ভোগ বা অপবর্গের বিষয় হয়। পুরুষের ভোগ এবং অপবর্গজন্য ভূতবর্গের সৃষ্টি। ভূতবর্গ পুরুষকে ভোগ এবং অপবর্গ প্রদান করে। ভূতবর্গের নিজের কোন স্বার্থ নাই। পুরুষের স্বার্থসাধনের জন্য ইহারা সৃষ্ট হইয়াছে। এই ভোগ ও অপবর্গ দান করিবার যোগ্যতা ভূতবর্গে আছে। ইহাই ভূতবর্গের পঞ্চম রূপ "অর্থবত্ত্ব"।

ভূতবর্গের উপরোক্ত পাঁচটী রূপের উপর সংযম করিলে ভূতবর্গ-জয় হয়। তাহাহইলে সমুদয় ভূতবর্গ তাহার বশে আসে। কোনও ভূত আর পুরুষের সুখ, দুঃখ বা মোহের কারণ হয় না। তখন যোগী বিষয়ে পূর্ণ বৈরাগ্যবান্ হন। তখন যোগী রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শাদি বিষয়ে আর মুগ্ধ হন না। তখন এই রূপরসাদি আর যোগীর কোন অনিষ্ট করিতে পারে না।

ততোঽণিমাদিপ্রাদুর্ভাবঃ কায়সম্পৎ তদ্ধর্ম্মানভিঘাতশ্চ ॥৪৫॥

তাহা হইতে অর্থাৎ ভূতজয় হইতে অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য্যের প্রাদুর্ভাব হয় এবং কায়সম্পৎ ও কায়ধর্ম্মের অনভিঘাতও সিদ্ধ হয়।

অষ্ট ঐশ্বর্য্য। (১) অণিমা=অত্যন্ত ক্ষুদ্র হওয়া, অণুপরিমাণ হওয়া, যোগী ইচ্ছা করিলে নিজ শরীরকে পিপীলিকা অপেক্ষাও ক্ষুদ্র করিতে পারেন। (২) লঘিমা=অত্যন্ত লঘু অর্থাৎ হাল্কা হওয়া। যোগী ইচ্ছা করিলে এতদূর হাল্কা হইতে পারেন যে মাকড়সার জালের একটী সূত্র অবলম্বন করিয়া উর্দ্ধে উঠিতে পারেন। সূর্য্যকিরণ অবলম্বন করিয়া সূর্য্যে উপস্থিত হইতে পারেন। (৩) মহিমা=নিজের শরীরকে পর্ব্বতাদির ন্যায় বৃহৎ করিতে পারেন। (৪) প্রাপ্তি=অতি দূরবর্ত্তী দ্রব্যও স্পর্শ করিতে পারেন। ইচ্ছা করিলে অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা চন্দ্র স্পর্শ করিতে পারেন। (৫) প্রাকাম্য=ইচ্ছার অনভিঘাত। যোগী ইচ্ছা করিলে ভূমি ভেদ করিয়া উঠিতে পারেন, মৃত্তিকার মধ্যে জলের ন্যায় প্রবেশ করিতে পারেন। কোন কিছুতেই তাঁহার ইচ্ছার ব্যাঘাত জন্মাইতে পারে না। (৬) বশিত্ব=ভূতভৌতিক সমুদয় পদার্থ যোগীর বশে আসে এবং যোগী কাহারও বশে আসেন না। তিনি সকলের অবশ্য। (৭) ঈশিত্ব=ভূতবর্গের উপর পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব করিবার ক্ষমতা। যোগী ইচ্ছা করিলে আমগাছে কাঁঠাল ফলাইতে পারেন। (৮) যত্রকামাবসায়িত্ব=সত্যসঙ্কল্পতা। যোগী যাহা সঙ্কল্প করেন, তাহাই সম্পন্ন করিতে পারেন।

পূর্ব্বোক্ত পাঁচপ্রকার রূপে সংযম করিলে যোগীর এই অষ্ট ঐশ্বর্য্য লাভ হয়। ইহা ব্যতীত তাঁহার রূপ, লাবণ্য ও বলাদি কায়সম্পৎ লাভ হয় আর তাঁহার শরীরধর্ম্মের অনভিঘাত হয় অর্থাৎ যোগী কঠিন পাথরের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারেন, পাথর তাঁহার প্রবেশরোধ

করিতে পারে না। জল যোগীর শরীরকে ভিজাইতে পারে না। অগ্নি যোগীর শরীর দগ্ধ করিতে পারে না। যোগী উলঙ্গ থাকিলেও— তাঁহাকে কেহ দেখিতে পায় না অর্থাৎ অনাবরণাত্মক আকাশ, তাঁহার অনাবরণ অর্থাৎ প্রকাশ করিতে পারে না।

কোন বস্তুর একটীমাত্র রূপ দেখিলে, তাহাকে দেখা হইল না। তাহার পাঁচটী রূপই দেখিতে হইবে। বস্তুর পাঁচটী রূপ দেখিলে আমরা সেই বস্তুকে জয় করিতে পারি। মনে কর কোন একটী অপরিচিত লোক তোমার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। তুমি মাত্র তাহার স্থূলরূপটী দেখিতে পাইলে; কিন্তু সে সাধু কি চোর, তাহা বুঝিতে পারিলে না। সে মনে কি ভাবিতেছে, বা সে কি মনে করিয়া তোমার নিকট আসিয়াছে, তাহার কিছুই তুমি জানিতে পারিলে না: সুতরাং তাহার স্থূলরূপ দেখিয়া—তাহাকে সম্যক্ জানা হইল না। একটী চোরকে চোর জানিয়া তাহার সহিত ব্যবহার করিলে সে তোমায় ঠকাইতে পারিবে না; কিন্তু তাহাকে সাধু মনে করিয়া তাহার সহিত ভদ্র ব্যবহার করিলে সে তোমার অনিষ্ট করিবে। সুতরাং ভূতবর্গের এই পাঁচটী রূপ জানিতে পারিলে, তাহারা আমাদের বশে আসে, আর আমাদের কোন অনিষ্ট করিতে পারে না: অধিকন্তু আমরা উপরোক্ত আটটী ঐশ্বর্য্য, কায়সম্পৎ এবং শরীরধর্ম্মের অনভিঘাত লাভ করি।

রূপলাবণ্যবলবজ্রসংহননত্বানি কায়সম্পৎ ॥ ৪৬ ॥

ভূতজয়সিদ্ধ যোগীর শরীর সুদৃশ্য, মনোহরকান্তিবিশিষ্ট, অতিশয় বলযুক্ত ও বজ্রের ন্যায় দৃঢ় হয়।

বাহ্যভূতজয় হইলে যোগীর রূপ অতি সুন্দর হয়, লাবণ্য মনোহর হয়। সাধারণ মানব অপেক্ষা তাঁহার অলৌকিক রূপমাধুরী হয়।

ভূতবর্গের স্থূলরূপের উপর সংযম করিলে অণিমা, লঘিমা, মহিমা এবং প্রাপ্তি এই চারিটী ঐশ্বর্য্য হয়; স্বরূপে সংযম করিলে, প্রাকাম্য; সূক্ষ্মে সংযম করিলে, বশিত্ব; অন্বয়ে সংযম করিলে, ঈশিত্ব; এবং অর্থবত্ত্বে সংযম করিলে, কামাবসায়িত্ব হয়।

গ্রহণস্বরূপাঽস্মিতাঽন্বয়ার্থবত্ত্বসংযমাদিন্দ্রিয়জয়ঃ ॥ ৪৭ ॥

গ্রহণ, স্বরূপ, অস্মিতা, অন্বয় ও অর্থবত্ত্ব এই পাঁচপ্রকার ইন্দ্রিয়রূপে সংযম করিলে ইন্দ্রিয়জয় হয়। যেমন ভূতবর্গের পাঁচপ্রকার রূপে সংযম করিলে ভূতবর্গজয় হয়, সেইরূপ ইন্দ্রিয়বর্গের পাঁচপ্রকার রূপে সংযম করিলে ইন্দ্রিয়জয় হয়।

প্রথম রূপ "গ্রহণ"। রূপগ্রহণশক্তিই চক্ষু। রসগ্রহণশক্তিই জিহ্বা। গন্ধগ্রহণশক্তিই নাসিকা। শব্দগ্রহণশক্তিই কর্ণ। স্পর্শগ্রহণশক্তিই ত্বক্। যে স্থূল চক্ষু আমরা বাহিরে দেখিতে পাই, তাহা চক্ষুরিন্দ্রিয় নহে। যে স্থূল জিহ্বা, নাসিকা, কর্ণ বা ত্বক্ আমরা বাহিরে দর্শন করি—তাহারা জিহ্বা, নাসিকা, কর্ণ বা ত্বগাখ্য ইন্দ্রিয় নহে। ইহাদের গ্রহণশক্তিই প্রকৃত চক্ষু, জিহ্বা, নাসিকা, কর্ণ বা ত্বগিন্দ্রিয়। চক্ষুর প্রকৃত মূর্ত্তি, চক্ষুর কার্য্য হইতে বুঝিতে পারি। চক্ষুর প্রকৃত মূর্ত্তি বাহিরে প্রকাশিত নাই। সেইরূপ কর্ণ প্রভৃতির প্রকৃত মূর্ত্তি আমরা তাহাদের গ্রহণকার্য্য হইতে বুঝিতে পারি। এই "গ্রহণ" ইন্দ্রিয়াদির প্রথম রূপ।

দ্বিতীয় রূপ "স্বরূপ"। চক্ষু কখনও দর্শন করে এবং কখনও দর্শন করে না। যখন দর্শন করে, তখন তাহার মধ্যে কার্য্য হয়; আর যখন দর্শন করে না, তখন সে কোনও কার্য্য করে না। তখন সে তাহার স্বরূপে বিশ্রাম করে। ইহাই চক্ষুর স্বরূপ। এইরূপ অন্যান্য ইন্দ্রিয়াদিরও স্বরূপ বুঝিতে হইবে। এই স্বরূপশক্তি ইন্দ্রিয়মধ্যে অবস্থান করিয়া

কখনও বা বিষয় পাইলে বিষয়কে গ্রহণ করে এবং কখনও বা বিষয়ের অভাবে নিজের শক্তিমূর্ত্তিতেই বিশ্রাম করে। এই শক্তিমূর্ত্তিই ইন্দ্রিয়ের দ্বিতীয় রূপ।

তৃতীয় রূপ "অস্মিতা বা অভিমান"। বিষয়ে অভিমান না থাকিলে, ইন্দ্রিয়ের কোন কার্য্য হয় না। অভিমানই ইন্দ্রিয়দিগকে কার্য্য করায়। অভিমান না থাকিলে ইন্দ্রিয়কার্য্যও থাকে না। রূপে অভিমান হইলেই, রূপদর্শন হয়। রসে অভিমান হইলেই রসাস্বাদন হয়। সুতরাং এই অস্মিতা বা অভিমান ইন্দ্রিয়ের তৃতীয় রূপ। এই ইন্দ্রিয়াভিমানিনী শক্তিই ইন্দ্রিয়ের তৃতীয় রূপ।

চতুর্থ রূপ "অন্বয়"। এই অভিমানের মূলে সত্ত্ব, রজঃ ও তম এই তিনটী গুণ আছে। এই তিন গুণের সহিত অভিমান অন্বিত থাকে, সেইহেতু ইহা ইন্দ্রিয়ের চতুর্থ রূপ। সত্ত্বে প্রকাশ বা জ্ঞান, রজে ক্রিয়া বা প্রবর্ত্তন এবং তমে স্থিতি বা ধারণ হয়।

পঞ্চম রূপ "অর্থবত্ত্ব"। ইন্দ্রিয়ের কার্য্যে ইন্দ্রিয়ের কোন স্বার্থ নাই। ইন্দ্রিয়েরা পরার্থ। ইন্দ্রিয়গণ পুরুষের ভোগ বা অপবর্গের নিমিত্ত। এই ভোগ বা অপবর্গ তাহাদের অর্থবত্ত্ব। ইহাই ইন্দ্রিয়ের পঞ্চম রূপ।

ইন্দ্রিয়ের এই পাঁচটী রূপে সংযম করিলে, যোগীর ইন্দ্রিয়ের উপর সম্পূর্ণ আধিপত্য জন্মে। ইচ্ছামাত্রে উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি করিতে পারেন। অন্ধকে চক্ষুদান করিতে পারেন। বধিরকে শ্রবণশক্তি প্রদান করিতে পারেন।

ততো মনোজবিত্বং বিকরণভাবঃ প্রধানজয়শ্চ ॥ ৪৮ ॥

ইন্দ্রিয়জয় হইলে মনোজবিত্ব অর্থাৎ মনের ন্যায় দ্রুতগতি, বিকরণ

ভাব অর্থাৎ দেহের অপেক্ষা না করিয়া ইন্দ্রিয়গণের বহির্বিষয়ে বৃত্তিলাভ ও প্রধানজয় অর্থাৎ সমস্ত প্রকৃতিবর্গজয় করিয়া সর্ব্বেশ্বরত্ব লাভ হয়।

মনের ন্যায় দ্রুতগতি কাহারও নাই। কলিকাতায় অবস্থান করিয়া মনকে কাশী বা হরিদ্বারে লইয়া যাইতে অধিক সময় লাগে না। মন ক্ষণমাত্রে তথায় যাইতে পারে। ইন্দ্রিয়জয় হইলে যোগীর এইপ্রকার গতির ক্ষমতা হয়। দেবর্ষি নারদ ক্ষণমধ্যে চতুর্দ্দশ ভুবন ভ্রমণ করিতেন। এরূপ হইলে মনও যেমন শীঘ্র যাইতে পারে—শরীরও তদ্রূপ শীঘ্র ও সহজে যাইতে পারে। কলিকাতায় অবস্থান করিয়া কাশীর বিষয়সকলকে অর্থাৎ চক্ষু ও কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয় রূপ ও শব্দাদি বিষয়কে যোগী ইন্দ্রিয়দ্বারা গ্রহণ করিতে পারেন; ইহাকে বিকরণভাব বলে। কলিকাতায় বসিয়া কাশীর বিশ্বনাথের মন্দিরের আরতি দর্শন করিতেছেন—তথাকার পুরোহিতগণের উচ্চারিত শিবস্তোত্র শুনিতে পাইতেছেন তথাকার পুষ্পাদির গন্ধ আঘ্রাণ করিতেছেন—ইহাকে বিকরণভাব বলে। এইসময়ে প্রকৃতি ও প্রকৃতির কার্য্যসমূহ যোগীর সম্পূর্ণ অধীনে আসে। ইন্দ্রিয়ের পাঁচটী রূপকে জয় করিলে উপরোক্ত মনোজবিত্ব, বিকরণভাব ও প্রধানজয়রূপ তিনটী সিদ্ধি লাভ করা যায়। এই ত্রিবিধ সিদ্ধির নাম মধুপ্রতীকা, কেননা মধুর সমস্ত অঙ্গে যেমন অমৃতরস, এই সিদ্ধিরও সেইরূপ।

সত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতিমাত্রস্য সর্ব্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্বং সর্ব্বজ্ঞাতৃত্বঞ্চ ॥ ৪৯ ॥

সত্ত্ব (বুদ্ধি) ও পুরুষের অন্যতাখ্যাতিমাত্রের (ভেদজ্ঞানমাত্রের) সংযমে সর্ব্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্ব অর্থাৎ সকল ভাবের উপর আধিপত্য এবং সর্ব্বজ্ঞাতৃত্ব সিদ্ধ হয়

পুরুষ বুদ্ধি নয় এবং বুদ্ধিও পুরুষ নয়। ইহারা ভিন্ন পদার্থ। সাধারণ লোকে ইহাদের এক বলিয়াই জানে। চিত্তে যতক্ষণ রজস্তমোমল থাকিবে—ততক্ষণ এই ভেদদর্শন হইবে না। চিত্তের মল পরিষ্কৃত হইলে, চিত্তে আর বিষয়কামনা না উঠিলে, বুঝিতে হইবে চিত্ত পরিষ্কৃত হইয়াছে; তখন বশীকার বৈরাগ্য সিদ্ধ হয় ও বিবেক উৎপন্ন হয়। এই বিবেকজ জ্ঞানে আমরা বুদ্ধি ও পুরুষের ভেদ বুঝিতে পারি। এই ভিন্নতাখ্যাতিমাত্রে সংযম করিলে যোগীর সর্ব্বজ্ঞাতৃত্ব ও সর্ব্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্ব সিদ্ধ হয়। সমস্ত বিষয়ের যে অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ জ্ঞান, তাহা যুগপৎ একসঙ্গে এককক্ষণেই উৎপন্ন হয়, ইহাকে সর্ব্বজ্ঞাতৃত্ব বলে। একটীর পর আর একটী জ্ঞান উদিত হয় না। একেবারেই সব জ্ঞানের উদয় হয়। সমস্ত ভাবের সহিত পুরুষের একেবারেই সংযোগকে সর্ব্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্ব বলে। পুরুষ একেবারেই সমুদয় দৃশ্য দর্শন করেন। ইহার নাম সর্ব্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্ব।

যেমন স্থিরজলে চন্দ্রপ্রতিবিম্ব স্পষ্ট দেখা যায় কিন্তু জল চঞ্চল হইলে দেখা যায় না। সেইরূপ স্থিরচিত্তে বুদ্ধি ও পুরুষের ভেদজ্ঞান সুস্পষ্ট হয়। চিত্তে কামনা থাকিলে চিত্ত চঞ্চল হয়। কামনাশূন্য চিত্ত স্থির। রজঃ ও তমোমল হইতে কামনার উৎপত্তি হয়; এইহেতু চিত্তস্থ রজঃ ও তমোমল পরিষ্কৃত হইলে, চিত্ত পরিষ্কৃত হয়, চিত্তস্থির হয়। স্থিরচিত্তে বিবেকজ্ঞান উৎপন্ন হয়। এইরূপ নির্ম্মলচিত্তে বুদ্ধি ও পুরুষের ভেদজ্ঞান হয় এবং সেই ভেদজ্ঞানে সংযম করিলে যোগীর জ্ঞানরূপা সিদ্ধি —সর্ব্বজ্ঞাতৃত্ব ও ক্রিয়ারূপা সিদ্ধি—সর্ব্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্ব সিদ্ধ হয়। এই সিদ্ধিকে শাস্ত্রে বিশোকা সিদ্ধি বলে।

তদ্বৈরাগ্যাদপি দোষবীজক্ষয়ে কৈবল্যম্ ॥ ৫০ ॥

তাহাতেও বৈরাগ্য হইলে অর্থাৎ সেই বিবেকখ্যাতিতেও আসক্তিহীন হইলে, দোষবীজ অবিদ্যাদি বন্ধন ও ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কর্ম্মবন্ধন নষ্ট হয়, তখন পুরুষের স্বরূপে অবস্থানরূপ কৈবল্য হয়।

সাধকের পক্ষে এই বিবেকখ্যাতি অতি উচ্চ অবস্থা। উচ্চ অবস্থা হইলেও কৈবল্যের সহিত তুলনা করিলে ইহাকেও তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়। বিবেকখ্যাতি বুদ্ধিসত্ত্বের ধর্ম্ম এবং বুদ্ধিসত্ত্বও হেয়, কারণ বুদ্ধিসত্ত্ব বিকারী কিন্তু পুরুষ অবিকারী। পুরুষ এই বুদ্ধি সত্ত্বহইতে ভিন্ন। এইরূপ প্রজ্ঞা বিশিষ্টরূপে হইলে, পুরুষের অনাদি অনন্তকাল হইতে সঞ্চিত সংস্কারবীজ দগ্ধ হইয়া যায়। বীজ দগ্ধ হইলে তাহা প্রসবক্ষমতারহিত হয়, তাহা হইতে আর নূতন সংস্কারের উৎপত্তি হয় না। সুতরাং চিরকালের জন্য যোগী এই সংসারতাপ হইতে মুক্ত হন। তখন বুদ্ধি অদৃশ্য হইয়া লয়প্রাপ্ত হয় এবং গুণের সহিত পুরুষের অত্যন্তবিচ্ছেদ হয়। ইহার নাম কৈবল্য। সুতরাং সর্ব্বজ্ঞাতৃত্ব ও সর্ব্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্ব যদিও অতি উচ্চ অবস্থা, তথাপি হেয়। এই হেয় সিদ্ধি ত্যাগ করিয়া তাহার উপরের কৈবল্য অবস্থা লাভ করিতে হয়। ইহাই সর্ব্বোচ্চগতি। ইহার উপরে আর কিছু নাই।

স্থান্যুপনিমন্ত্রণে সঙ্গস্ময়াকরণং পুনরনিষ্টপ্রসঙ্গাৎ ॥ ৫১ ॥

স্থানীদের দ্বারা অর্থাৎ দেবগণের দ্বারা নিমন্ত্রিত হইলে তাহাতে সঙ্গ (আসক্তি) বা স্ময় (কৃতকৃতার্থ হইলাম এরূপ মনে করা) করিবে না, কেননা তাহাতে পুনর্ব্বার অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা আছে।

প্রবৃত্তিপথে যাওয়া যেমন সহজ, নিবৃত্তিপথে যাওয়া তেমনই কঠিন।

জগতের অধিকাংশ জীবই প্রবৃত্তিমার্গানুগামী। আমরা যদি কাহাকেও নিবৃত্তিপথে গমন করিতে দেখি, তাহাহইলে, আমরা তাহার হিংসা করিয়া থাকি। পরের ভাল আমরা দেখিতে পারি না। পরের ভাল দেখিলে, আমাদের মন হিংসানলে দগ্ধ হয়। সেইজন্য আমরা তাহার উন্নতির পথে বাধা দিই। সে যাহাতে আর অধিক দূর অগ্রসর হইতে না পারে, আমরা প্রাণপণে তাহার চেষ্টা করি। আমরা শত্রুভাব ধারণ করিয়াই হউক আর মিত্রভাব ধারণ করিয়াই হউক তাহার উন্নতিতে বাধাপ্রদান করি। ইহাই জীবের স্বভাব। আমার অপেক্ষা আর একজন বড় হইবে, ইহা কাহারও ইচ্ছা নহে। সকলেই আমা অপেক্ষা ক্ষুদ্র হউক। আমাকে মান্য করুক। আমার তোষামোদ করুক, আমি ইহাই চাই। মানুষে যেমন মানুষের উন্নতিতে বাধা দেয়, দেবতারাও সেইরূপ বাধা দেন। যোগী যখন ঐশ্বর্য্যলাভ করেন এবং ক্রমান্বয়ে উন্নতিপথে অগ্রসর হন, তখন দেবতাদেরও ভয় হয়, তাঁহারা মনে করেন যে এই মানুষটা তাঁহাদের একটা পদ অধিকার করিয়া বসিবে। তাঁহারা ভাবেন, মানুষ তাঁহাদের ক্রীতদাস। মানুষেরা যাগযজ্ঞ করিবে এবং তাঁহাদের হবির্ভোজন করাইবে। আমরা যেমন গরু বা ছাগল পুষিয়া তাহার নিকট হইতে দুগ্ধ দোহন করিয়া লই, আমরা আবার সেইরূপ দেবতাদিগের পোষা গরু ছাগলের ন্যায়। দেবতারা আমাদের নিকট হইতে তাঁহাদের হবি সংগ্রহ করিয়া ভোগ করিয়া থাকেন। আমাদের যেমন একটী গরু মরিয়া বা হারাইয়া গেলে কষ্ট হয়, দেবতাদেরও সেইরূপ একটী মানুষ দেবতা হইলে বা মুক্তি পাইলে কষ্ট হয়—এইজন্য তাঁহারা যোগীর সাধনপথে বিঘ্ন আনয়ন করেন।

যোগের চারিটী অবস্থা,—প্রথমকল্পিক, মধুভূমিক, প্রজ্ঞাজ্যোতিঃ এবং অতিক্রান্তভাবনীয়। যাঁহারা যোগশিক্ষা আরম্ভ করিয়াছেন ও

কিছু কিছু অতীন্দ্রিয় জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা পরের মনের কথা অল্প অল্প বুঝিতে পারেন, ইহাই প্রথমকল্পিক। দ্বিতীয় বা মধুভূমিক অবস্থা—এ অবস্থায় যোগীর নাম হয় ঋতম্ভরপ্রজ্ঞ। এই অবস্থায় যোগী ভূত ও ইন্দ্রিয়বর্গকে জয় করিবার সাধনা করিতেছেন। তৃতীয় অবস্থাকে প্রজ্ঞাজ্যোতিঃ বলে। এ অবস্থায় যোগী পঞ্চভূত ও ইন্দ্রিয়গণকে সম্পূর্ণ বশীভূত করিয়া বিশোক হইয়াছেন। ইহাদের আর কোনও বাসনা বা কর্ত্তব্য নাই। ইহারা জীবন্মুক্ত অবস্থাতে সম্পূর্ণ আরোহণ করিয়াছেন। চতুর্থ অবস্থা অতিক্রান্তভাবনীয়। এ অবস্থায় যোগীর চিত্তলয়রূপ একটী কার্য্য ব্যতীত আর কোন কার্য্য থাকে না।

এই চারি অবস্থার মধ্যে দ্বিতীয় অবস্থার যোগারূঢ় যোগীকে দেবতারা প্রলোভন দেখাইয়া অধঃপাতিত করেন। এই যোগীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, তাঁহারা তাঁহাকে সাদরে নিমন্ত্রণ করেন। স্বর্গের যত উপভোগ্য বিষয় যোগীর সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করেন। যোগীকে অভিবাদন পূর্ব্বক বলেন,—"হে মহাত্মন্! আপনি বহুদিন যাবৎ তপস্যার ক্লেশ সহ্য করিয়াছেন! আপনার পরিশ্রমের ফলস্বরূপ এই স্বর্গলাভ করিয়াছেন! আপনি মহাপুরুষ, আপনি আজ কৃতকৃত্য হইয়াছেন! কিছুদিন এখানে বিশ্রাম করিয়া স্বর্গসুখ ভোগ করুন! এস্থানের সুন্দরী অপ্সরাদিগের সহিত বিহার করুন! এই মন্দাকিনীর জল স্বচ্ছ ও পবিত্র, ইহাতে স্নানাহ্নিক সম্পাদন করুন! এস্থানের অমৃততুল্য রসায়ন পান করুন; জরা ও মৃত্যুর হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিবেন! এখানকার কল্পতরু আপনার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবে! এখানে সিদ্ধ মহর্ষিগণ ও মনোহারিণী দেবকন্যাগণ বাস করিতেছেন। আপনি সুখসম্ভোগের নিমিত্ত দিব্য ইন্দ্রিয়াদি লাভ করিয়াছেন; অতএব সে সকল ইন্দ্রিয় সাহায্যে দিব্যসুখ সম্ভোগ করুন! আপনি স্বীয় ক্ষমতায় এইসকল ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছেন; আর যোগক্লেশ সহ্য করিবার

আবশ্যক নাই!” এইপ্রকার প্রলোভনে পতিত হইয়া সাধক যেন আত্মবিস্মৃত না হন। ভোগের সঙ্গ সর্ব্বদাই আমাদের অনিষ্টসাধন করে। পার্থিব জড় সুখভোগই হউক বা স্বর্গীয় দিব্য সুখভোগই হউক—সকল ভোগই নশ্বর। সকল ভোগই বন্ধন। বন্ধন সর্ব্বদাই বন্ধন—তাহা সোণার শিকলেই হউক বা লোহার শিকলেই হউক বন্ধন, বন্ধন ভিন্ন অপর কিছুই নহে। বিষয় সম্ভোগ করিয়া সুখ বা শান্তি পাওয়া যায় না। বিষয়কে আশ্রয় করিয়া কেহ কখনও সুখী হয় নাই। একমাত্র ভগবানকে আশ্রয় করিতে পারিলেই আমাদের সুখ হয়। জগতে আমাদের প্রকৃত বন্ধু কেহ নাই। আমাদের বিবেকই আমাদের একমাত্র বন্ধু। সর্ব্বদা বিবেকের সহিত পরামর্শ করিয়া কার্য্য করা কর্ত্তব্য। আমাদের নিজেদের মঙ্গল আমরা স্বয়ং যেমন বুঝিব, অপর কেহ তেমন বুঝিতে পারিবে না। অন্যের কথা দূরে থাকুক—দেবতারাও আমাদের বিঘ্নস্বরূপ হইয়া দাঁড়ান। এ অবস্থায় এক বিবেকের সাহায্য ব্যতীত আমাদের অন্য কোনও উপায় নাই। পার্থিব বা স্বর্গীয় বিষয়ের উপর নির্ভর না করিয়া, মানুষের উপর নির্ভর না করিয়া, সর্ব্বদা নিজ বিবেকের উপর নির্ভর করাই একমাত্র উপায়। দ্বিতীয় অবস্থার যোগীদিগকেই দেবতারা প্রলোভন দেখাইয়া থাকেন। দ্বিতীয় অবস্থা অতিক্রম করিলে, সাধক দেবতা অপেক্ষা উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হন। দেবতারা সেস্থানে যাইতে পারেন না। এইসকল প্রলোভন সম্মুখে আসিলে, সাধক তাহাদের সঙ্গ করিবেন না। সঙ্গদোষ আলোচনা করিবেন, “অনাদি অনন্ত জন্ম ও মৃত্যুপ্রবাহে পতিত হইয়া আমি ত্রিতাপে দগ্ধ হইতেছি, কত শত পশু, পক্ষী ও কৃমিকীটাদি জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, কত সৌভাগ্যবলে ভগবৎ-কৃপায় আজ এই সাধনপথের সন্ধান পাইয়াছি এবং এই কষ্টসাধ্য সাধন করিয়া আমার বিবেকজ্ঞানের সঞ্চয় হইয়াছে; এই জ্ঞান

নির্ব্বাপিত হইলে পুনরায় অজ্ঞান আসিয়া আমাকে মহা অনর্থে পাতিত করিবে। জগতে মানুষের প্রলোভনে এবং স্বর্গীয় দেবতাদিগের প্রলোভনে, যদি আমার ভোগতৃষ্ণারূপ বায়ু পুনরায় প্রবাহিত হয়, তাহাহইলে, আমার এই বিবেকরূপ দীপ নিভিয়া যাইবে এবং আমি পুনরায় ঘোর অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে পড়িয়া অশেষ যন্ত্রণা অনুভব করিব। কোনরূপে এই আলোক সংগ্রহ করিয়াও আবার কি নিমিত্ত তাহাকে দূরে নিক্ষেপ করিব?' এইসকল ভোগ স্বপ্নসদৃশ মিথ্যা ও ক্ষণস্থায়ী। যাহাদের অন্তঃকরণ নীচ, তাহারাই এই ভোগ প্রার্থনা করিবে। আমি মোক্ষাভিলাষী। মোক্ষই আমার একমাত্র প্রার্থনীয় বস্তু। হে বিষয়-তৃষ্ণা! হে ভোগস্পৃহা! তোমাদিগকে নমস্কার! তোমাদের কুশল হউক। তোমরা স্বস্থানে প্রস্থান কর, আমাকে অব্যাহতি দাও।" এইরূপে সাধক সেই সকল বিষয় সর্ব্বথা ত্যাগ করিবেন। এইরূপে যোগী সঙ্গত্যাগ করিবেন। শুদ্ধ সঙ্গত্যাগ করিলেই যথেষ্ট হইল না। স্ময়ও ত্যাগ করিবেন। স্ময় কাহাকে বলে? "অহো! আমিত খুব বাহাদুর! আমিত খুব উচ্চে উঠিয়াছি! দেখ! দেবতারাও আমাকে ডাকাডাকি করিতেছেন! ধন্য আমার জীবন! ধন্য আমার তপস্যা! আমি এক্ষণে কৃতকৃতার্থ হইয়াছি!" এই প্রকার অভিমান ও অহঙ্কারকে "স্ময়" বলে। যেমন সঙ্গ ত্যাগ করিবে, সেইরূপ স্ময়ও ত্যাগ করিবে। যদি এই সঙ্গ বা স্ময় ত্যাগ না কর, তাহাহইলে, এই দেবতারা নিশ্চয়ই তোমার অনিষ্টসাধন করিবেন। তাঁহারা সর্ব্বদাই যোগীদের ছিদ্রান্বেষণ করেন ও সুবিধা পাইলেই তাঁহাদের সর্ব্বনাশসাধন করেন!

ক্ষণতৎক্রময়োঃ সংযমাদ্বিবেকজং জ্ঞানম্ ॥ ৫২ ॥

ক্ষণ ও তাহার ক্রমে সংযম করিলে বিবেকজ জ্ঞান হয়।

"ক্ষণ" কাহাকে বলে? কালের অতি ক্ষুদ্র অংশকে ক্ষণ বলে। যেমন দ্রব্যের সূক্ষ্মতম অংশকে পরমাণু বলে, সেইরূপ কালের সূক্ষ্মতম অংশকে ক্ষণ বলে। কোন দ্রব্যকে ভাগ করিতে করিতে তাহা এত ক্ষুদ্র হয় যে আর তাহাকে ভাগ করা চলে না। পুষ্পের যে গন্ধ আমরা আঘ্রাণ করি, তাহাতেও স্থূল অণু আছে, সে অণুকেও ভাগ করা চলে। গন্ধের এই স্থূল অণুকে ভাগ করিতে করিতে তাহা অতি ক্ষুদ্র হইয়া যায়, তাহা সূক্ষ্মতম আকার ধারণ করে। গন্ধের এই সূক্ষ্মতম অংশকে "গন্ধতন্মাত্র" বলে। আমাদের স্থূল ইন্দ্রিয় গন্ধতন্মাত্র আঘ্রাণ করিতে পারে না। গন্ধতন্মাত্র আমাদের স্থূল ইন্দ্রিয়ের অতীত পদার্থ। যোগীরা সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়দ্বারা গন্ধতন্মাত্র আঘ্রাণ করিয়া থাকেন। এই গন্ধতন্মাত্র গন্ধের অতি সূক্ষ্মতম অংশ। এই অংশকে আর বিভাগ করা যায় না। এই গন্ধতন্মাত্র যখন আরও সূক্ষ্ম হয়— তখন আর "তন্মাত্র" থাকে না। তখন "অস্মিতা" হইয়া যায়। তখন তন্মাত্রের লয় হয়। তন্মাত্রই বিষয়ের সূক্ষ্মতম অংশ। রূপের সূক্ষ্মতম অংশ রূপতন্মাত্র। শব্দের সূক্ষ্মতম অংশ শব্দতন্মাত্র। রসের সূক্ষ্মতম অংশ রসতন্মাত্র। স্পর্শের সূক্ষ্মতম অংশ স্পর্শতন্মাত্র। বিষয়ের সূক্ষ্মতম অংশকে—যে অংশের আর বিভাগ হয় না—তাহাকে পরমাণু বলে। তেমনই কালের সূক্ষ্মতম অংশকে ক্ষণ বলে।

লৌকিক ব্যবহারে আমরা এই ক্ষণের সমষ্টি ধরিয়া অনুপল, পল, দণ্ড, দিন, রাত্রি, সপ্তাহ, পক্ষ, মাস ও বৎসরাদি নির্ণয় করিয়া থাকি। প্রকৃত পক্ষে এসকল কিছুই নাই, কেবল ক্ষণই বর্ত্তমান আছে। লৌকিক ব্যবহারে আমরা অতীত ও ভবিষ্যৎ কাল বলি; কিন্তু

অতীত কালও নাই; ভবিষ্যৎ কালও নাই। একমাত্র ক্ষণই বর্ত্তমান আছে। লৌকিক ব্যবহারে আমরা এক ক্ষণের সহিত তাহার পরবর্ত্তী ক্ষণের, আবার তাহার সহিত তৎপরবর্ত্তী ক্ষণের যোগ করিয়া দিন, মাস প্রভৃতি কালের কল্পনা করিয়া থাকি। দিন, মাস প্রভৃতি কল্পনা-মাত্র। ইহাদের বাস্তবতা নাই। প্রকৃতপক্ষে ইহারা কোন বস্তু নহে। প্রকৃতপক্ষে ক্ষণের সহিত ক্ষণের যোগ করা যায় না। একটী ক্ষণ লয় পাইয়া তৎপরে আর একটী ক্ষণের উদয় হইতেছে; সুতরাং ক্ষণের সহিত ক্ষণের যোগ করা অসম্ভব। যদি কাল বলিয়া কোন বস্তু স্বীকার করিতে হয়, তাহাহইলে, ক্ষণই আছে। আর বর্ত্তমান ক্ষণই সর্ব্বদা বর্ত্তমান আছে। অতীতক্ষণও নাই, ভবিষ্যৎক্ষণও নাই, বর্ত্তমানক্ষণই আছে। লৌকিক দৃষ্টিতে ক্ষণ ও কাল বস্তু। যৌগিক দৃষ্টিতে ক্ষণ ও কাল অবস্তু। ইহারা বিকল্পমাত্র। এই সকল শব্দের ব্যবহার হয় এবং এই সকল শব্দের ব্যবহারযোগ্যতা আছে; কিন্তু মূলে কোনও বস্তু নাই। অজ্ঞানে কাল আছে, জ্ঞানে কাল নাই। কাল বলিয়া কোন বাস্তব পদার্থ নাই। ইহা আমাদের কল্পনা।

তবে কাল কল্পনার সৃষ্টি কোথা হইতে হইল? পরমাণুর দেশান্তর-গতি হইতে ক্ষণের সৃষ্টি হইয়াছে। একটী পরমাণুর একদেশ হইতে অন্যদেশে যাইতে যে সময় লাগে তাহাই ক্ষণ বলিয়া উক্ত হয়। দেশান্তরগতি কাহাকে বলে? একস্থান ত্যাগ করিয়া অন্যস্থানে গমন করাকে পদার্থের দেশান্তরগতি বলে। প্রত্যেক গতিই দেশান্তর-গতি। যেখানে গতি থাকে, সেখানেই স্থানপরিবর্ত্তন থাকে। স্থান-পরিবর্ত্তন ভিন্ন গতি হয় না। গতি হইলেই স্থানপরিবর্ত্তন হইল। এই গতি বহুদূর ব্যাপিয়াও হইতে পারে আবার অল্পদূর ব্যাপিয়াও হইতে পারে। কলিকাতা হইতে কাশী যাইলেও গতি হয়, আবার বাড়ী থেকে বাজার গেলেও গতি হয়, আবার এক ঘর থেকে

আর এক ঘরে গেলেও গতি হয়। আমরা যখন হাঁড়িতে করিয়া জল গরম করি, তখন সে জল ফুটিতে থাকে। সেই জল নড়াচড়া করে। সেই জলের মধ্যে গতি হয়। হাঁড়ির মধ্যস্থ প্রত্যেক জলবিন্দু স্থানপরিবর্ত্তন করে, সেইজন্য তাহাদের গতি হয়। গতি হইলেই অবস্থান্তরপ্রাপ্তি হয়। অবস্থান্তরপ্রাপ্তি হইয়াছে অথচ গতি হয় নাই, এরূপ দ্রব্য হইতে পারে না। মাটী অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া ঘট হয়। এই ঘট হইতে হইলে, মাটীর গতি আবশ্যক হয়। মাটীর কোন গতি না হইয়া ঘট হইল, এরূপ হইতে পারে না। শিশু অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া যুবক হইল। শিশুর শরীরে যে পরিমাণে মাংসাদি ছিল, তাহা বর্দ্ধিত হইয়া যুবকের শরীর হইয়াছে; সুতরাং তাহার মাংসাদির মধ্যে গতি হইয়াছে; সুতরাং তাহার মাংসাদির পরমাণুর দেশান্তরপ্রাপ্তি ঘটিয়াছে। পাঁচ বৎসর বয়স্ক শিশুর বিংশতি বৎসর বয়স্ক যুবক হইতে ১৫ বৎসর সময় লাগিয়াছে। এই ১৫ বৎসর ধরিয়া তাহার মাংসের মধ্যে প্রতিক্ষণে মাংসসৃষ্টিরূপ ক্রিয়া চলিয়াছে; প্রতিক্ষণে তাহার মাংসমধ্যস্থ পরমাণু ক্রিয়াশীল বা গতিশীল ছিল। সেই ক্রিয়া বা গতি এত ধীরে ধীরে হইয়াছে যে তাহা আমাদের লক্ষ্যে আসে নাই; কিন্তু এই ১৫ বৎসরে যে একটা বৃহৎ পরিবর্ত্তন হইয়াছে, ইহা নিশ্চিত। আমরা সেই শিশুর ক্ষণিক পরিবর্ত্তন দেখিতে পাই নাই; কিন্তু তাহার কালব্যাপী পরিণাম দেখিতে পাইয়াছি। এইরূপে ক্রিয়া মূল করিয়াই আমরা ক্ষণের সৃষ্টি করিয়াছি৷ শিশুর মাংসমধ্যস্থ প্রতি পরমাণুর যে সময় ব্যাপিয়া দেশান্তরপ্রাপ্তি হইয়াছে, তাহাই এক একটী ক্ষণ। একটী পরমাণু যতটুকু সময় লইয়া দেশান্তর প্রাপ্ত হয়—ততটুকু সময়কে একটী ক্ষণ বলে। এক্ষণে যে ক্ষণ আছে, পরমুহূর্ত্তে আর সে ক্ষণ থাকিবে না। সেইজন্য ক্ষণই বর্ত্তমান আছে, কাল নাই। আবার একটী পরমাণুর

দেশান্তরপ্রাপ্তির উপর ক্ষণ নির্ভর করিতেছে; সুতরাং ক্ষণও নাই। ক্ষণ বা কাল আমাদের কল্পনা মাত্র, বাস্তব পদার্থ নহে। অজ্ঞানে কাল আছে, জ্ঞানে কাল নাই।

যেমন জলতরঙ্গ একবার উঠিতেছে ও আবার পরক্ষণেই লয় পাইতেছে, সেইরূপ ক্ষণপ্রবাহও প্রতিক্ষণে উৎপন্ন ও লয়প্রাপ্ত হইতেছে। একটী ক্ষণের সহিত তাহার পরবর্ত্তী ক্ষণের মিলন নাই; কিন্তু অজ্ঞান দৃষ্টিতে আমাদের মনে হয় যে, ক্ষণপ্রবাহসকল একসঙ্গে মিলিত হইয়া কালরূপ ধারণ করিয়াছে; সেইজন্য আমরা কালকে একটী বাস্তব অবয়ব বলিয়া মনে করি। এই ক্ষণব্যাপী ক্রিয়ার জ্ঞান এবং সেই জ্ঞানের ধারা, তন্মাত্রজ্ঞান ব্যতীত অপর কিছু নহে। এই ক্ষণের যে পর পর উদয়, তাহাই ক্ষণের ক্রম। এই ক্ষণ ও তাহার ক্রমে অর্থাৎ ক্ষণমাত্রে দ্রব্যের যে পরিণাম হয়, তাহাতে সংযম করিলে বিবেকজ্ঞান হয়।

জাতিলক্ষণদেশৈরন্যতানবচ্ছেদাত্তুল্যয়োস্ততঃ প্রতিপত্তিঃ ॥ ৫৩ ॥

জাতি, লক্ষণ ও দেশের তুল্যরূপত্ব নিবন্ধন যে স্থলে দুইটী বস্তুর পার্থক্য অবধারণ করা যায় না, সে স্থলে এই বিবেকজ সূক্ষ্ম জ্ঞান হইতে তাহাদের ভেদ স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়।

জাতিভেদ, লক্ষণভেদ ও দেশভেদ অনুসারে আমরা বস্তুর পার্থক্য অবধারণ করি। জাতিভেদ, যেমন গোজাতি অশ্বজাতি হইতে বিভিন্ন। লক্ষণভেদ, যেমন সাদা গরু কাল গরু হইতে বিভিন্ন। দেশ-ভেদ, যেমন বাঙ্গালাদেশের গরু পশ্চিমদেশের গরু হইতে বিভিন্ন। যে দ্রব্যে আমরা এই তিনপ্রকার ভেদ পাই না, তাহার পার্থক্য নিশ্চয় করিতে পারি না। আমাদের স্থূলদৃষ্টিতে পার্থক্য নিশ্চয় হয়

না বটে, কিন্তু যোগীরা সূক্ষ্মদৃষ্টিবলে এই পার্থক্য নিশ্চয় করিতে পারেন।

বৃক্ষে দুইটী পত্র দেখিতে একরূপ। স্থূল দর্শনে তাহাদের ভেদ দৃষ্ট হয় না; কিন্তু অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে তাহাদের ভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দুইটী বালুকা কণার মধ্যেও যথেষ্ট ভেদ দর্শন করিতে পারা যায়। আবার যোগীর দর্শনশক্তি তদপেক্ষাও সূক্ষ্ম। বস্তুর তন্মাত্রদর্শনে যোগী প্রতি বস্তুর মধ্যেই ভেদ দর্শন করিয়া থাকেন। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে তন্মাত্রদর্শন হয় না। দ্রব্যের সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্মাবস্থা—তন্মাত্র। তদপেক্ষা সূক্ষ্ম গ্রাহ্য অবস্থা আর হইতে পারে না। ক্ষণে যে ক্রম ও পরিণাম হয়, তাহাই সূক্ষ্মতম ভেদ। যোগীর বিবেকজ জ্ঞানে সেই সূক্ষ্মতম ভেদের অবধারণ হয়।

তারকং সর্ব্ববিষয়ং সর্ব্বথা বিষয়মক্রমং চেতি বিবেকজং জ্ঞানম্‌ ॥ ৫৪ ॥

বিবেকজ জ্ঞান তারক, সর্ব্ববিষয়, সর্ব্বথাবিষয় এবং অক্রম।

পূর্ব্বোক্ত সংযম হইতে যে বিবেকজ জ্ঞান হয়, তাহাকে তারক জ্ঞান বলে, কেননা এই জ্ঞান সাধককে অগাধ সংসারসমুদ্র হইতে ত্রাণ করে। ইহাকে সর্ব্ববিষয় জ্ঞান বলে, কেননা এই ব্রহ্মাণ্ডে যতপ্রকার বিষয় আছে, ইহাতে সমুদয় বিষয়েরই জ্ঞান হয়। এমন কোন বিষয় নাই, যাহার জ্ঞান হয় না। ইহা সর্ব্বথাবিষয়, অর্থাৎ এই জ্ঞান হইলে বিষয়ের সর্ব্বাবস্থার জ্ঞান হয়; বিষয়ের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান জ্ঞান হয়। এই বিবেকজ জ্ঞান অক্রম অর্থাৎ ইহা ক্রমশূন্য অর্থাৎ এই সমুদয় জ্ঞান যুগপৎ একেবারেই প্রকাশ,

পায়। একটীর পর আর একটী, এরূপে নয়, একেবারেই সমুদয় জ্ঞান যুগপৎ প্রকাশ পায়।

পূর্ব্বোক্ত সংযম হইতে এবং ইন্দ্রিয়াদির সাহায্য ব্যতীত আমাদের যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাকে প্রতিভা বলে। এই প্রতিভাই যথার্থ জ্ঞানশক্তি। এই প্রতিভা হইতে যে স্বাভাবিক জ্ঞান জন্মে, তাহাকেই তারকজ্ঞান বলে। এই জ্ঞান কাহারও উপদেশজাত নহে। এই জ্ঞান শব্দসাহায্যে জন্মে না। এই জ্ঞান সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান। এই জ্ঞান হইলে; সকল জ্ঞানই হইল। ডাক্তারী জ্ঞানই বল, আর ইঞ্জিনিয়ারী জ্ঞানই বল, আর ওকালতি জ্ঞানই বল, আর ব্যবসাদারী জ্ঞানই বল, আর রাসায়নিকতত্ত্বই বল বা উদ্ভিদ্‌তত্ত্বই বল—সকল জ্ঞানই ইহার মধ্যে নিহিত আছে। এই তারকজ্ঞান আমাদের সকলেরই আছে, কেবল অপ্রকাশিত আছে। যখন রজঃ ও তম আবরণ একেবারে নিঃশেষ হইয়া যাইবে, তখন এই সাত্ত্বিকজ্ঞান প্রকাশ পাইবে। এই সত্ত্বজ্যোতিঃপ্রকাশরূপ প্রতিভা উৎপন্ন হইলে, আপন হইতেই সকল বিষয় প্রকাশিত হয়। কোন বিষয় আর সাধকের নিকট অপ্রকাশিত থাকে না এবং কোন বিষয়ের প্রমাণও আবশ্যক করে না। এই তারকজ্ঞান বিভূতির মধ্যে গণ্য নহে। ইহা আমাদের অন্তিম সময়ের পরম বন্ধু।

এই ব্রহ্মাণ্ডে অনন্তপ্রকারের ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য আছে এবং প্রতি দ্রব্যে বিভিন্নতা বর্ত্তমান আছে। জগতের মধ্যে এমন দুইটী দ্রব্য নাই যাহাদের পরস্পরের মধ্যে সর্ব্ববিষয়ে ঐক্য আছে। দুইটী বালুকাকণাও একপ্রকার হয় না। তুমি কয়টী দ্রব্যের জ্ঞান অর্জ্জন করিতে পার? এই অনন্ত অসীম ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি দ্রব্যের জ্ঞান অর্জ্জন করা অসম্ভব। তুমি কোটি কোটি জন্মগ্রহণ করিয়াও যদি চেষ্টা কর, তাহাহইলেও এই অনন্ত প্রকারের অনন্ত সৃষ্টির জ্ঞানলাভ করা অসম্ভব। এক একটী

পদার্থকে অবলম্বন করিয়া জ্ঞানলাভ করিতে গেলে, কোটী কোটী জন্মেও সময় কুলাইবে না; কিন্তু যে জ্ঞানের উপর এই অনন্ত সৃষ্টি ভাসিতেছে, সেই জ্ঞানকে ধরিতে পারিলেই তোমার সকল জ্ঞানপ্রাপ্তি হইবে। এই জ্ঞানকেই তারকজ্ঞান বলে। তোমার প্রতিভাজ্ঞানের পূর্ণপ্রকাশ হইলেই এই তারকজ্ঞান হইল।

সত্ত্বপুরুষয়োঃ শুদ্ধিসাম্যে কৈবল্যমিতি ॥ ৫৫ ॥

বুদ্ধিসত্ত্ব ও পুরুষের শুদ্ধি ও সাম্যকে কৈবল্য বলে।

বুদ্ধিসত্ত্বের শুদ্ধি কাহাকে বলে? চিত্ত হইতে রজঃ ও তমোমল বিদূরিত হইলেই বুদ্ধিসত্ত্বের শুদ্ধি হয়। তখন চিত্তের সমুদয় সংস্কারের ক্ষয় হইয়া যায়; সুতরাং ক্লেশবীজসকলও দগ্ধ হয় এবং চিত্তে পুরুষের ন্যায় শুদ্ধি উৎপন্ন হয়। সংস্কার না থাকার জন্য, তখন চিত্ত আর বিষয়াকারে পরিণামপ্রাপ্ত হয় না: সুতরাং চিত্ত শুদ্ধ ও নির্ম্মল হয়। আর পুরুষের শুদ্ধি কাহাকে বলে? পুরুষ সর্ব্বদাই নির্ম্মল ও শুদ্ধ। প্রকৃতপক্ষে নূতন করিয়া পুরুষের শুদ্ধি হয় না। যেমন সূর্য্যকে মেঘে ঢাকিলে জগৎ অন্ধকারে আবৃত হয়, কিন্তু সূর্য্য শুদ্ধ, নির্ম্মল ও দীপ্তিমানই থাকে, মেঘরূপ আবরণ দূর হইলেই আবার সূর্য্য প্রকাশিত হয়; সেইরূপ চিত্তের রজস্তমোমল দূর হইলেই আবার পুরুষ স্বরূপে প্রকাশিত হন। বস্তুতঃ পুরুষ কখনও অশুদ্ধ হন না। অণিমাদি সিদ্ধি হউক বা না হউক, এই বিভূতিপাদে বর্ণিত কোনও প্রকার ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হউক বা না হউক, এবং তারকজ্ঞান প্রাপ্ত হউক বা না হউক, যদি এই বুদ্ধি ও পুরুষের শুদ্ধি হয়, তাহাহইলেই, কৈবল্য হইবে। এইসময় পুরুষ স্বরূপে অবস্থান করেন। সাধকের মধ্যে বিভূতি উৎপন্ন হউক বা না হউক, সাধকের সেদিকে দৃষ্টি রাখিবার

আবশ্যক নাই। স্বর্গ, মর্ত্ত্য বা বিভূতি, সমুদয় কামনা ত্যাগ করিয়া সাধনা করিতে হইবে। এইরূপ করিতে করিতে চিত্ত সংস্কারবিহীন হইবে। সর্ব্বকামনাশূন্য হওয়াই সাধনার একমাত্র উদ্দেশ্য। সাধনার দ্বারা অলৌকিক জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্য লাভ হয় বটে, কিন্তু তাহাদের দ্বারা দুঃখের একান্তনিবৃত্তি হয় না। দুঃখের মূল অবিদ্যা। তাহার নাশই আবশ্যক। চিত্তের লয় হইলে, এই দুঃখের অত্যন্তনাশ হয়; সুতরাং অবিদ্যারূপ মূলও ধ্বংস হয়। ইহাই পরমার্থসিদ্ধি। ইহাই কৈবল্য। সংযতচিত্তের অসীম ক্ষমতা। এমন কোন অলৌকিক ও অদ্ভুত কার্য্য নাই, যাহা সংযতচিত্তে করিতে পারে না। প্রভু যীশুখৃষ্ট বলিতেন "Believe—move and the mountain will move at your command" অর্থাৎ নিজের আত্মার শক্তির প্রতি দৃঢ় ও অটল বিশ্বাস রাখিয়া যদি ঐ পর্ব্বতকে স্থানচ্যুত হইতে আজ্ঞা কর, তাহাহইলে, ঐ পর্ব্বতও স্থানচ্যুত হইবে। শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধনধারণও উক্তপ্রকার সংযত চিত্তের ফল। আমরা হিন্দু হইয়া আমাদের ধর্ম্মসম্বন্ধে এতই বীতশ্রদ্ধ হইয়াছি যে, ঋষিদিগের এইসকল উক্তিকে আমরা সম্পূর্ণরূপে অবজ্ঞা করিতে শিক্ষা করিয়াছি। তাহার ফলস্বরূপ শিয়াল কুকুরের ন্যায় দুটা পেটের অন্নের জন্য আজ দ্বারে দ্বারে জুতার ঠোকর খাইতেছি, এখনও আমাদের চেতনা হইতেছে না। আমরা চিত্তে যাহা দৃঢ় ভাবনা করিব, আমরা তাহাই হইব। ভারতের আধিপত্য পাওয়া কঠিন নহে। ত্রৈলোক্যের আধিপত্য পাওয়াও কঠিন নহে। একবার চিত্তশুদ্ধি কর। চিত্ত হইতে রজঃ ও তমোমল দূর কর। তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই সাধনা করিতে পারিবে, তখন তুমি সত্যসঙ্কল্প হইবে।

বিভূতিপাদ সমাপ্ত।

কৈবল্য-পাদঃ।

জন্মৌষধিমন্ত্রতপঃ-সমাধিজাঃ সিদ্ধয়ঃ ॥ ১ ॥

জন্ম, ওষধি, মন্ত্র, তপ ও সমাধি এই পাঁচপ্রকারে সিদ্ধি হইতে পারে।

জন্ম। জন্মের পর সিদ্ধি। কেহ কেহ জন্মগ্রহণ করিবার পর বিনা সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে। ইহারা যদিও এজন্মে সাধনা করে নাই; পূর্ব্বজন্মে সাধনা করিয়াছিল এবং পূর্ব্বজন্মের দেহ সিদ্ধির অনুকূল না হওয়ায় দেহান্তরপ্রাপ্তিতে সেই সিদ্ধি প্রকাশিত হইল। এক্ষণে বৃদ্ধ বয়সে যাহারা সাধনা করিতেছে, তাহারা যদি সিদ্ধিলাভের উপযুক্ত হয় এবং সিদ্ধিলাভের পূর্ব্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহাহইলে পরজন্মে তাহাদিগের এই সিদ্ধি আপনাআপনি প্রকাশিত হইবে। আমরা সচরাচর দেখিতে পাই এক একটী ছেলে খুব অল্প বয়সেই উৎকৃষ্ট গায়ক হয়। ইহার কারণ আর কিছুই নহে, পূর্ব্বজন্মে তাহার এই গীতসাধনা সম্পন্ন হইয়াছিল। এক একটী ছেলের মেধাশক্তি অতি প্রখর; পূর্ব্বজন্মে তাহার মেধাশক্তি সম্বন্ধীয় প্রবল সাধনা ছিল। আমরাও ইহজন্মে যে সাধনা প্রবলভাবে করিব—পরজন্মে তাহার ফল প্রকাশ পাইবে। অতএব কাহারও সামান্যমাত্র সময়ও অলসভাবে অতিবাহিত করা উচিত নহে। ছোট ছোট ছেলেদের এবং মেয়েদের সময় যেন বৃথা অপব্যয় না হয়। তাহারা যেন তাহাদিগের বয়স ও সামর্থ্যানুযায়ী প্রবলভাবে সাধনার অনুষ্ঠান করে। সাধনা বলিতে, কেবল জপ, ধ্যান বা পূজা বুঝায় না। ছোট ছোট ছেলে মেয়ের সাধনা—পিতামাতা ও গুরুজনদিগকে ভক্তি করা, তাঁহাদিগের আদেশ পালন করা, বিদ্যালয়ের পাঠ উত্তমরূপে অভ্যাস করা ইত্যাদি।

ওষধি। ঔষধের প্রভাবে নানাপ্রকার সিদ্ধি হয়। একপ্রকার লতার রস চক্ষে দিলে, নানাপ্রকার অদ্ভুত দেবদর্শনাদি হয়। পূর্ব্বকালে অসুর-ভবনে রাসায়নাদির দ্বারা সিদ্ধির কথা শুনিতে পাওয়া যায়। ক্লোরোফর্ম্ম প্রয়োগে লোকের অনুভবশক্তি লুপ্ত করিয়া ডাক্তারেরা অস্ত্রোপচার সাধন করে। এমন কি অনেকে দেহ হইতে বহির্গত হইতেও পারে।

মন্ত্র। মন্ত্র জপের দ্বারা বা প্রয়োগের দ্বারা অনেকে শরীর হইতে ভূত, প্রেত তাড়াইয়া থাকেন।

তপস্যা। প্রবল তপস্যাদ্বারাও সিদ্ধিলাভ হয়।

সমাধি। সমাধিজাত সিদ্ধিই উৎকৃষ্ট সিদ্ধি। এই সকল কারণে কাহারও কোনও সিদ্ধি দেখিলেই তাহাকে মহাপুরুষ বলিয়া ধারণা করিও না।

জাত্যন্তরপরিণামঃ প্রকৃত্যাপূরাৎ ॥ ২ ॥

প্রকৃত্যাপূরণ হইতে জাত্যান্তরপরিণাম হয়।

জীব একদেহ ত্যাগ করিয়া অন্যদেহ ধারণ করে। সে নূতন দেহ পায় কোথায় আর পূর্ব্বদেহই বা যায় কোথায়? আমরা সচরাচর দেখি, হয় মৃত্যুর পর দেহকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলে, আর নয় মৃত্তিকা-মধ্যে প্রোথিত করে, আর নয়ত অপর প্রাণীতে সেই দেহ ভক্ষণ করে। ভস্মীভূতই হউক, প্রোথিতই হউক বা ভক্ষিতই হউক, দেহের উপাদান বিনষ্ট হয় না; [illegible]নান্তরিত হয় মাত্র। আমরা দেখি, শীত ও গ্রীষ্মকালে পুষ্করিণীর জল শুষ্ক হইয়া যায়, তাই বলিয়া কি সে জল নষ্ট হইয়া যায়? নষ্ট হইয়া যায় না। সেই জল সূর্য্যের উত্তাপে জলাকার ত্যাগ করিয়া বাষ্পাকার ধারণ করে, তাহা হইতে মেঘ হয়; আবার ভবিষ্যতে সেই মেঘ মেঘাকার ত্যাগ করিয়া জলের আকার ধারণ করে। এইসকল

দেখিয়া আমরা বুঝিতে পারি যে, প্রকৃতির কোন উপাদান একেবারে চিরকালের নিমিত্ত নষ্ট হয় না, তাহার আকৃতি, গঠন ও অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় মাত্র। মাটীতে বীজ বপন করিলে, সেই বীজ হইতে শস্য হয়। এই শস্য কোথা হইতে আসে? এই শস্য মাটী হইতে আসে। মাটী রূপান্তরিত হইয়া—মাটীর রূপ ত্যাগ করিয়া শস্যরূপ ধারণ করে। আমরা আবার এই শস্য ভক্ষণ করি; তখন শস্য সেই শস্যরূপ ত্যাগ করিয়া আমাদের শরীরে মাংসাদির রূপ ধারণ করে। পরে এই মাংস পুনরায় মাংসরূপ ত্যাগ করিয়া মাটীরূপ ধারণ করে। এইরূপে আমরা বুঝিতে পারি যে প্রকৃতির কোন উপাদান নষ্ট হয় না। একস্থান হইতে অপরস্থানে বিভিন্ন মূর্ত্তিতে অবস্থান করে মাত্র। যেরূপ স্থূল ক্ষিতি, অপ্, তেজাদি তত্ত্বের পরিণাম হয়, সেইরূপ সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধ্যাদিরও পরিণাম হয়। এই প্রকারে দেবশরীর, দেবশরীরের উপযুক্ত স্থূল ও সূক্ষ্ম উপাদান পায়। মনুষ্যশরীর তদুপযুক্ত উপাদান পায়; পক্ষী, মৎস্য প্রভৃতির শরীর তাহাদের উপযোগী উপাদান প্রাপ্ত হয়। মনুষ্যশরীরে—মনুষ্যের ন্যায় ইন্দ্রিয়াদি, দেবশরীরে—দেবতার ন্যায় ইন্দ্রিয়াদি, পক্ষীশরীরে—পক্ষীর ন্যায় ইন্দ্রিয়াদি হয়। প্রকৃতিই এই সব উপাদান দান করে। প্রকৃতি তাহাদের দেহের জন্য সেইরূপ মাংস, অস্থি, বাগ্‌যন্ত্র, শ্রোত্রেন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধ্যাদি যোগাইয়া থাকে। প্রকৃতিই এইসকল উপাদান পূরণ করিয়া থাকে। মনে কর, তুমি মানুষজন্ম ধারণ করিয়া গাধার ন্যায় কার্য্য করিলে, পরজন্মে তুমি গাধার মাংস, অস্থি ও ইন্দ্রিয়াদি প্রাপ্ত হইবে। প্রকৃতি তোমাকে এই সব উপাদান যোগাইয়া দিবে। আমরা সচরাচর মৃত্যুর পর এই সকল উপাদান পাইয়া থাকি; উৎকট পুণ্য বা পাপের ফলে—ইহজন্মেই এইরূপ শারীরিক রূপান্তর হয়; যেমন রাজপুত্র নন্দীশ্বর উৎকট তপস্যাপ্রভাবে ইহজন্মেই দেবশরীর প্রাপ্ত

হইয়াছিলেন এবং রাজা নহুষ উৎকট পাপের ফলে সর্পশরীর ধারণ করিয়াছিলেন। এইরূপ উৎকট পুণ্য ও পাপের ফলে ইহজন্মেই তাঁহাদিগের শরীর ও ইন্দ্রিয়াদির ঘোর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। এইরূপ ঘোর পরিবর্ত্তন দেখিতে না পাইলেও, পুণ্য ও পাপের ফলে যে শারীরিক ও মানসিক পরিবর্ত্তন হয়, তাহা আমরা লক্ষ্য করিতে পারি। এইজন্য ঘোর পাপিষ্ঠও যদি পুণ্যকার্য্য করিতে থাকে, তাহাহইলে, তাহার মুখাদির রূপ, লাবণ্য ও গঠনাদির পরিবর্ত্তন দেখিতে পাই। সেই মুখ যেন কর্কশ ও কঠোর ভাব পরিত্যাগ করিয়া—সৌম্য ও সুন্দর মূর্ত্তি ধারণ করে। আবার যাহারা নিরন্তর পাপ কার্য্য করে, তাহাদের মুখশ্রী কঠোর, কর্কশ ও বিশ্রী হইয়া যায়। সুতরাং বুঝিতে পারি যে, যে যেরূপ কার্য্য করিবে, প্রকৃতিও তাহাকে সেইরূপ শরীর ও ইন্দ্রিয় দান করিবে। এইরূপে প্রকৃতির আপূরণ হইতেই জাত্যান্তরপরিণাম হয়।

নিমিত্তমপ্রয়োজকং প্রকৃতীনাং বরণভেদস্তু ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ ॥ ৩ ॥

ধর্ম্মাধর্ম্মাদি নিমিত্ত সকল অপ্রয়োজক অর্থাৎ ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম প্রভৃতিকে প্রবর্ত্তনা করে না, কেবল বরণভেদ করে মাত্র অর্থাৎ ধর্ম্ম অধর্ম্মের আবরণকে নষ্ট করে; কিম্বা অধর্ম্ম ধর্ম্মের আবরণকে নষ্ট করে। যেমন ক্ষেত্রস্বামী নিম্নক্ষেত্রে জল আনয়নের প্রতিবন্ধক উচ্চক্ষেত্রের বাঁধ কাটিয়া দেয়।

কৃষকেরা নিম্নক্ষেত্রে জল লইয়া যাইতে হইলে, জলপূর্ণ উচ্চক্ষেত্রের বাঁধ কাটিয়া দেয়। বাঁধ কাটিয়া দিলে, জল আপনিই সবেগে নিম্নক্ষেত্রে প্রবাহিত হয় ও তাহাকে প্লাবিত করে। কৃষক জলগমনের প্রতিবন্ধক

বাঁধ কাটিয়া দেয় মাত্র। জল আপনা হইতেই যায়। কৃষক জলকে লইয়া যায় না। সেই নিম্নক্ষেত্রে যে সকল গাছ আছে, সেইসকল গাছের মূলে জল আপনিই প্রবেশ করে। কৃষককে আর প্রত্যেক গাছের মূলে জল যোগাইতে হয় না। তবে সেই সকল গাছের মূলে যদি কোন আগাছা, তৃণ, কণ্টকলতাদি থাকে, তবে কৃষক কেবলমাত্র সেই তৃণ ও কণ্টকলতাদি তুলিয়া ফেলে, তাহাহইলে, তাহার অভিপ্রেত গাছের মূলে যথাপরিমাণ জল প্রবেশ করে এবং তাহার অভিপ্রেত গাছটী ঐ সমুদয় জল শোষণ করিয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ফলপ্রদান করে, কিন্তু যদি তৃণ ও কণ্টকলতাদি তুলিয়া না ফেলা হয়, তাহাহইলে, ঐ জলের দ্বারা তৃণ ও কণ্টকাদি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া, তাহার অভিপ্রেত আবশ্যকীয় গাছটীকে নষ্ট করিয়া ফেলে এবং কৃষকও তাহা হইতে কোন ফল প্রাপ্ত হয় না। এইকারণে কৃষককে কেবলমাত্র আগাছাগুলি তুলিয়া ফেলিতে হয় ও তৎপরে জলগমনের প্রতিবন্ধকস্বরূপ বাঁধ কাটিয়া দিলে, জল আপনি ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া প্রতি বৃক্ষের মূলে প্রবেশ করে ও তাহাদের পুষ্টিবর্দ্ধন করে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, প্রকৃতিই আমাদের দেহের ও ইন্দ্রিয়াদির উপাদানসমূহ আমাদের যোগ্যতানুযায়ী আমাদিগকে দান করে। ধর্ম্মপালন করিলে আমরা উন্নতদেহ প্রাপ্ত হই এবং অধর্ম্মকার্য্য করিলে নীচদেহ প্রাপ্ত হই। তাহাহইলে, ধর্ম্ম বা অধর্ম্মই কি এইরূপ দেহপ্রাপ্তির কারণ? না, তাহা নহে। ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম এইপ্রকার দেহপ্রাপ্তির কারণ নহে। তবে কি করিয়া—এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন উচ্চ বা নীচ দেহপ্রাপ্তি হয়? যেমন কৃষক জলগমনের প্রতিবন্ধকস্বরূপ বাঁধ কাটিয়া দেয়, তেমনই ধর্ম্ম অধর্ম্মরূপ আবরণ নষ্ট করে। অধর্ম্মরূপ আবরণ নষ্ট হইলে, তখন প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদান—ক্ষেত্রের জলের ন্যায়, আপনা আপনিই সেই উচ্চ জীবের আবশ্যকমত সকল উপাদান

যোগাইয়া থাকে এবং সেই জীব উন্নত দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি প্রাপ্ত হয়। সেইরূপ অধর্ম্ম, ধর্ম্মরূপ আবরণকে নষ্ট করিলে, জীব উচ্চাবস্থা হারাইয়া পশুর দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি পাইয়া থাকে। সুতরাং আমরা যতই ধর্ম্মকার্য্য করিব, ততই আমাদের অধর্ম্মরূপ বাঁধ নষ্ট হইবে এবং প্রকৃতির নিকট হইতে আমরা উন্নত দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির উপকরণ প্রাপ্ত হইব।

জীব যে প্রকার দেহ পাইয়া থাকে, সেই প্রকার দেহের উপযোগী ইন্দ্রিয়াদিও প্রাপ্ত হয়, সেই ইন্দ্রিয়াদির শক্তিও তদনুরূপ হয় এবং তদনুযায়ী ভোগ ও আয়ুঃ প্রাপ্ত হয়। প্রকৃতির মধ্যে কতরকম শরীর ও ইন্দ্রিয়াদি আছে তাহার স্থিরতা নাই। যেমন কুম্ভকার একতাল মাটী হইতে তাহার ইচ্ছামত হাঁড়ী, সরা বা কলসী প্রভৃতি নানাপ্রকার দ্রব্য প্রস্তুত করিতে পারে, তেমনি প্রকৃতি হইতে যে কোনপ্রকার আকারাদি প্রকাশ পাইতে পারে।

নির্ম্মাণচিত্তান্যস্মিতামাত্রাৎ ॥ ৪ ॥

অস্মিতামাত্র হইতে বহুচিত্ত নির্ম্মিত হয়।

সময়ে সময়ে যোগী লোকহিতকর কার্য্যের জন্য বহুচিত্ত নির্ম্মাণ করেন। সিদ্ধ যোগীর সমস্ত সংস্কারবীজ দগ্ধ হইয়া গিয়াছে এজন্য তাঁহার নিজের জন্য কোন কার্য্য বাকী থাকে না, কেবল জনহিতের জন্য তিনি নির্ম্মাণচিত্ত হন এবং ইচ্ছানুসারে যতদিন আবশ্যক এই জগতে বাস করিয়া, ইচ্ছানুসারে দেহত্যাগ করেন। যোগী নানাপ্রকার চিত্ত নির্ম্মাণ করিয়া নানাপ্রকার দেহ সৃষ্টি করেন এবং যুগপৎ সমুদয় দেহে বর্ত্তমান থাকিয়া ঐ অসংখ্য প্রকারের লোকহিতকর কার্য্য শেষ করেন। যোগীর এইপ্রকার পৃথক্ পৃথক্ চিত্ত ও দেহ নির্ম্মাণ করিবার শক্তি আছে। পৃথক্ পৃথক্ দেহে পৃথক্ পৃথক্ চিত্ত থাকে

এবং তাহাদের কার্য্যও পৃথক্ পৃথক্ হয়। অস্মিতামাত্র হইতে এই চিত্ত নির্ম্মিত হয়। অস্মিতা এক, কিন্তু চিত্ত বহু। যেমন অস্মিতা হইতে ভিন্ন ভিন্ন তন্মাত্রের সৃষ্টি হয়, তেমনই অস্মিতা হইতে ভিন্ন ভিন্ন চিত্তও সৃষ্ট হয়।

প্রবৃত্তিভেদে প্রয়োজকং চিত্তমেকমনেকেষাম্ ॥ ৫ ॥

যোগীর একটী সর্ব্বপ্রধান চিত্ত অন্যান্য বহু নির্ম্মাণচিত্তের প্রবৃত্তিভেদে প্রয়োজক হয়।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, যোগী অনেক চিত্ত নির্ম্মাণ করেন, অনেক চিত্ত হইলে, অনেক শরীরও হইবে এবং নানারূপ প্রবৃত্তিও হইবে। সকল শরীরে সকল চিত্তের একরূপ প্রবৃত্তি হইবে না। এরূপ হইলে, যোগী সেই সকল চিত্ত লইয়া কাজ করিবেন কি করিয়া? ঋষি বলিতেছেন যে, এই বহুচিত্তের নিয়ামকস্বরূপ যোগী একটী প্রধান চিত্ত নির্ম্মাণ করেন। সেই প্রধান চিত্তদ্বারা অন্যান্য বহু চিত্ত নিয়মিত হয়; যেমন একই মন, চক্ষু, কর্ণ ও নাসিকার কার্য্যকে নিয়মিত করে, তেমনি একটী প্রধান চিত্ত অন্য সকল অধীনস্থ চিত্তের চালক হয়। এইজন্য ভিন্ন ভিন্ন চিত্তে প্রবৃত্তিভেদ থাকিলেও অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন প্রবৃত্তি থাকিলেও, তাহাদের কার্য্যের কোন বিশৃঙ্খলা হয় না।

তত্র ধ্যানজমনাশয়ম্ ॥ ৬ ॥

পাঁচপ্রকার সিদ্ধচিত্তের মধ্যে ধ্যানজ চিত্ত অনাশয়।

জন্ম, ঔষধি, মন্ত্র, তপঃ ও সমাধি এই পাঁচটী উপায় হইতে পাঁচপ্রকার সিদ্ধি হয়—ইহাদের মধ্যে সমাধিজাত সিদ্ধিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট,

কারণ তাহাতে ক্লেশবীজ ধ্বংস হইয়া যায় ও কর্ম্মবাসনার লয় হয়; সুতরাং সেইরূপ চিত্ত কর্ম্মাশয়শূন্য অর্থাৎ অনাশয়। এরূপ চিত্তে, রাগ বা দ্বেষ, পুণ্য বা পাপ কিছুই নাই—এইজন্য ইহা অনাশয়। অন্য চারিপ্রকার সিদ্ধচিত্ত এরূপ নহে, তাহাদের কর্ম্মাশয় থাকে সুতরাং তাহারা আশয়যুক্ত।

কর্ম্মাশুক্লাকৃষ্ণং যোগিনস্ত্রিবিধমিতরেষাম্ ॥ ৭ ॥

যোগীদের কর্ম্ম অশুক্লাকৃষ্ণ, অপরের অবশিষ্ট ত্রিবিধ।

কর্ম্ম চারিপ্রকার। (১) কৃষ্ণ, (২) শুক্ল, (৩) কৃষ্ণশুক্ল, ও (৪) অশুক্লাকৃষ্ণ।

(১) কৃষ্ণকর্ম্ম। যাহারা দিবারাত্র পাপকার্য্য করে; লোকের উপর অত্যাচার করে ও প্রাণিহিংসা, চুরি, মিথ্যাকথন ও মদ্যপানাদি অধর্ম্মকার্য্য করে, তাহাদের কার্য্য কৃষ্ণ।

(২) শুক্লকর্ম্ম। যাহাদের কর্ম্মে একটুও পাপ থাকে না। কেবলমাত্র পুণ্য থাকে। চান্দ্রায়ণাদি ব্রত, তপস্যা, ওঙ্কারজপ ও ধ্যানাদি দ্বারা শুক্লকর্ম্মের উৎপত্তি হয়।

(৩) কৃষ্ণশুক্লকর্ম্ম। যাহারা পাপ ও পুণ্য উভয়েরই অনুষ্ঠান করে। যেমন যজ্ঞকালে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিপীলিকা প্রভৃতির হিংসাদ্বারা কৃষ্ণকর্ম্ম ও তৎসঙ্গে কাঙ্গালীভোজনাদিদ্বারা শুক্লকর্ম্মেরও অনুষ্ঠান হয়—এইজন্য ইহাদের কৃষ্ণশুক্ল কর্ম্ম বলে।

(৪) অশুক্লাকৃষ্ণ=অশুক্ল+অকৃষ্ণ। ইহাতে পুণ্যও নাই আর পাপও নাই। কর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষা করিয়া কর্ম্ম করিলে, তাহাতে পুণ্য বা পাপ সঞ্চিত হয় এবং তদনুযায়ী সুখদুঃখভোগ হয়; কিন্তু আসক্তি ও ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করিলে, পাপপুণ্যের ভাগী হইতে হয় না

এবং ফলভোগও করিতে হয় না; সুতরাং ফলভোগের জন্য দেহধারণও করিতে হয় না; সুতরাং আর জন্মও হয় না। যোগীদের কর্ম্ম এইরূপে অশুক্লাকৃষ্ণ এবং অন্যের অপর তিনপ্রকার।

ততস্তদ্বিপাকানুগুণানামেবাভিব্যক্তির্বাসনানাম্ ॥ ৮ ॥

সেই তিনপ্রকার কর্ম্ম হইতে সেই কর্ম্মবিপাকের অর্থাৎ জাতি, আয়ুঃ ও ভোগের অনুরূপ বাসনাদিগের অভিব্যক্তি অর্থাৎ প্রকাশ হয়।

পাপকর্ম্ম হইতে পাপকর্ম্মবিপাকের বাসনা হয় এবং সেইরূপ পশুদেহপ্রাপ্তি ঘটে। পুণ্যকর্ম্ম হইতে পুণ্যকর্ম্মবিপাকের কামনা হয় ও সেইরূপ দেবদেহপ্রাপ্তি ঘটে। মিশ্রিত কর্ম্ম হইতে মিশ্রিত কর্ম্ম-বিপাকের বাসনা হয় ও সেইরূপ মনুষ্যদেহপ্রাপ্তি ঘটে। যে যেরূপ কর্ম্ম করে তাহার কর্ম্মবিপাকের বাসনাও তদ্রূপ হয়। কর্ম্মবিপাক কাহাকে বলে? জাতি, আয়ুঃ ও ভোগকে কর্ম্মবিপাক বলে। যাহার শূকরজন্ম হইয়াছে—সে পূর্ব্বে শূকরের ন্যায় কর্ম্ম করিয়াছিল এবং এইজন্য সে শূকরজন্ম প্রাপ্ত হইবার বাসনাও করিয়াছিল। যে যেরূপ কর্ম্ম করিবে, তাহার সেরূপ জাতি, আয়ুঃ ও ভোগের বাসনাও হইবে এবং সে সেইরূপ দেহ লইয়া জন্মগ্রহণ করিবে।

কর্ম্ম হইতে সংস্কারের সঞ্চয় হয়। সৎকর্ম্ম হইতে সৎসংস্কার আর অসৎকর্ম্ম হইতে অসৎসংস্কার হয়। যে কর্ম্ম হইতে দেবশরীর উৎপন্ন হইবে, সে কর্ম্ম হইতে নারক, পশু, পক্ষী বা মনুষ্যজন্মের উৎপত্তি হয় না। সেইরূপ যে কর্ম্ম হইতে নারকযোনি প্রাপ্ত হইবে, তাহা হইতে দেবাদিজন্মপ্রাপ্তি ঘটে না। কায়িক, বাচিক বা মানসিক এই তিনপ্রকার কর্ম্ম হইতে মানুষের ধর্ম্ম বা অধর্ম্মসঞ্চয় হয়। ফলকামনা

করিয়া কোন্ কার্য্য করিলে এই ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ সংস্কার সঞ্চিত হয়। আমাদের চিত্তে কোটী কোটী সংস্কার আছে। সেই কোটী কোটী সংস্কারের মধ্যে মৃত্যুর সময় কতকগুলি সংস্কার প্রবল হয় এবং সেই প্রবল সংস্কারগুলি লইয়া জীব জন্মগ্রহণ করে। সংস্কারের ধর্ম্মাধর্ম্মানুযায়ী তাহারা জাতি, আয়ুঃ ও ভোগ প্রাপ্ত হয় এবং জন্মগ্রহণ করিয়া সুখ ও দুঃখ ভোগ করে। আত্মজ্ঞানদ্বারা মুক্তিলাভ না হওয়া পর্য্যন্ত, তাহাদের এইরূপ জননমরণক্লেশ পুনঃ পুনঃ ভোগ করিতে হয়। জীব জন্মগ্রহণ করিয়া পূর্ব্বসংস্কারানুযায়ী কর্ম্ম ও ভোগে লিপ্ত হয়। যেরূপ জন্ম হয়; তদুপযোগী সংস্কারসকলও প্রকাশ পায়। কুকুরজন্মে কুকুরের সংস্কার, বিড়াল জন্মে বিড়ালের সংস্কার, পক্ষীর জন্মে পক্ষীর সংস্কার ইত্যাদি। পক্ষীকে কেহ উড়িতে শিক্ষা দেয় না—সে আপনি সংস্কারানুযায়ী তাহা করে। মুরগীর ছানাকে কেহ খুঁটিয়া খাইতে শিক্ষা দেয় না—সে পূর্ব্ব সংস্কারানুযায়ী তাহা করিতে পারে। চিত্ত-মধ্যে সকল জাতিরই উপযোগী সংস্কার বর্ত্তমান আছে। নূতন দেহ ধারণ করিলেই তাহাদের সেই সেই দেহের উপযোগী সংস্কার প্রবুদ্ধ হয় এবং তাহারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব দেহ বিস্মৃত হয়। মানুষ মনে করে— "আমি প্রত্যেক জন্মেই মানুষ হইয়া জন্মিয়াছি।" পক্ষী মনে করে "আমি প্রত্যেক জন্মেই পক্ষী হইয়াছি।"

জাতিদেশকালব্যবহিতানামপ্যানন্তর্য্যং
স্মৃতিসংস্কারয়োরেকরূপত্বাৎ ॥ ৯ ॥

জাতি, দেশ ও কালের দ্বারা ব্যবহিত হইলেও স্মৃতি ও সংস্কারের একরূপত্ব হেতু বাসনাসকল অব্যবহিতের ন্যায় অর্থাৎ অত্যন্ত সমীপবর্ত্তীর ন্যায় উদ্দিত হয়।

কোন একটী লোক দশ হাজার বৎসর পূর্ব্বে ইউরোপের রোম নগরীতে কুক্কুরজন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। এই কুক্কুরজন্মের পর শৃগাল, গো, মহিষ, বিড়াল, পক্ষী প্রভৃতি এক হাজার জাতি হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া তদনুরূপ আয়ুঃ ও ভোগাদি প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু এজন্মে মানুষ হইলে কি হইবে? তাহার আচার ব্যবহার ও সমুদয় কার্য্যপ্রণালী যদি কুক্কুরের ন্যায় হয়, তখন বুঝিতে হইবে যে তাহার কুক্কুরসংস্কার জাগরিত হইয়াছে। কুক্কুরজন্মে যে সকল বাসনা ছিল, সেইসকল বাসনা জাগরিত হইয়াছে। কুক্কুরসংস্কারের বাসনা জাগিয়াছে। মানুষ হইয়াছে বটে, মানুষের ন্যায় হাত পা পাইয়াছে, মানুষের ন্যায় মুখ, চক্ষু পাইয়াছে, মানুষের ন্যায় আহার বিহার করে, মানুষের ন্যায় কথা কহে, কিন্তু তাহার স্বভাব কুক্কুরের ন্যায়। তখন বুঝিতে হইবে যে, তাহার চিত্তে সেই কুক্কুরের সংস্কারগুলি পুষ্টিলাভ করিয়াছে এবং পরজন্মে তাহাকে কুক্কুর হইতে হইবে। পরজন্মে সে কুক্কুরের দেহ পাইবে ও ঠিক কুক্কুরের ন্যায় আচরণ করিবে। দশ হাজার বৎসর পূর্ব্বে তাহার যে কুক্কুরের সংস্কার ছিল, এই দীর্ঘকাল ব্যবধান থাকিলেও, হেতু পাইবামাত্র সেই সংস্কার ও বাসনা উদিত হইয়াছে। যদিও কুক্কুরজন্মের পর তাহার শৃগাল প্রভৃতি সহস্র জাতীয় জন্ম হইয়াছে, তথাপি এই সহস্র জাতি ব্যবধান থাকিলেও, তাহার কুক্কুরদেহ-প্রাপ্তিবিষয়ে কোন বাধা হইবে না। যদিও পূর্ব্বে সে রোমনামক বহুদূরদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল এবং আগামী জন্মে হয়ত এই ভারতবর্ষেই কুক্কুর হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে, তাহাহইলেও, এইরূপ দেশের দূরত্ব থাকিলেও তাহার কুক্কুরজন্মের বাধা হইবে না। এই জন্য জাতি, দেশ ও কালের বিভিন্নতা ও দূরত্বের ব্যবধান থাকিলেও, বাসনা ও সংস্কারানুযায়ী জন্ম হইবার কোন বাধা হয় না। কেননা, সংস্কার ও বাসনা একই প্রকার। সংস্কার হইতে বাসনার জন্ম হয়,

আবার বাসনা হইতে সংস্কারের জন্ম হয়। সংস্কার হইতে স্মৃতি উৎপন্ন হয়—সেই স্মৃতিই বাসনা।

সংস্কার হইতে স্মৃতির উৎপত্তি হয়। আচ্ছা—এই দশ হাজার বৎসর পরে, তাহার কুক্কুরস্মৃতি জাগিল কেন? দেবস্মৃতিও ত জাগিতে পারিত? কারণ পাইলেই পূর্ব্বস্মৃতি জাগরিত হয়। বিনা কারণে পূর্ব্বস্মৃতি জাগরিত হয় না। এখানে যদিও মানুষ হইয়া জন্মিয়াছে, তথাপি সে মানুষ-কুক্কুরের সঙ্গেই অধিক সময় অবস্থান করিত। সে মানুষ-কুক্কুরের সঙ্গে থাকিতে ভালবাসিত। তাহার সঙ্গী মানুষ-কুক্কুরের আচরণ সে অভ্যাস করিয়াছিল। সমুদয় জীবন সে মানুষ-কুক্কুরের সঙ্গেই ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে, এই কারণে তাহার মধ্যে আজ কুক্কুরের সংস্কার জাগরিত হইয়াছে। যদি সে মানুষ-মানুষের সঙ্গ করিত, তাহাহইলে, তাহার মানুষের সংস্কার জাগিত। যদি সে মানুষ-দেবতার সঙ্গ করিত, তাহাহইলে, তাহার দেবতার সংস্কার জাগিত।

সংস্কার হইতেই আমাদের বাসনার উদ্রেক হয় এবং সেই বাসনানুযায়ী আমরা কার্য্য করি। অনেক পুণ্যের ফলে আমরা মানবদেহ পাইয়াছি। মানবদেহ পাইয়া যদি পশুর বৃত্তি অবলম্বন করি, তাহাহইলে, পরজন্মে পশু হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হইবে, অতএব আমাদের সাবধান হইয়া কার্য্য করা উচিত। আমরা যেরূপ সঙ্গ করিব, আমাদের সেইরূপ আচরণ অভ্যস্ত হইবে ও পরজন্মে আমরা সেইরূপ দেহ প্রাপ্ত হইব। কুক্কুরের ন্যায় আচরণ করিলে কুক্কুরদেহ পাইব। শৃগালের ন্যায় আচরণ করিলে শৃগালদেহ পাইব। শূকরের ন্যায় আচরণ করিলে শূকরদেহ পাইব। মানুষের ন্যায় আচরণ করিলে মানুষদেহ পাইব। দেবতার ন্যায় আচরণ করিলে দেবদেহ পাইব। আর যদি ফলকামনা ত্যাগ করিয়া নিষ্কামভাবে কার্য্য করি, জন্মমৃত্যুর হাত হইতে অব্যাহতি পাইব। অনাদি অনন্তকাল হইতে

আমরা এই জন্মমৃত্যুপ্রবাহে পতিত হইয়া কত কোটী কোটী যোনিতে ভ্রমণ করিতেছি। এই কোটী কোটী যোনির সংস্কার আমাদের চিত্তে গ্রথিত হইয়া আছে। যখন যেটীর হেতু উপস্থিত হইবে, তখন সেইটীই উদ্বুদ্ধ হইবে, তাহা সহস্র সহস্র প্রকার ভিন্ন ভিন্ন জাতির ব্যবধানেই থাক বা দেশ বা কালের ব্যবধানেই থাক, কিছুতেই আটকাইবে না। হেতু পাইলেই তৎক্ষণাৎ মুহূর্ত্তমাত্রে সেই দূরবর্ত্তী সংস্কার জাগিয়া উঠিবে ও তদনুরূপ দেহধারণের কারণ হইবে।

তাসামনাদিত্বং চাশিষো নিত্যত্বাৎ ॥ ১০ ॥

আশীর নিত্যত্বহেতু তাহাদের অর্থাৎ বাসনা সকলের অনাদিত্ব সিদ্ধ হয়।

আশী কাহাকে বলে? আত্মার আশীর্ব্বাদকে আশী বলে। আত্ম-বিষয়ের আশীর্ব্বাদ—যেন আমার অভাব না হয়, যেন আমি চিরকালই থাকি, যেন আমার দুঃখ না হয়—এইরূপ বাসনা নিত্য। ইহা সর্ব্বকালে, সর্ব্বপ্রাণীতে বিদ্যমান; সুতরাং এই বাসনার উৎপত্তি কোন্ সময় হইতে হইয়াছে, তাহা কেহ বলিতে পারে না। এইজন্য আশীও যদ্রূপ নিত্য, বাসনাও তদ্রূপ অনাদি। আশী নিত্য বলিয়া ইহা অতীতকালেও ছিল; সুতরাং অতীতকালের জন্মও আমাদের স্বীকার করিতে হয়। এইরূপে অনাদি জন্মপরম্পরা স্বীকার করিতে হয়।

হেতুফলাশ্রয়ালম্বনৈঃ সংগৃহীতত্বাদেষামভাবে তদভাবঃ ॥ ১১ ॥

হেতু (অবিদ্যা), ফল (জাতি, আয়ুঃ ও ভোগ), আশ্রয় (চিত্ত) এবং আলম্বন (শব্দ ও স্পর্শাদি বিষয়)—এই সকলের দ্বারা সংগৃহীত হইলে বাসনার উদয় হয় এবং ইহাদের অভাবে বাসনার লয় হয়।

অনন্তকাল হইতে অনন্ত প্রকারের সংস্কার আমাদের চিত্তে সঞ্চিত হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে ও পরেও হইবে। যখন আমাদের এরূপ অবস্থা, তখন মুক্তি অসম্ভব। কোনরূপ বিষয় উপস্থিত হইলেই, পূর্ব্বসংস্কারানুযায়ী আমরা তাহাতে হয় অনুরাগ, না হয় দ্বেষ করিয়া থাকি এবং এইরূপে রাগ ও দ্বেষ করিয়া পুনরায় রাগ ও দ্বেষের সংস্কার চিত্তে সঞ্চিত করি। সুতরাং আমাদের মনে স্বভাবতঃই এইরূপ সন্দেহ উঠিয়া থাকে যে, সংসারক্লেশ নিবারণ অসম্ভব। এইজন্য ঋষি বলিতেছেন,—"হেতু, ফল, আশ্রয় ও আলম্বন এই চারিটীর অভাব হইলে বাসনা বিনষ্ট হয় এবং সংসারক্লেশও নিবারিত হয়।

কার্য্য যতই প্রবল হউক না কেন, তাহার কারণকে বিনষ্ট করিতে পারিলে, কার্য্য আপনিই লোপ পায়। যখন শরীর ধারণ করিতে হইয়াছে, তখন কার্য্য হইবেই, রাগ ও দ্বেষ মনে উঠিবেই, সেই রাগ ও দ্বেষের বশবর্ত্তী হইলে, পুনরায় সংস্কারের সৃষ্টি হইবে আর সেই রাগ ও দ্বেষের বশবর্ত্তী না হইলে, আর সংস্কারও পড়িবে না। পূর্ব্বসংস্কার ভোগ প্রদান করিয়া আপনিই ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া যাইবে। প্রারব্ধ কর্ম্মের ফলে সম্মুখে সন্দেশ আসিয়া উপস্থিত হইল, আসক্তির সহিত সেই সন্দেশ ভোগ করিলে পুনরায় সংস্কার পড়িবে, আর উদাসীনভাবে ভোগ করিলে আর সংস্কার সঞ্চিত হইবে না। এই সন্দেশ আসিয়াছে,

ইহা খুব ভাল সন্দেশ, ইহা খাইতে বেশ মিষ্ট লাগে, ভবিষ্যতে আরও খাইতে হইবে—এই সকল বাসনাকে আসক্তি বলে। এই আসক্তির ত্যাগ হইলেই, এই বাসনার ত্যাগ হয়। আবার উদাসীন ভাবেও ভোগ করা যায়। যখন সন্দেশ আসিয়াছে, তখন ইহা খাইতে হইবে; তবে যতটুকু খাওয়া আবশ্যক, ততটুকু খাইবে। সন্দেশের আস্বাদ বা গন্ধ অনুভব করিতে করিতে ইন্দ্রিয়তৃপ্তিসহকারে খাইবে না। খাইতে হয়, তাই খাইতেছ—কারণ কিছু না খাইলে শরীর রক্ষা হয় না। শরীর রক্ষার জন্য বা ক্ষুধানিবৃত্তির জন্য খাইতেছ। ভবিষ্যতে যদি ইহার পরিবর্ত্তে প্রারব্ধবশতঃ শুষ্ক ছোলামাত্র আসে, তাহাও এইরূপে খাইবে। সন্দেশ ভাল আর ছোলা খারাপ এরূপ মনে করিবে না। মনকে বিকৃত না করিয়া উভয় দ্রব্যই শরীর রক্ষার নিমিত্ত পরিমাণমত খাইবে। সন্দেশের জন্য বিশেষ অনুরাগ বা ছোলার প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করিবে না। সন্দেশও যেমন ক্ষুধানিবৃত্তি করে, ছোলাও সেইরূপ ক্ষুধানিবৃত্তি করে। ক্ষুধানিবৃত্তি করাই আহারের উদ্দেশ্য; বিলাসভোগ বা ইন্দ্রিয়তৃপ্তি—আহারের লক্ষ্য নহে। না খাইলে শরীর থাকিবে না, সাধন হইবে না, তাই খাইতেছ; বিলাসের জন্য খাইবে না। এইপ্রকার ভোগকে উদাসীনভাবে ভোগ বলে। ইহাতে চিত্তের সংস্কার ক্ষীণ হয় ও পুনরায় বাসনার উৎপত্তি হয় না। লোকে সচরাচর ক্ষুধার নিবৃত্তি করিতে গিয়া জিহ্বার স্বাদাভিলাষ পূর্ণ করে—নাসিকার গন্ধগ্রহণেচ্ছার তৃপ্তিসাধন করে। এইরূপ ইন্দ্রিয়ের আসক্তিসহকারে ভোগ করিলে, সংস্কার অবশ্যম্ভাবী এবং সংসারগতিরও নিবারণ হইবে না। এইহেতু সুখ বা দুঃখভোগের সময় রাগ ও দ্বেষ ত্যাগ করিবে।

"সমভাবে সুখদুঃখ করিয়া বহন,
হে অর্জ্জুন! যেইজন ব্যথিত না হন।

অমরত্ব লাভ তিনি করেন নিশ্চয়,
ইহলোকে পরলোকে নিত্যানন্দময়॥"

রাগদ্বেষাদিই আসক্তিবৃদ্ধি করে, আবার অবিদ্যাই এই রাগদ্বেষাদির হেতু। এই অবিদ্যার প্রভাবে রাগাদি উৎপন্ন হয় এবং রাগাদির ফলে বাসনা ও সংস্কারের উৎপত্তি হয় এবং সেই সংস্কারের ফলস্বরূপ দেহধারণ করিতে হয়। সুতরাং এই অবিদ্যারূপ হেতু ও তাহার ফল জাতি, আয়ুঃ ও ভোগ; তাহাদের আশ্রয় চিত্ত এবং তাহাদের অবলম্বন শব্দ, স্পর্শাদি বিষয়ের অভাব হইলে—বাসনারও অভাব হয় এবং তাহার সংস্কার ও চিত্তরূপ আশ্রয়েরও অভাব হয়। তখন তাহার ফল জাতি, আয়ুঃ ও ভোগ আর হয় না; সুতরাং এইরূপে সংসারের নিবারণ হইয়া মুক্তি হয়।

অতীতানাগতং স্বরূপতোঽস্ত্যধ্বভেদাদ্ধর্ম্মাণাম্॥ ১২॥

অতীত ও অনাগত স্বরূপতঃ আছে, ধর্ম্মসকলের অধ্বভেদ অর্থাৎ কালভেদ জন্য উক্তরূপ অতীত ও অনাগত বলা হয়।

"সত্তের অবিদ্যমানতা নাই এবং অসত্তের বিদ্যমানতা নাই।" সৎ—চিরকালই সৎ, চিরকালই আছে। যাহা কোন কালে থাকে এবং কোন কালে থাকে না, তাহা সৎ হইতে পারে না। মাটী সৎ—কেননা মাটী চিরকাল আছে। মাটী হইতে ঘট প্রস্তুত হইল। মাটীর মাটীত্বরূপ ধর্ম্ম পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া ঘটত্বভাব হইল, তাই বলিয়া, মাটী অসৎ হইল না। পূর্ব্বে মাটীর মধ্যে মাটী ছিল, এক্ষণে ঘটের মধ্যে মাটী রহিল; সুতরাং মাটী পূর্ব্বেও যেমন ছিল, এখনও সেইরূপ রহিল। মাটীত্বরূপ ধর্ম্মটী অতীত হইয়া বর্ত্তমান ঘটত্ব নামক ধর্ম্মটী প্রকাশিত হইল। আবার ঘট ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিলে তখন মাটীর চূর্ণত্বরূপ ধর্ম্ম আসিবে।

এস্থলে মাটীর ঘটত্ব ধর্ম্মটী বর্ত্তমান—মাটীত্ব ধর্ম্মটী অতীত ও চূর্ণত্ব ধর্ম্মটী অনাগতরূপে অবস্থিত। মাটীত্বভাব, ঘটত্বভাব এবং চূর্ণত্বভাব একসঙ্গেই প্রকাশ পায় না। যে ভাব পূর্ব্বে প্রকাশ পাইয়াছিল, যেমন মাটীত্বভাব, তাহা অতীত; যে ভাব এক্ষণে প্রকাশ পাইয়াছে, যেমন ঘটত্বভাব, তাহা বর্ত্তমান, এবং যে ভাব পরে প্রকাশ পাইবে, যেমন চূর্ণত্বভাব, তাহা ভবিষ্যৎ। অতীতে মাটীত্বরূপ ধর্ম্ম লীন হয় বটে, কিন্তু তাহার ধর্ম্মী মাটীর লয় হয় না এবং ভবিষ্যতে চূর্ণত্বরূপ ধর্ম্ম প্রকাশ পাইলেও মাটীর লয় হইবে না। মাটী চিরকালই মাটী। মাটীর লয় হয় না; সুতরাং মাটী সৎ। একটী সুবর্ণের বলয় ভাঙ্গিয়া কর্ণাভরণ (মাক্‌ড়ী) প্রস্তুত হইল এবং পরে মাক্‌ড়ী ভাঙ্গিয়া কণ্ঠাভরণ (হার) তৈয়ারী হইবে। এক্ষণে মাক্‌ড়ী সুবর্ণের বর্ত্তমান অভিব্যক্তি, বালা অতীত অভিব্যক্তি এবং হার ভবিষ্যৎ অভিব্যক্তি। কিন্তু সুবর্ণ চিরকালই একভাবে সমপ্রকাশ। এইজন্য সতের বিনাশ নাই। আমাদের দেহের মাংস ও অস্থি, মাটী ভিন্ন অন্য কিছু নহে। যে সকল শস্য খাইয়া আমাদের দেহের মাংসবৃদ্ধি হয়, তাহারা মাটী ভিন্ন অন্য কিছু নহে। এই মাংস ও অস্থি এক্ষণে মাংস ও অস্থিরূপে বিদ্যমান। মৃত্যুর পর ইহা মাটী হইবে এবং সেই মাটী হইতে শস্য উৎপন্ন হইবে এবং পুনরায় তাহা হইতে জীবের মাংস ও অস্থি তৈয়ারী হইবে—ইহা মাটীর ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা। এ সকল অবস্থা প্রকৃতপক্ষে মাটী ভিন্ন অপর কিছুই নহে। আমাদের ভ্রান্তিদৃষ্টিতে এগুলিকে পৃথক্ পৃথক্ দ্রব্য বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহারা সবই এক দ্রব্য। ইহারা সবই মাটী। এইজন্য মাটী সৎ। মাটীর বিনাশ নাই। মাটী চিরকাল থাকে। ঘট অসৎ, চূর্ণ অসৎ, মাংস অসৎ, শস্য অসৎ কারণ ইহারা চিরকাল থাকে না। যাহা উৎপন্ন হইয়া নষ্ট হয়, তাহা সৎপদার্থ নহে। যে মূলদ্রব্য হইতে তাহা উৎপন্ন হইয়াছে, সেই মূলদ্রব্যই সত্য পদার্থ। সেই মূলদ্রব্যকে

কারণ বলে আর উৎপন্ন দ্রব্যকে কার্য্য বলে। কারণ হইতে কার্য্য উৎপন্ন হয়। মাটী কারণ, আর ঘট কার্য্য। কারণ সত্য, কারণ চিরস্থায়ী; কিন্তু কার্য্য ক্ষণস্থায়ী, সেইজন্য কার্য্য নশ্বর ও মিথ্যা। মিথ্যাবস্তু চিরকাল থাকে না, তাহার নাশ হয়। যাহার উৎপত্তি ও নাশ আছে—তাহা মিথ্যা। শরীর উৎপন্ন হয় ও নষ্ট হয়; এইজন্য শরীর মিথ্যা। যাহা মিথ্যা তাহাকে সত্য বোধ করা ভ্রান্তি। মিথ্যা শরীরে সত্যতাবোধ ভ্রান্তি। শরীর মিথ্যা, কিন্তু শরীর যাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা সত্য। শরীর কার্য্য—সেইহেতু বিনশ্বর। মিথ্যাবস্তুতে সত্যতাবোধ অবিদ্যার কার্য্য। অবিদ্যার দ্বারা মোহিত হইয়া আমরা মিথ্যাকে সত্যজ্ঞান করিতেছি। বিদ্যাদ্বারা এই মিথ্যাজ্ঞান নিবারিত হইবে, তখন শরীরকে মিথ্যা বলিয়া বোধ হইবে।

কারণ সত্য আর কার্য্য মিথ্যা। বস্তুতঃ এক অখণ্ড অসীম সত্যই সর্ব্বদা বর্ত্তমান। সেই সত্যের আশ্রয়ে যে সকল কার্য্য হইতেছে—আমরা সেই কার্য্য দেখিয়া অতীত ও অনাগত বলি। প্রকৃতপক্ষে মাটীর অতীতত্বও নাই, অনাগতত্বও নাই। মাটী সর্ব্বদাই বর্ত্তমান। বস্তুতঃ সুবর্ণের বালা, মাকড়ী ও হার দেখিয়া আমরা অতীত, বর্ত্তমান ও অনাগত আখ্যা দিয়া থাকি; কিন্তু সুবর্ণ চিরকালই বর্ত্তমান। যদি কালের সত্তা স্বীকার করিতে হয়, তাহাহইলে একমাত্র বর্ত্তমান কালই আছে। অতীত বা অনাগত বলিয়া কোন কাল নাই। ক্ষণিক ক্রিয়ার ধারাই কাল নামে অভিহিত হয়। যদি কোন ক্রিয়া না থাকে, তাহাহইলে, কালও নাই। একমাত্র ক্রিয়াই বর্ত্তমান। কাল বলিয়া কোন বাস্তব পদার্থ নাই। ক্ষণিক ক্রিয়াকে আশ্রয় করিয়া আমরা কাল আখ্যা দিয়া থাকি। যে ক্ষণিক ক্রিয়া পূর্ব্বে হইয়া গিয়াছে, তাহাকে উল্লেখ করিয়া আমরা অতীত কাল বলি। যে ক্ষণিক ক্রিয়া এক্ষণে হইতেছে, তাহাকে উল্লেখ করিয়া আমরা বর্ত্তমান কাল বলি

এবং যে ক্ষণিক ক্রিয়া পরে হইবে, তাহাকে উল্লেখ করিয়া আমরা ভবিষ্যৎ কাল বলি। বাস্তবিক কাল নাই। ক্রিয়ামাত্রই ছিল, আছে ও থাকিবে। দ্রব্যের এইরূপ অধ্বভেদ বা সময়ভেদ হইতেই আমরা অতীত ও অনাগত বলিয়া থাকি। বাস্তবিক অতীতদ্রব্য অতীত বা নষ্ট হয় নাই, তাহা স্বরূপতঃ আছে এবং ভবিষ্যৎদ্রব্যও বর্ত্তমানকে নষ্ট করিয়া উৎপন্ন হইবে না এই হেতু বাস্তবিক অতীত ও অনাগত দ্রব্য সর্ব্বদাই বিদ্যমান আছে; আমাদের সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিতে ও মলিন বুদ্ধিতে তাহা দেখিতে ও বুঝিতে পারি না। যোগিগণ সূক্ষ্মদৃষ্টিতে এবং নির্ম্মল বুদ্ধিতে এই সকল দেখিতে ও বুঝিতে পারেন।

কারণ সত্য—কার্য্য মিথ্যা। কার্য্য লয়প্রাপ্ত হয় কিন্তু একেবারে ধ্বংস হয় না। কার্য্য কারণরূপ ধারণ করে। জগতে কোন দ্রব্যের সম্পূর্ণ ধ্বংস নাই। ঘটরূপ কার্য্যের লয় হইয়া তাহার কারণ মাটীতে পরিণত হয়। যাহা ঘট, তাহাই মাটী। যাহা মাটী, তাহাই ঘট। দুইই এক। ভেদদৃষ্টিতে আমরা দুই দেখি; বাস্তবিক দুই নাই—একই আছে। অভেদদৃষ্টিতে একই দেখা যায়। ভেদদৃষ্টিতে ঘট, শরাব, কলসী, মাংস, ছোলা, কড়াই প্রভৃতি দেখি। অভেদদৃষ্টিতে সবই মাটী। ঘট কার্য্য। ঘট তাহার কারণ মাটিতে লয়প্রাপ্ত হয়। আবার স্থূল ক্ষিতি তাহার কারণ সূক্ষ্ম ক্ষিতি বা গন্ধতন্মাত্রে লয় পায়। এইরূপে প্রতিলোমক্রমে বিচার করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, সর্ব্বকার্য্যের মূলে—এক প্রধান বা প্রকৃতি বিদ্যমান। এইজন্য অতীত ও অনাগত বাস্তবিক লৌকিক দৃষ্টিতে বিদ্যমান আছে—সেইকারণে অতীত ও অনাগতের অবিদ্যমানতা নাই। কিন্তু পরমার্থতঃ অতীত ও অনাগত নাই, সমস্তই পরম প্রত্যক্ষদর্শী যোগীর নিকট বর্ত্তমান অবস্থার অবভাস-স্বরূপে প্রতীয়মান হয়। সেইজন্যই লোকের অতীত ও ভবিষ্যৎ-জীবন যোগীর জ্ঞানচক্ষে বর্ত্তমানবৎ প্রতীত হয়। সময় সময় সাধারণ

লোকেও তাহাদের ভবিষ্যৎ বুঝিতে পারে এবং অনেক সময় স্বপ্নেও ভবিষ্যৎ ঘটনা দৃষ্ট হয়; ইহার কারণ এই যে, সেই সময়বিশেষের জন্য তাহাদের চিত্তে সাত্বিকভাবের অতিস্ফুরণনিমিত্ত কিঞ্চিৎ ভবিষ্যৎ-জ্ঞানের অবভাস হয়

তে ব্যক্তসূক্ষ্মা গুণাত্মানঃ ॥ ১৩ ॥

ত্রিকালে স্থিত ধর্ম্মগণ ব্যক্ত ও সূক্ষ্ম এবং ত্রিগুণাত্মক।

মাটী হইতে ঘট হইল। ঘট ব্যক্ত অবস্থা এবং মাটী সূক্ষ্ম অবস্থা; কারণ সূক্ষ্ম এবং কার্য্য ব্যক্ত বা প্রকাশিত। যাহা স্থূলভাবে প্রকাশিত হইল, তাহা নিশ্চয়ই আগে ছিল। কোন কিছু নাই অথচ কিছু প্রকাশিত হইল, ইহা হইতে পারে না। বটবীজের মধ্যে বটবৃক্ষ ছিল, তাহা না হইলে, বটবীজ রোপণ করিলে বটবৃক্ষ প্রকাশিত হইত না। বীজের মধ্যে বটবৃক্ষ সূক্ষ্ম অব্যক্তভাবে ছিল এবং যখন প্রকাশিত হইল তখন স্থূলভাবে আমাদের নয়নগোচর হইল। গোলাপগাছের মধ্যে গোলাপফুল সূক্ষ্মভাবে থাকে, স্থূল রূপ গ্রহণ করিয়া তাহা আমাদের নয়নগোচর হয়। গোলাপফুলের গোলাপী বর্ণ পূর্ব্বে সূক্ষ্ম রূপতন্মাত্ররূপে গাছের মধ্যে ছিল, এক্ষণে স্থূল গোলাপীবর্ণরূপে বাহিরে প্রকাশিত হইল। গোলাপফুলের গোলাপী গন্ধ পূর্ব্বে সূক্ষ্ম গন্ধতন্মাত্ররূপে গোলাপ গাছের মধ্যে ছিল, এক্ষণে স্থূল গোলাপীগন্ধরূপে আমাদিগের নিকট প্রকাশিত হইল। লাল, নীল, হরিৎ প্রভৃতি যে সমুদয় রূপ আমরা বাহিরে দেখিতে পাই, তাহারা স্থূল রূপ। তাহারা সূক্ষ্ম রূপতন্মাত্র হইতে প্রকাশিত হয়। রূপতন্মাত্রে নানাপ্রকার রূপ নাই, তাহা রূপমাত্র। নানাপ্রকারের গন্ধ, যাহা আমরা বাহিরে পাই, তাহা সূক্ষ্ম গন্ধতন্মাত্র হইতে প্রকাশিত হয়। এই গন্ধতন্মাত্রে নানাপ্রকার

গন্ধ থাকে না, ইহা গন্ধমাত্র। সেইরূপ স্থূল শব্দ, স্থূল রস ও স্থূল স্পর্শ তাহাদিগের স্ব স্ব তন্মাত্র হইতে প্রকাশিত হয়। তন্মাত্র অবস্থায় তাহারা বহু থাকে না, তাহারা তৎ মাত্র থাকে, সুতরাং যাহা এক্ষণে প্রকাশিত হইয়া বর্ত্তমানভাবে অবস্থিত আছে, তাহা পূর্ব্বে অতীতভাবে ছিল এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে। বর্ত্তমান প্রকাশিত অবস্থায় তাহারা স্থূল এবং অতীত ও অনাগত অবস্থায় তাহারা সূক্ষ্ম। বর্ত্তমান স্থূল অবস্থায় আমরা তাহাদিগকে দর্শন করি এবং অতীত ও অনাগত সূক্ষ্ম অবস্থায় আমরা তাহাদিগকে দেখিতে পাই না। যোগীরা সমাধিদ্বারা তাহাদের সূক্ষ্ম অবস্থা দেখিতে পান।

ধর্ম্মী ভিন্ন ধর্ম্ম প্রকাশ পায় না। এই ধর্ম্মের অতীত, অনাগত, ও বর্ত্তমান তিনটী অবস্থা। এইসকল ধর্ম্ম, সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে; এইজন্য ইহারা ত্রিগুণাত্মক। সত্ত্ব, রজঃ ও তম বিকারপ্রাপ্ত হইয়া এইসকল ধর্ম্মের সৃষ্টি করিয়াছে। পঞ্চভূত, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় ও মন এই ষোড়শটী কার্য্যবিকার, তাহাদের কারণ পঞ্চতন্মাত্র ও অস্মিতা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। লৌকিক দৃষ্টিতে ইহাদের নানাপ্রকার দেখায়, কিন্তু পারমার্থিক দৃষ্টিতে ইহারা সত্ত্ব, রজঃ ও তম ভিন্ন অপর কিছু নহে। সাধনদ্বারা সমাধি হইলে, এই ধর্ম্মসকল দৃষ্টিগোচর হয় এবং পরমার্থ সিদ্ধ হয়। পরমার্থ সিদ্ধ হইলে, আমাদের দুঃখের একান্তনিবৃত্তি হয়।

পরিণামৈকত্বাৎ বস্তুতত্ত্বম্ ॥ ১৪ ॥

সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের একরূপ পরিণামবশতঃ বস্তুতত্ত্বের একত্ব হয়।

ব্রহ্মাণ্ডের [illegible] বিষয় তিনগুণের মিশ্রণে উৎপন্ন হইয়াছে।

একটীমাত্র গুণ হইতে কোন বিষয় উৎপন্ন হয় নাই। সকল বিষয়ের মধ্যেই তিনটী গুণ আছে। যখন তিনটী গুণের দ্বারা বিষয় হইয়াছে, তখন পরিণামে একটীমাত্র বস্তু হয় কিরূপে? যদিও তিনটী গুণ পরস্পর মিলিত থাকে, তথাপি তিনটী গুণের পরিমাণ একরূপ সমান থাকে না। তিন গুণ নানাপ্রকারে ও নানাপরিমাণে মিশ্রিত হওয়াতে নানাপ্রকার বস্তুর উদ্ভব হইয়াছে। কোথাও বা সত্ত্বগুণের প্রাবল্য, কোথাও বা রজোগুণের এবং কোথাও বা তমোগুণের প্রাবল্য দেখা যায়। এইরূপে গুণের ন্যূনাধিক্যরূপ বৈষম্যবশতঃ নানাপ্রকারের পরিণাম হইয়াছে। এক একটী পরিণামকে এক একটী বস্তু বলা যায়। মূল ধর্ম্মী এক—অব্যক্ত প্রকৃতি। তাহা হইতে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ প্রকাশ পাইয়া অনন্তপ্রকার ধর্ম্মের সৃষ্টি করিয়াছে। গুণ তিনটী হইলেও তাহাদের কারণ এক অব্যক্ত প্রকৃতি। সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থাই অব্যক্ত প্রকৃতি। এই প্রকৃতির সাম্যাবস্থার বা অব্যক্তভাবের ভঙ্গ হইলে অর্থাৎ তিন গুণের সাম্যাবস্থা ভগ্ন হইয়া বৈষম্য বা ক্রিয়া হইলেই সৃষ্টি হইতে আরম্ভ হয়। এই তিনটী গুণ কেহ কাহাকেও ছাড়িয়া থাকে না। চিরকাল একত্র অবস্থান করে। যখন সাম্যাবস্থায় অবস্থান করে, তখন কোন সৃষ্টি নাই। যখন একটী গুণ প্রবল হইয়া অপর গুণদ্বয়কে অভিভূত করে, তখন তাহাদের মধ্যে বৈষম্য ও চাঞ্চল্য উপস্থিত হয় এবং তখন সৃষ্টি হয়। প্রত্যেক বস্তুর মধ্যেই এই গুণের ক্রিয়া বর্ত্তমান আছে। গুণের ক্রিয়া নাই অথচ বস্তু আছে, ইহা হইতে পারে না। প্রত্যেক বস্তুমধ্যেই প্রতিক্ষণে সূক্ষ্মক্রিয়া চলিতেছে। ক্রিয়া বন্ধ হইলেই বস্তুর লয় হইবে। ক্রিয়াই বস্তুর জীবন। ক্রিয়া ভিন্ন বস্তু নাই। বস্তু স্থূলই হউক আর সূক্ষ্মই হউক, প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে গুণের কার্য্য বর্ত্তমান। গুণের কার্য্য বন্ধ হইলেই সেই বস্তুর লয় হইবে। অব্যক্ত প্রকৃতির প্রথম ক্রিয়া বা

সৃষ্টি—মহত্তত্ব। মহত্তত্ব অতিশয় সূক্ষ্ম। তৎপরে ক্রমে ক্রমে সূক্ষ্মতা কমিয়া আসিয়া সর্ব্বশেষে স্থূল ক্ষিতি ও অপ্ প্রভৃতির সৃষ্টি হইয়াছে। এক একটী গুণের ন্যূনাধিক্যে এক একটী বস্তু সৃষ্ট হইয়াছে। যেমন, সত্বপ্রধান অহঙ্কার হইতে জ্ঞানেন্দ্রিয়, রজঃপ্রধান অহঙ্কার হইতে কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং তমঃপ্রধান অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্র সৃষ্ট হইয়াছে। ক্রমে এই পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চমহাভূত উৎপন্ন হইয়াছে। এই গুণ যদিও তিনপ্রকার, তথাপি ক্রিয়া হইয়া পরিণামপ্রাপ্ত হইলে, সেই পরিণাম একটীই হয়। সেই এক একটী পরিণামই এক একটী বস্তু। জগতে যতপ্রকার বস্তু আছে—তাহাদের কোনটী সত্বপ্রধান, কোনটী রজঃপ্রধান এবং কোনটী বা তমঃপ্রধান। কাঁচকলা সত্বপ্রধান, লঙ্কা রজঃপ্রধান এবং বাসি ও পচা অন্ন তমঃপ্রধান।

বস্তুসাম্যে চিত্তভেদাত্তয়োর্ব্বিভক্তঃ পন্থাঃ ॥ ১৫ ॥

বস্তুসাম্যে অর্থাৎ জ্ঞেয় বস্তুর সাম্যতা বা অভেদত্বজন্য এবং চিত্ত বা জ্ঞানের ভেদ বা পৃথক্ত্বজন্য এই জ্ঞান ও জ্ঞেয় এক নহে—কিন্তু পৃথক্।

বস্তু এক, কিন্তু চিত্ত অনেক। যে চিত্তের যেরূপ স্বভাব, সেই চিত্ত সেই একই বস্তুকে সেইরূপ ভাবেই গ্রহণ করিতেছে। একই কামিনীকে—কামুকের চিত্ত কামভাবে, সন্তানের চিত্ত মাতৃভাবে, সপত্নীর চিত্ত শত্রুভাবে এবং ভৃত্যের চিত্ত কর্ত্রীভাবে গ্রহণ করিতেছে; সুতরাং বিষয় এক হইলেও চিত্ত ভিন্ন ভিন্ন। সুতরাং জ্ঞান, জ্ঞেয় বস্তু হইতে ভিন্ন পদার্থ। এস্থলে প্রত্যেক চিত্ত তাহাদের প্রকৃতি অনুসারে পার্থক্যের পরিচয় দিতেছে। যদি সকলের চিত্ত এক হইত, তাহা হইলে, সকলেই সেই কামিনীকে একই ভাবে গ্রহণ করিত।

ন চৈকচিত্ততন্ত্রং বস্তু তদপ্রমাণকং তদা কিং স্যাৎ ॥ ১৬ ॥

বস্তু একচিত্তের তন্ত্র নহে অর্থাৎ একজ্ঞানের অধীন নহে। তাহা হইলে, সেইটী যখন চিত্তের অপ্রমাণক অর্থাৎ অগোচর হইবে, তখন বস্তুটীর দশা কি হইবে?

কেহ কেহ বলে যে বাস্তবপক্ষে বস্তুর বিদ্যমানতা নাই। বস্তু চিত্তের কল্পনামাত্র। যে চিত্তে যেরূপ কল্পনা উঠিতেছে, সেই চিত্তে সেইরূপ প্রত্যয় উঠিতেছে বা বস্তুজ্ঞান হইতেছে। তোমার চিত্তে কুক্কুরের কল্পনা উঠিয়াছে, তাই তুমি কুক্কুর দেখিতেছ; বাস্তবপক্ষে কুক্কুর বলিয়া কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নাই। ইহা তোমার চিত্তের কল্পনামাত্র। তোমার চিত্তে কুক্কুরের কল্পনা না উঠিলে তুমি কুক্কুর দেখিতে পাইতে না। তাহারা বলে কুক্কুর নাই—ইহা কল্পনামাত্র। ঋষি বলিতেছেন—মনে কর, একস্থানে একটী কুক্কুর দাঁড়াইয়া আছে এবং সেখানে ২০ জন লোক বিদ্যমান আছে ও সেই ২০ জন লোকই সেই কুক্কুর দেখিতেছে। তাহাদের মধ্যে যদি একজন লোক সেই কুক্কুরকে না দেখে, তাহাহইলে, অবশিষ্ট ১৯ জনের দৃষ্টি হইতেও সেই কুক্কুর চলিয়া যাইবে কি? যদি কুক্কুররূপ বস্তুজ্ঞানটী একই চিত্তের অধীন হয়, তাহাহইলে, সেই একটী লোকের চিত্ত হইতে কুক্কুরজ্ঞানের অপলাপ হইলে কি সেই কুক্কুরটীর সম্পূর্ণ অপলাপ হইবে? কিন্তু তাহা হয় না। ইহার দ্বারা প্রমাণ হইল যে, বস্তু সর্ব্বসাধারণ, আর চিত্ত প্রতি লোকের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন। সুতরাং বাহ্যবস্তু একচিত্ততন্ত্র নহে অর্থাৎ একচিত্তের দ্বারা কল্পিত নহে। এইহেতু জ্ঞান ও জ্ঞেয় উভয়ই সৎ ও ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ। দ্রষ্টা ও দৃশ্য উভয়ই সৎ, তন্মধ্যে দৃশ্য বিকারশীল, আর দ্রষ্টা অবিকারী। দৃশ্যের সহিত দ্রষ্টার একত্ববোধ হইলেই ভোগ এবং পৃথক্ত্ববোধ হইলেই মোক্ষ।

তদুপরাগাপেক্ষিত্বাচ্চিত্তস্য বস্তু জ্ঞাতাজ্ঞাতম্ ॥ ১৭ ॥

বাহ্য বস্তু উপরাগের অপেক্ষা করিয়া, আমাদের জ্ঞাত বা অজ্ঞাত হয় অর্থাৎ বাহ্য বস্তুতে উপরাগ হইলে তাহা আমাদের জ্ঞাত হয় এবং উপরাগ না হইলে তাহা আমাদের অজ্ঞাত থাকে। বিষয়ের জ্ঞাত ও অজ্ঞাতস্বরূপত্ব হেতু চিত্ত পরিণামী।

বিষয় ও চিত্ত—কে কাহাকে আকর্ষণ করে? চিত্ত বিষয়কে আকর্ষণ করে অথবা বিষয় চিত্তকে আকর্ষণ করে? শাস্ত্রে বলে, মন অপেক্ষা বিষয় বলীয়ান্। বিষয় মনকে আকর্ষণ করে। চিত্ত বা মন থাকে ভিতরে বা আধ্যাত্মিক প্রদেশে, আর বিষয় থাকে বাহিরে। তাহাহইলে, কিরূপে এই সংযোগক্রিয়া হয়? বিষয় ইন্দ্রিয়রূপ প্রণালী বা পথ দিয়া চিত্তে উপস্থিত হয়। রূপ চক্ষুর মধ্য দিয়া চিত্তে উপস্থিত হয়। রস জিহ্বার মধ্য দিয়া চিত্তে উপস্থিত হয়, সেইরূপ শব্দ, গন্ধ ও স্পর্শ যথাক্রমে কর্ণ, নাসিকা ও ত্বকের মধ্য দিয়া চিত্তে উপস্থিত হয়। বিষয় চিত্তে উপস্থিত হইলে, চিত্ত সেই বিষয়ের দ্বারা উপরঞ্জিত হয়; চিত্ত যে বিষয়ে উপরঞ্জিত হয় বা চিত্ত যে বিষয়ের সহিত সংযুক্ত হয়, আমাদের সেই বিষয়ের জ্ঞান হয়। সেই বিষয় আমাদের নিকট জ্ঞাত হয় এবং অপরাপর বিষয় অজ্ঞাত থাকে। চিত্ত বিষয়ের দ্বারা উপরঞ্জিত না হইলে, আমরা সেই বিষয়ের সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে পারি না। বিষয় চিত্তকে উপরঞ্জিত করিলে, চিত্তের সহিত বিষয়ের যোগ হয়। তখন পুরুষ সেই বিষয়ে অভিমান করিয়া সেই বিষয়কে ভোগ করে। চিত্ত বিষয়ের সহিত সংযুক্ত না হইলে, পুরুষের বিষয়ভোগ হয় না; তখন পুরুষের মোক্ষ হয়। চিত্ত ও বিষয়ের সংযোগে পুরুষের অভিমানকে ভোগ, আসক্তি বা সংসার বলে; আর চিত্ত ও বিষয়ের অসংযোগে পুরুষের অভিমানকে বৈরাগ্য, অনাসক্তি বা মুক্তি বলে।

বিষয় ইন্দ্রিয়প্রণালীর মধ্য দিয়া চিত্তের নিকট উপস্থিত হইলে, পুরুষ তাহা ভোগ করিতেও পারেন, আবার না করিতেও পারেন। ভোগ করা বা না করা পুরুষের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিতেছে। পুরুষের ভোগের ইচ্ছা থাকিলে পুরুষ বিষয় ভোগ করেন—তখন ঐ বিষয় চিত্তকে উপরঞ্জিত করিতে সমর্থ হয়, আর পুরুষের ভোগের ইচ্ছা না থাকিলে অর্থাৎ পুরুষ বৈরাগ্যবান্ হইলে বা ভোগে অনাসক্ত হইলে, বিষয় চিত্তকে উপরঞ্জিত করিতে পারে না। ইন্দ্রিয়প্রণালী দিয়া চিত্তের মধ্যে বিষয় উপস্থিত হইলেও যদি পুরুষের ভোগে অনাসক্তি হয়, তাহাহইলে, বিষয় চিত্তকে উপরঞ্জিত করিতে পারে না। যে স্থলে পুরুষের ভোগেচ্ছা বর্ত্তমান আছে, সেই স্থলেই বিষয় চিত্তকে উপরঞ্জিত করিতে পারে। সমাধিকালে বা সুষুপ্তিতে শব্দ বা স্পর্শ চিত্তে উপস্থিত হইলেও সেই শব্দ বা স্পর্শ চিত্তকে উপরঞ্জিত করিতে পারে না। চিত্তের এই ভোগেচ্ছা কোথা হইতে উৎপন্ন হয়?—চিত্তের পূর্ব্বসংস্কার হইতে। যাহার সংস্কারে মাংসাহারের আসক্তি আছে, মাংস তাহার চিত্তকে উপরঞ্জিত করিতে পারিবে। যাহার মাংসাহারে প্রবৃত্তি নাই, মাংস তাহার চিত্তকে উপরঞ্জিত করিতে পারিবে না। এইজন্য বিষয় উপস্থিত হইলেও, সকল বিষয় সকলের চিত্তকে উপরঞ্জিত করিতে পারে না। যাহার চিত্তে যেরূপ সংস্কার আছে, সেইরূপ বিষয়ই তাহার চিত্তকে উপরঞ্জিত করিবে। যাঁহার চিত্তে কোনরূপ সংস্কার নাই, তাঁহার চিত্তও কোনরূপ বিষয়দ্বারা উপরঞ্জিত হয় না। তাঁহার নিকট জগতের বাস্তব অস্তিত্ব নাই। তিনিই প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানী। তিনি কুক্কুরকে আমাদের ন্যায় কুক্কুর বলিয়া দেখেন না। তিনি ব্রাহ্মণ ও চণ্ডালকে সমভাবেই দেখেন। তাঁহার ভেদজ্ঞান নাই। তিনি সর্ব্বত্রই সমদর্শন করেন। এই হেতু বিষয়ের যেমন চিত্তের সহিত যুক্ত হইয়া পুরুষকে ভোগ প্রদানের যোগ্যতা আছে; সেইরূপ পুরুষের

ভোগের জন্য চিত্তের বিষয় গ্রহণ করিবার বা উপরঞ্জিত হইবার যোগ্যতাও আছে। এইরূপে উভয়ের মধ্যে যথাযোগ্য কারণ বর্ত্তমান থাকিলে, যখন বিষয়ের সহিত চিত্তের যোগ হয়, তখন চিত্ত জ্ঞাত; এবং যখন যোগ না হয় তখন তাহা অজ্ঞাত। নিজে আগ্রহ করিয়া পুস্তক পাঠ করিতে বসিলে, পুস্তকের বিষয়গুলি চিত্তে সংযুক্ত হয় এবং পুস্তকপাঠও শীঘ্র হয়। আর পিতামাতার অনুরোধে বা তিরস্কারে অনিচ্ছার সহিত পুস্তক পাঠ করিলে, তাহা শীঘ্র মুখস্থ হয় না বা তাহা আয়ত্ত করিতে পারা যায় না। স্বীয় ইচ্ছা ও আগ্রহের সহিত কার্য্য করাকে আমরা শ্রদ্ধা বলি, আর অনিচ্ছার সহিত কার্য্য করাকে আমরা অশ্রদ্ধা বলি। শ্রদ্ধার সহিত কার্য্য না করিলে, সে কার্য্যে উৎসাহ হয় না এবং সফলতাও লাভ করা যায় না। অশ্রদ্ধার সহিত কার্য্য করিলে, তাহা বিফল হয়। যাহার যে বিষয়ে পূর্ব্বসংস্কার আছে তাহার সেই বিষয়ে শ্রদ্ধা হয়।

"হোম দান, জপ তপ, কর যে সকল।
শ্রদ্ধা না থাকিলে পার্থ! সকলি বিফল॥"

এই জ্ঞাতাজ্ঞাতস্বরূপত্বহেতু চিত্ত পরিণামী। কিন্তু পুরুষ অপরিণামী, কারণ পুরুষ সদাজ্ঞাত।

সদা জ্ঞাতাশ্চিত্তবৃত্তয়স্তৎপ্রভোঃ পুরুষস্যাহপরিণামিত্বাৎ ॥১৮॥

চিত্ত পরিণাম প্রাপ্ত হয় কিন্তু পুরুষ অপরিণামী। এইজন্য প্রভু পুরুষের অপরিণামিত্বের জন্য পুরুষ সদাজ্ঞাত; অর্থাৎ কখনও জ্ঞাত এবং কখনও অজ্ঞাত এরূপ নয়।

চিত্তে যখন যে বৃত্তি উঠে, তাহা পুরুষের জ্ঞাত। পুরুষের অজ্ঞাতসারে চিত্তে কোন বৃত্তি উঠিতে পারে না। প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প,

নিদ্রা বা স্মৃতি যে কোন বৃত্তিই চিত্তে উঠুক না কেন, তাহা সর্ব্বদাই পুরুষের জ্ঞাত। তাহা কখনও পুরুষের অজ্ঞাতসারে হয় না। এইজন্য পুরুষবিষয় যে চিত্ত তাহা সদাজ্ঞাত, কিন্তু চিত্তের বিষয় জ্ঞাতাজ্ঞাত। এই হেতু চিত্ত পরিণামী এবং পুরুষ অপরিণামী। চিত্তের ন্যায় পুরুষও পরিণামী হইলে, তাহার বিষয় চিত্তবৃত্তিসকল, শব্দ ও রসাদির ন্যায় কখনও জ্ঞাত এবং কখনও বা অজ্ঞাত হইত; কিন্তু তাহা হয় না, কারণ চিত্ত সর্ব্বদাই জ্ঞাত; ইহাই পুরুষের অপরিণামিত্বের পরিচায়ক।

ন তৎ স্বাভাসং দৃশ্যত্বাৎ ॥ ১৯ ॥

দৃশ্যত্বহেতু চিত্ত স্বপ্রকাশ নহে।

যে প্রকাশ করে তাহাকে দ্রষ্টা বলে, আর যাহার প্রকাশ করা যায় তাহার নাম দৃশ্য। দ্রষ্টা দৃশ্যকে প্রকাশিত করিতে পারে; কিন্তু দৃশ্য দ্রষ্টাকে প্রকাশিত করিতে পারে না। দ্রষ্টা চেতন ও দৃশ্য অচেতন। চেতন অচেতনকে জানিতে পারে, কিন্তু অচেতন চেতনকে জানিতে পারে না। শরীর, ইন্দ্রিয়, তন্মাত্র ও অস্মিতাদি সমুদয় প্রকৃতিতত্ত্ব অচেতন, এইজন্য তাহারা দৃশ্য—তাহারা দ্রষ্টাকে জানিতে পারে না; কিন্তু দ্রষ্টা এসকলকে জানিতে পারে। অন্ধকার ঘরের মধ্যে আলোক থাকিলে, আলোক ঘরের ভিতরকার সমুদয় দ্রব্য প্রকাশিত করিতে পারে; কিন্তু দ্রব্য আলোককে প্রকাশিত করিতে পারে না। আলোক স্বপ্রকাশ। আলোককে প্রকাশিত করিবার জন্য আর অপর আলোকের আবশ্যক হয় না। দ্রষ্টা স্বপ্রকাশ দ্রষ্টাকে প্রকাশিত করিবার জন্য আর অপর দ্রষ্টার আবশ্যক করে না। যেমন ঘরের ভিতরের দ্রব্য প্রকাশিত করিবার জন্য আলোকের আবশ্যক, সেইরূপ শরীর ও ইন্দ্রিয়াদি তত্ত্বসকল প্রকাশিত করিবার জন্য দ্রষ্টা পুরুষের আবশ্যক।

স্বাভাস কাহাকে বলে? স্বাভাস=স্ব+আভাস। যাহা নিজে নিজেই আভাসমান হয়, তাহাকে স্বাভাস বলে। যাহার আভাসের জন্য অর্থাৎ প্রকাশের জন্য অপর কাহারও সাহায্য আবশ্যক হয় না, তাহা স্বাভাস। দ্রষ্টা পুরুষ স্বাভাস, কিন্তু দৃশ্য প্রকৃতি স্বাভাস নহে; এইজন্য দৃশ্যত্বহেতু প্রকৃতি স্বাভাস নহে। চিত্ত দৃশ্যপদার্থ, এজন্য চিত্ত স্বাভাস নহে—চিত্ত পরাভাস। এইজন্য দ্রষ্টা ও দৃশ্য পৃথক্ পদার্থ। এইজন্য দ্রষ্টা—শরীর বা ইন্দ্রিয়াদি নহে। শরীর ও ইন্দ্রিয়াদিতে আমিত্ববোধ ভ্রান্তিমাত্র। অনাদি অনন্তকাল হইতে এই ভ্রান্তি চলিয়া আসিতেছে। এই ভ্রান্ত বিশ্বাস এত দৃঢ় হইয়াছে, যে সহজে এই ভ্রান্তির অপনোদন হয় না।

একসময়ে চোভয়ানবধারণম্ ॥ ২০ ॥

একসময়ে উভয়ের অবধারণ হয় না। একই ক্ষণে দ্রষ্টা ও দৃশ্যের অবধারণ হয় না। যে সময়ে দৃশ্যের অবধারণ হয়, সে সময়ে দ্রষ্টার অবধারণ হয় না। যে সময় বিষয়জ্ঞান হয়, সে সময় দ্রষ্টার জ্ঞান হয় না। যে সময় বিষয়জ্ঞান হয়, সে সময় আত্মস্মৃতি হয় না। বিষয়ভোগকালে আত্মস্মৃতি হয় না। যখন বিষয়ভোগ হয় না, তখন আত্মস্মৃতি হয়। বৈরাগ্যাবস্থায় আত্মস্মৃতি হয়। এইহেতু একই সময়ে উভয়ের অবধারণ হয় না।

চিত্তান্তরদৃশ্যে বুদ্ধিবুদ্ধেরতিপ্রসঙ্গঃ স্মৃতিসঙ্করশ্চ ॥ ২১ ॥

চিত্তান্তর দৃশ্য অর্থাৎ এক চিত্ত অন্য চিত্তকে প্রকাশ করে, এইরূপ স্বীকার করিলে, বুদ্ধি-বুদ্ধির অতিপ্রসঙ্গ হয় অর্থাৎ প্রথম চিত্তকে

দ্বিতীয় চিত্ত, আবার দ্বিতীয় চিত্তকে তৃতীয় চিত্ত, আবার তৃতীয় চিত্তকে চতুর্থ চিত্ত প্রকাশ করে ; এইরূপ অনবস্থা দোষ ও স্মৃতিসঙ্কর উৎপন্ন হয়।

একটী চিত্ত যদি আর একটি চিত্তের প্রকাশক হয়, তবে সেই প্রকাশক চিত্তের আবার আর একটী প্রকাশক চাই—এইরূপ ক্রমান্বয়ে চিত্তসংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়া যায়—তাহার আর শেষ হয় না ; সুতরাং ইহাতে অতিপ্রসঙ্গ দোষ বা অনবস্থা দোষ হয়। আবার যতগুলি চিত্ত হইবে, ততগুলি স্মৃতিও হইবে ; সুতরাং কোন্ স্মৃতিটী নিশ্চয় জ্ঞানে অবলম্বন করিব, তাহারও স্থিরতা হয় না। চিত্তও সংখ্যায় যত বর্দ্ধিত হয়—স্মৃতিও সংখ্যায় ততই বর্দ্ধিত হয় ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ব্যবহারকালে আমরা একটী বিষয়ের একটী স্মৃতিই অনুভব করি—অনেক স্মৃতি অনুভব করি না। এইহেতু চিত্ত চিত্তকে দর্শন করে না। চিত্তের দ্রষ্টা অপর কিছু থাকে। দ্রষ্টা পুরুষই দৃশ্য চিত্তকে দর্শন করে। এইরূপে দ্রষ্টা ও দৃশ্যের পৃথক্ত্ব প্রমাণসিদ্ধ হইল। সুতরাং চিত্ত দ্রষ্টা নহে—চিত্ত দৃশ্য। এইরূপে দ্রষ্টা ও দৃশ্যের ভেদ স্থির করিয়া দৃশ্য হইতে আসক্তি পরিত্যাগ করিবে। সর্ব্বদা দৃশ্যের সহিত নির্লিপ্ত থাকিবে। দৃশ্যের সহিত লিপ্ত হওয়াকেই ভোগ বলে, আসক্তি বলে বা সংসার বলে আর দৃশ্যের সহিত নির্লিপ্ত অবস্থাকেই মুক্তি বলে। "আমি দৃশ্য নহি—আমি দ্রষ্টা।" দৃশ্যে আমিত্ব অভিমান করিলেই দৃশ্যের সহিত লিপ্ত হইয়া যাইবে, তখন তোমার সংসার যন্ত্রণা ভোগ হইবে। আর দৃশ্যের সহিত নির্লিপ্ত থাকিয়া—অনাসক্তভাবে অবস্থান করিতে পারিলে তোমার "জীবন্মুক্ত" অবস্থা হইবে।

চিতেরপ্রতিসংক্রমায়াস্তদাকারাপত্তৌ স্ববুদ্ধিসংবেদনম্ ॥ ২২ ॥

চিতিশক্তি অপ্রতিসংক্রমা অর্থাৎ সঞ্চারবিহীনা হইয়াও স্ববুদ্ধি-

সংবেদনবশতঃ অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া তদাকারপ্রাপ্তের ন্যায় হয় অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তির স্বারূপ্য ধারকের ন্যায় হয়।

চিতিশক্তি অপ্রতিসংক্রমা সুতরাং অপরিণামিণী। তবে পরিণতের ন্যায় হয় কি প্রকারে? পুরুষ প্রকৃতপক্ষে বিষয়াকারে পরিণত হন না। পুরুষ সদা নির্ম্মল, বিশুদ্ধ ও একরূপ। পুরুষের রূপ বা আকারের পরিবর্ত্তন হয় না। তথাপি বুদ্ধিবৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া বৃত্তির স্বারূপ্য ধারণ করেন। পুরুষ তখন আপনাকে বুদ্ধিবৃত্তির সহিত এক মনে করেন। পুরুষ নিজের স্বাতন্ত্র্য বিস্মৃত হন। ইহাকেই আত্মবিস্মৃতি বলে। পুরুষ আপনার স্বরূপ ভুলিয়া বুদ্ধিবৃত্তির স্বরূপে অভিমান করেন। পুরুষ মনে করেন,—"আমি পুরুষ নহি, আমি বুদ্ধিবৃত্তি", বুদ্ধিবৃত্তিতে অভিমান করিয়া পুরুষ সেই বৃত্তির সুখে সুখী হন, সেই বৃত্তির দুঃখে দুঃখী হন। বাস্তবিক বৈষয়িক সুখদুঃখ পুরুষকে স্পর্শ করিতে পারে না। বিষয়ে অভিমান করিয়া পুরুষ এই সুখদুঃখ ভোগ করেন। পুরুষের এই অভিমানকে অস্মিতা বা অহঙ্কার বলে। বুদ্ধিবৃত্তি সাত্ত্বিক-প্রকাশ। প্রকাশের নামই বুদ্ধি। চিত্তের যে প্রকাশভাব—তাহাই বুদ্ধি। চিত্তের মধ্যে সংস্কার সঞ্চিত আছে। সংস্কার অব্যক্ত ও নিষ্ক্রিয় অবস্থায় আছে। তাহাতে রজোগুণের কার্য্য হইয়া 'সাত্ত্বিক-প্রকাশ হয়। সত্ত্বগুণের স্বভাব প্রকাশ। এই সাত্ত্বিক-প্রকাশকে বুদ্ধি বলে। চিত্ত জড়, সংস্কারও জড়; সত্ত্ব, রজঃ ও তম ইহারাও জড়। তবে ইহাদের কার্য্য হয় কি করিয়া? চৈতন্যের আভাস বা প্রতিবিম্ব পাইয়া ইহারা কার্য্যক্ষম হয়। চৈতন্যের আভাস না পাইলে, ইহারা কার্য্যক্ষম হইত না। চিত্ত জড়—চিত্ত ভোগ করে না। নির্গুণ পুরুষও ভোগ করেন না। তবে ভোগ করে কে? পুরুষের আভাস পাইয়া এই যে বুদ্ধিবৃত্তি প্রকাশ পায় এবং যাহাতে পুরুষ অভিমান করেন, যাহা অস্মিতা নামে আখ্যাত, তাহাই ভোগ

করে। পুরুষ ভোগে অভিমান করিলে, তাঁহার সংসার হয় আর স্বরূপে অভিমান করিলে, তাঁহার মুক্তি হয়। ভোগে অভিমান—প্রবৃত্তি বা বন্ধন এবং স্বরূপে অভিমান—নিবৃত্তি বা মোক্ষ। এই অস্মিতার অনুলোমগতিতে সংসার হয় আর এই অস্মিতার প্রতিলোম-গতিতে মুক্তি হয়। পুরুষ যখন বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয় ও শরীরাদিতে অভিমান করেন তখন তাঁহার অনুলোমগতি—তখন তাঁহার বন্ধন; আর পুরুষ যখন শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধ্যাদিতে অভিমান ত্যাগ করিয়া নিজ স্বরূপে অভিমান করেন, তখন তাঁহার প্রতিলোমগতি ইহাই নিবৃত্তিপথ—ইহাই মোক্ষ। সুতরাং অস্মিতার এই দুইটী গতি আছে। এইপ্রকারে পুরুষ অপ্রতিসংক্রম হইয়াও বুদ্ধিবৃত্তির সহিত একাকার হইয়া যেন বুদ্ধি হইয়া যান। জলে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব পতিত হইয়াছে, ঐ জল কম্পিত হইলে মনে হয় যেন সূর্য্য কম্পিত হইতেছে; কিন্তু বাস্তবিক সূর্য্য যেমন তেমনই আছে। সেইরূপ বুদ্ধিবৃত্তিতে চৈতন্যের প্রতিবিম্ব পতিত হইয়া বোধ হয়, যেন চৈতন্য বুদ্ধিবৃত্তির সুখদুঃখ ভোগ করিতেছেন; কিন্তু বাস্তবিক চৈতন্যের কোন ভোগ নাই, চৈতন্য যেমন তেমনই আছেন।

চৈতন্যের আভাসে চিত্তে সমুদয় বিষয় প্রকাশিত হয়। রূপবিষয় যেমন নীলপীতাদি, রসবিষয় যেমন কটুতিক্তাদি এবং শব্দ, স্পর্শ ও গন্ধাদি সমুদয় বিষয়ের জ্ঞান যেমন চিত্তে উদিত হয়—আমিত্ব-জ্ঞানও তদ্রূপ উদিত হয়। বিষয়বোধকে বোধ বলে এবং আমিত্ব-বোধকেও বোধ বলে। বিষয়ও যেমন বোধ, আমিত্বও সেইপ্রকার বোধ। অতএব এই আমিত্ববোধ, বোধমাত্র—ইহা পুরুষ নহে। সমুদয় বোধের মধ্যে এই "আমিত্ব" বোধই চরমবোধ। ইহার উপর আর কোন বোধ নাই। বোধের মধ্যে ইহাই সর্ব্বশেষ বোধ; সুতরাং আমিত্ব পুরুষ নহে। এই আমিত্ব হইতে পুরুষকে স্বতন্ত্র

করিতে পারিলেই মুক্তি। সমুদয় বিষয়ের অভিমান ত্যাগ করিয়া পরিশেষে এই আমিত্বের অভিমানও ত্যাগ করিতে হইবে অর্থাৎ আমিত্বও ভুলিয়া যাইতে হইবে। আমিত্ব বা অস্মিতা বা অভিমানের লয় হইলেই মুক্তি।

দ্রষ্টৃ-দৃশ্যোপরক্তং চিত্তং সর্ব্বার্থম্ ॥ ২৩ ॥

একদিকে দ্রষ্টৃপুরুষের সহিত ও অন্যদিকে শব্দাদি সমুদয় ইন্দ্রিয়-বিষয়ের সহিত উপরক্ত অর্থাৎ সম্বন্ধ বলিয়া চিত্তকে সর্ব্বার্থ বলা হয়।

যেমন একটী স্বচ্ছ স্ফটিকের একপার্শ্বে একটি লাল দ্রব্য রাখিলে ও অন্যপার্শ্বে একটী নীল দ্রব্য রাখিলে, উক্ত স্ফটীক উভয় বর্ণেই রঞ্জিত হয় অর্থাৎ উভয় বর্ণের সহিত সম্বদ্ধ হয়, সেইপ্রকার চিত্তও দ্রষ্টা ও দৃশ্য উভয়েরই সহিত সম্বদ্ধ—এইজন্য চিত্ত সর্ব্বার্থ। একই চিত্তের বিষয়জ্ঞান, ইন্দ্রিয়জ্ঞান ও পুরুষজ্ঞান হয়। বিষয় গ্রাহ্য, ইন্দ্রিয় গ্রহণ ও পুরুষ গ্রহীতা। সুতরাং গ্রাহ্য, গ্রহণ ও গ্রহীতার জ্ঞান এক চিত্ত দ্বারাই হয়। এই গ্রাহ্য, গ্রহণ ও গ্রহীতার যথার্থজ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান। গ্রাহ্য—বিষয়, সুখদুঃখজড়িত; কিন্তু গ্রহীতা—পুরুষ, সুখদুঃখশূন্য। এই প্রকৃতি ও পুরুষের জ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান। এই তত্ত্বজ্ঞানই জ্ঞান এবং অপর সমস্তই অজ্ঞান।

তদসংখ্যেয়বাসনাভিশ্চিত্রমপি পরার্থং সংহত্যকারিত্বাৎ ॥২৪॥

সেই চিত্ত অসংখ্য বাসনার দ্বারা চিত্রিত হইলেও তাহা সংহত্যকা-রিত্ব—হেতু পরার্থ।

ইট, কাঠ, চুণ, সুরকী দিয়া একখানি ঘর তৈয়ারী হইয়াছে;

সেই ঘরের মধ্যে খাট, পালঙ্ক, বিছানা, বাক্স প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া রাখা হইয়াছে ও ঘরের দেওয়ালে নানাপ্রকার চিত্রপট স্থাপিত হইয়াছে। এই ইট, কাঠ ও গৃহমধ্যস্থ আসবাব প্রভৃতি কাহার সুখের নিমিত্ত? তাহারা কি তাহাদের স্ব স্ব সুখের জন্য সংগৃহীত হইয়াছে?—ইট, কাঠ, প্রভৃতি এই সুখভোগ করে না; ইহারা অপরের সুখভোগের জন্য সংগৃহীত হইয়াছে—ইহারা পরার্থ। ইহারা স্বার্থ নহে। ইহারা পরের প্রয়োজন সিদ্ধ করে; ইহারা পরের সুখের জন্য। ইহারা সেই গৃহস্বামীর সুখের জন্য। এইজন্য ইহারা পরার্থ। সেইপ্রকার আমাদের চিত্তরূপ গৃহ অনাদি অনন্তকালের বাসনাজাল দ্বারা চিত্রিত হইলেও, তাহারা চিত্তের প্রয়োজনসাধন-জন্য নহে। তাহারা চিত্ত হইতে ভিন্ন অপর এক পুরুষের অর্থ বা প্রয়োজনসাধনের জন্য। চিত্তের নিজের সুখদুঃখ ভোগের জন্য এই আয়োজন হয় নাই। পুরুষের ভোগ ও অপবর্গের জন্যই এই আয়োজন।

বিশেষদর্শিন আত্মভাব-ভাবনা-বিনিবৃত্তিঃ ॥ ২৫ ॥

বিশেষদর্শীর আত্মভাবভাবনা নিবৃত্ত হয়।

বিশেষদর্শী কাহাকে বলে? পুরুষদর্শীকে বিশেষদর্শী বলে। যিনি পুরুষসাক্ষাৎকার করিয়াছেন, তিনি বিশেষদর্শী। আত্মভাব-ভাবনা কাহাকে বলে?—আত্মার বিষয়ে ভাবনা। আমি কে? কোথা হইতে আসিলাম? কোথায় যাইব? ইত্যাদি প্রকার ভাবনাকে আত্মভাবভাবনা বলে। যখন আত্মপুরুষের সহিত সাক্ষাৎকার হয় তখন আত্মভাবভাবনাও নিবৃত্ত হয়।

আত্মভাবভাবনা কি সকলেরই হয়?—না, সকলের হয় না।

যাহারা ঘোর নাস্তিক, তাহাদের হয় না। যাহাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে অনেক সাধনা নিষ্পন্ন হইয়াছে, তাহাদেরই আত্মভাবভাবনা হয়। ইহাদের লক্ষণ কি? যাহাদের আত্মভাবভাবনা হয়, তাহাদের মোক্ষশাস্ত্রে অত্যন্ত রুচি হয়। তাহারা মোক্ষশাস্ত্র, শ্রবণ, মনন ও ধ্যান করিতে ভালবাসে এবং তাহাতে সুখ পায়। ইহার আলোচনায়, তাহাদের দেহে রোমহর্ষ ও অশ্রুপাতাদি সাত্ত্বিক লক্ষণসকল পরিস্ফুট হয়। মৃত্তিকামধ্যে তৃণবীজ থাকিলে, যেমন বর্ষার জল পাইলেই তাহার অঙ্কুরোদ্গম হয়, সেইরূপ মোক্ষশাস্ত্রের আলোচনা হইলে, এই সকল পূর্ব্বজন্মের সাধনসম্পন্ন মানবগণের দেহে সাত্ত্বিকভাবসকল প্রকাশ পায়। আত্মাকে যতদিন না জানা হয়, ততদিনই আত্মজিজ্ঞাসা থাকে। একবার আত্মাকে জানিলে আত্মজিজ্ঞাসারও নিবৃত্তি হয়। অবিদ্যার নিবৃত্তি হইলেই আত্মদর্শন হয়—ইহারাই বিশেষদর্শী এবং ইহাদের আত্মভাবভাবনার অর্থাৎ আত্মতত্ত্বজিজ্ঞাসার নিবৃত্তি হয়।

তদা বিবেকনিম্নং কৈবল্যপ্রাগ্ভারং চিত্তম্॥ ২৬॥

সেই সময় চিত্ত বিবেকনিম্ন অর্থাৎ বিবেকপ্রবাহে পতিত ও কৈবল্যপ্রাগ্ভার হয় অর্থাৎ মুক্তির অভিমুখ হয়।

বিবেকের দ্বারা যখন আত্মভাবভাবনা নিবৃত্ত হয়, তখন চিত্ত কল্যাণপথপ্রবাহী। একটী নালার যে দিকে নীচু, জল সেইদিকে প্রবাহিত হয় এবং পরিশেষে সর্ব্বনিম্নস্থানে গিয়া সেই জল সঞ্চিত হয়; সেইরূপ যে চিত্ত পূর্ব্বে বিষয়মার্গে ধাবিত হইত, এক্ষণে তাহা বিবেকমার্গসঞ্চারি হইয়া কৈবল্যলাভ করে।

তচ্ছিদ্রেষু প্রত্যয়ান্তরাণি সংস্কারেভ্যঃ ॥ ২৭ ॥

তাহার ছিদ্রে অর্থাৎ সেই বিবেকমার্গবাহী চিত্তের অন্তরালে পূর্ব্ব-সংস্কার হইতে অন্য ব্যুত্থানপ্রত্যয়সকল উদিত হয়।

চিত্ত বিবেকপথে প্রবাহিত হয় বটে, কিন্তু তখনও সকল সংস্কারের ক্ষয় হয় নাই। তখনও অনেক অজ্ঞান বা অবিবেকসংস্কার চিত্তে সঞ্চিত আছে। এই সকল অজ্ঞানসংস্কার হইতে উপরোক্ত বিবেকের অন্তরালে মধ্যে মধ্যে অজ্ঞানপ্রত্যয় উত্থিত হয়। পরে ক্রমে বিবেক অভ্যাস করিতে করিতে বিবেকসংস্কার সঞ্চিত হয় এবং সেই বিবেকসংস্কার অবিবেকসংস্কারকে ক্ষয় করে। একবার জ্ঞানের স্রোত বহিলেই সাধকের নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত নহে, কারণ তখনও তাহার চিত্তে অজ্ঞানস্রোত বহিতে পারে, তখনও তাহার পতন হইতে পারে, এইজন্য যতদিন না সম্পূর্ণরূপে সংস্কারক্ষয় হয়, ততদিন দৃঢ়ভাবে সাধন করিয়া যাইবে।

হানমেষাং ক্লেশবদুক্তম্ ॥ ২৮ ॥

ইহাদের অর্থাৎ এই সকল অবিবেকপ্রত্যয়ের হান পঞ্চবিধ ক্লেশ-হানের ন্যায় উক্ত হইয়াছে।

জ্ঞানাগ্নিদ্বারা অবিদ্যা ও অস্মিতাদি পাঁচপ্রকার ক্লেশ যেমন দগ্ধ হইয়া যায়, আর তাহা হইতে কোন কার্য্য হয় না, পূর্ব্বসংস্কারসকলও সেইরূপ জ্ঞানাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া নাশপ্রাপ্ত হয়। যেমন ধান্যবীজ দগ্ধ হইলে আর তাহা হইতে অঙ্কুরোদ্গম হয় না, তেমনিই সংস্কার দগ্ধীভূত হইলে, আর তাহা হইতে কোন প্রত্যয় উঠে না। বিবেকজ্ঞানের অপরি-পক্ক অবস্থায় এইরূপ ব্যুত্থানসংস্কারসকল উত্থিত হয় বটে; কিন্তু

পরিপক্ব হইলে আর সেইরূপ হইতে পারে না। বিবেকসংস্কার যতই বর্দ্ধিত হয়, ব্যুত্থানসংস্কার ততই কমিয়া যায়। পরে ব্যুত্থান-সংস্কার সম্পূর্ণ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া যায়। চিত্তে কেবলমাত্র বিবেকসংস্কার থাকে। চিত্তে সংস্কার থাকিলেই বন্ধন। চিত্তে সংস্কার থাকিলেই চিত্ত রহিয়া গেল, চিত্তের লয় হইল না। যতদিন চিত্তের লয় না হইবে, ততদিন মুক্তি নাই। তাহাহইলে, এই বিবেকসংস্কার ধ্বংসের উপায় কি? এই বিবেকসংস্কার ধ্বংস করিবার জন্য কোন প্রকার সাধন করিতে হইবে না। ইহা আপনিই ধ্বংস হইয়া যাইবে। বিবেক-সংস্কার আপনিই ধ্বংস হইয়া চিত্তের সহিত লীন হইয়া যায়। চিত্ত লয়প্রাপ্ত হইলেই মুক্তি। এইস্থানেই গুণের অধিকারসমাপ্তি। এইস্থানে সাধক গুণের হাত হইতে অব্যাহতি পাইলেন।

প্রসংখ্যানেঽপ্যকুসীদস্য সর্ব্বথা বিবেকখ্যাতে-র্ধর্ম্মমেঘঃ সমাধিঃ ॥ ২৯ ॥

প্রসংখ্যানেও অকুসীদ হইলে সর্ব্বথা বিবেকখ্যাতি হইতে ধর্ম্মমেঘ সমাধি হয়।

প্রসংখ্যান অর্থাৎ সমুদয় প্রাকৃতিক তত্ত্বের স্বরূপ নির্ব্বাচনপূর্ব্বক তাহাদের অবধারণ। মূলাপ্রকৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া চিত্ত, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, মন, ইন্দ্রিয় ও ভূতাদি সমুদয় তত্ত্বের প্রকৃত স্বরূপ জানিয়া তাহাতে মন স্থির রাখা। ইহাকে বিবেকজ জ্ঞান বলে। এই বিবেকজ জ্ঞানেও অকুসীদ হইতে হইবে। কুসীদ অর্থাৎ সুদ। মহাজনেরা টাকা ধার দিয়া তাহার সুদ ভোগ করে। কুসীদ=কুৎসিতেষু বিষয়েষু সীদতীতি কুসীদঃ=রাগঃ। বিষয়মাত্রই বিষস্বরূপ। বিষয়মাত্রই আমাদের সংসারপথে আনয়ন করে, এজন্য বিষয় কুৎসিৎ। এই কুৎসিৎ

বিষয়ে যে অনুরাগ তাহাকে কুসীদ বলে। যেমন, যতই সুদ লাভ হউক না কেন—মহাজনের তাহাতে আশা মিটে না; সে আরও চায়—তাহার আশার তৃপ্তি হয় না—তাহার আশার উদর পূর্ণ হয় না—তাহার লোভের উপশম হয় না বরং উত্তরোত্তর বৰ্দ্ধিত হয়—তাহার কাম উত্তরোত্তর বৰ্দ্ধিত হইয়া তাহাকে অধঃপাতে লইয়া যায়। এই দুষ্পূর কামকেই কুসীদ বলে। এইরূপ কামরহিত পুরুষকে অকুসীদ বলে। যাঁহার বিষয়াসক্তি নাই, যিনি সকল ভোগ্যবিষয়ে বিরক্ত—তিনিই অকুসীদ। বিবেকজ জ্ঞানের দ্বারা সর্ব্বজ্ঞতাসিদ্ধিলাভেও এইপ্রকার অকুসীদ হইলে, সর্ব্বথা বিবেকখ্যাতি হইতে ধর্ম্মমেঘ সমাধি হয়। অর্থাৎ যোগী যখন এই সর্ব্বজ্ঞতাসিদ্ধিকেও তুচ্ছ ও হেয় জ্ঞান করিয়া তাহাতে বিরক্ত হন, তখন তাঁহার ধর্ম্মমেঘ সমাধি হয়। মেঘ হইতে যেমন বৃষ্টির জল বর্ষিত হয়, এই ধর্ম্মমেঘ হইতেও সেইরূপ অশুক্লাকৃষ্ণরূপ ধর্ম্ম বর্ষিত হয়। ইহাই সাধনের চরম সীমা।

ততঃ ক্লেশকর্ম্মনিবৃত্তিঃ ॥ ৩০ ॥

উপরোক্ত ধর্ম্মমেঘ সমাধি হইলে ক্লেশ ও কর্ম্মের নিবৃত্তি হয়।

—ধর্ম্মমেঘ সমাধি লাভ হইলে অবিদ্যা ও অস্মিতাদি পঞ্চক্লেশ সমূলে বিনষ্ট হয়; সুতরাং তাহাদের সহিত পুণ্য ও পাপরূপ কর্ম্মাশয়ও ক্ষীণ হয়, এজন্য সাধকের সমুদয় কর্ম্মও বিনষ্ট হয়। এইরূপে ক্লেশ ও কর্ম্মের নিবৃত্তি হওয়ায় সাধক জীবন্মুক্ত হন। তাঁহারা আর নূতন সঙ্কল্প বা কর্ম্ম কিছুই করেন না; কেবল পূর্ব্বপ্রারব্ধ ভোগের জন্য শরীর ধারণ করেন। ইঁহারা আর জন্মগ্রহণ করেন না। যদি করেন, তাহাও নির্ম্মাণচিত্ত হইয়া—পরোপকারের নিমিত্ত। জীবন্মুক্তেরা অভয়। ইঁহাদের কোনপ্রকার ভয় নাই। ইঁহারা প্রাণভয়ে দৌড়াইয়া পলা-

হইয়া যান না, কোনপ্রকার কঠিন ব্যাধি, ক্ষুধা বা তৃষ্ণাতে অভিভূত হন না। আজকাল অনেক আশ্রমে জীবন্মুক্তের অভাব নাই! জীবন্মুক্তের ছড়াছড়ি! ইহারা প্রাণেরও মমতা রাখে এবং বিলাস-ভোগ ত্যাগ করিতেও ক্লেশবোধ করে, কিন্তু "অহং ব্রহ্মাস্মি" বলিতে কুণ্ঠিত হয় না! সংসারে এমন পাপকার্য্য নাই, যাহা এই প্রতারক জীবন্মুক্তগণ করিতে না পারে। এই সকল ভণ্ড সন্ন্যাসীর সঙ্গ সর্ব্বথা ত্যাগ করিবে। ইহাদের অপেক্ষা সাধারণ সংসারীরা শতগুণে শ্রেষ্ঠ। কারণ সংসারীরা প্রকাশ্যে পাপ করে, আর এই ভণ্ড মহাপুরুষেরা গোপনে পাপ করে। জীবন্মুক্ত হওয়া সহজ কথা নয়। পরম সৌভাগ্য না থাকিলে জীবন্মুক্তের দর্শনলাভ হয় না।

তদা সর্ব্বাবরণমলাপেতস্য জ্ঞানস্যানন্ত্যাজ্ জ্ঞেয়মল্পম্ ॥৩১॥

তখন সমস্ত আবরণমল অর্থাৎ ক্লেশকর্ম্ম বিমুক্ত হইয়া জ্ঞানের অনন্তত্ব সিদ্ধ হয় এবং জ্ঞেয় অল্প বলিয়া প্রতিভাত হয় অর্থাৎ অতি তুচ্ছ হয়।

রজঃ ও তমোগুণকে মল বলে। ইহারাই সত্ত্বের আবরণ। সত্ত্বই জ্ঞান। এই জ্ঞান রজঃ ও তমোমলের দ্বারা আবৃত হয় বলিয়া জীব অজ্ঞানে আচ্ছন্ন হয়। রজঃ ও তমোমল বিদূরিত হইলেই সমস্ত আবরণ ঘুচিয়া যায়। রজঃ ও তমোমল হইতেই ক্লেশকর্ম্মের উদ্ভব হয়; সুতরাং তখন জীব ক্লেশকর্ম্ম হইতেও বিমুক্ত হয় এবং চিত্তসত্ত্ব আবরণমলবিহীন হয়। চিত্তসত্ত্বই জ্ঞান, সুতরাং তখন যোগী অনন্ত জ্ঞানের অধিকারী হন এবং পূর্ব্বের জ্ঞেয় বিষয়সমূহ তাঁহার সেই অনন্ত জ্ঞানের তুলনায় অকিঞ্চিৎকর বোধ হইয়া থাকে। যেমন সমুদয় আকাশের মধ্যে জোনাকি পোকাকে অতি ক্ষুদ্র বোধ হয়,

সেইরূপ তখন সেই অনন্ত জ্ঞানের তুলনায় জ্ঞেয়ও অল্প হইয়া যায়। এই ধর্ম্মমেঘ সমাধির দ্বারা বাসনার সহিত ক্লেশ ও কর্ম্মাশয় একেবারে সমূলে ধ্বংস হয়; তখন আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। দৃষ্টান্ত যথাঃ—অন্ধ মণি বিদ্ধ করিয়াছে, অঙ্গুলিবিহীন ব্যক্তি সেই মণি লইয়া মালা গাঁথিয়াছে, গ্রীবাহীন ব্যক্তি ঐ মালা গলায় পরিয়াছে আর জিহ্বারহিত ব্যক্তি তাহার প্রশংসা করিয়াছে। এই সকল ব্যাপার যেমন অসম্ভব, সেইপ্রকার সংস্কারবীজ দগ্ধ হইলে পুনর্জ্জন্ম অসম্ভব।

ততঃ কৃতার্থানাং পরিণামক্রমসমাপ্তির্গুণানাম্ ॥৩২॥

ধর্ম্মমেঘ সমাধি হইতে গুণসকল কৃতার্থ হয়, সুতরাং তাহাদের পরিণামক্রমের সমাপ্তি হয়, অর্থাৎ তাহারা আর পরিণাম প্রাপ্ত হয় না; কিন্তু স্ব স্ব কারণে লীন হয়।

লোকে কাজ করে কতক্ষণ? যতক্ষণ তাহার অর্থ বা প্রয়োজন সিদ্ধ না হয়। লোকে ভোজন করে কতক্ষণ? যতক্ষণ তাহার ক্ষুধার পরিতৃপ্তি না হয়। ক্ষুধার পরিতৃপ্তি হইলে, সে আর আহার করিতে চায় না। তৃষ্ণার পরিতৃপ্তি হইলে, সে আর জলপান করিতে চায় না। যে, যে কার্য্য করিতেছে, সে সেই কার্য্যে কৃতার্থ হইলে, আর সেই কার্য্য করে না। তখন তাহার কার্য্যসমাপ্তি হয়। চিত্তের কার্য্য—পুরুষের ভোগ এবং অপবর্গ সাধন। পুরুষ ভোগে বিতৃষ্ণ হইলে আর ভোগ চাহেন না এবং অপবর্গ প্রাপ্ত হইলে পুরুষের সকল অভাব মিটিয়া যায়, আর চাহিবার বস্তু কিছু থাকে না; সুতরাং চিত্তমধ্যস্থ গুণের কার্য্যও শেষ হয়। পুরুষের ভোগ এবং অপবর্গজন্যই গুণসকল এতদিন কার্য্য করিতেছিল, এক্ষণে সেই কার্য্য সম্পন্ন হওয়াতে, তাহাদের কার্য্য শেষ হইল। এইহেতু ধর্ম্ম

মেঘ সমাধি হইতে ক্লেশকর্ম্মের শেষ হয়, জ্ঞানের চরম উৎকর্ষ হয় এবং গুণের পরিণামক্রমের শেষ হয়। তাহাতে গুণসকল কৃতার্থ হয়।

ক্ষণপ্রতিযোগী পরিণামাপরান্তনির্গ্রাহ্যঃ ক্রমঃ ॥ ৩৩ ॥

যাহা ক্ষণের প্রতিযোগী অর্থাৎ ক্ষণরূপ কার্য্যাবকাশের নিরূপক ও পরিণামের অপরান্ত অর্থাৎ অবসান পর্য্যন্ত গ্রাহ্য, তাহাই ক্রম।

কালের অতি সূক্ষ্ম অবিভাজ্য অংশকে ক্ষণ বলে। এক একটী ক্ষণে এক একটী ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়। বাস্তবিক কাল বলিয়া কোন দ্রব্য নাই, সুতরাং ক্ষণ বলিয়াও কোন কিছু বাস্তব পদার্থ নাই। এক একটী ক্রিয়ার ধারাকে ক্ষণ বলে। একটী ক্রিয়ার ধারা শেষ হইয়া আর একটী ক্রিয়া আরম্ভ হয়। এই প্রথম ক্রিয়ার শেষ যেখানে হয়—সেই পর্য্যন্ত একটী ক্রিয়ার ধারা অর্থাৎ একটী ক্ষণ অর্থাৎ প্রথম ক্ষণ। আবার দ্বিতীয় ক্রিয়ার ধারা যেখানে শেষ হইবে, তাহা দ্বিতীয় ক্ষণ; আবার তৃতীয় ক্রিয়ার ধারা যেখানে শেষ হইবে, তাহা তৃতীয় ক্ষণ। এইপ্রকার ধারাবাহিকভাবে ক্রিয়া চলিতেছে, অর্থাৎ ক্ষণ হইতেছে এবং এই একটী সম্পূর্ণ ক্রিয়ার ধারাকে বা এক একটী সম্পূর্ণ ক্ষণকে ক্রম বলে। একটী ক্রিয়ার ধারার আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত অংশকে একটী ক্ষণ বলে এবং তাহাই একটী ক্রম। এইরূপ পর পর ক্রিয়াভাবকে পর পর ক্রম বলে। একটী পদার্থের ঠিক পরক্ষণেই প্রথম পদার্থের অপগমে অপর দ্বিতীয় পদার্থের অবস্থিতি এবং দ্বিতীয় পদার্থের পরক্ষণেই দ্বিতীয় পদার্থের অপগমে তৃতীয় পদার্থের অবস্থিতি এবং এইরূপভাবে ক্রমান্বয়ে একটী পদার্থের অপগম ও অপর পদার্থের অভ্যুদয়—এইভাবে নিরন্তর সৃষ্টি, স্থিতি ও

প্রলয় কার্য্য নির্ব্বাহিত হইতেছে। এইরূপ প্রকৃতির মধ্যস্থ প্রত্যেক দ্রব্যেই নিরন্তর এই ক্রিয়াপ্রবাহ চলিতেছে। যদিও এই সূক্ষ্ম ক্রিয়াপ্রবাহ আমাদের স্থূল দৃষ্টিগোচর নহে, তথাপি পরমার্থদৃষ্টিতে ইহা নিরন্তর ক্রমানুসারে চলিতেছে। একটী ক্ষুদ্র শিশুর দেহ কয়েক বৎসরে একটী বৃহৎ মনুষ্যের কলেবরে পরিণত হয়। আমরা প্রতিদিন সহস্র চেষ্টা করিলেও, তাহার বৃদ্ধির পরিণাম লক্ষ্য করিতে পারি না; কিন্তু সে নিশ্চয়ই প্রতিক্ষণে একটু একটু করিয়া বর্দ্ধিত হইতেছে। এইরূপে জগতের যাবতীয় দ্রব্যেরই ক্ষণপরিণাম হইতেছে।

যাহা পরিণামপ্রাপ্ত হইয়া স্বরূপবিচ্যুত হয়, তাহা অনিত্য আর যাহার স্বরূপ সর্ব্বদাই একরূপ থাকে, তাহা নিত্য। গুণধর্ম্মের পরিণাম আছে কিন্তু গুণস্বরূপের পরিণাম নাই। প্রকৃতির তত্ত্বসমূহের পরিণাম ও বিকার থাকিলেও মূলা প্রকৃতির স্বরূপের বিকার হয় না। সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের স্বরূপের বিকৃতি হয় না। সত্ত্ব, রজঃ, ও তমোগুণের পরিমাণের ন্যূনাধিক্যবশতঃ নানাপ্রকার পদার্থ সৃষ্ট হয় কিন্তু তাহাদের বিকৃতি হয় না। পরিমাণের কমবেশী হইলেও স্বরূপের বিকৃতি হয় না। যেমন লাল, নীল, হরিৎ তিনবর্ণের সূত্রদ্বারা একটী দড়ি পাকাইলে তাহা এক গাছি দড়ি হয় বটে; কিন্তু সেই তিন বর্ণের সূতার লাল, নীল ও হরিদ্বর্ণের মিশ্রণ হয় না, তাহাদের বর্ণস্বরূপ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্রভাবে অবস্থান করে। লাল সূতা নীলের সঙ্গে মিলাইয়া যায় না। লাল সূতা বা নীল সূতার বর্ণের বিকার হয় না। সেইরূপ ত্রিগুণের পরিমাণানুসারে দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধ্যাদি নির্ম্মিত হয় বটে কিন্তু গুণের স্বরূপবিচ্যুতি হয় না। এইহেতু এই গুণসকলও নিত্য। এইহেতু পুরুষও যেমন নিত্য, প্রকৃতিও সেইরূপ নিত্য। তবে পুরুষের পরিণাম হয় না, কিন্তু প্রকৃতির পরিণাম হয়। এইজন্য পুরুষ অপরিণামী নিত্য বা কূটস্থ নিত্য, আর প্রকৃতি পরিণামী

নিত্য। প্রকৃতির গুণধর্ম্মের কার্য্যের শেষ হইলেই তাহার পরিণামের অন্ত হইল। তখন গুণসকল কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া প্রকৃতিতেই লীন হয়। যে জীব হইতে এইরূপে সমুদয় গুণকার্য্য শেষ হয়—সে মুক্ত হয়। যে জীব সাধন অবলম্বনে এইরূপে গুণের অধিকার হইতে অব্যাহতি পায়—সে মুক্ত হয়। পৃথিবীর সকল জীবই এইপ্রকারে মুক্ত হইলে পৃথিবী জনশূন্য হইতে পারে কি? এই প্রশ্নের যথার্থ নিশ্চয় উত্তর দেওয়া যায় না, তবে এ পর্য্যন্ত বলা যায়, যে সকল জীব সাধন দ্বারা গুণের অধিকার অতিক্রম করিবে, তাহারা মুক্ত হইবে; আর যাহারা গুণের অধিকার অতিক্রম করিবে না, তাহারা মুক্ত হইবে না। আমরা কতকগুলি প্রশ্নের নিশ্চয় উত্তর দিতে পারি, আর কতকগুলির পারি না। যদি প্রশ্ন হয়,—সকল জীব মরিবে কি? ইহার নিশ্চয় উত্তর দেওয়া যায় অর্থাৎ সকল জীবই মরিবে। যদি প্রশ্ন করা যায়,—সকল জীব জন্মিবে কি? ইহার নিশ্চয় উত্তর দিতে পারা যায় না, কারণ যাহারা মুক্ত হইবে, তাহারা জন্মিবে না; আর যাহারা মুক্ত হইবে না, তাহারা

পুরুষার্থশূন্যানাং গুণানাং প্রতিপ্রসবঃ কৈবল্যং স্বরূপপ্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তিরিতি ॥ ৩৪ ॥

পুরুষার্থশূন্য হইলে অর্থাৎ ভোগ ও অপবর্গশূন্য হইলে গুণসকলের অর্থাৎ কার্য্যকারণরূপে অবস্থিত সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের প্রতিপ্রসব হয় অর্থাৎ প্রলয় হয় অর্থাৎ প্রতিলোমগতিতে তাহারা নিজ মূলকারণে—অব্যক্ত প্রকৃতিতে গিয়া অবস্থান করে। ইহাকে কৈবল্য বলে; কিম্বা চিতিশক্তির স্বরূপপ্রতিষ্ঠা অর্থাৎ চিতিশক্তি যখন বৃত্তিরূপ গ্রহণ না

করিয়া নিজস্বরূপে অবস্থান করেন, তখন সেই স্বরূপপ্রতিষ্ঠাই কৈবল্য।

প্রকৃতি পরার্থ। প্রকৃতি নিজ প্রয়োজনসাধনার্থ কিছু করে না। প্রকৃতির বেশভূষা পুরুষের ভোগ বা অপবর্গের জন্য। প্রকৃতিকে অবলম্বন করিয়া পুরুষ ভোগও করিতে পারেন আবার মুক্তিও পাইতে পারেন। প্রবৃত্তিপথে পুরুষের ভোগ হয়, তখন পুরুষ ত্রিগুণের অধীন থাকেন—তখন পুরুষের গুণাধিকার ক্ষয় হয় না। আর পুরুষ নিবৃত্তিপথ অবলম্বন করিলে ত্রিগুণের অধীন থাকেন না, তখন পুরুষের গুণাধিকার শেষ হয়। তখন গুণও তাহার কার্য্য হইতে বিরত হয়—তখনই মুক্তি বা কৈবল্য হয়। তখন পুরুষ বদ্ধও হন না, মুক্তও হন না; কারণ পুরুষের বন্ধন কোন কালে ছিল যে ভ্রমদর্শনে পুরুষ বদ্ধ বলিয়া অনুভব করিতেছিলেন সেই ভ্রম অপগত হয়। বস্তুতঃ পুরুষ চিরমুক্ত। ভ্রান্তির অপনোদনই সাধন। জগতে জাগতিক বস্তুসমূহে সুখও নাই আর দুঃখও নাই। যতদিন তুমি এই সুখদুঃখের মধ্যে থাকিবে, ততদিন তোমার বন্ধন, এই সুখদুঃখের অতীত হইলেই মুক্তি। জগৎ নাই—একমাত্র ব্রহ্মই আছেন। জগৎ নাই বলিলেই ত জগৎ লোপ পাইবে না। ইহার জন্য দৃঢ় সাধন কর—সাধন করিতে করিতে সকল বিষয় বুঝিতে পারিবে। তখন বিবেকরূপ সুবাতাস প্রবাহে তোমার সকল মোহ ও সংশয়মেঘ দূরীভূত হইবে। সুতরাং বুদ্ধি নির্ম্মল হইলেই সমস্ত বুঝিতে পারিবে। বুদ্ধিতে ময়লা থাকিলে বুঝিতে পারিবে না। শাস্ত্রানুযায়ী কার্য্য কর, নিজেকে অতি বুদ্ধিমান্ ভাবিও না। এইরূপে নিজেকে অতি বুদ্ধিমান্ ভাবিয়াই অধিকাংশ লোক নরকের পথে অগ্রসর হইতেছে। সাবধান! সাবধান! সাবধান!

কৈবল্যপাদ সমাপ্ত।

পরিশিষ্ট।

ঋষিবাক্য সত্য। তাঁহারা যাহা আদেশ করিয়াছেন—তাহা পালন করিলে আমরা সুখী হইব। আমাদের বুদ্ধি মলিন। আমাদের বুদ্ধি অনুযায়ী কার্য্য করিলে - আমরা দুঃখ পাইব।

যোগসিদ্ধ না হইলে আমরা দুঃখের হাত হইতে ত্রাণ পাইব না। চিত্তবৃত্তির নিরোধ করাকে যোগ বলে। চিত্তের সংস্কার হইতে চিত্তের বৃত্তির উদ্ভব হয়। চিত্তের সংস্কার ক্ষীণ হইলেই চিত্তবৃত্তির নিরোধ হয়।

যোগসিদ্ধ হইলে আমাদের আত্মদর্শন হইবে। আমাদের আত্মবিস্মৃতি লোপ পাইবে। যাহার আত্মস্মৃতি সর্ব্বদা জাগরূক, সেই সুখী। আমরা শরীরাদি নহি—আমরা আত্মা।

চিত্তের দুইপ্রকার বৃত্তি,—সৎ ও অসৎ। অসৎ বৃত্তি যেমন কাম, ক্রোধ প্রভৃতি মনে উঠিলে তাহার কার্য্য করিবে না এবং সৎ বৃত্তি যেমন দয়া, ক্ষমা প্রভৃতি মনে উঠিলে সেই বৃত্তির কার্য্য করিবে। ফলকামনা ত্যাগ করিয়া কার্য্য করিলে আর নূতন সংস্কার সঞ্চিত হইবে না এবং পুরাতন সংস্কার ক্রমে ক্রমে লয়প্রাপ্ত হইয়া চিত্তলয় হইবে।

প্রাণপণে আলস্য ও অধিক নিদ্রা ত্যাগ করিবে। ইহারা তমোগুণের কার্য্য। তমোগুণের যত ক্ষয় হইবে—সত্ত্বগুণ ততই বর্দ্ধিত হইবে। রজোগুণের সাহায্যে তমোগুণকে ক্ষয় করিয়া সত্ত্বগুণ বর্দ্ধিত করিবে। সত্ত্বগুণ যতই বর্দ্ধিত হইবে—তুমি ততই সুখী হইবে।

প্রবৃত্তিপথ একেবারে ত্যাগ করিবে। নিবৃত্তিপথের অনুসরণ করিবে। সর্ব্বদা অভ্যাস ও বৈরাগ্য লইয়া থাকিবে। নিরন্তর যোগভ্যাস করিবে। শ্রদ্ধাসহকারে যোগাভ্যাস করিবে। যাহার যোগাভ্যাসে

শ্রদ্ধা নাই, তাহার যোগসাধন হইবে না। এই অভ্যাস ও বৈরাগ্য-সহকারে যোগসাধন করিলে শীঘ্রই চিত্তবৃত্তিনিরোধ হইবে। এই সাধনা প্রবল উত্তমসহকারে করিবে। তোমার চেষ্টা যত প্রবল হইবে, মুক্তি তত শীঘ্র হইবে।

শ্রদ্ধা, বীর্য্য, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞার সাধন করিবে। শ্রদ্ধা হইতে বীর্য্য হয়, বীর্য্য হইতে স্মৃতি হয়, স্মৃতি হইতে সমাধি হয়, আর সমাধি হইতে প্রজ্ঞা হয়। প্রথমাভ্যাসীর পক্ষে এই সাততিক স্মৃতিসাধনই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠসাধন।

বিক্ষিপ্ত চিত্তকে একাগ্র করিবার চেষ্টা করিবে। যাহার চিত্ত যত একাগ্র হইয়াছে—সে সাধনে তত অগ্রসর হইয়াছে। যোগসাধনদ্বারা চিত্ত একাগ্র হয়। সর্ব্বদা মানসিক জপ লইয়া থাকিলে চিত্ত সহজে ও শীঘ্র একাগ্র হয়।

সাত্ত্বিক আহার ও বিহার দ্বারা শরীর ও মন সুস্থ রাখিবে। শরীর ও মন সুস্থ রাখিতে না পারিলে সাধন হইবে না। ব্যাধি, স্ত্যান, সংশয়, প্রমাদ, আলস্য, অবিরতি, ভ্রান্তিদর্শন, অলব্ধভূমিকত্ব ও অনবস্থিতত্ব এই নয়টী আমাদের শত্রু। ইহারা আমাদের সাধনের বিঘ্ন। ইহাদিগকে সর্ব্বদা জয় করিবার চেষ্টা করিবে।

সর্ব্বদা মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষার সাধন করিবে। এই চারিটী সাধন না করিলে তোমার কিছুতেই কিছু হইবে না।

তপস্যা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রণিধান এই তিনটী ক্রিয়াযোগ। এই ক্রিয়াযোগের দ্বারা আমাদের অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ এই পাঁচটী ক্লেশ দূর হইবে।

আমরা সৎ বা অসৎ যে কিছু কর্ম্ম করি, চিত্তে তাহার সংস্কার পতিত হয়। এই সংস্কার হইতে আমরা জাতি, আয়ুঃ ও ভোগ লাভ করি। সংস্কার তিনপ্রকার,—সঞ্চিত, প্রারব্ধ ও ক্রিয়মান। এই

সংস্কার লইয়া আমাদের কর্ম্মাশয় প্রস্তুত হয়। এই সংস্কারই আমাদের সমুদয় ক্লেশের মূল। এই কর্ম্মাশয়ই আমাদের জন্মের বীজস্বরূপ। এই কর্ম্মাশয় ধ্বংস হইলে আর জন্ম হয় না। যাহার যেরূপ কর্ম্ম সে সেইরূপ জাতি, আয়ুঃ ও ভোগ লাভ করে।

আমরা সৎকর্ম্মদ্বারা আমাদের অসৎকর্ম্মাশয় ক্ষয় করিতে পারি। যদি তোমার পূর্ব্বজন্মের বা ইহজন্মের কোন বৃহৎ পাপকর্ম্মাশয় থাকে, তাহাহইলে, পুণ্যকার্য্য করিলে সেই পাপকর্ম্মাশয় ক্ষীণ করিতে পারা যায়। আবার যদি তোমার কোন পুণ্যকর্ম্মাশয় থাকে, তাহা হইলে, পাপকার্য্য করিলে সেই পুণ্যকর্ম্মাশয় ধ্বংস হইতে পারে। সর্ব্বদা ফলাকাঙ্ক্ষারহিত হইয়া পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে।

অতীত দুঃখের বিষয় চিন্তা করিয়া কোন ফল নাই। যে দুঃখ বর্ত্তমানে ভোগ হইতেছে—তাহা ভোগ হইয়া শেষ হইবে। কেবল ভবিষ্যৎ দুঃখের প্রতিকারজন্য প্রবল চেষ্টা করিবে। পুনর্জ্জন্ম আমাদের একটী প্রধান ভবিষ্যৎ দুঃখ। অতএব এই পুনর্জ্জন্ম নিবারণের চেষ্টা করিবে।

শরীর, ইন্দ্রিয় ও মন প্রভৃতি দৃশ্য। দৃশ্য "আমি" নহি। যতদিন দৃশ্যে অভিমান থাকিবে, ততদিন ক্লেশও থাকিবে। "আমি দ্রষ্টা—আমি চিরসুখী। আমার দুঃখ কোনকালে ছিল না, এখনও নাই এবং ভবিষ্যতেও হইতে পারে না। আমি সৎ, চিৎ ও আনন্দস্বরূপ।" প্রবল পুরুষকারসহযোগে দৃশ্যে এই অভিমান ত্যাগ কর।

যোগের আটটী অঙ্গ। (১) যম, (২) নিয়ম, (৩) আসন, (৪) প্রাণায়াম ও (৫) প্রত্যাহার—এই পাঁচটী বহিরঙ্গ সাধন এবং (৬) ধারণা, (৭) ধ্যান ও (৮) সমাধি—এই তিনটী অন্তরঙ্গ সাধন। তন্মধ্যে যম পাঁচপ্রকার,—অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ এবং নিয়ম পাঁচ প্রকার,—শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রণিধান। যথাশক্তি এই অষ্টাঙ্গযোগ সাধন করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিবে।

- জ্যোতির্দর্শন, দেবদর্শন বা অন্য কোনপ্রকার ঐশ্বর্য্য বা বিভূতি তোমার সাধনার লক্ষ্য নহে। যতদিন দৃশ্যদর্শন থাকিবে, ততদিন তুমি বদ্ধ। কৈবল্যই তোমার সাধনের লক্ষ্য হইবে। দৃশ্যদর্শনে বিমোহিত হইও না। এই সকল দৃশ্য আমাদের বিশেষ কোন উপকারে আসে না। সাধন করিতে করিতে ঐশ্বর্য্যলাভ আপনা হইতেই হয়। প্রকৃত সাধক ইহাতে আসক্ত হন না।

চিত্তের দুইটী পরিণাম হয়। (১) ব্যুত্থানপরিণাম ও (২) নিরোধপরিণাম। নিরোধপরিণাম বর্দ্ধিত করিয়া ব্যুত্থানপরিণামের ধ্বংস করিবে। চিত্তের নিরোধপরিণাম বর্দ্ধিত হইলে, সমাধি হইবে।

সর্ব্বদা আত্মচিন্তা করিবে। "আমি কে? কোথা হইতে আসিলাম? কোথায় যাইতেছি? কি করিতে আসিয়াছি? কোথায় যাইব? আমার কে আছে? আমার প্রকৃত মিত্র কে? আমার এ দুঃখ কেন? এ দুঃখ কোথা হইতে আসিল? আমার কার্য্যের দ্বারা আমার সুখ হইবে, না দুঃখ হইবে? আমার পিতামাতা বা আত্মীয়স্বজনাদির সহিত আমার কতদিন সম্বন্ধ থাকিবে? আমার এ ঘরবাড়ী, টাকাকড়ি ও বিষয়সম্পদ কি চিরকাল থাকিবে? এ দেহ কি চিরদিন থাকিবে? এ যৌবন কি চিরদিন থাকিবে? আমি কি কখনও বৃদ্ধ ও জরাগ্রস্ত হইব?" সর্ব্বদা এইরূপ চিন্তা করিলে তত্ত্বজ্ঞান লাভের ইচ্ছা হইবে ও তুমি প্রকৃত পথের সন্ধান পাইবে। তুমি এক্ষণে অজ্ঞানে কুপথে ভ্রমণ করিতেছ ও দুঃখের উপর দুঃখ সঞ্চয় করিতেছ।

মনুষ্যজীবন অসার ধনসম্পত্তি লাভের জন্য নহে। মোক্ষলাভের জন্য। যাহার মোক্ষলাভ না হইল, তাহার জীবন বৃথায় গেল। অতএব মোক্ষলাভজন্য প্রাণপণ করিবে।

তুমি যে অবস্থায় আছ, সেই অবস্থাতে থাকিয়াই সাধন করিবে। ঐ অবস্থাই তোমার সাধনের অনুকূল। তুমি নিজ সংকল্পদ্বারা তোমার

ঐ অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছ। তুমি তোমার স্ত্রী, পুত্র, স্বজন ও স্বদেশ-বাসীর নিকট ঋণী—তুমি তাহাদের ঋণ পরিশোধ করিয়া সংস্কার ক্ষয় না করিলে তোমার চিত্ত শুদ্ধ হইবে না।

তুমি কর্ত্তা সাজিও না। তুমি ভগবানের দাস বা দাসী মাত্র। তুমি তাঁহার প্রীত্যর্থে নিষ্কামভাবে কার্য্য কর। কোন ফলের আশা করিও না। তিনি তোমায় কখনও সুখদান করিবেন, আবার কখনও দুঃখদান করিবেন—তোমার সংস্কারক্ষয়ের জন্য। তুমি এই সুখদুঃখ তাঁহার দান বলিয়া গ্রহণ করিবে ও নির্ব্বিকারচিত্তে ভোগ করিবে। কখনও মনে অসন্তোষের ভাব আনিও না। সংস্কারজনিত কষ্টকে কষ্ট বলিয়া অনুভব করিও না। মনে করিবে—তুমি এই কষ্ট সহ্য না করিলে তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে না। পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইলে, তোমার পাপ ক্ষীণ হইবে—তোমার চিত্তশুদ্ধি হইবে। তোমাকে কেহ গালাগালি দিলে, তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল বলিয়া মনে করিবে—ভৎর্সনাকারীর উপর ক্রুদ্ধ হইও না। এইরূপে সংসারের সকল কষ্ট সহ্য করিবার চেষ্টা কর; তাহাতে তোমার উপকার হইবে। যাহারা বিনাদোষে তোমায় গালাগালি দেয়, তাহারা তোমার পরম মিত্র—তাহারা তোমার মহা উপকার সাধন করে। তুমি কায়মনোবাক্যেও তাহাদের অপকার করিও না। তাহাদের প্রতি হিংসাভাব পোষণ করিও না। তাহা করিলে তোমার চিত্ত মলিন হইবে এবং সংস্কারবৃদ্ধি হইবে। অতএব সাবধান! শত্রুর প্রতি হিংসা বা দ্বেষভাব পোষণ করিও না। যদি কর, তাহাহইলে, তোমার নিজেরই অমঙ্গল হইবে। সর্ব্বদা তাহাদের মঙ্গল চিন্তা করিবে, তাহাহইলে, তোমার চিত্ত শুদ্ধ হইবে। শত্রুর অনিষ্ট না করিয়া তাহাকে ক্ষমা করিবে। প্রত্যেক সংসারী মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষার সাধন করিলে, সংসারে তাহাদের আর কোন কষ্ট হইবে না।

নিতান্ত আবশ্যক না হইলে কাহারও সেবাগ্রহণ করিবে না; পরন্তু প্রাণপণে সকলের সেবা করিবে। সেবাগ্রহণ করা—পাপ, আর সেবা করা—পুণ্য। মাথা নীচু করিয়া সর্ব্বদা সংসারের ও দেশের সেবা করিবে। মনের মধ্যে অহঙ্কার ভাব আনিও না।

"তৃণাদপি সুনীচেন—তরোরপি সহিষ্ণুনা—অমানিনা মানদেন—কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।" অহঙ্কারে মত্ত হইও না। অপরের নিকট নিজেকে তৃণ অপেক্ষাও অধম বিবেচনা করিবে। জগতের দুঃখ কষ্ট বুক পাতিয়া সহ্য করিবে। দেখ, বৃক্ষের শাখা ছেদন করিলেও সে তাহা সহ্য করে এবং ছেদনকারীকে ফল ও ছায়াদানে কুণ্ঠিত হয় না। অনেক লোক মান পাইবার আশায় তোমার নিকট আসিবে, তাহারা সে মানের উপযুক্ত পাত্র নহে, ইহা জানিয়াও তুমি তাহাদিগকে মানদান করিতে কুণ্ঠিত হইও না। যাহারা তোমার সহিত তর্ক করিতে আসিবে, তুমি তাহাদিগের নিকট মূর্খ সাজিবে—অনর্থক তর্ক করিয়া বৃথা সময় নষ্ট করিও না। তুমি তাহাদিগকে বিনা আপত্তিতে "জয়পত্রিকা" লিখিয়া দিবে। সর্ব্বদা শ্রীহরিকে স্মরণ করিবে। এক মুহূর্ত্তের জন্যও ভগবানকে বিস্মৃত হইও না। "করেতে করহ সংসারের কাজ, হৃদয়েতে ভাব সেই রসরাজ।" হস্তপদে সংসারের কাজ করিবে কিন্তু মনে সর্ব্বদা মানসিক জপ লইয়া থাকিবে। ভগবানকে ভুলিয়া কাজ করিলে তাহা তোমার আসক্তি-যুক্ত কর্ম্ম হইবে এবং তাহা বন্ধনের কারণ হইবে। তুমি তোমার শরীর, ইন্দ্রিয় বা মনের তৃপ্তিজন্য যে কার্য্য করিবে, তাহা পাপকার্য্য—তাহা তোমার বন্ধনের কারণ হইবে। তুমি ঈশ্বরের দাস বা দাসী-স্বরূপ তাঁহার প্রীতির জন্য যে কার্য্য করিবে—তাহা তোমার মুক্তির কারণ হইবে। যে কার্য্যে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি আছে—সে কার্য্য কুকার্য্য; আর যে কার্য্য ঈশ্বরপ্রীত্যর্থে হইবে—তাহা সৎকার্য্য।

বাঁশে ঘুণ ধরিলে যেমন বাঁশ অন্তঃসারশূন্য হয়, আমাদের জাতির অন্তরে ঘুণ ধরায় সেইরূপ অন্তঃসারশূন্য হইয়াছে। নিজের বা দেশের উন্নতিসাধন করিতে হইলে অলসতা ও বিলাসিতা ত্যাগ করিতে হয়। জগতে যত মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা কেহই অলসতা ও বিলাসিতার প্রশ্রয় দেন নাই। যে দেশের লোকে বেলা ৮টা পর্য্যন্ত নিদ্রা যায়, অনর্থক তর্ক ও পরচর্চ্চা লইয়া থাকে এবং কুরুচিপূর্ণ নাটক নভেলাদি পাঠ করিয়া জীবনের অমূল্য সময় ব্যয় করে; চা, পান, তামাক, গাঁজা, গুলি ও মদ খাইয়া পয়সা নষ্ট করে; বিবাহে কন্যার পিতাকে নিপীড়িত করিয়া তাহার শোণিতপানে লোলুপ; প্রতিবাসীর ঐশ্বর্য্যদর্শনে হিংসানলে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরে; ফুটবল খেলিয়া ও সাঁতার কাটিয়া বাহাদুরী জানায়; বায়স্কোপ, থিয়েটার দেখিয়া ও চপ্ কাটলেট্ খাইয়া পিতামাতার পয়সা নষ্ট করে; তাহাদিগের উন্নতি সুদূরপরাহত। দেশের উন্নতিকামী হইতে হইলে, অলসতা ও বিলাসিতা সম্পূর্ণ ত্যাগ করিতে হইবে। যাহা না খাইলে জীবন রক্ষা হয় না, সেইরূপ খাদ্য খাইবে। যাহা না পরিধান করিলে লজ্জানিবারণ হয় না, সেইরূপ বস্ত্রদ্বারা শরীর আ— করিবে। অনর্থক অর্থ নষ্ট না করিয়া সেই অর্থ সংগ্রহ করিয়া বৃহৎ বৃহৎ হিতকর অনুষ্ঠান করিবে। এই সকল বৃথা বিলাসিতায় প্রতি বৎসর আমাদের কোটী কোটী টাকার অপব্যয় হইতেছে। এই অর্থদ্বারা আমরা অনেক সদনুষ্ঠান করিতে পারি। ভারতের সম্পত্তি—ভারতের মাটী। ভারতের রক্ষাকর্ত্রী—ভারতমাতা। কিছু ধান্য ও তুলাগাছ ও দুই একটী গাভী থাকিলেই আমাদের সকল অভাবমোচন হয়—সর্ব্বসুখে সুখী হইতে পারি; উদরান্নের জন্য ভিখারীর ন্যায় দ্বারে দ্বারে ঘুরিতে হয় না।

সম্পূর্ণ।